নিউ এজ পাবলিকেশন্স

কল্যাণীয়া মিঠুকে

লেখাগুলি সবই 'দেশ' সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। আমার এই দীর্ঘ জীবনে অনেক লোকের সঙ্গে মেশবার এবং জানবার সুযোগ হয়েছে, যাঁদের কাজ ও জীবন আমাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁদের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি; সকলের দেওয়া সম্ভব হয়নি, আরও কিছু বেশী লোকের যদি দিতে পারতাম তাহলে খুশী হতাম।

যাঁদের কাছ থেকে আমার জীবনে নানা রকম সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কয়েক-জনের সামান্য পরিচয় এতে দেওয়া হল। এটা আমার শ্রদ্ধার্ঘ, যেমন (মাস্টারমশাই) যতীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ আশুতোষ দাস, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, হেমন্তকুমার বসু, নির্মলকুমার বসু, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, অনুকূল চক্রবর্তী, গোষ্ঠবিহারী বেরা, ইন্দ্র-নারায়ণ সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রকাশ—এঁরা সকলেই আমার প্রণম্য। আমার সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কামরাজ, এস. কে. পাতিল, নিজলিঙ্গাপ্পা, কে. সি. আব্রাহাম, মাইকেল জন, সঞ্জীব রেড্ডি—এঁরা সব আমার সহকর্মী এবং সহায়ক। আরও যাঁরা আছেন তাঁদের তালিকা করতে গেলে একটা বড় বই হয়ে যাবে। এ-ছাড়া সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অনেকে আছেন যাঁদের নাম ভোলা শক্ত। স্নেহাস্পদ যারা, জায়গায় জায়গায় তাদের নাম উল্লেখ থাকলেও, তাদের নাম আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়। মা ও মেয়েদের কথা যদি বলি, প্রথমেই মনে পড়ে আমার সহকর্মী সুকুমার দত্ত-র মায়ের কথা; বড়ডোঙ্গল-এর হাবুর মা'র কথাও ভোলবার নয়। আর স্নেহাস্পদ শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মায়ের কথা চিরকালই মনে থাকবে।

ভারতবর্ষে সর্বত্রই একটা জিনিস পাওয়া যায় যে, আমাদের মত যারা বাল্যকালে ঘর ছেড়েছিলাম, তাদের কাজে টিকে থাকবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন মেয়েদের স্নেহ ও ভালবাসা। অফুরন্তভাবে আমি ভারতবর্ষের সর্বত্র এ সৌভাগ্য লাভ করেছি।

মানুষের কথা বাদ দিলে তারপরই আসে ভারতবর্ষের দিকে দিকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, যা মনকে অভিভূত করে দেয় এবং প্রেরণা যোগায়, তার উল্লেখ। পাহাড়, জঙ্গল, জনপথ, গ্রাম, কোথাও উর্বরা শস্যশ্যামলা, কোথাও রুক্ষ কঠিন, বড় বড় নদী কোথাও ভীষণমূর্তি, কোথাও শান্ত, স্থির ও নম্র। সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় মন যেমন দিগন্তের দিকে ছুটে যায়, তেমনি মহা ঐশ্বর্যশালী হিমালয়ের কাছে মাথা আপনাআপনি নত হয়ে আসে। একবার জওহরলালের সঙ্গে দেখা করার নির্ধারিত সময়ে দেখা করতে পারিনি—কৈফিয়ত হিসেবে বলেছিলাম যে, আমি তীর্থ-দর্শনে গেছলাম—'ভাকরা-নাঙ্গাল'। জওহরলাল খুব উপভোগ করেছিলেন। আমাদের সুযোগ হয়েছে ভারতবর্ষের নতুন নতুন তীর্থ দেখবার; এ সম্পদ মহামূল্য। এই অনুভূতির কিছুটা অবশ্য বোধহয় লেখার মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে।

'কষ্টকল্পিত' লেখার মধ্যে যে ভুল-ত্রুটি আছে তার জন্য শ্রীমান গৌর (গৌরকিশোর ঘোষ) ও মিঠু (ইন্দ্রাণী দে) দায়ী।

এইভাবে নিয়মিত যে কোনদিন লিখব ভাবিনি। লিখতে তো কষ্ট হয়েছে এবং কল্পনা যখনই করা হয়েছে, তার মধ্যে খানিকটা তো ভুল-প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক।

অতুল্য ঘোষ

ঘুরতে ঘুরতে মাইহারে গিয়ে হাজির হলুম। ছোট্ট রাজ্য। কিন্তু সব আছে—প্রাসাদ আছে, চক আছে, কারুকার্য করা আলোকস্তম্ভ আছে, বাঁধানো পুকুর আছে, হাতীশাল আছে, আরও—যা যা দেশীয় রাজ্যে থাকে, সবই আছে। ছোট হলে কি হবে—মাইহারের নাম ভারতের গুণী সমাজের সকলেরই জানা। ভারতবর্ষের বাইরেও গিয়ে পেঁছেছে। বিক্রমাদিত্যের সভার নাম চিরকাল থাকবে। সেখানে কত বড় 'নবরত্ন'। কিন্তু বরাহ-মিহিরের চেয়ে কালিদাসের নামই লোকে বেশী জানে। আকবরের সভার নাম ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আবুল ফজলের খুব নাম। কিন্তু তানসেনের নাম—সে তো কেউ কোনদিন ভুলবে না। তেমনি ছোট্ট মাইহারের—আলাউদ্দিন। আচার্য। তুলনা নেই। আর যত দিন যাবে, তত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লোক স্মরণ করবে। এমন একটি নাম।

আমি যখন গিয়ে পেঁছিলুম, বেলা তখন প্রায় ন'টা। দেখলুম সামনের ছোট্ট বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। হাতে একটা থলে জাতীয় জিনিস। আমি প্রণাম করলুম। আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বোধ হয় চিনতে পারেননি—আমি নামও বলিনি। যথোচিত কুশল প্রশ্নাদির পর একটু সলজ্জ হেসে বললেন, "আমি তো দেবীপক্ষে মাছ খাই না। আশিস্ আসছে—তাই বাজারে মাছ কিনতে যাচ্ছি।" গায়ে ফতুয়া পরনে লুঙ্গি। আর বয়স তখন এক শ উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘরে প্রকাণ্ড কালীর ছবি। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি দেখলুম ওঁকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। এর মধ্যে অবশ্য আমার মিষ্টিমুখ করা হয়ে গেছে, কারণ আমি পুজোর পর গেছি।

নাম না বলার জন্য অবশ্য দণ্ড পেতে হয়েছিল। আমার পরই ওঁকে প্রণাম করতে কয়েকজন বাঙালী যুবক গিয়ে হাজির হয়। তাদের মুখে আমার নাম শুনে মৃদু অনুযোগ করেন কেন আমি পরিচয় দিইনি। ফলে আমাকে আবার মাইহারে গিয়ে প্রণাম করে খেয়ে আসতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার জীবনের প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরিয়ে সটান শান্তিনিকেতন গেলুম। 'চার অধ্যায়' পড়ে খুব উত্তেজিত। গেছলুম—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে। কারণ, আমরা যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলুম, তাতে ব্রহ্মবান্ধব আমাদের মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করেছে, তাঁর সম্পাদিত "সন্ধ্যায়" একটি ছবি বেরোল। ব্রহ্মবান্ধবের মাথায় টোপর এবং দুই হাতে দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্রিটিশ সরকারকে দেখাচ্ছেন। কাজেও হয়েছিল তাই। তাঁর বিচার শেষ হবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব পরলোকগমন করেন।

বোলপুরে যাবার জন্য যখন ট্রেনে চেপেছিলুম, তখন যে মনোভাব ছিল, বোলপুর স্টেশনে যখন নামলুম, মানসিক উত্তেজনা তখন অনেকটা কমে গেছে। মনের মধ্যে তখন দ্বিধা, গিয়ে কি বলব। দেখা হওয়া সম্বন্ধে মনে কোন ভাবনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে যোগাযোগ

ছিল। সেইজন্য খবর না দিয়ে গেলেও দেখা হত। যথাসময়ে দেখা করে কথাবার্তা বলে ফিরে এলুম পান্থশালায়। দুদিকে দুটি মাটির ঘর, মাঝখানে একটি ঢাকা বারান্দা—এরই নাম 'পান্থশালা'। অনেক অতিথি তখন সেখানে থাকতেন। রাত্রি সাড়ে আটটায় খাওয়া শেষ হয়েছে। নটার মধ্যেই শুয়ে পড়েছি। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে একটু গোলমাল শুনতে পেলুম। একজন যেন অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন—আর একটি খুব মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, "কালী, কালী; গুরুদেবের এখানে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এর মধ্যে আবার তর্কাতর্কি কেন? কালী, কালী"। যাই হোক, একটু বাদেই সব শান্ত। কিছুক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এল—কেউ যেন তারের যন্ত্র বাজাচ্ছেন। মনে হল, শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় এটা খুব স্বাভাবিক। আমি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলুম। কিছুক্ষণ বাদেই বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালুম। আরও খানিক বাদে বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। একটি খর্বাকৃতি লোক বারান্দায় বসে আছেন, পরনে লুঙ্গি। তিনিই আলাপ করছেন। আর, বোধ হয়, সামনে এক তাড়া বিড়ি। দেড় ঘন্টা বাদে বাজনা থামল। বললেন, "কালী, কালী। গুরুদেবের কাছে আমাদের আবার ইজ্জত।" খানিক বাদে আবার বাজনা আরম্ভ হল। এইভাবে রাত চারটে অবধি কাটল। একমাত্র শ্রোতা আমি, আর বাজাচ্ছেন—আলাউদ্দিন স্বয়ং। আমরা যে যার ঘরে চলে গেলুম। পান্থশালার এক ঘরে উনি, এক ঘরে আমি। সকালে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলেন, "থাকছেন তো?" আমি সবিনয়ে উত্তর দিলুম, "আজ তো থাকবই।" সেদিনও প্রায় সারা রাত আমার একমাত্র শ্রোতা হয়ে তাঁর সামনে বসে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। গান্ধীজী নিজে বাছাই করেছেন, আর বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা বাছাই শুরু করে দিয়েছেন। বাঙলা দেশের ভার ছিল শ্রদ্ধেয় সতীশ দাশগুপ্ত মশায়ের উপর। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন পঞ্চাননদা (পরলোকগত শ্রীপঞ্চানন বসু)। গান্ধীজী বলেছিলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীরা যতক্ষণ না গ্রেপ্তার হন, ততক্ষণ পর্যন্ত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। এই দিল্লী যাবার ব্যাখ্যা নিয়েই আমার সঙ্গে একটু মতান্তর হল। কর্তৃপক্ষ বললেন যে, বাড়ি থেকে বেরিয়েই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দিল্লী অভিমুখে যেতে হবে। আমি সানুনয়ে নিবেদন করলুম যে, নিশ্চয়ই দিল্লী অভিমুখে যাবে, কিন্তু সারা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে। অনুমতি মিলল না। আর একটা ছোট ব্যাপারও ছিল। ডঃ ভূপেন দত্ত মশাই সত্যাগ্রহী হতে চাইলেন। আপত্তি উঠল—তিনি খদ্দর পরলেও ভেতরের গেঞ্জিটা খদ্দরের নয়। আমি খুব ক্ষুণ্ণ হলুম—কিন্তু নিরুপায়।

দু-একদিনের মধ্যেই কাগজে খবর বেরোল—গান্ধীজী এলাহাবাদ আসছেন, হয় কমলা নেহরু হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করতে, অথবা হাসপাতালের উদ্বোধন করতে। মনঃস্থির করে ফেললুম যে, গান্ধীজীর কাছে যেতে হবে। জওহরলাল তখন জেলে। আনন্দ ভবনে তখন আছেন গান্ধীজী, রাজেন্দ্রবাবু—কংগ্রেস সভাপতি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী, মহাদেব দেশাই এবং আরও কেউ কেউ। আমার এলাহাবাদ যাবার কোনও অসুবিধে নেই—কারণ, গান্ধীজী আমায় চিনতেন না। এলাহাবাদে যে হোটেলে উঠলুম সেখানে ছিলেন বাংলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ঊর্ধ্বতন পরিষদের কংগ্রেস নেতা শ্রীকামিনীকুমার দত্ত এবং আসামের চিফ্ হুইপ শ্রীরবীন্দ্রকুমার আদিত্য। কিরণবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হাত জোর করে অনুরোধ করলুম একবার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অতিশয় ভদ্র কিরণবাবু একটু হেসে বললেন, "আমরাই মোটে পাঁচ মিনিট সময় পেয়েছি।" এর পর আর অনুরোধ করা চলে না। কিরণবাবুরা বেরিয়ে গেলেন। আমিও তারপর ভয়ে ভয়ে আনন্দ ভবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আনন্দ-ভবনে গিয়ে জওহরলালের সেক্রেটারী উপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলুম। উপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল। উপাধ্যায় মশাই আসতে একটা কাগজে কয়েকটা কথা লিখে তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, "এটা মহাদেব দেশাইকে দেবেন। আমি ফিরে যাচ্ছি।" উপাধ্যায় মশাই একটু বিব্রত বোধ করে বললেন, "সে কি কথা ? আপনি একটু বসুন। আমি কাগজটা মহাদেব দেশাইকে দিই। তারপর তিনি কি বলেন আপনাকে জানাব।" বসলুম, পনের মিনিট গেল, কুড়ি মিনিট গেল। তখন ঠিক করেছি, আধ ঘন্টা গেলেই চলে যাব। আধ ঘন্টা হয়ে গেল। তখন ঠিক করলুম—আরও পনের মিনিট। এমন সময় দু'জন সেবা-দলের কর্মী এসে জানালেন যে, আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। কার কাছে বললেন না। আমার তখন মনের মধ্যে নানারকম ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। একটি বড় ঘরের দরজার গোড়ায় সেবাদলের কর্মীরা আমায় পোঁছে দিলেন। দেখলুম —কিরণবাবু, কামিনীবাবু, রবীন্দ্রবাবু বেরিয়ে আসছেন। কিরণবাবু স্বভাবসুলভ হেসে বললেন, "বাহাদুর বটে। খোদ কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন।" শুনে আমার পা দুটো পাথরের মত ভারী বলে মনে হল। যাই হোক, কোনরকমে তো ঘরে ঢুকে পড়লুম। এমন সময় কানে এলো, "কিরণ, তোমার মেয়ে কেমন আছে এখন ?" সেই চির পরিচিত কণ্ঠস্বর। বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ে গেল—কাগজে বেরিয়েছে কিরণবাবুর মেয়ে অসুস্থ। চেয়ে চেয়ে দেখলুম যে, গান্ধীজী বসে আছেন—বুক তখনও ধড়াস-ধড়াস করছে। তাঁর পাশে রাজেন্দ্রবাবু, তাঁর পাশে আচার্য কৃপালনী। মনে হল, আমরা কত ক্ষুদ্র। আমি কিরণবাবুর সঙ্গে এক ট্রেনে এলুম, এক হোটেলে রইলুম—একবারও তাঁর মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করিনি। আর যিনি সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাচ্ছেন, এই ছোট্ট খবরটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

প্রণাম করে সামনে বসে পড়লুম। দেখলুম, হাতে আমি যে কাগজটা মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়েছিলুম, সেটা রয়েছে। শিউরে উঠলুম। আমার হাতের লেখা আমার নিজেরই পড়তে কষ্ট হয়। কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, আমি উত্তর দিলুম। সব অনুমতিই মিলল—ডাঃ ভূপেন দত্তের সত্যাগ্রহী হওয়া এবং বাংলাদেশের সত্যাগ্রহীরা বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করে অন্য প্রদেশে যাবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে

বলতে হবে যে, দিল্লী যাচ্ছি; আর মুখে ধ্বনি দিতে হবে "দিল্লী চলো।" পরের দিন সকালে তাঁর প্রাতঃভ্রমণের সময় আমায় দেখা করতে বললেন। আমি তো প্রণাম করে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু পা ভাঙ্গা, ওঁর সঙ্গে হাঁটব কি করে?

পরের দিন সকালে ওঁর সঙ্গে বেরোলুম। বিশদ ভাবে বাংলা দেশের সব খবর নিলেন। খানিকটা হাঁটবার পরই আমি পিছনে ছিলুম, আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "Young man, তুমি আমায় বলনি কেন যে, তোমার পা injured!" আমি তো অবাক। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না—উনি সামনে, আমি পিছনে; আমি যদি পা একটু টেনেও চলে থাকি, উনি জানতে পারলেন কি করে? ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে আছে। প্রথমেই কিরণবাবুর মেয়ের কথা, তারপরেই আমার শারীরিক অক্ষমতার জন্য সমবেদনা—ঘটনাগুলো বুদ্ধিতে পাওয়া যায় না। এঁকে কি বলব? জনগণমন অধিনায়ক অথবা ঋষি ও দ্রষ্টা?

কলকাতায় আমাদের বাড়ির সামনে একটা মস্ত বড় বাড়ি ছিল। উচ্চতায় বড় নয়, আয়তনে বড়। রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি টানা বারান্দা। ভেতরে ঠাকুরদালান। দুটো বড় ফল আর ফুলের বাগান। ঠাকুরদালানের সামনে মস্ত বড় খোলা অঙ্গন। বাড়িটি ছিল হাই কোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর নাতিদের এক শরিক বাড়ির এক অংশে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস অফিস রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রের নাম হয়তো অনেকের স্মরণ নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক প্রান্তে যে ওয়াহাবি বিদ্রোহ হয়েছিল, তিনি সেই বিদ্রোহীদের কারোর কারোর বিচার করে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি ছিল, সেই ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের একজন তাঁর বাড়িতে বাবুর্চি হয়ে থেকে তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। অবশ্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ঐ ওয়াহাবিদের একজনের হাতেই নিহত হন। এর পিছনেও রহস্য ছিল। কি করে সমুদ্দুর পেরিয়ে, বড়লাটের সশস্ত্র প্রহরা অতিক্রম করে ছোরা মেরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, অনেক বিশ্লেষণ করেও তার হদিস পাওয়া যায়নি।

এ সম্পর্কে হাওড়া জেলার শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য আরো অনেক তথ্য দিয়েছেন, তা নীচে দেওয়া হল—

লর্ড মেয়ো ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ সালে 'গ্লাসগো' নামে একটি জাহাজে চেপে আন্দামান পরিদর্শনে আসেন। সারাদিন আন্দামান দেখে Mt. Harriot-এ বিশ্রাম নিয়ে তিনি সন্ধ্যে সাতটার সময় পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে আসেন Ross Island-এ যাওয়ার জন্যে। স্বভাবতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লাটসাহেব রক্ষীবিহীন অবস্থায় ডানদিকে সমুদ্র পাড়ে কিছুটা এগিয়ে যান। ঠিক ঐ সময়

শের আলি নামে এক যুবক একটি রুটি কাটা ছুরি দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করতে থাকে। লোকজন ও প্রহরীরা ছুটে আসার আগেই লাটসাহেব মাটিতে পড়ে যান, জেলখানার ডাক্তার ছুটে আসেন; কিন্তু লর্ড মেয়োর প্রাণ বাঁচাতে পারেন না। লাটসাহেব মেয়োর মৃতদেহ কলকাতায় পাঠানো হয় এবং পরে Ireland-এ স্বদেশে তাঁর মৃতদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আপাতদৃষ্টিতে লর্ড মেয়োর হত্যাকারী, বৃত্তিতে নাপিতের কাজ করত আন্দামানে; কিন্তু ঐ শের আলি ছিল উল্লির পুত্র এবং জাতিতে কুকি খেল। বয়স প্রায় তিরিশ। পেশোয়ারের কর্নেল পোলক সাহেবকে হত্যার অপরাধে, বিভিন্ন স্থানে কারাবাসের পর ২রা এপ্রিল ১৮৬৭ সালে আন্দামানের জেলে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত সৎ ব্যবহারের পুরস্কারস্বরূপ ১৫ই মে ১৮৭১ সালে মুক্তি পেয়ে ঐ দ্বীপেই নাপিতের বৃত্তি নিয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু করে। ঐ স্বাধীনতাকামী যুবক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল; অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর প্রতি ছিল তার বিজাতীয় ক্রোধ।

যাই হোক, লর্ড মেয়োকে হত্যার অপরাধে শের আলির বিচার করেন Genl. Stewart (যিনি পরবর্তীকালে ভারতের প্রধান সেনাপতি হন)। এই আন্দামানেই শের আলির বিচার হয় এবং এই আন্দামানেই ১১ই মার্চ ১৮৭২ সালে সকাল সাতটায় শের আলির ফাঁসি হয়।

১৯২০-তে লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হল। বহু জায়গায় কংগ্রেস কার্যালয় খোলা হয়েছে। উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ও ঐ সময়েই খোলা হয়। তখন কংগ্রেসের সদস্য হবার বয়স ছিল ২১ বছর বা তার ঊর্ধ্বে। আমার তখন সে বয়স হতে অনেক দেরি। কিন্তু কংগ্রেস অফিসে যাতায়াতে তো কোনও বাধা ছিল না—যখন সামনাসামনি বাড়ি। বাড়িতেও কারো কোনও আপত্তি ছিল না। ঐখানে যাতায়াত করে কয়েক বছরের মধ্যে রাজেন্দ্র দেব, অমরেন্দ্রনাথ বসু, হেমন্ত বসু, ভবভূতি সোম (নাম ছিল ভগবতী, কিন্তু কংগ্রেস অফিসে ঠাট্টা করে সবাই দুধ চাইত। সেইজন্য বদলে ভবভূতি করে নিয়েছিলেন), ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেককে চিনেছিলুম। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সুরেশদা ও হেমন্তদার সঙ্গে।

যে বাড়িতে জন্মেছিলুম সে বাড়ি থেকে ছুটি পাওয়া যেত, পুজোর সময় ছ' দিন, গ্রীষ্মের সময় পনের দিন। ব্যস্। বাকী সমস্ত সময়টাই কলকাতায়। আমাদের বাইরের বাড়ি আর ভেতরের বাড়ির মাঝখানে একটা ছাদ ছিল। নাম ছিল "গইলের ছাদ"। গইল অর্থাৎ গোয়াল। আমরা অবশ্য সেখানে কখনো গরু থাকতে দেখিনি। কোনও এক কালে একটা ষাঁড় ছিল। পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তখন, এখনও বোধ হয় রেওয়াজ আছে, একটি ষাঁড়কে পুজো-টুজো করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হত। এখনও বড়বাজারে এমন ষাঁড় দেখতে পাওয়া যায়। এই গইলের ছাদের উপর বড় বড় ঝুড়ি আর থলের মধ্যে নানারকম ফল পোরা হত। আখ কলা, শসা, পেঁপে, আতা, গোমুখ, ফুটি, অসময়ের আম, বাতাবি লেবু, আরও দু-চার রকমের ফল, যার নাম মনে পড়ছে না। এ কাজ হত সারা রাত ধরে। আমরা সবিস্ময়ে ভাবতুম, গ্রামে যাওয়া হচ্ছে—যেখানে ফল জন্মায়, সেখানে এসব কেন নিয়ে যাওয়া হবে? বড় হয়ে বুঝলুম যে, সাধারণ গ্রামের সঙ্গে এসব ফল উৎপাদনের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

ষষ্ঠীর দিন সকালে লোক-লস্কর, ফলমূল নিয়ে সদলে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে ওঠা হত। গন্তব্য স্থান হুগলী জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম। যেখানে দোল, দুর্গোৎসব, রাস, কালীপুজো হত। কিন্তু সব পুজোয় আমাদের যাবার হুকুম ছিল না। খালি দুর্গাপুজোর সময় ষষ্ঠীর দিন গিয়ে দ্বাদশীর দিন ফেরত আসা। এইটিই নাকি দস্তুর ছিল। গ্রামের মধ্যে তখন ঐ একখানিই পুজো হত। গোটা গ্রামের লোক পুজো দেখতে আসত। কেবল বাড়ির কর্তারা বড় একটা পুজো-বাড়িতে আসতেন না। বাড়ির গিন্নীরা, বউয়েরা, ছেলেরা—সবাই আসত। কর্তারা আসতেন না। কারণ, তাতে নাকি মর্যাদাহানির ভয় ছিল। অবশ্য পুজোর সময় বাড়ি-ভরতি লোক হত। বিজয়ার দিন আমি প্রণাম করতাম ১০২ জনকে।

আমাদের এক পুরোহিত ছিলেন। আমরা তাঁকে বলতাম 'বামুন জ্যাঠামশাই'। তাঁর বয়স তখনই প্রায় সত্তর। তিনি বেশ মজার মজার গল্প বলতেন। একদিন বললেন "জানো, এই গ্রামে আগে সতেরোখানা পুজো হত। এক বছর বোসেদের বাড়ির ঠাকুর এ বাড়ির আগে বিসর্জন দিয়েছিল। আর যায় কোথায়? কর্তাদের হুকুমে বাকী ক'খানা ঠাকুর পুড়িয়ে ফেলা হল।" তিনি বেশ বীর দর্পে বলতেন, আর শুনে আমাদের রোমাঞ্চ হত। স্টেশন থেকে একটা রাস্তা সোজা আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে দেড় মাইল দূরে একটা বড় গ্রামে গেছে। আমাদের রাস্তাটা কাঁচা। আর একটা রাস্তা স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তার পাশ দিয়ে ঐ বড় গ্রামে চলে গেছে, কিন্তু তিন মাইল ঘুরে। কৌতূহল হত। বামুন জ্যাঠা বললেন, "আরে, এই রাস্তাটাই তো ছিল। এটাই পাকা হবার কথা ছিল। কিন্তু হল কি জানো? একদিন কর্তারা কলকাতা থেকে আসছেন। খালের ধারে এসে দেখলেন, তাঁদের একটু দেরি করতে হবে। কারণ, অন্য দুটো পালকি তখন ডোঙ্গায় উঠে গেছে। তাঁরা ডোঙ্গা দুটোকে ফিরে আসতে বললেন। যখন ফিরে এল না, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে পালকি দুটোকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। সেই পালকি দুটোর একটায় ছিলেন একজন ডাক্তার। আর একটায় ঐ পাশের গ্রামের এক অবস্থাপন্ন লোক। মায়ের অসুখের জন্য ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছিলেন।" পরে বুঝতে পেরেছিলুম ঐ ভদ্রলোক তিনমাইল দূর দিয়ে রাস্তাটা নিয়ে গেছলেন আমাদের গ্রামের সংস্রব ত্যাগ করার জন্য।

ইংরাজের ভালভাবে সেবা করার জন্য কিছু কিছু বাঙালী পরিবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। রাজা, মহারাজা, সদাগরী অফিসের বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি—অর্থাৎ প্রচুর অর্থ উপার্জনের উপায় ইংরেজরা করে দিতেন। আমাদের পূর্বপুরুষ বেশী পাননি। ছিটেফোঁটা পেয়েছিলেন। তাতেই অবশ্য যখন-তখন যাকে-তাকে পীড়ন করা চলত। অবশ্য যাঁরা প্রভুত্বপরায়ণতার জন্য অনেক কিছু পেয়েছিলেন, তাঁরা বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য বেশ কিছু করে গেছেন। তাঁদের কাছে সত্যিই বাঙালীরা ঋণী। কিন্তু কি প্রগাঢ় প্রভুভক্তি ছিল! শুনেছি, ইংরাজের ফোন এলে ওইসব প্রভুভক্তরা সাষ্টাঙ্গে ফোনকে প্রণাম করতেন। আবার এও শুনেছি, ইংরাজের concubine-দের ঐসব কৃতিপুরুষরা প্রণাম করতেন। কারণ, concubine-দের গর্ভে ইংরাজের সন্তান আসত।

দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে কিন্তু অন্য ছবি ফুটে বেরোত। কত সম্প্রদায় এবং কত মানুষ যে নানারকমে উপকৃত হত, তার ঠিক হিসেব দেওয়া শক্ত। ঠাকুর গড়তেন সূত্রধরেরা, শোলার সাজ-সরঞ্জাম দিতেন মালাকররা। তাঁরা আবার পুজোর ফুল-বেলপাতাও দিতেন। কুম্ভকার সম্প্রদায়ের একচেটে ছিল হাঁড়িকুড়ি, গামলা, দই-

কর্মার মালসা আর বোধনের ঘট, স্বর্ণকারেরা দিতেন আসনাঙ্গুরীয়, সোনারূপোর কুঁচি, কাঁসারীরা দিতেন কাঁসার দানসামগ্রী, কুমারীবরণের থালা, ঘটি, বাটি। ডোমেরা দিতেন তীর, তেকাটা, আর আচার্য বামুন আনতেন পঞ্চপল্লব ও কলা-বউ। এক সম্প্রদায় বাজাতেন ঢাক, আর এক সম্প্রদায় বাজাতেন সানাই আর ঢোল। গয়লারা দিতেন দইকর্মার দই আর ভূরিভোজনের দই-ক্ষীর। ময়রাদের বাঁধা ছিল বাতাসা, মুড়কি, মণ্ডা। কর্মকারেরা দিতেন বলিদানের খাঁড়া। তন্তুবায়েরা তো আসতেনই কার্তিকের কালোপেড়ে কোড়া কাপড়, গণেশের ধুতি আর দুজনের উত্তরীয় এবং কলা-বউয়ের শাড়ি নিয়ে। পরামানিক-শ্রেণী প্রায় সর্বত্রই নৈবেদ্য সাজাতেন। আর সবার উপরে তো পুরোহিত মশায় ছিলেনই। তাঁর জন্য শাঁখ লাগত, ঘন্টা লাগত, পঞ্চপ্রদীপ লাগত। সেগুলোও গ্রামেই তৈরী হত। টোলের পণ্ডিতমশাই বোধনের দিন থেকেই আসতেন। সুরেলা গলায় চণ্ডীপাঠ—সে সুর ছোটদেরও মন আকৃষ্ট করত। আর এক শ্রেণী ছিল, যারা অন্য ফুল আনলে পুজো হত না, কিন্তু সাপ-অধ্যুষিত পুকুর থেকে তারাই পদ্মফুল তুলে আনত। তখন স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার চলত না। আর এর সঙ্গে যাত্রা, কোথাও শখের থিয়েটার তো ছিলই। একটা দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করে গাঁয়ের বৃত্তিধারীরা প্রায় সকলেই উপকৃত হতেন। তখন সর্বজনীন পুজোর চলন ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসব উপভোগ করতেন সমাজের সর্বসাধারণ।
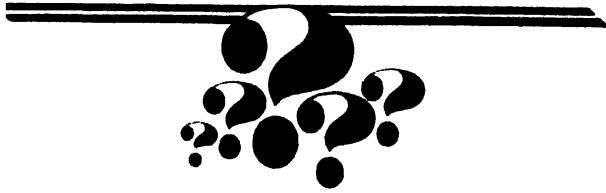
সুভাষ এসে বলল, “দাদা, প্রাইম মিনিস্টারের ফোন।” ফোনের মধ্য দিয়ে মাথাই-এর কথা ভেসে এল, প্রাইম মিনিস্টার এখনই ডাকছেন। প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ জওহরলাল। আমি তো প্রমাদ গুনলাম। “দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি”, তখনই বেরতে হবে। আমতা-আমতা করে মাথাইকে বললুম, “একবার প্রাইম মিনিস্টারকে দাও না!” মাথাই একটু অবাক হল। বলল, “কেন, আপনি কি আসতে পারবেন না?” যাই হোক, ফোনটি কেটে দিল। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায়ও নেই। খানিকক্ষণ বাদেই সুভাষ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, “দাদা, প্রাইম মিনিস্টার নিজে ফোন ধরেছেন।” আমি সভয়ে ফোনটি তুলে নিলুম। ওদিক থেকে কথা ভেসে এল, “তোমার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?” আমি প্রায় টেলিফোনের সামনেই বসে পড়ার যোগাড়। যাই হোক, কোনক্রমে বললাম, “স্যার, এখনই তো যেতে পারছি না! আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।” আবার কথা ভেসে এল, “অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?” মনে হল যেন একটু রাগ হয়েছে। আমি তখন সামলে নিয়েছি। আমি বললুম, “স্যার, খুব জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমি বাকরা যাচ্ছি। আপনি তো সব সময় বলেন ওগুলো আমাদের তীর্থস্থান।” খানিকক্ষণ টেলিফোনে নিঝুম নিস্তব্ধতা। তারপরই সেই প্রাণখোলা হাসি। বললেন, “ফিরে এসে দেখা ক'রো, তাতেই আমার কাজ হবে।

আমি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" মিনিট আষ্টেকের মধ্যেই চিঠি এসে গেল। আমি তো বেরিয়ে পড়লুম চন্ডীগড়ের দিকে।

দিল্লী ছাড়বার পরই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের চেহারা একেবারে অন্যরকম। রাস্তার দুধারে একটু জায়গা পড়ে নেই—খালি গাছ আর গাছ। এবং গাছ খালি বসানো হয়নি, সেগুলো সযত্নে লালন করা হচ্ছে। অপূর্ব শোভা। চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের হাওড়া থেকে মোগলসরাই অবধি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারের কথা মনে পড়ে গেল। যেখানে স্বাভাবিক কারণে বনজঙ্গল আছে তার কথা আলাদা, তা নইলে রুক্ষ, শুষ্ক, শ্রীহীন। নতুন পাঞ্জাব গড়ায় প্রতাপসিং কায়রোঁর দান অসামান্য। জমিতে যতরকম চাষ করা যায়, শুধু যে তার ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, যাতে সব জমিতে সেচের জল গিয়ে পৌঁছতে পারে, তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এক-বার পথে যেতে যেতে দেখলুম, একটি মোটর-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি এবং কয়েকজন কারিগর। কলকাতায় যেমন চলন্ত পোস্ট অফিস হয়েছে (চিঠি ফেলা যায় ও ডাক টিকিট কিনতে পাওয়া যায়), পাঞ্জাবে নানারকম চলন্ত গাড়ি হয়েছিল, যাতে করে সুদক্ষ কারিগররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অচল নলকূপ, এবং সেচ ও চাষের অন্যান্য অচল যন্ত্রপাতিকে সচল করে দিতে পারেন। আমাদের এখানে কত টিউবওয়েল কেবলমাত্র ওয়াশারের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে আছে, কত গভীর নলকূপ সামান্য বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের অভাবে কাজে লাগানো যায় না। এগুলো মেরামত করার জন্য মাসের পর মাস স্থানীয় লোকদের অপেক্ষা করতে হয় এবং অনেক সময় এগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যায়। পাঞ্জাবে এরকম অভিযোগ করার উপায় কারোর ছিল না।

চন্ডীগড় থেকে বাকরা যাবার পথটাই অদ্ভুত। বাকরা পরিকল্পনার জন্য সব-টাই অদলবদল হয়ে গেছে। কোথাও নদীর নীচে দিয়ে খাল গেছে, আবার কোথাও বা রেললাইনের মাথা দিয়ে খাল চলে গেছে। আর চতুর্দিকে ইলেকট্রিকের তার যেন সারা পাঞ্জাবকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। কোথাও এক ফালি জায়গা খালি নেই—সব সবুজ। বাকরা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম বাঁধ। শতদ্রু এবং অন্য দু-একটা ছোটখাট নদীর জলকে বাঁধা হয়েছে। প্রতি বছরই এইসব নদীর জল বর্ষাকালে অনেক চাষের জমিতে বালি ছড়িয়ে ধ্বংস করত, অনেক রাস্তাঘাটও ভেঙেচুরে দিত। এখন এই জলরাশি বাঁধা পড়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানাকে তো বাঁচিয়েছেই, রাজস্থানের মরুভূমিকেও সুজলা সুফলা করেছে। আর বিদ্যুৎ তো এ রাজ্যগুলিতে দিচ্ছেই—দিল্লীতেও দিচ্ছে।

জওহরলালের চিঠিখানি দিলুম রাজ্যপালকে। তখন বোধ হয় (স্যার) সি পি এন সিংহ রাজ্যপাল। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি চিঠিটি পড়ে একটু হেসে বললেন, "আপনার খুব বিপদ।" আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম। উনি হেসে বললেন, "দিল্লীতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। পণ্ডিতজী আপনার সঙ্গে দু-তিনজন লোক দিতে বলেছেন, যারা আপনাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবে। সেই-জনাই মনে হচ্ছে পরীক্ষা দিতে হবে।" যাই হোক, বাকরা বাঁধ, (লাঙ্গলে জলাধার)—ওখানে পাহাড়ে যেসব গর্ত হয়েছিল, কি করে একটা পিচকারির মত যন্ত্র দিয়ে সিমেন্ট ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তাও দেখলুম। আরও দেখলুম, পাহাড়ের পাথর আর মাটি মিশিয়ে সিমেন্ট কম দিয়ে কংক্রীট করা হচ্ছে। যেখান থেকে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে—এসবই খুব আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। তবে যাঁরা সব ওখানে কাজ করেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার

ব্যবস্থা তখনও বিশেষ ভাল হয়নি। থাকবার ব্যবস্থা সবটাই লাঙ্গালে। নানাবিধ যানে করে রোজই ট্যুরিস্ট যায়। গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য 'Sutlej House'। অতি মনোরম পরিবেশ—চতুর্দিকের বাগানটি বেশ ভাল।

দিল্লী যেদিন ফিরলুম সেদিনই বিকেলে তাঁর নির্দেশমত জওহরলালের সঙ্গে দেখা করলুম। অন্য বিষয়ে কথা ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সেগুলি আলোচনা করলেন, একবারও বাকরার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। আমার তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যখন উঠে আসছি তখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ওখান থেকে মোট কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? আর কোন কোন বিদ্যুৎ-উৎপাদক-যন্ত্র বিকল থাকার জন্য কি পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে?" আমি উত্তর দেবার আগেই নিজেই সব বলে গেলেন। তখন একেবারে বুঁদ হয়ে আছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো যায়, সেচের জল বাড়ানো যায়, আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ কতটা করা সম্ভব—এইসবের মধ্যে। যখন বলছিলেন তখনকার চেহারাই আলাদা, যেন অন্য রাজ্যে চলে গেছেন।

পাঁচেটে যেদিন গেলুম সেদিন সেখানে সকালে শ্যামাপ্রসাদ এসেছিলেন। এটি ডি ভি সি-র একটি বাঁধ। পঞ্চকোট পাহাড়ের নীচে। পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। তখন যেসব ইঞ্জিনীয়ার কাজ করছিলেন, তাঁরা বললেন, "অত্যন্ত বিপদে পড়েছি। যত টাকা বরাদ্দ তার চেয়ে বেশী খরচ হয়েছে—কাজও বেশী হয়েছে। আরও কিছু কাজ হওয়ার দরকার, কিন্তু টাকা নেই। কর্তৃপক্ষের দোষ নেই, কিন্তু আমরা উৎসাহের আতিশয্যে বেশী কাজ করে ফেলেছি। বর্ষা আসন্ন। বর্ষায় দামোদরের রূপ তো বদলে যায়! সে ফুলে-ফেঁপে উদ্দাম গতিতে এসে বাড়তি কাজ যেটুকু হয়েছে, সব ভেঙে দেবে। এখন যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তা হলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব।" এইসব বলে তাঁরা আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিলেন। মনে হল, কাগজটা সবটাই সাংকেতিক চিহ্নে ভরতি, অর্থাৎ নানারকম অংক কষা আছে। সেদিনই বিকেলে কলকাতায় জওহরলালের আসার কথা। কোথায় বাইরে যাচ্ছেন। কলকাতায় রাত্রিটুকু থাকবেন। সাধারণত আমার পক্ষে রাজভবনে কোনও উৎসবে বা ভোজসভায় যাওয়া হয়ে উঠত না। তবে জওহরলাল এলে সে কথা স্বতন্ত্র। নেতার কাছে যেতেই হত। রাত্রে গিয়ে দেখি মাত্র কয়েকজন এসেছেন এবং শ্যামাপ্রসাদও রয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদ আমায় বললেন, "পাঁচেট থেকে ফোন এসেছে, আপনি তো গেছলেন। জওহরলালকে বলে সমস্যার একটা সমাধান করুন। তা নইলে ইঞ্জিনীয়ারগুলি বিপদে পড়বে। উৎসাহের আধিক্যে একটু বেশী কাজ হয়ে গেছে। তাতে ভালই হয়েছে—তবে রক্ষা করতে না পারলে অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে।" ঠিক হল, শ্যামাপ্রসাদ আগে বলবেন, তারপর আমি বলব। খাওয়ার পর বাড়ি যাওয়ার আগে শ্যামাপ্রসাদ বলে গেলেন, তিনি জওহরলালকে বলেছেন, জওহরলাল চুপ করে ছিলেন। রাত্রে যখন উনি শুতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা গেলুম এবং অতি বিনীতভাবে সব কথা জানিয়ে দিলুম। ভয়ানক রেগে গিয়ে বললেন, "এখানে রাত এগারোটার সময় কি এসব কথা আমাকে জানানো উচিত? তা ছাড়া আমি তো এসব জানি না, ইরিগেশন মিনিস্টার জানবেন।" রাগ দেখে মনে হল, বোধ হয় কার্যসিদ্ধি হবে। যা হোক, প্রণাম করে চলে এলুম। সকালবেলা এয়ার-পোর্টে, তখন অন্য মানুষ। আর রাগ নেই। বললেন, "তোমার সঙ্গে.........দেখা করবে।" ব্যস আর কোনো কথা নয়।

অবশ্য টাকাটা মঞ্জুর হয়েছিল। যদিও আমি জানতুম এবং শ্যামাপ্রসাদও জানতেন সরকারী নিয়মানুযায়ী আমাদের অনুরোধ বিধিসঙ্গত নয়, জওহরলালের এইসব পরিকল্পনাকে রূপ দেবার আগ্রহের জন্যই আমরা ভরসা করে বলেছিলুম।

জীবনে অনেক নেতা ও কর্মীর সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছে। অনেকের মধ্যেই একটা প্রাবল্য দেখা যায়, মতের পার্থক্য থাক বা না থাক, কতগুলো জিনিস কল্পনা করে নিয়ে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলার এ ব্যাধি সমাজের সব স্তরেই প্রায় আছে। সাহিত্যিক, ক্রীড়ামোদী, ব্যবহারজীবী, রাজনীতিজ্ঞ। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এসবের ব্যতিক্রম। দল, মতামত—এসব নির্বিশেষে মানুষের সম্পর্ক বজায় রাখতেন। হাওড়ায় প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছে—জগজীবন রাম সভাপতি। আমি শ্যামাপ্রসাদকে গিয়ে বললুম, "সম্মেলনের সঙ্গে প্রদর্শনী হচ্ছে। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে রাজী। যখন মন্ত্রী ছিলেন, অনেক ছোট বড় কাজ করে দিতেন। যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন, তখনও কোন অসুবিধের সৃষ্টি হলেই জানাতুম—কখনও কোনও বিরক্তি দেখিনি। রাজনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এরকম বন্ধু খুব কম পাওয়া যায়।

যে পরিবারে জন্মেছিলুম, তাদের তখন পড়তি অবস্থা—ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতিচ্ছবি। ঠাট বজায় রাখার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রাণান্ত হতে হচ্ছে। শরিকী মামলা লেগেই আছে, মামলায় যারা জিতছে, তারা মামলা-শেষে হিসেবে পাচ্ছে, যে সম্পত্তির জন্য মামলা হল, মামলায় যা খরচ হচ্ছে তার চেয়ে সে সম্পত্তির দাম কম। এই হিসেবের জন্য কিন্তু মামলা করার উৎসাহে কোনও ভাঁটা পড়েনি। মাতামহবংশের তখনও জলুস আছে। কারণ, মাতামহ তখনও জীবিত। মাতামহের বাবা ছিলেন পাঁচ টাকা মাইনের পাঠশালার শিক্ষক। সেখান থেকে শুরু করে শেষ করেছিলেন সাবজজ ও রায়বাহাদুর হয়ে। বন্ধুদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, স্যার গুরুদাস ছিলেন, আরও তখনকার বহু স্বনামধন্য লোক ছিলেন। মাতামহের কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে হত। সেই সময় তখনকার দিনের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হত কম। 'লাল-বাল-পাল' খ্যাত বিপিনচন্দ্র পালকে অনেকবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। এঁদের তখন দেশ-জোড়া খ্যাতি। আরও অনেককে—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ললিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বিশ্বকোষ'-খ্যাত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে দেখেছিলুম। চিত্তরঞ্জন দাশকে দেখেছিলুম। শরৎচন্দ্রকে দেখেছিলুম বেশ একটু বড় হয়েই।

জন্মেছি ১৯০৪-এ। বিবেকানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্যুতি তখনও বেশ। বিদ্যাসাগর তখনও 'দয়ার সাগর' বলেই খ্যাত। জন্মাবার পরই

বঙ্গভঙ্গ। বিরাট আন্দোলন। গোটা বাংলাদেশ যেন রেগে ফুঁসে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর'-এর আবির্ভাব ঘটেছে। 'সন্ধ্যা' ব্রহ্মবান্ধবের কাগজ। 'যুগান্তর'-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবব্রত বসু। তিনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন। নাম হয়েছিল স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। স্বামীজীর ছোট ভাই শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পরে ডঃ ভূপেন দত্ত বলে পরিচিত—তিনিও পরে যুগান্তর-এর সম্পাদক হয়েছিলেন এবং জেল থেকে বেরোবার পর আমেরিকা চলে যান। সেখান থেকে ফেরেন বোধ হয় ১৯২৬-১৯২৭ সালে। বর্তমান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের অনেকে বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে প্রথম কম্যুনিজমের বই পাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অরবিন্দের নামও তখন একটু একটু করে ছড়াচ্ছে।

বঙ্গভঙ্গের পরই বোমা তৈরি আরম্ভ হল। গুলিও চলল। আমাদের বাড়ির কাছেই, বোধ হয় ৭১ নং পাথুরেঘাটা স্ট্রীটের কাছে একজন পুলিস অফিসার নিহত হলেন। আততায়ী ধরা পড়ল না। ১৯১১-য় মোহনবাগান পেল আই এফ এ শীল্ড। সে কি উন্মাদনা! শুধু-পায়ে বাঙালীর ছেলেরা বুটপরা ইংরেজদের হারিয়ে সেদিনের ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছিল। আজকের দিনে যারা ক্রীড়ামোদী তারা কল্পনাও করতে পারবে না। ১৯১১-য় ভারতবর্ষে যারা আই এফ এ শীল্ডে আসত তাদের বেশির ভাগই জাঁদরেল মিলিটারী দল। তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। সকলের পায়ে ভারী ভারী বুট। পরাধীন ভারতবর্ষে ভাতখেঁকো বাঙালীরা শুধু-পায়ে শাসকগোষ্ঠীর ধুরন্ধরদের অনায়াসে হারিয়ে দিল। মোহনবাগানের এই জয়ের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষ যেন শাসকগোষ্ঠীকে এক বিরাট ধাক্কা দিল—এই ছিল সেদিনের মনোভাব।

বঙ্গভঙ্গ রদ হল। সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, Settled fact-কে unsettle করেছি!" জয়জয়কার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা বিরাট ধাক্কা খেল। তখন তো বয়স মোটে সাত! খুবই আনন্দ হয়েছিল। আর একটু বড় হবার পর ইতস্তত গুঞ্জনধ্বনি শুনলাম। প্রথম প্রথম ভাল লাগেনি। তারপর ধীরে ধীরে সব জিনিসটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠন করতে। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেবার জন্য বাংলাদেশকে দু ভাগ করার বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি দিয়ে আন্দোলন করেছিলুম। প্রথমে যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন মনোভাব ঠিকই ছিল। তারপর জনসাধারণের অজ্ঞাতে একটা বড় ধোঁকার জাল সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ হয়ে একটা প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ববঙ্গ আর আসাম নিয়ে এবং তাতে মুসলমান জনসংখ্যা বেশী। কথাটা হিন্দু-মুসলমান নিয়ে নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা মুসলমান-প্রধান প্রদেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল—তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। আমরা বাঙলাকে ভাঙতে দিতে চাইনি। কত লোক নির্যাতিত হল। বরিশাল কনফারেন্সে যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেখানে কত রক্তক্ষয় হল। আন্দোলন জয়যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ রদ। ফলে গোটা বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে গেল। সেটাও বড় কথা নয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করতে আমরা কি মাসুল দিলুম? রক্তক্ষয়, জেল, দ্বীপান্তর ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির আর সীমা রইল না। পাট এবং অন্যান্য কৃষিদ্রব্যে সমৃদ্ধ সুর্মা ভ্যালী বেরিয়ে গেল। আর বাদ পড়ল ভারতবর্ষের মধ্যে খনিজ দ্রব্যে মহাসমৃদ্ধ মানভূম, সিংভূম জেলা। পৃথিবীতে পাটের প্রয়োজন যে কত বেশী, বিশেষত সেই সময়ে, তা বোঝাবার দরকার নেই—অর্থ-

নীতিবিদ মাত্রেই জানেন। আর লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র আরও কতরকম খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলকে আমরা হারালুম। জয় হয়তো হয়েছিল, কিন্তু কিসের বিনিময়ে? এখানে আঞ্চলিকতার কথা উল্লেখ করছি না, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জিনিসটা বিচার করলে দেখা যাবে, Settled fact-কে unsettle তো করা যায়ই নি এবং ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাসির কাছে আমরা একেবারে হেরে গিয়েছিলুম। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় প্রবল হয়েছে। বাঙালী ভারতবর্ষের মধ্যে 'বন্দে মাতরম' গান ছড়িয়ে দিয়েছে, ফাঁসির হুকুমের পর বাঙালী কানাই দত্তর ওজন বেড়ে গেল—চতুর্দিকে অচিন্তনীয় জাগরণ। অতএব, আর্থিক দিক দিয়েও বাঙলাকে পঙ্গু কর—এই হল সেদিনের বঙ্গভঙ্গ রদের আর একটা ছবি। বিচার যাঁরা করবেন, নিশ্চয়ই তাঁরা সব দিক খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তবে এদিকটা ভেবে দেখবেন। ভারতবর্ষের যেকোনও জায়গায় লোহা থাকলেই তো ভারতবর্ষের মঙ্গল—এ কথাটা যেমন সত্য, তেমনি আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধি ও অভাব বৃদ্ধির উপর অঞ্চলের কল্যাণ-অকল্যাণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের নিজের সমস্যা তো আছেই এবং অনেক সমস্যার কারণ হল বহিরাগতের আগমন। ইতিহাসের একটা মস্ত বড় পরিহাস—বঙ্গভঙ্গ রদ করতে গিয়ে আমরা বাঙলাকে অর্থনীতির দিক থেকে পঙ্গু করেছিলুম। আবার দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে আমরা সেই বঙ্গভঙ্গকে সাদরে বরণ করে নিয়ে এলুম।

বোধ হয় ১৯২৫। সুরেশদা আর হেমন্তদা বললেন, 'কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর যাও। আশুদা, বিজয়বাবু আর প্রফুল্ল চাইছে।' আশুদা আর বিজয়দাকে চিনতুম, প্রফুল্লদার কথা শুনেছিলাম। আশুদা পার্মানেন্ট কমিশন পেয়েছিলেন। ১৯২১-এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে হরিপালে বসেন ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। বাড়ি শ্রীরামপুর। তখনকার দিনেই প্রায় চোদ্দ শ' টাকা রোজগার করতেন মাসে। পঁয়ত্রিশ টাকা নিজেদের খরচের জন্য রেখে বাকী টাকা খরচ হত 'কল্যাণ সংঘ' নামে এক আশ্রমে, যেখানে বহু কংগ্রেস কর্মী বাস করতেন—বিজয়দা ছিলেন কর্তা। স্থানীয় এক স্কুলের হেড-মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে বিজয়দা কংগ্রেসের কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। বার বার জেল খাটার পর বর্ধমান জেলার নবকলাগ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলেন। এখন সেটি পঃ বঙ্গে আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত।

আশুদা, (ডাঃ আশুতোষ দাস) ১৯৪০-এ জেল থেকে বেরিয়ে এসে যে ম্যালেরিয়া তাড়াবার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন, সেই ম্যালেরিয়াতেই প্রাণ দেন। এইরকম আত্মভোলা ঋষিচরিত্র মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি।

প্রফুল্লদা বিহারে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতি হলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন—তবে পকেটে করে তাস নিয়ে আসতেন। বি এস-সি

পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবার জন্য এক অডিটারের অফিসে 'Article' ছিলেন। বিলেত যাওয়ার সব ঠিক, মায় জাহাজের টিকিট অবধি কাটা হয়ে গেছে—এমন সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। ব্যস, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাস আরম্ভ হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে Forbes Mansionএ। সেখানে তখন সব কর্মীরা থাকতেন। আবাল্য বন্ধু রবি পালিত মশাই হুগলী চলে গেলেন—জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রথম সম্পাদক। প্রফুল্লচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে হুগলী গেলেন। তখন হুগলী বিদ্যামন্দির খুব জমজমাট। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক জাতীয় বিদ্যালয় হয়। সেই সময় হুগলী বিদ্যামন্দিরও আরম্ভ হয়—সঙ্গে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়। মাস্টারমশাই (অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) থাকতেন, ভূপতিদারও (ভূপতি মজুমদার) যাতায়াত ছিল। নজরুলও প্রায়ই বসবাস করতেন। পরিচালনা করতেন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরহরি সোম, বিনয়কৃষ্ণ মোদক প্রভৃতি। ১৯২৩-এ আরামবাগ মহকুমার বড়ডোঙ্গল গ্রামে বন্যায় সাতজন মারা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র গেলেন ত্রাণকার্যে বড়ডোঙ্গলে। সেখানেই ১৯৪৮-এর জানুয়ারী অবধি স্থায়ী বসবাস। তখন একুশ বছর বয়স হলে তবে কংগ্রেস সদস্য হওয়া যেত। আমি সেই সবে সদস্য হয়েছি। এমন সময় শ্রীরামপুর যেতে হল। প্রথমে তিন-চারবার ঘুরে এলাম, কারণ জায়গা বা মানুষ কিছুই চিনি না। গিয়ে উঠতুম কানাইলাল দত্তের ভগিনী-পতি কার্তিকচাঁদ মশাইয়ের বাড়ি। আশুদা এই পরিবারেরই সন্তান। এঁরা সস্নেহে আমায় গ্রহণ করেছিলেন। এখনও এ-বাড়ির ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী সমানভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তারপর শ্রীরামপুরে বসবাস আরম্ভ করলাম। সঙ্গী—বর্তমান লোকসভার সদস্য শ্রীবিজয় মোদক। কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই, সহায় ও সম্বল কংগ্রেসের নাম। শ্রীরামপুরের ডাঃ শ্রীশ দত্ত মশাই সবরকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর ছেলে এবং আমার সহকর্মী সুকুমার দত্ত পঃ বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি আন্দোলনের সময় বার বার জেলে গিয়েছিলেন। তারপর এম এল এ, এম এল সি হন। আর যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করেছেন। শ্রীশবাবুর জামাতা সুশীলচন্দ্র দে মশায় আমাকে তাঁর পরিবারভুক্ত করে নেন।

শ্রীরামপুরে তখন অনুশীলন, যুগান্তর—দু' দলেরই প্রভাব। কংগ্রেসের প্রভাবও বেশ ছিল। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ মশাই এ কাজে অগ্রণী ছিলেন। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। খাদি ফেরি করতে হবে। গাদা গাদা খদ্দরের কাপড় কিনে আনতেন। বেশিরভাগই তার বিক্রী হত না। অবিক্রীত সমস্ত কাপড় তিনি নিজে নিয়ে নিতেন। আর ছিলেন জিতেনদা। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। এখান থেকে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে এম এস-সি হন। গিয়েছিলেন কিন্তু বৈপ্লবিক কাজের জন্য। তিনিই খবর আনেন যে, জার্মানী থেকে এক জাহাজ অস্ত্র আসছে, যে জাহাজ থেকে অস্ত্র নেবার জন্য বাঘা যতীন বালেশ্বরের উপকূলে গিয়েছিলেন। জিতেনদা বহু দিন আটক থাকার পর মুক্তি পান এবং ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। পরে লোকসভা ও বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। জিতেনদা ছিলেন ভারতীয় 'Belting' শিল্পের জনক। প্রথমে ভারতবর্ষে বেল্টিং-এর কাজ ওঁরাই আরম্ভ করেছিলেন এবং সে সময় অমানুষিক পরিশ্রম করেন। বয়োকনিষ্ঠদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

হঠাৎ হুগলী থেকে খবর এল, শ্রীরাজাগোপালাচারী, শ্রীযমুনালাল বাজাজ এবং

শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে হুগলী বিদ্যামন্দিরে নিয়ে যেতে হবে। রাজাগোপালাচারীর নাম সুপরিচিত। যমুনালাল বাজাজও প্রথম সারির নেতা—কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার গান্ধীজীর স্নেহপাত্র এবং খুচরো চাঁদা আদায়ে তাঁর জোড়া সারা ভারতবর্ষে আর ছিল না। যে-কোনও সভাতেই তিনি দু'-তিনজন লোক নিয়ে একটা চাদর ছড়িয়ে ঘুরতেন। আর তাতে বর্ষার ধারার মত টাকা, পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি আধুলি বর্ষিত হত। এঁদের আমাকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে হুগলীতে। কোনও অভিজ্ঞতাও নেই, এঁদের চিনিও না। যাই হোক, শিয়ালদা স্টেশন থেকে নৈহাটী হয়ে হুগলী ঘাটে নামতে হবে। গাড়িতে রাজাজীর হাতে বই, আর শঙ্করলাল নানারকম প্রশ্ন করে আমার ভয় ভাঙাতে লেগে রইলেন। যমুনালালজী গাড়িতে অন্যান্য প্যাসেঞ্জাররা যে-সমস্ত ঠোঙা, সিগারেটের টুকরো ফেলছিলেন, সেগুলো কুড়িয়ে গাড়ি পরিষ্কার করতে লাগলেন। যাই হোক, কোনক্রমে নৈহাটীতে গাড়ি বদল করে তো বিদ্যামন্দিরে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। আমার মনে তখন বেশ একটু গর্বমিশ্রিত আনন্দ হয়েছে—এই দুরূহ কাজটা তো করেছি। মিনিট কয়েক বাদে একটা গোলমাল আরম্ভ হল। সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাজাজীর বিছানা ট্রেনে ফেলে এসেছি। সকলেই একটু উদ্‌ভ্রান্ত, সামান্য উত্তেজিত। আর আমার অবস্থা তখন ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। আমরা ভূপতিদার অম্লমধুর শ্লেষ মিশ্রিত তিরস্কারে অভ্যস্ত ছিলুম। কিন্তু রাজাজীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কর্তৃপক্ষ সকলেই ব্যস্ত হয়েছেন এবং সন্ত্রস্তও বটে। সকলেই আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়। ভর্ৎসনা ও তিরস্কারই শুনছি—কারো মুখে অন্য কোনও কথা নেই। এমন সময় দেখি হঠাৎ সবাই চুপ। যমুনালালজী এসে হাজির হলেন। যমুনালালজী হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের অনেকেরই ওর ডবল বয়স।' আর রাজাজীকে বললেন, 'আমাদের নিজেদের জিনিস তো আমাদেরই দেখা উচিত ছিল। তার জন্য ওকে দায়ী করা হচ্ছে কেন? আমরা কংগ্রেসের সেবক, জেলা কংগ্রেস অফিসে আসছি। নিজেদের জিনিস যদি আমরা নিজেরা ঠিক না রাখতে পারি, তবে তো আমাদের বাড়ি থেকে বেরোনোই উচিত হয়নি।' আমার বুকের মধ্যে যে-সব ঢাক-ঢোল, কাঁসি একসঙ্গে বাজছিল, তার আওয়াজ যেন একটু কমে গেল। তবুও ভয় পুরো মাত্রাতেই আছে। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো। তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না।' আর কর্তৃপক্ষ, মানে আমার দাদাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আপনারা কিছু ভাববেন না, ও-ই সব ব্যবস্থা করবে।' পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে ডেকে পাঠালেন। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার একটা কাগজে কি সব লিখতে লাগলেন। আমার দিকে চেয়ে যমুনালালজী বললেন, 'এই কাগজটা নিয়ে যে বড় স্টেশনে আমরা গাড়ি বদল করেছিলুম, সেখানে চলে যাও।' অর্থাৎ নৈহাটী স্টেশন। কাগজটা নিয়ে নৌকো করে নৈহাটী স্টেশনে হাজির হলুম। স্টেশন মাস্টারকে কাগজটা দেবার আগে খুলে পড়লুম। একটা চিঠি। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেছেন যে, তাঁর, রাজাজী আর যমুনালালজীর লাগেজ গাড়ি বদল করার সময় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যদি খুঁজে দেন, তা হলে ওঁরা বাধিত হবেন। স্টেশন মাস্টারকে চিঠিটা দেবার পর চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। আমিও বসবার একটা চেয়ার পেলুম। ঘন্টা চারেক বাদে লাগেজ এসে হাজির হল। লেবেলে নাম লেখা ছিল। যখন লাগেজ নিয়ে বিদ্যামন্দিরে ঢুকলুম, তখন নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন ডিউক অফ

ওয়েলিংটন—ওয়াটার্লুর পরই ফেরত আসছি। বাইরে থেকে বিদ্যামন্দিরকে মনে হচ্ছিল নিঝুম। আমি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রশ্ন। আমি কোনও উত্তর না দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে লাগেজ দেখিয়ে দিলুম। আবার যমুনালালজী ডেকে পাঠালেন। সবাইকে বললেন, 'দেখো, ওই তো নিয়ে এল।'

বিদ্যামন্দিরে তখন একটা অদ্ভুত পরিবেশ। মাস্টারমশাই বাস করেন। মহা-বিপ্লবী। ভূপতিদাও কম যান না—কোর্ট মার্শাল-এর হুকুম হয়েছিল। কিন্তু আমরা অনুভব করতাম কোথাও দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। তফাতটা আছে জানতুম, কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়, তা আজও বুঝতে পারিনি।
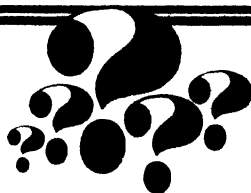
শ্রীরামপুরের কংগ্রেস অফিস ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠল। বহু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বর্তমান বি পি এন টি ইউ সি-র সভাপতি বিষ্টুচরণের পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হল। ওর মা আমাকে নিজের ছেলের মত মনে করতেন। ওখানেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হল শ্রীমান সুশীতলের সঙ্গে। সুশীতল রায়চৌধুরী। এ নাম বর্তমানে অনেকেরই জানা আছে। সুপরিচিত নকশাল নেতা। যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি নম্র ব্যবহার। চেহারার সঙ্গে যদি গুলি-গোলা ছোঁড়ার কোনও সম্পর্ক থাকে, তবে তার চেহারা ও ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পড়া-শুনাতেও সাধারণের চেয়ে বেশী। এখন সে জীবিত নেই। কিন্তু একটা নাম রেখে গেছে, যে নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক রহস্য এবং অনেক বিস্ময়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অসীমের নাম। অসীম চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে 'কাকা' বলে পরিচিত। চার বছর ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে প্রখর। কিন্তু নম্রতায় আদর্শস্থানীয়।

সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল শ্রীরামপুরেই। ওঁকে আর তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে হিজলী জেলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেনঃ "এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেইসব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে।" যখন ইংরাজ সরকারের পুলিসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তারা গুলি করে কেন মারল? বাঁট দিয়ে মারলে তো মানুষ বেঁচে থাকত। তাতে পুলিসপুঙ্গব সপ্রতিভভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আজ্ঞে, তা হলে সরকারী জিনিস নষ্ট হত। বন্দুকটা ভেঙে যেত।" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—তিনিও আসা-যাওয়া আরম্ভ করলেন। তার কয়েক মাস আগেই তিনি বিদেশ থেকে ফেরত এসেছেন। স্বামীজীর ছোটভাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক বার হয় তখন তার প্রথম সম্পাদকরূপে জেল হয়। সেই সময়েই বিদেশ চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। ফিরে

এলেন। প্রকাণ্ড পণ্ডিত। সমাজবিজ্ঞান ও কম্যুনিজম তথ্য—দুইয়েতেই পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তিনি আমাদের মত অনেককেই কম্যুনিজম পড়িয়েছিলেন। ১৯৩০-এর কিছু আগে আমাকে ডেকে বলেন, "ওরে, আর ক্লাস করব না। কম্যুনিজমের সঙ্গে টেররিজমের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু যারা পড়তে আসে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন টেররিস্ট আছে।" ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় যখন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ সত্যাগ্রহী হতে চাইলেন, তখন বেশ বিপদ হয়েছিল। যাঁরা অনুমতি দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, "উনি খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি পরেন বটে, কিন্তু ভেতরে তো গেঞ্জি পরেন।" অবশেষে গান্ধীজী স্বয়ং তাঁকে অনুমতি দেন। এ রকম সরল, আত্মভোলা এবং নিরহংকার মানুষ খুব কম দেখা যায়। শেষজীবনে কষ্টও পেয়েছিলেন খুব। দুটি চোখই যেতে বসেছিল। সব মানুষকে সমানভাবে গ্রহণ করতেন। কোনও শুচিবায়ু ছিল না। এঁকে আমি শ্রীরামপুর নিয়ে যেতুম এবং সেখানে কম্যুনিজমের চর্চা হত। এতে ভূপতিদা (ভূপতি মজুমদার) খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ভূপতিদা আমাকে আগে থেকেই জানতেন—আমার মামার সহপাঠী। সেজন্য আমার ওপর একটু জোরও ছিল। অবশ্য তাতে ভূপতিদার যাতায়াত বন্ধ হয় নি। আমাদের ঐ আড্ডার কয়েকজন ছেলে পরে কম্যুনিস্ট হিসাবে খুব নাম করে। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। অতি মেধাবী ছাত্র। পরে সি পি আই-এর একজন নেতা হিসাবে নাম হয়। অনেক দিন আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সরোজ একজন প্রাত্যহিক আড্ডাধারী ছিল। যত দূর মনে পড়ছে শ্রীরামপুর থেকে আরামবাগে গিয়ে ১৯৩০-এ জেলেও যায়। অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' কাগজের সম্পাদক হয়েছিল। আবার লোকসভাতেও নির্বাচিত হয়। বিনয়ও একজন নিয়মিত আড্ডাধারী ছিল। বিনয় পরে বর্ধমান থেকে এম এল এ হয়। সরোজ ও বিনয়ের মত স্বল্পভাষী, নিরহংকার ও আদর্শে বিশ্বাসী এবং স্বভাবে নম্র খুব কম ছেলেই হয়। আর আসতেন বিপিনদা। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। বিপিনদা, গিরীন বাঁড়ুজ্যে মশাই ও প্রভাসচন্দ্র দে। বিপিনদার কথাবার্তা-ব্যবহারে ছেলেরা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হত। সারা জীবন দেশের কাজ করে গেছেন এবং সে কাজে কোনও খাদ ছিল না। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু—এঁরাও আসতেন। প্রিয়দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গান্ধীবাদী এবং সাহিত্যিক। যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনি প্রিয়ভাষী। নির্মলদার নাম এখনও অনেকেরই স্মরণ আছে। নোয়াখালিতে তিনি গান্ধীজীর সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। অ্যানথ্রোপলজিতে পরম পণ্ডিত, গান্ধীজীর উপর পরম বিশ্বাস। আচরণে ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব, আর ব্যক্তিগত জীবনযাপনে ছিলেন একেবারে খাঁটি ভারতীয় এবং কোনও কৃচ্ছ্রসাধনেই পিছিয়ে যান নি। যুক্তিতর্কে যেমন তীক্ষ্ম, তেমনি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু মনটি ছিল বড় কোমল। যতদিন বেঁচে ছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার অগ্রজের কাজ করে গেছেন। পরিশ্রম করতে পারতেন অমানুষিক।

আমাদের শ্রীরামপুরের আড্ডার সমস্ত দায়দায়িত্ব বহন করত শংকরী। গত কুড়ি বছর ধরে হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার। split-এর আগে কংগ্রেসে এবং split-এর পরে সংগঠন কংগ্রেসে। ও যেন তৈরী হয়েছে নিজেকে সরিয়ে রেখে কাজ করার জন্য। সব কাজেই শংকরীকে চাই। কিন্তু তাকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারিতে তো নয়ই, কোনও সারিতেই দেখতে পাওয়া যেত না। বিশৃঙ্খলা হলেই বুঝতে পারা যেত, কাজে শংকরী নেই। তখন শ্রীরামপুরে তুলসীবাবুরও

খ্যব নাম।

শ্রীরামপ্যর থেকে একট্য দ্যরে উত্তরপাড়ায় ছিলেন গোবিন্দা। বাঘা যতীন, যদ্যগোপল মখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহকর্মী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। লম্বা-চওড়া চেহারা, টকটকে রঙ। যেমন নির্ভীক, তেমনি দয়াল্য। ছোটবেলায় আমরা মিশেছি। কিন্তু কোনও দিন টের পাওয়া যায়নি, ঐ রকম একটা বড় লোকের সংগে ওঠাবসা করছি। অদ্ভুদ চরিত্র। শেষজীবনে আর্থিক কষ্টও অনেক পেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য লোককে দেওয়া-থোয়া একট্যও কমেনি, আর ম্যখের হাসিও বন্ধ হয় নি। আর একজন মান্যষের সংগে যোগাযোগ হল। অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মেট্রোপলিটন মেনের প্রধান শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগ্যপ্ত। ইনি গান্ধীজী মহাত্মা হবার অনেক আগেই তৎকালীন খ্যাতনামা মাসিকপত্র 'গৃহস্থে' লিখেছিলেন, "এই ছোট্টখাট্ট মান্যষটিকে একদিন সারা ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নেতা বলে গ্রহণ করবে।" তখন গান্ধীজীর নাম শিক্ষিতসমাজ একট্য-আধট্য জেনেছে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যাবলীর জন্য। আমরা পরম বিস্ময়ে ভাবতুম সতীশদা কি করে ব্যঝতে পেরেছিলেন গান্ধীজীর সম্পর্কে। সব বিপ্লবী গোষ্ঠীর সংগে ও'র জানাশ্যনা ছিল, অনেকের সংগে ঘনিষ্ঠতা ছিল। আবার সকলকে উনি সাদরে ও সস্নেহে গ্রহণ করতেন। আমরা কলকাতায় এলে ও'র ওখানে আস্তানা গাড়তুম—কোনওদিন মনেও হয় নি যে, বাড়িতে নেই।

শ্রীরামপ্যর আড্ডায় অনেক দিন ছিল স্যশীল দাশগ্যপ্ত। অল্প বয়সেই বৈপ্লবিক কাজের জন্য জেল হয়। মেদিনীপ্যরের মত দ্যর্ভেদ্য জেল থেকে পালিয়ে আসে। দ্যর্ধর্ষ ও শক্তিশালী সরকার অন্যসন্ধান করেও বার করতে পারেনি যে, কি করে পালিয়ে এসেছিল। ১৯৪৬ অথবা ১৯৪৮-এর কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দ্য-ম্যসলমানকে থামাতে গিয়ে স্যশীল প্রাণ দেয়। সাহস ছিল অদ্ভুত, তেমনি দেশপ্রেম। বহ্য লোকের নিষেধ সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঙ্গা নিবারণে প্রাণ দিতে। এইভাবেই প্রাণ দেয় আমাদের মাণিক, উত্তরপাড়ার স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট্ট-খাট্ট মান্যষটি। প্রচন্ড সাহস। অন্যায়ের বির্যদ্ধে র্যখে দাঁড়াতে হবে, তা সে শ্রমিক সংগঠনেই হোক, কংগ্রেসের কাজেই হোক, বা হিন্দ্য-ম্যসলমানের দাংগাই হোক। প্যরনো গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গেলে বালি ছাড়িয়ে উত্তরপাড়ায় ঢ্যকবার ম্যখে ওর একটি আবক্ষম্যর্তি আছে।

উটি থেকে দিল্লীর জন্য বেরোল্যম। যেতেই হবে। তিন লাইন হ্যইপ। পার্লা-মেন্টের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। কোয়েম্বাট্যরে প্লেন ছাড়ার পর পাইলট এসে এক ট্যকরো কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। দিনটি ২৭ মে, ১৯৬৪। একে আমি চোখে কম দেখি, তার উপর লেখাটিও অস্পষ্ট। যা হোক, বোঝা গেল জওহরলালের

অবস্থা সংকটাপন্ন। চীন আক্রমণের পর থেকেই জওহরলালের স্বাস্থ্যটা ভাঙতে আরম্ভ করে প্রায় কুড়ি দিন একেবারে শয্যাগত ছিলেন। বাঙ্গালোরে যখন প্লেন থামল, একজন অফিসার এসে বললেন যে, মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে কথা বলবেন। মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা। টেলিফোনে যা বললেন তার মানে—আর আশা নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কখন যাবে?' উত্তর করলেন, 'ক্যাবিনেট মিটিং চলছে, শেষ হলেই যাব।' বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজের পথে প্লেনে সব ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ভাববার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আকাশ-পাতাল কত কথাই মনে হতে লাগল। কিন্তু সেগুলো সবই উদ্‌ভ্রান্তের ভাবনার মত।

মাদ্রাজ এয়ারোড্রোমে কামরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে দেখলুম। প্লেন একটু দেরি করেই ছাড়ল। ছাড়বার কিছু পরে পাইলট কামরাজকে একটা কাগজ দিয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত বার্তা—জওহরলাল আর নেই। পাইলট দাঁড়িয়ে ছিল কামরাজের কাছে। কামরাজ ঘাড় নাড়াতে খবরটি ঘোষণা করে দেওয়া হল। পালাম এয়ারোড্রোম থেকে সোজা আমরা গেলুম ত্রি-মূর্তি ভবনে। জওহরলাল শুয়ে আছেন ঘরে, একটা চাদর ঢাকা। দুটো হাত অঞ্জলি দেওয়ার মত বুকে। ঘরে ধূপের গন্ধ এবং রাশিকৃত ফুল। আনুষঙ্গিক পাঠও হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কত দিনের কথা মনে হতে লাগল। সেই কবে কংগ্রেসে যোগদান করেছি। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে নতুন জীবন এবং নতুন কর্মধারা এনে কংগ্রেসকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তারপর দেশবন্ধু গেলেন, মতিলাল গেলেন, আরও কত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চলে গেলেন। গান্ধীজী নিহত হলেন ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি। তারপরও যাঁদের নাম এবং কার্যক্রম সারা ভারতবর্ষ ও কংগ্রেসকে ধরে রেখেছিল, তাঁদের মধ্যে বল্লভভাই গেছেন, মৌলানা গেছেন, রাজেন্দ্রবাবু আর নেই, শেষ গেলেন জওহরলাল। একটা যুগের অবসান হল।*

গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ভাগী হবার জন্য তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবার সাধনা করছিলেন। জওহরলালও সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। অবশ্য পায়ে হেঁটে নয়। গান্ধীজীর মনোভাব ছিল জানা ও সেবা করা। জওহরলালের মনোভাব ছিল অভিভাবকত্বের। বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত রাজার দুলাল জওহরলালের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সংঘর্ষ ছিল। দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু দরিদ্রকে আপন করে নিতে জানতেন। উত্তরপ্রদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে যখন ঘুরতেন, গরীব লোকদের কুঁড়েঘরে চারপাইতে স্বাভাবিকভাবেই বসে পড়তেন। কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কিন্তু একটা পার্থক্যবোধ ছিল। লোকে ওঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, কিন্তু কোনও দিন আপনজন বলে ভাবেনি। ১৯৩০-এ লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি হন। আর ১৯৬৪-তে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল নেতারূপে এবং

---

* এই কবিতাটি জওহরলালের ঘরে মৃত্যুর সময় টেবিলে পাওয়া গিয়েছিল। কবিতাটির নাম: Stopping by woods on a snowy evening: লেখক Robert Frost.

> The woods are lovely, dark and deep,
> And I have promises to keep,
> And miles to go before I sleep,
> And miles to go before I sleep.

দেশের প্রধান মন্ত্রীরূপে ভারতবর্ষে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। লোকে সমালোচনা করত, কিন্তু বিশ্বাসও করত। আর আমরা যারা কংগ্রেস-কর্মী, তারা ওঁর নেতৃত্বে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহ হয়নি তা নয়, কিন্তু সে বিদ্রোহের পিছনে অশ্রদ্ধা থাকত না। বহু জায়গায় জওহরলাল নীতি স্বীকার করেছেন; কিন্তু তার পিছনে এমন মনোভাব থাকত যে, ওঁর নেতৃত্বে মর্যাদা আরও বর্ধিত হত। পরস্পরবিরোধী কথাও অনেক বলেছেন, ভুলও অনেক করেছেন। কিন্তু কোথাও সেগুলো গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ওঁকে সব মলিনতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেত। যেমন প্রাণচঞ্চল, তেমনি অস্থির। কিছু একটা করতে হবে—হয়তো অনেক সময় জানেন না যে, কি করতে হবে। ফলে নিজে কষ্ট পেয়েছেন, অনেককে কষ্ট দিয়েছেন। গতিবেগ ছিল দুর্বার। সেইখানেই ছিল অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে পার্থক্য।

জওহরলাল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। কথাগুলো সবই এলোমেলো চিন্তার ফল। খানিক বাদে জওহরলালের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালুম। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও কোথাও কোথাও দেখা গেল, পরে কি হবে, তাই নিয়ে আলোচনা। তখনও আমাদের আচ্ছন্ন ভাব কাটেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু বিরক্তি বোধ হল। আরও খানিকক্ষণ থেকে আমি আর কামরাজ বেরিয়ে পড়লুম। কামরাজ আমাকে ক্যানিং লেনে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল—পথে একটাও কথা হয়নি। দিল্লীর সেদিনকার অবস্থা ভোলা শক্ত। একটি প্রাণ যেন দিল্লীর সকলকার প্রাণকে হরণ করে নিয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি নেই, স্কুটার নেই, সাইকেল নেই, টাংগা নেই। দু-চারজন লোক যে চলছে, তাও নিঃশব্দে। কোথাও কোনও দোকান খোলা নেই। অনেকের অনেক অসুবিধে হয়েছে; কিন্তু এত নিথর নীরবতা যে, মনে হচ্ছে যেন রাজধানী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঝুম হয়ে গেছে। সেদিন বোধ হয় দিল্লীতে টেলিফোন ব্যবহার হয়েছিল সবচেয়ে কম।

রাত সাড়ে ন'টার সময় সুভাষ এসে বললে, 'একটা টেলিফোন এসেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।' আমার অক্ষমতা জানাতে সুভাষ একটু ইতস্তত করে বলল যে, নাম সমর চাটুজ্যে। ইউ কে থেকে এইমাত্র এসেছেন। পালাম থেকে টেলিফোন করছেন। আমি টেলিফোন ধরলুম। ওপার থেকে সমরের গলা ভেসে এল, 'আমি এইমাত্র পঞ্চাশটি বাচ্চা নিয়ে ইউ কে থেকে এসে পালামে নেমেছি। যেসব জায়গায় ওঠবার কথা বা আশা ছিল, কোনও জায়গাতেই সুবিধে হচ্ছে না।' ক্ষণকালের জন্যে চুপ করে রইলুম। সেটা একান্ত ক্ষণিক। বললুম, 'ওখান থেকে এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের একটা বাস নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এসো।' তারপরই প্রকাণ্ড সমস্যা। অতগুলো ছেলেমেয়ে—তারা খাবে কি? আমাদের বাড়িতে রান্না হয়নি। যা খাবার ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে। ভাববারও অবসর ছিল না, সমর দলবল নিয়ে এসে হাজির হল। সমর চট্টোপাধ্যায়। সি এল টি-র একটি ট্রুপ নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন, সেদিনই পালামে এসে নেমেছেন। সমরের মুখচোখ শুকিয়ে গেছে। সেও ভাবতে পারছে না, কি ব্যবস্থা করবে। অথচ সেই হল সি এল টি-র প্রাণস্বরূপ। আমাদের বাড়িতে কয়েকজন এম পি তখনও ছিলেন। তাঁরা সমরকে অভয় দিয়ে বললেন যে, কোনও ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। পাশেই একটা খালি বাড়ি

ছিল, বাচ্চাদের নিয়ে দুজন এম পি আমাদের বাড়ির যত চাদর, বালিশ, বিছানা নিয়ে চলে গেলেন। আর দু-তিনজন এম পি একটা গাড়িতে নানারকম বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ও-বাড়িতে তখন বাচ্চারা দু-চারখানা বিস্কুট, কতকগুলি ফল যা ছিল, খেয়ে প্রচুর জল খেয়েছে। তারপর একটু শান্ত হয়েছে, সমরের চেহারাটাও বদলেছে। যারা বাসন-কোসন নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা দু-তিনটে দোকানের দরজা খোলায় এবং বলে, 'চাচা নেহরুর বাচ্চারা এসেছে। এরা যদি না খেয়ে থাকে, তা হলে কি চাচা নেহরু তৃপ্তি পাবেন?' জওহরলালের নাম জাদুমন্ত্রের কাজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুটি, ডাল, সব্জি প্রস্তুত। মিষ্টান্ন ছিল না। ছেলেরা যখন খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল, তখন ঠিক রাত্রি বারোটা।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। তার কিছু আগেই অবশ্য 'ছায়া' মন্ত্রিসভা হয়েছিল। 'লীগ ও কংগ্রেস'। দুজন মুখ্যমন্ত্রী। সব লেখাপড়া, নিয়মকানুন শেষ হবার পর লীগের মন্ত্রীরা চলে যাবেন ঢাকায় ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বসবেন কলকাতার মহাকরণে, পশ্চিমবঙ্গে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। ১৫ই আগস্টের আগেই ঝড় উঠল। তরুণ তফসিলী-ভুক্ত মন্ত্রী শ্রীরাধানাথ দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে হবে। ডঃ ঘোষের নির্দেশে খুব গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। এবং তারপর যে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন এবং ডাঃ রায় এলেন, এইখানেই তার সূত্রপাত। প্রতিবাদে অনেকে মুখর হয়ে উঠলেন। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীমোহিনী বর্মন, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীরাধানাথ দাস এবং আরও কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগপত্র লিখে ফেললেন। ঘন ঘন বৈঠক, কিছুতেই আর সমস্যার সমাধান হয় না। দেশভাগজনিত একটা দুঃখ ও অবসাদ আছে, তার উপর আবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতিও বেশ প্রকট হয়ে আছে গান্ধীজী নোয়াখালি ঘুরেছেন, কলকাতায় যেখানে ছিলেন, সে বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে—এসব মিলিয়ে রাজনীতি বেশ ভারাক্রান্ত। আর তার উপর যদি এতজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন, তা হলে ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-উৎসব পর্যবসিত হবে নৈরাশ্য ও হতাশায়।

নানারকম আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেও যখন সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল না তখন কংগ্রেস সভাপতিকে আনাই সাব্যস্ত হল। আচার্য কৃপালনী তখন কংগ্রেস সভাপতি। আচার্য কৃপালনী এলেন, অনেকের সঙ্গে কথাবার্তাও বললেন। কিন্তু জট বিশেষ খুলল না। আচার্য কৃপালনী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ডেকে বললেন, 'আপনাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'না। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' আচার্য কৃপালনী বললেন, 'আমি

কংগ্রেস-সভাপতি। আমি নির্দেশ দিচ্ছি আপনাকে হতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র সেন উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার সব কথা শুনতে প্রস্তুত। যে কাজ দেবেন, করব। কিন্তু মন্ত্রী হতে পারব না।' ঘুরে-ফিরে সেই অচল অবস্থা। একজন অখ্যাতনামা কর্মী অনেক ঘোরাঘুরি করে সমস্যা সমাধানের একটা সাময়িক সূত্র বার করলেন। ১৫ই আগস্টটা কেটে যাক, তারপর ৩১শে আলাপের মধ্যে ভেবে-চিন্তে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিপালিত হবে। সাময়িক বিরতি। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কলকাতায় ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতির জন্য কোনো জনসভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অথচ উনি জনসভা করবেনই। অনেক ভেবেচিন্তে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর কাছেই, কিন্তু যাত্রাটা খুব উপভোগ্য হয়েছিল। গাড়ির পেছনের আসলে উনি এবং আর দুটি মেয়ে—দুজনেই বি এ পাস। আর সামনের সীটে আমার সঙ্গে বন্ধুবর এ বি চ্যাটার্জি, আই সি এস। মেয়ে দুটি আচার্য কৃপালনীকে রাস্তাঘাট ভাল করে বোঝাল। টালা ব্রীজ দিয়ে যেতে যেতে বোঝাল, ওটি Tolly's নালার উপরে সেতু। বালী ব্রীজকে হাওড়া ব্রীজ বলে চালিয়ে দিল। আর উনি তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল। দেখে একবারও মনে হবে না যে, কিছুক্ষণ আগেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিয়ে ওঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দু-একটি কলিও পেছন থেকে শুনতে পাওয়া গেল। উনি অবশ্য গান গাইছিলেন না, মনে হল যেন একটু গুনগুন করছেন।

শ্রীরামপুর থেকে যখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পেঁছিলুম, তখন রাত সাড়ে আটটা। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করতে সাড়ে ন'টা বাজল। কৃপালনী তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আরও মিনিট দশেক বাদে আমি বাড়ি ফিরে আসব, এমন সময় বসার ঘরে কৃপালনী এসে হাজির হলেন। আমি নমস্কার করে চলে আসার উপক্রম করতেই উনি হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। আমার তখন মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাল না। সারা দিন উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। মনটা বেশ অবসন্ন। কৃপালনী মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফুল্ল, তোমার বাড়িতে কি বাড়তি রেডিও আছে?' ডঃ ঘোষ চটপট উত্তর দিলেন, 'না।' সঙ্গে সঙ্গে কৃপালনী আমার দিকে তর্জনী প্রসারিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?' দুজনের কথাবার্তায় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলুম, আত্মস্থ হয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' এমন সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সব কাজের তত্ত্বাবধায়ক নৃপেনদা (ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ বোস) এসে হাজির হলেন। কৃপালনী তখন ঘর থেকে চাদর বার করে এগিয়ে পড়েছেন। নৃপেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, ব্যাপার কি?' মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিলেন, 'একটা বাড়তি রেডিও নেই বলে দাদা অতুল্যকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন।' কৃপালনী বললেন, 'প্রফুল্ল জানে না, ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক আগে সুচেতা বন্দে মাতরম গাইবে।' এ কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আমি ভয়ে ভয়ে পিছু নিলুম। নৃপেন্দা এসে একটা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালেন। উনি সেদিকে তাকালেনও না। খুব বিরক্ত, খুব ক্ষুব্ধ। কারণ ছিল দুটো। রেডিও থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা পরিবেশন করা হবে, আর তার সঙ্গে সুচেতার গান। আমি নিউ আলিপুরে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি পেঁছে দিয়ে বিদায় নিলুম।

এই প্রসঙ্গে ওঁদের বিয়ের কথা মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনে কৃপালনী অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে জেলে গেলেন। কয়েক বছর বাদে এ আই সি সি-র

সম্পাদক। ১৪ বছর সম্পাদক ছিলেন। আর ১৪ বছরই সাদিক আলি (বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল) পার্মানেন্ট সেক্রেটারী। তখন মতিলাল এলাহাবাদে তাঁর বিরাট প্রাসাদ 'স্বরাজ ভবন' কংগ্রেসকে দান করেছেন। সেখানেই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়। স্বাধীনতার সময়-সময়েই দিল্লীতে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কৃপালনী বাস করতেন এলাহাবাদে। সুচেতা পড়াতেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। কোণাকুণি গেলে গঙ্গার এপার-ওপার। সুচেতাও তখন পুরো কংগ্রেসী। বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু সবটাই কেটেছে বাংলার বাইরে। পরিবারের অনেকেই কৃতী। উনি সেসব ছেড়ে কংগ্রেসের পথই বেছে নিয়েছেন। দেখাসাক্ষাৎ দুজনের হত বিভিন্ন সভাসমিতিতে। বয়সের পার্থক্য মোটে বাইশ বছরের। ক্রমশ সুচেতার এ আই সি সি-র অফিসে আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে দাদাকে দু-এক পদ রেঁধেও খাওয়াতেন। সুচেতা কৃপালনীকে 'দাদা' বলতেন, মৃত্যুকাল অবধি 'দাদা'ই বলে গেলেন। এইরকমই চলছিল। কার সাধ্য কিছু বলে। কৃপালনীর জিভের তীক্ষ্ণতা অনেক সময় রাজাজীকে হার মানাত। এমন সময় জওহরলাল জেল থেকে বেরোলেন। সব দেখেশুনে কৃপালনীকে একদিন বললেন, 'হুঁ।' (Yes)। ব্যস্, আর কোনও কথা নয়। জওহরলাল আর কৃপালনী, দুজনে তখন খুবই ঘনিষ্ঠ। দু দিন বাদেই জওহরলাল কৃপালনীকে বললেন, 'এবার বিয়ে করে ফেল।' কৃপালনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ায় খুব দক্ষ। কিন্তু উনিও কিছুক্ষণের জন্য চুপ। খানিক বাদেই সুচেতারও ডাক পড়ল। সেখানে আর বিয়ে করার অনুরোধ নয়, জওহরলাল বললেন, 'আমি বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছি।' অগত্যা। অবশ্য দুজনেই খুব ইচ্ছুক ছিলেন। তবে জওহরলাল মাঝখানে না পড়লে হয়তো হয়েই উঠত না। কৃপালনী ও সুচেতাকে নানাভাবে, নানা অবস্থায় দেখেছি। ১৯৭৫-এর শেষের দিকে কৃপালনীর হল নিউমোনিয়া। সেবার সবটা দায়িত্বই সুচেতার উপর। অনেক রাগারাগিতে একটা নার্সের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলুম। কিন্তু শরীর তখন আয়ত্তের বাইরে। এর আগে সুচেতার দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আর কৃপালনীর অসুখের সময় উপরি-উপরি রাত জাগার জন্য মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর হাসপাতাল। দাদা হলেন সম্পূর্ণ নিরাময়। সুচেতা ছেড়ে চলে গেলেন।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হলো ১৯২৮ সালে। মতিলাল সভাপতি। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। সে সময়ে সাইমন কমিশন সারা ভারতবর্ষে ঘুরছে। উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষকে আরও কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কট করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান মতিলাল। এঁদের বিচার্য

বিষয়, ইংরেজের সঙ্গে কোনরকম রফায় এসে স্বায়ত্তশাসন পাবার চেষ্টা। কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত আগেই মাদ্রাজ কংগ্রেসে এবং তার আগে গৌহাটি কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই অবস্থায় কলকাতায় যদি আবার স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা হলে নেহরু কমিশনের চেয়ারম্যান কি করে দুটোকে মেলাবেন! গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় মতিলাল সম্মত হলেন কংগ্রেস সভাপতি হতে। তবে জওহরলাল এবং আরও অনেকে মতিলালের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব আনা হবে না। উত্তেজনা যথেষ্ট রয়েছে। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে লালা লাজপৎ রায়, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতি নেতা পুলিসের লাঠিতে আহত হয়েছেন। এই পটভূমিকায় কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

আমার কথা স্বতন্ত্র। আগে কংগ্রেস দেখেছি, ১৯১৭-য় কলকাতায় বেসান্ত কংগ্রেস। ১৯২০-এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন কলকাতায়, লালা লাজপৎ রায় সভাপতি, গান্ধীর নেতৃত্বে সেখানে অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত হলো। তারপর নাগপুর, গয়া, কোকোনাদা, মাদ্রাজ, গৌহাটি ও আরও অনেক জায়গায় হয়েছে; তার কোন কোনটায় গেছি দর্শক হিসেবে। এই প্রথম প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান। মনের মধ্যে বেশ একটু মুরুব্বি-মুরুব্বি ভাব এসে গিয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জে এম সেনগুপ্ত, সম্পাদক ডঃ বি সি রায়, আর সেবাদলের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। আর সুভাষচন্দ্রের পরই যে দুজন সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন, একজন হলেন হেমন্তদা (বোস), আর একজন হলেন রবি সেন। স্বাভাবিকভাবেই হেমন্তদার কাছেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হেমন্তদার শিবিরে থাকার ফলেই কংগ্রেসের আর একটা রূপের সঙ্গে পরিচয় হলো। দলাদলি, মনান্তর ও মতান্তরের কথা খানিকটা শোনা ছিল এবং জানাও ছিল। ১৯২৩-এর বি-পি-সি-সির সাধারণ সভা। এক দিকে দেশবন্ধু স্বয়ং, অন্য দিকে শক্তিশালী দৈনিক 'সার্ভেন্ট' সংবাদপত্রের নির্ভীক সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী; তাঁর সঙ্গে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্লচন্দ্র গরীবের ছেলে। নিজের চেষ্টায় ও মেধায় প্রথম ভারতীয় 'অ্যাসে মাস্টার' হয়েছিলেন। সিভিলিয়ান-এর পদ, হাজার টাকা মাইনে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন; খাদি প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাথী। আর অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ডঃ সুরেন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের সঙ্গী। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় নো-চেঞ্জার বা প্রো-চেঞ্জার যে দলেরই শক্তি বৃদ্ধি হোক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষের খুবই ক্ষতি হয়েছিল। একটি টেবিল-চেয়ারও আস্ত ছিল না। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। ১৯২৫-এর শেষে বা ২৬-এ বীরেন শাসমলের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলনের সভাপতি বীরেন শাসমল মশায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসঙ্গত মন্তব্য করেন। অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। আবার ক্রুদ্ধও অনেকে হয়েছিলেন। বগুড়ার যতীনদার (রায়) মত ঋষিকল্প লোক, তাঁরও ক্ষোভের সীমা ছিল না। ঢেউ এসে লাগলো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে। তখন সভাপতি অধ্যাপক জে এল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলো। তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাবকে স্বীকৃতি না দিয়ে আফিস দখল করে বসে রইলেন। সামনে করপোরেশন ইলেকশন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করপোরেশন ইলেকশনের জন্যে আর একটি নির্বাচনী

কমিটি করে দিলেন; তার আফিস ডাঃ রায়ের বাড়িতে। ফলে করপোরেশনের নির্বাচনে দু দল কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড়ালো। এক দল ওয়ার্কিং কমিটির নামে, আর এক দল বাতিল পি-পি-সি-সির নামে। এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খানিকটা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস শিবিরে বাস করে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। ডঃ কানাই গাঙ্গুলী মশায় সন্ধ্যের সময় যখন প্রতিনিধি-শিবিরে ফিরছিলেন তখন এক দল প্রতিনিধি প্রকাশ্যভাবে গিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। তার পরের দিনই একদল সেবাদল-কর্মী সামরিক কায়দায় মার্চ করে গিয়ে অস্থায়ী হাস-পাতাল ও ফার্স্ট এইড সেন্টার ভেঙে দিলো। সন্ধ্যেবেলা তিন লরী ইঁটের টুকরো এলো মূল কংগ্রেস মণ্ডপ ভাঙবার জন্যে। যারা ভাংগতে এসেছিল তাদের মোকাবিলা করার জন্যে জওহরলাল একটি ঘোড়ায় চাপলেন। এ কাহিনী আর বেশী না লেখাই ভাল। ডাঃ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের পদ থেকে তিনবার অব্যাহতি চেয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন. তিনি আর কার কাছে পদত্যাগ করবেন! তিনিও একান্ত ক্ষুব্ধ। এই হলো আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

কংগ্রেস কার্যক্রমেও জটিল অবস্থা। যথারীতি প্রতিশ্রুতি ভংগ করে জওহর-লাল পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব আনলেন। সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও আরও অনেকে। বেশীর ভাগই বাংলার প্রতিনিধি। কিন্তু বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী বিপিনদা (গাঙ্গুলী), অমরদা (চট্টোপাধ্যায়) ও আরও কয়েকজন—তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় নৃপেনদাও (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন—কোনও পক্ষেই ভোট দিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, মতিলালকে যখন কথা দেওয়া হয়েছে, আমরা বাংলার ডেলিগেট, আমাদের অন্তত সে কথার মর্যাদা রাখা উচিত। ভোটে অবশ্য স্বাধীনতা প্রস্তাব বাতিল হয়। প্রায় সাড়ে তিন শ' ভোটের ব্যবধানে। যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ইংরেজকে সময় দেওয়া হয়েছিল এক বছর। ঠিক এক বছর বাদে ১৯২৯-এর ২১শে ডিসেম্বর রাত বারটার পর অর্থাৎ ইংরাজী ক্যালেণ্ডার মতে ১৯৩০-এর ১লা জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি জওহরলাল। সেই লাহোর কংগ্রেসেই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়, যা বরাবর প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

আগে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে আরো অনেক অধিবেশন হতো। একটা উল্লেখযোগ্য সম্মেলন ছিল—'জাতপাত তোড় সম্মেলন'। প্রধানতঃ অস্পৃশ্যতা নিয়ে বক্তৃতা হতো, আর তার সঙ্গে ছিল এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়া। সেইসব ভোজনশালায় যেসব মন্তব্য হতো তার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ 'ভটচায্যি মশায়ের পাতের দই আমার পাতে এসে পড়েছে, আর আমার পাতের দই ভটচায্যি মশায়ের পাতে পড়েছে।' বর্তমানে এসব শুনলে হয়তো অনেকেই অদ্ভুত মনে করবেন; কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এ ঘটনা খুব বিরল ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে তো ছিলই. পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলেও ছিল। আর যুব সম্মেলনও মাঝে মাঝে হতো, সেটা খুব জোরদার ছিল না। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় একটি যুব সম্মেলন হয়েছিল। বিনু (অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বোধ হয় ছিল সংগঠক। এই যুব সম্মেলনে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটতো। কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দী এবং ইংরেজী প্রায় সমান সমানই চলতো। কিন্তু যুব সম্মেলনে পাক্কা ইংরাজী কথা। ফলে. মাদ্রাজ এবং বোম্বের যুবকরাই বেশী হাততালি পেত। একটি বেশ ভাল প্রদর্শনীও হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। মাঝে মাঝে মনে

হতো মূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রদর্শনীর বোধ হয় কোন যোগ নেই। বাস্তবে কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন।

গান্ধীজী সব সময়েই মঞ্চে থাকতেন। বহু উত্তেজক বক্তৃতাও তাঁর সামনে হতো। কিন্তু কি যেন একটা তাঁর কথার মধ্যে ফুটে বেরুতো, যাতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাতেই উত্তেজনার ভাব অনেক কমে যেত। আমরা কয়েকজন একসঙ্গে ভোট দিতে ঢুকেছিলুম—হেমন্তদা (বোস), প্রফুল্লদা (সেন), ধীরেনদা (মুখোপাধ্যায়), আরও কেউ কেউ। আমি আর হেমন্তদা আলাদা হয়ে গেলুম। হেমন্তদা বললেন, 'দেখ, গান্ধীজীর বক্তৃতার পর অন্য কথা ভাবাই যায় না। তবুও...।' ভোটপর্ব তো শেষ হলো। ভোটে যাঁরা জিতলেন তাঁরাও খুশী নন, আর যাঁরা হারলেন তাঁরা তো নিরানন্দ বটেই। ফলে, ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের ঘন ঘন বৈঠক। পাকা চুলওলা মতিলাল, তাঁর এমন একটা সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ ছিল যে, সকলেই তাঁকে একটু সমীহ করতো। তাঁর বক্তৃতা হলো যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনই কমনীয়। কঠোরতা ছিল, কিন্তু সে কঠোরতায় তিক্ততা ছিল না। মহামর্যাদাময় এ মানুষটি অত বাধার মধ্যেও সেদিন সকলের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। আর একজন মানুষ—গায়ে একটা 'ওপেন ব্রেস্ট' কোট, আর বগলে গোল করে জড়ানো একটা চাদর—বলছিলেন, 'মনকষাকষি করে লাভ কি? আমরা তো কংগ্রেসকে আহ্বান করেছি! সকলেই আমাদের অতিথি। কোনও অতিথির যদি অমর্যাদা হয় তা হলে লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা থাকবে না।' সুরেশদার (মজুমদার) একটা সুবিধে ছিল। উনি ছিলেন আবাস-গৃহ-বিভাগের কর্তা। সব প্রতিনিধির সঙ্গেই দেখা হতো, আর সব সময়েই ঐ এক কথা। রাত্রে সেনগুপ্ত মশায় স্বয়ং সব শিবিরে হাজির হলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন রাজনীতিতে এক অসাধারণ মানুষ। ইংরাজীতে স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝায়—এর বাংলা আমি জানি না—যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাই। কোনও ছোট জিনিস কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মতান্তর হয়তো অনেকের সঙ্গেই হতো, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে মনান্তর হবার সুযোগ কখনো কাউকে দেননি। ডায়াবেটিসের রুগী, কিন্তু খেতে খুব ভালবাসতেন, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবরা জোর করে খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতো। অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসে যোগদান করেন, কিন্তু তখনো ব্যারিস্টারি ছাড়েননি। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময় দেশবন্ধুর যাবার কথা, দেশবন্ধু যেতে পারলেন না, পাঠিয়ে দিলেন যতীন্দ্রমোহনকে। লোকে জানতো না, স্টেশনে স্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা। যতীন্দ্রমোহনের অবস্থা সঙ্গীন। ফির এসে প্র্যাকটিস ছাড়লেন এবং ধীরে ধীরে দেশবন্ধুর একান্ত আপনজন হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর উনি যে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী, বাংলা কংগ্রেস সেটা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দিলো ত্রিমুকুটে অভিষিক্ত করে। বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্ট, আইনসভার দলপতি ও করপোরেশনের মেয়র। ওঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যখন বিলাতী বর্জন হলো তখন কয়েকজন ওঁর কাছে গিয়ে হাজির, 'স্যার, এইবার তো মেমসাহেবকে ছাড়তে হবে। বিলাতী মেম।' উনি হেসে বললেন, 'তোমরা বিলাতী বেগুন (টোম্যাটো) ছেড়ে দাও।' এইসব কথার মধ্যে এসে হাজির হলেন ওঁর যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্তা। তিনি সব শুনে হেসে বললেন, 'আমি তো বাঙালী বিয়ে করেছি। উনি আমায় ত্যাগ করতে পারেন; কিন্তু আমি তো ভারতবর্ষ ছাড়বো না, এটাই তো আমার দেশ।' যাঁরা পরিহাস করতে

গিয়েছিলেন তাঁদের অবস্থা তখন সঙ্গীন। একবার একটা সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলুম। মৌরলা মাছ, কচু, লাউ—এইসব তো খাওয়ার ব্যবস্থা। বিকেলবেলা প্রতাপদা (গুহ রায়) বললেন, 'ওরে সাহেব তো সব কচু খেয়ে ফেলেছে—মানে আধ সের।' আমরা তো হতভম্ব, আবার কচু পাই কোথায়! যতীন্দ্রমোহন নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন; বললেন, 'তোমাদের ঐ প্রদর্শনীতে যে ছানার হাতী করেছো ঐটাই নিয়ে এসো না। কাল সকালে প্রদর্শনী খুললে বলবে, হাতী বনে পালিয়েছে।'
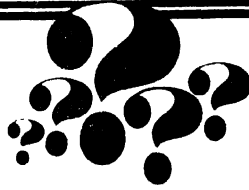
হঠাৎ টেলিফোনটা আওয়াজ করে উঠল। এখানে টেলিফোন ভয়ানক বেমানান। বাড়ির শেষ থেকেই শুরু হয়েছে ছোট ছোট অগুন্তি পাহাড়। দু শ', তিন শ', পাঁচ শ', সাত শ' ফিট। উঁচু হলেই একে একটা 'রেঞ্জ' বলা চলত। ওর মধ্যে একটা পাহাড় একটু উঁচু। ওর উপর 'দেওলাসিনি' ঠাকুর আছেন। ক' শ' বছর যে সে ঠাকুর আছেন, তা কেউ জানে না, তবে তিনি আছেন। একটা কালো পাথরের উপর আর একটা কালো পাথর দাঁড়িয়ে। তার সামনে মাঝে মাঝে সারারাত ধরে মাদল বাজে। আর আমাদের বিহারী হল পুরুত। কিছু অমঙ্গল বা অকল্যাণ হলে, বা হবার সম্ভাবনা থাকলে, বিহারীর ডাক পড়ে। বিহারী আবার এদিকে ওষুধও দিতে পারে। তবে আগের চেয়ে এখন মুশকিল, আগে অনেক গাছ লতা-পাতা ছিল, এখন তো সবই কাটা গেছে। তবুও এ পাহাড়গুলোর ধারে-কাছে ও মধ্যে একটু একটু জঙ্গল রয়েছে। শাল, পিয়াশাল, লোহা, ছাতিম, বয়ড়া, শিমুল, আরও যে কত রকমের গাছ। এখন আবার বন-সংরক্ষণের কর্তারা কিছু সেগুন ও প্রচুর ইউক্যালিপটাস গাছ বসিয়েছেন। মাঝে-মধ্যে কিছু ফুল গাছও আছে। বেশির ভাগই হলদে আর লাল। কুরচি ফুলও রয়েছে। জাপানী চেরীর মত সমস্ত গাটা সাদা ফুলে ভর্তি হয়ে যায়। সে এক অপূর্ব শোভা। আর রক্তরাঙা বিজয়কেতন উড়িয়ে পলাশ তো আছেনই। ফাগুন মাসে পলাশ ফুল যখন বনে বনে আগুন ধরিয়ে দেয়, পলাশ গাছটিও তেমনি মাটিকে শুষে, চেটে-পুটে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়। এমন সম্বনেশে গাছ আর নেই। গাছ যত বড় হবে, মাটির অবক্ষয় তত বাড়বে। চারদিকে যেসব জমি পড়ে আছে, তার বেশির ভাগই কাঁকুরে। অতি কষ্টে দু-চার কিতে জমিতে যদি বা ফসল হয়, কিন্তু জল কোথায়? মাঝে মাঝে কতকগুলো চটান, অগভীর পুকুর আছে, ফাগুন পড়লেই আর তাতে জল নেই। এখানে বলে বাঁধ—নীচে দিয়ে তো জল ওঠে না, বর্ষার জল ধরে রাখতে হয়। আর বর্ষা এখানে অতিশয় কৃপণ। দু'-তিন বছর অন্তর অন্তর দেখা পাওয়া যায়। মাঠের মাঝে মাঝে কতকগুলো তালগাছ পাহারাওয়ালার মত দাঁড়িয়ে। আর ইতস্তত ছড়ানো কতকগুলি ছোট ছোট পল্লী। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, আর উপরে ছন, কোথাও বা খড়। কিন্তু ঘরগুলো

তকতকে, ঝকঝকে। কারোর দেওয়াল সাদা মাটিতে লেপা, কারোর বা কালো মাটিতে, কোথাও কোথাও রাঙা মাটিতে। আর কতরকমের ছবি। এরকম একটি জায়গায় টেলিফোন থাকার কি কোনো মানে হয়?

বাঁকুড়া শহর থেকে আটাশ মাইল দূরে। কাছের বাজার আট মাইল। আর বাসের রাস্তা পাঁচ মাইল। এখানে আমার ছোট বাড়ি। গ্রামের নাম দেওলাগড়া। আগে চতুর্দিকেই বন ছিল, এখন সব বন কাটা। মাঠ করছে ধূ ধূ। এই জায়গায় বিশ্রী ও বেমানান হল টেলিফোন, কিন্তু তবুও আছে। সঙ্গীদের মধ্যে একজন টেলিফোনটি তুললেন। আসাম-তেজপুর থেকে টেলিফোনটি আসছে। কে কথা কইবে ঠিক বোঝা গেল না। ইংরেজীতে বলে 'পার্সোন্যাল কল'—এর বাংলা হয় না। আমি তো ভাবছি বুড়ী (শ্রীপ্রিয়লতা বড়ুয়া), দেবু (শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া), কামাখ্যা (শ্রীকামাখ্যা ত্রিপাঠী)—এদেরই কারোর কিছু হয়েছে। কিছু পরে গলার আওয়াজ ভেসে এল। বেশ পরিষ্কার না হলেও বুঝতে পারলাম—লালবাহাদুর। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কথা সামান্যঃ 'তুমি এখনই কলকাতা চলে এসো। আমি সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছব।' ব্যস্। একটু আশঙ্কা মনে ছিল যে, তাড়াতাড়ি হয়তো ফিরতে হবে। চীনেরা প্রায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বার উপক্রম করেছে। সঙ্গে কয়েকজন ডাক্তার। তাঁরা তো খেতে অবধি দিলেন না। বললেন 'এখুনি বেরোতে হবে।' মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের কর্তা ডাঃ মুরলী সেনগুপ্ত, হাড়গোড় ভাঙ্গা ও জোড়া দেওয়ার কর্তা ডাঃ কালীশঙ্কর বসু এবং স্বাস্থ্য বিভাগের জয়েন্ট ডিরেকটর ডাঃ সরিৎ মল্লিক। তাঁরা এমন তৎপর হয়ে উঠলেন, মনে হল তাঁরা তেজপুরেই যেতে চান। ঐ বাড়িটা ছেড়ে আসার সময় আমার একটু কষ্ট হয়। শ্রীমান ভূপেশ গুপ্ত (এম পি) ঐ বাড়িকে ঐতিহাসিক করে দিয়েছেন। রাজ্যসভায় বলেছিলেন, 'ঐ বাড়িটি বিরাট। সরকারী বন বিভাগের বারোজন লোক ঐ বাড়িতে সব সময় কাজ করেন। আর আমার পুত্রবধূ ওখানে বাস করেন।' আমার পুত্রবধূ আমার পুত্রকে বিয়ে করে বিবাহিতা হয়েছেন। তাঁর পক্ষে সংগত কারণ ছিল না স্বামীকে ত্যাগ করে ঐ বাড়িতে বাস করার। তবু আমার পুত্রবধূ একটু খুশী হয়েছিলেন, কারণ পার্লামেন্টে তো নাম উঠেছিল। ভূপেশ গুপ্তকে একদিন বলেই ফেলেছিল, 'আপনাকে একদিন ভাল করে খাওয়াব। কারণ আপনার জন্যই তো কাগজে নাম বেরোল, লোকে আমার নাম জানল।' অবশ্য ও বাড়িতে অনেকেরই পদচিহ্ন পড়েছে। মোরারজীভাই, কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডী, মোহনলাল সুখাড়িয়া, দেবকান্ত বড়ুয়া—এঁরা হলেন রাজনীতির। আর আমাদের ঘরের তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত, সুমথনাথ, শান্তিনিকেতনের প্রাণস্বরূপ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর—এমন খ্যাত-অখ্যাত বহু লোকই মাঝে মাঝে কাটিয়ে এসেছেন।

কলকাতায় পৌঁছলুম। ঘর ভরতি লোক। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লদা (সেন), পুলিসমন্ত্রী কালীবাবু, চিফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী, পুলিস কমিশনার, আই জি, এবং ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলে যতজনের আসা উচিত, অনুচিত, তাঁরা সকলেই আছেন। লালবাহাদুর পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখ শুকনো। যে মানুষ সব সময় গাম্ভীর্যকে এড়িয়ে চলতেন, দেখে মনে হল তাঁর উপর দিয়ে একটা ভূমিকম্পের প্রলয় ঘটে গেছে। প্রফুল্লদা এলেন, কালীবাবু এলেন। লালবাহাদুর বললেন, 'এখনই হাজার পাঁচেক কম্বল, যতগুলি সম্ভব Balaclava cap, আনুষঙ্গিক কয়েক শ' বোতল রাম আর দেড় শ' জীপ তেজপুর

পাঠাতে হবে। কাল সকালের মধ্যেই। সেদিন রবিবার, তায় রাত্রি। তবু কম্বলের ব্যবস্থা হল। কালিম্পঙ-এর এস ডি ও-কে ফোন করে ছ' শ' Balaclava cap-ও পাওয়া গেল। আর 'রামের' ব্যবস্থা করা একটুও শক্ত ছিল না। কিন্তু সকালের মধ্যে জীপ পাঠানো যাবে কি করে? লালবাহাদুর কারণটাও খুলে বললেন। চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে যখন আমাদের সৈন্যরা গিয়ে পেঁছেছে, তখন দেখা গেল, তাদের গায়ে কোনও পশমের পোশাক নেই, শোবারও কোনো গরম কাপড়ের ব্যবস্থা নেই। জীপ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পর আমি সভয়ে লালবাহাদুরকে বললুম, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি একজন অফিসারকে দায়িত্ব দেন, তবে জীপ পেঁছনোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে অফিসারটির উপর মুখ্যমন্ত্রী খুশী নন, তাঁর বিভাগীয় কর্তাও তেমন প্রসন্ন নন।' আই জি এবং পুলিস কমিশনারকে ডাকা হল। নামটি শুনে লালবাহাদুর ছাড়া সকলেই একটু ভড়কে গেলেন। সম্মতি অবশ্য মিলল। সম্মতি না মিলে উপায় ছিল না। অত্যন্ত সহজ, সাধাসিধে, খর্বাকৃতি মানুষ লালবাহাদুর। কিন্তু মানুষের মনকে স্পর্শ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একবার কোনও একটা কাজে আমরা দুজন কোচবিহারের পথে শিলিগুড়িতে অনেকক্ষণ ছিলুম। ব্যাডমিন্টন কোর্ট দেখেই উনি কাপড়টা মাল-কোঁচা করে পরে তক্ষুনি নেমে পড়লেন। ছেলেরা কি খুশী, বিশেষত ওঁর পার্টনার। নাম মনে হচ্ছে মন্টু। সে বোধ হয় শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিল। মানুষটি তো এইরকম কিন্তু ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। অফিসারটি এলেন ব্যারাকপুর থেকে। শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত। আমরা দুজনে একটু আলোচনা করলুম। তারপর অফিসারটি আই জি-কে বললেন, 'স্যার, আমি তা হলে এখন জলপাইগুড়ি যাই।' সকলেই থ। মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত এগারোটা বেজে গেছে, কি করে যাবে?' আবার লালবাহাদুর এগিয়ে এলেন। সকলকে বললেন, 'দেখা যাক না, ওঁরা কি করেন?' তার পরদিন সকাল আটটায় জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে জানালেন, 'স্যার, তেজপুরের পথে পঞ্চাশ খানা জীপ বেরিয়ে গেল।' সাড়ে দশটার মধ্যে এক শ' পঞ্চাশটি জীপ পশ্চিম বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছে।

এর পরের কাহিনী আরও ভাল। তেজপুরের এক শ' পঞ্চাশখানা জীপ পেঁছবার পর তাদের বলা হল যে, জীপের আর কোনোও দরকার নেই। ফেরবার পথে তিনজন ড্রাইভার আর আটখানি জীপ উধাও। খেসারতের টাকা অবশ্য গভর্নমেন্টকে দিতে হয়নি। লালবাহাদুর আমাকে সভাপতি করে একটি কমিটি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এইড কমিটি'। আমরা বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছিলুম। বোধ হয় ষাট লাখের কাছাকাছি হবে। সোনা-দানা যা পাওয়া যেত, সব সরকারী খাতায় জমা পড়ত। আর টাকাখরচ হত লালবাহাদুরের পরামর্শমত। সোনার কথায় ডঃ শিশির কুমার মিত্রের কথা মনে পড়ছে। অনেকে অনেক দিয়েছিলেন। অকৃপণ হস্তে দান। ডঃ মিত্র তাঁর বাল্য-কাল থেকে আরম্ভ করে যতগুলি সোনার মেডেল পেয়েছিলেন, সবগুলি দিয়ে দেন—প্রায় এক ঝুড়ি হবে।

কিছুদিন পরে আমি তেজপুর গেছলুম। সেখানে হাসপাতালে যতজন জওয়ান শুয়ে ছিল, তাদের শতকরা নিরানব্বইজন 'ফ্রস্ট'-এ আহত হয়। কারোর হাতের আঙুল, কারো পায়ের আঙুল ছোট হয়ে গেছে, আরও নানারকম উপসর্গে ভুগছে। আর কি কান্না! 'আমরা লড়াই করতে পেলুম না।' চোদ্দ হাজার

ফিট উপরে মানুষ যদি শুধু গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে যে অবস্থা হয়, প্রত্যেকের সেই অবস্থা। যেমন সর্বাঙ্গে ব্যথা, তেমনি ক্রোধ। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ক্রোধ প্রকাশ করার উপায় নেই, ডিসিপ্লিন আছে। কিন্তু কান্না-ভেজা গলায় সে কি আত্ম-তিরস্কার! 'আমরা ভারতবর্ষ রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে এলুম, রাইফেল ধরতেও পেলুম না।' এঁদের মধ্যে একজনও লড়াইয়ে ভয় পাননি। সকলেই ভারতবর্ষ রক্ষায় অদম্য উৎসাহী ও আগ্রহী। কিন্তু অসহায় দর্শকের মত দেখতে হয় ভারতবর্ষের মাটি চীনা সৈন্যরা কলুষিত করছে। এঁদের ব্যথা লিখে বোঝাবার নয়।
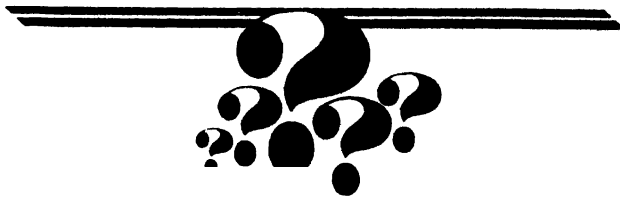
দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন কর্পোরেশনের মেয়র হলেন। আইন-সভার কংগ্রেস দলের দলপতি ও বি পি সি সি-র সভাপতি নির্বাচিত হলেন। গান্ধীজীর উপস্থিতিতে এবং সর্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই রাজনীতিতে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা গেল। ঠিক বোঝানো যাবে না। কারণ, যুক্তি বিপক্ষে কিছুই ছিল না; তবু একটা ফুসফুস, গুজগুজ প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—যেটা যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে। এরই প্রকাশ হল কিছুদিন বাদে, বাংলার রাজনীতিতে 'বিগ ফাইভ'-এর আবির্ভাবে। স্বরাট সি বোস (শ্রীশরৎচন্দ্র বসু), বি সি রায় (বিধানচন্দ্র রায়), টি সি গোস্বামী (তুলসীচন্দ্র গোস্বামী), এন সি চন্দ্র (নির্মলচন্দ্র চন্দ্র), এন আর সরকার (নলিনীরঞ্জন সরকার)—এই পাঁচজন হলেন 'বিগ ফাইভ'। এঁদের প্রভাব হল রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসামান্য। যতীন্দ্রমোহনকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সুভাষচন্দ্র তখন অনেকের সঙ্গে বার্মা মুলুকের মান্দালয় জেলে। এঁরা সব গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স, ক্রিমিনাল ল আমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট ও রেগুলেশন থ্রি অফ ১৮১৮-এ। তখন বলা হত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'। অবশ্য বিনা বিচারে। যতীন্দ্রমোহন একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজনীতিতে গান্ধীজী-মতিলালের সঙ্গী ও ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য। চরিত্র ছিল একেবারে অনন্যসাধারণ—ঠিক বোঝানো যাবে না। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময় যখন চাঁদা তোলা আরম্ভ হল, কয়েকদিন চাঁদা তুলতে ওঁর কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। ফিসফাস গুঞ্জনধ্বনি শুরু হয়ে গেল। যখন চাঁদা দিলেন, তখন পরিমাণ দু লক্ষ টাকা। অবস্থা তত ভাল নয়, সেই সবে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কলকাতায় একটি পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ দু লাখ টাকা দিয়েছেন এবং ঐ কারণেই চাঁদা দিতে দেরি হয়েছিল। এই ছিলেন যতীন্দ্রমোহন।

'বিগ ফাইভ'-এর শরৎবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের লোক, দেশসেবায় প্রভূত খ্যাতি, ব্যারিস্টারিতেও নাম হয়েছে। বিধানচন্দ্র নিজের চেষ্টায় ডাক্তারিতে সুনাম

করেছেন, নির্বাচনে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন, আর দেশবন্ধুর অনুরোধ সত্ত্বেও স্বরাজ্য পার্টির নামে না দাঁড়িয়ে 'নির্দল' দাঁড়িয়েছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য আশীর্বাদ করেন। তুলসীবাবু রাজার কুমার। বাপ কিশোরীলাল গোস্বামী ধনকুবের, বড়লাটের কৌন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য, ইংরেজরা 'রাজা' খেতাব দিয়েছিলেন। এই কিশোরীলালেরই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান তুলসীচন্দ্র। ইংরাজী বলতেন সাহেবের মত, ব্যারিস্টারি পাস, কিন্তু কোনও দিন আইনব্যবসাই করেননি। নির্মলবাবু তিন পুরুষের অ্যাটর্নি। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান। নলিনীবাবু ব্যবসায়ী মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি করেছেন এবং অর্থনীতি বোঝেন বলে খ্যাতিও হয়েছে। কিছুদিনের জন্য এঁরাই ছিলেন বাংলায় কংগ্রেসের নিয়ামক। অবশ্য বেশী দিন এঁদের এই জোর টেকেনি। তবে যতদিন জোর ছিল, রাজনীতির কথা কইতে হলে এঁদের সঙ্গেই আলোচনা করতে হত। সে একটা অদ্ভূত অবস্থা। এই জোট ভাঙবার কারণ—এঁরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিভিন্ন মত ছিল। শরৎচন্দ্র পুরোপুরি ইংরেজের বিরুদ্ধে। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত। রাজনীতির বাইরে ঠিক দাদু বা স্নেহপ্রবণ জ্যাঠামশায়। আর বড় প্রাণখোলা লোক। কিছুদিনের জন্য আমার খুব ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে দিনগুলোর কথা ভোলবার নয়। দাঁত তোলাতে নিয়ে গেলুম বঙ্কিম ডাক্তারের কাছে (ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়)। বললেন, 'ডাক্তার, আমার দাঁতের মূল প্রায় এক হাত, খুব সাবধান। আর এই অতুল্য আমার সঙ্গে এসেছে, আমায় ধরে বসে থাকবে।' ডাক্তারের শোচনীয় অবস্থা। হাসতেও পারেন না অত বড় লোকের সামনে। একবার মিটিং করতে জনাই গেছেন। জনাইয়ের মনোহরার খুব খ্যাতি এখনও আছে। আমি যখন একটু অন্যত্র গেছি, পাশের লোককে ডেকে বললেন, 'অতুল্য নেই; এই বেলা আমায় কয়েকটা মনোহরা আনিয়ে দাও। ও বড় খিটখিট করে।' ওঁর ডায়াবিটিস। সেজন্য মিষ্টি খাওয়ায় একটু বাধা দেবার চেষ্টা করা হত। একবার বোধ হয় কাঁচরাপাড়ার পথে ওঁকে এক জায়গায় নামাবেই। আমি অনেক বারণ করাতেও তারা শুনল না। উনি আমায় থামিয়ে নেমে গেলেন। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গীর বারণ সত্ত্বেও তোমরা আমায় জোর করে নামিয়েছ। আমি এখানে কোনও কথা বলব না।'

গান্ধীজী তখন সোদপুরে। হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল। ভয়ে ভয়ে গেলুম। সতীশবাবু গান্ধীজীর সামনে বসিয়ে দিলেন। দিল্লী থেকে বল্লভভাই একটি চিঠি দিয়েছেন, তার উপর গান্ধীজী কি লিখেছেন, আমাকে সেই চিঠিখানি নিয়ে শরৎবাবুর কাছে যেতে হবে। চিঠিতে কি লেখা আছে গান্ধীজী আমায় জানালেন এবং নির্দেশ দিলেন, এ সম্বন্ধে কারোর সঙ্গে যেন আলোচনা না করি। আমার তখন বেশ বেসামাল অবস্থা। তবে বিশ্বাস আছে যে, শরৎবাবু বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারবেন না। চিঠিখানা নিয়ে হাজির হলুম উডবার্ন স্ট্রীটের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই হেমন্তদার (বসু) সঙ্গে দেখা। হেমন্তদা সংবাদাদি জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম যে, একবার দেখা করব। কারণ জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, 'আজ্ঞে, আমি নিরুত্তর।' হেমন্তদা একটু হেসে চলে গেলেন। সামনে গিয়ে চিঠিখানি দিলুম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, এ সময়ে কি চিঠি?' আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম, 'গান্ধীজীর চিঠি।' চিঠিখানা খুলে পড়লেন। 'তুমি এ চিঠিতে কি লেখা আছে জানো?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'কি লেখা আছে, বলো।'

আমি খুব ভয়ে ভয়ে বললুম, 'চিঠিতে যা লেখা আছে, গান্ধীজী কোথাও উল্লেখ করতে আমায় বারণ করেছেন—আমি নিরুপায়।' কয়েক সেকেন্ড গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপরই হো-হো করে হাসি। 'তুমি তো সেই কোন কলেজের কর্তা বলেছিলেন, 'জানি, বলব না' সেইরকম বললে।' এই ছিলেন শরৎবাবু। বুকভরা স্নেহ আর দরদ।

তুলসীচন্দ্র ছিলেন পাক্কা স্বদেশী ইংরেজ। বাড়ি শ্রীরামপুরে। একদিন বাড়িতে গিয়ে বলেছিলুম, 'আপনার তো অনেক ম্যাগাজিন আছে, কংগ্রেস অফিসের জন্য কয়েকখানা দিন না।' উনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সবই তো ইংরিজী। কংগ্রেস অফিসে দিয়ে কি হবে?' উনি ভাবতেও পারতেন না, কংগ্রেস অফিসে কেউ ইংরেজী পড়ার মত লোক আছে। ওঁর খুব নাম হয়েছিল, সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীতে, জেল এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্টের উপর বক্তৃতায়। মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জেলের নানা অবিচারের বিরুদ্ধে হাঙ্গারস্ট্রাইক করেছেন। উনি তখন কংগ্রেসী দলের চিফ্ হুইপ। 'অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন' নিয়ে আসেন, জেলে রাজবন্দীদের অনশন উপলক্ষ করে। ওঁর বক্তৃতায় সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠেছিল এবং বিধ্বস্ত হয়। উনি কোথা থেকে কর্নেল মালভ্যানি নামে এক উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারীর রিপোর্ট এনে হাজির করেন। তাতে লেখা ছিল—জেলখানায় রাজবন্দীদের উপর যে অত্যাচার করা হয়, তা অমানুষিক (inhuman)। সে সময় বিলেত থেকে যেসব সরকারী কর্মচারী আসতেন, তাঁরা ন্যায়নীতি ও বিবেক ডোভার ছাড়বার আগে সেখানকার মাটিতেই জমা রেখে আসতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একজন এসেছেন, তাঁরা হঠাৎ হঠাৎ কঠোর সত্য বলে ফেলতেন। কর্নেল মালভ্যানি ছিলেন সেরকম একজন। তুলসীচন্দ্র পুরো সুযোগ নিয়ে সরকারকে একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়লেন। চতুর্দিকে হইহই-রইরই পড়ে গিয়েছিল। তুলসীচন্দ্র পরে লীগের আমলে মন্ত্রী হয়ে বেশ একটু সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। আবার দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শ্রীসত্য-রঞ্জন বক্সী ও শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহকে নিয়ে 'সিনথেটিক' পার্টি করেন।

নির্মলচন্দ্র দেশবন্ধুর ভক্ত। কংগ্রেসের একজন গোঁড়া সমর্থক। সামান্য কয়েক বছর হলেও ওঁর কাছে অনেক স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি। ওঁর একটা কাহিনী বললেই ওঁকে ঠিক বোঝা যাবে। দেশবন্ধু নির্বাচনের সময় বললেন, 'ওহে নির্মল, খানকতক গাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা কর।' নির্মলচন্দ্র অত হাঙ্গামায় গেলেন না। গাড়ি কেনবার জায়গায় গিয়ে বারোখানা গাড়ির কত দাম হয় জিজ্ঞেস করে সঙ্গে সঙ্গে চেক কেটে দিয়ে এলেন। আমার মনে হয়, এঁর যে পরিচয় দিই, তাতে সব বলা হবে না। শ্রীমান প্রতাপ বাপের অনেক গুণ পেয়েছে, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে পিতৃদেবের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাবার পর আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাই। বোধ হয় ১৯৫২। নির্বাচন কমিটির সভাপতি নির্মলচন্দ্র। আমাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন তারাশঙ্কর (বন্দ্যোপাধ্যায়)। নির্মলচন্দ্র একদিন মিটিং-এর মধ্যেই বললেন, 'তারাপ্রসন্নবাবু, আপনার "কাদম্বরী" অদ্ভুত।' তারাশঙ্কর সভয়ে বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে, সে আমার লেখা নয়। পরম শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত তারা-শঙ্কর তর্করত্নের লেখা।' সঙ্গে সঙ্গে নির্মলচন্দ্রর উত্তর, 'আহা, ওই হল। আমরা তো ছেলেবেলায় পড়েছি।' তারাশঙ্কর আরও বিপন্ন বোধ করলেন, 'আজ্ঞে, আপনার ছেলেবেলায় তো আমি বই লিখিনি।' এই ছিল আমাদের

নির্বাচন সমিতির গুরুগম্ভীর সভার নিত্যকারের ঘটনা। একদিন নরেশদার (মুখোপাধ্যায়) বাড়িতে খাওয়া। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় ছ'টা পাখির (স্নাইপ) রোস্ট এল। নির্মলচন্দ্র খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'নরেশ, তুমি ভরপেট খেয়ে এখন ছ'টা পাখি খাবে?' নরেশদা তো হতবাক্। উনি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি খাব? এ তো আপনাদের জন্য এসেছে।' উত্তর হল, 'আমাদের জন্য যদি এসে থাকে, তবে খাওয়ার শেষে এল কেন?' যাক গে, কাল আবার এসে খাওয়া যাবে।' বলে অট্টহাস্য।
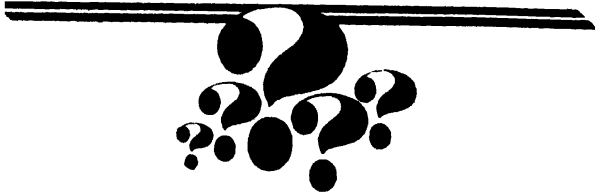
খুব উত্তেজিতভাবে আমার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। সর্বনাশ! এ যে আনন্দবাজারের সুপরিচিত সাংবাদিক! আমি ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা বলছি। উত্তেজনা একটু কমলে বোঝা গেল যে, বিহারে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-এর সফরের সময় কষ্ট পেয়েছে। লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'চল না একবার আমার সঙ্গে।' মুখ দেখে মনে হলো, অবসাদভাব যেন একটু কমলো। কিন্তু তখনও ক্ষোভ বেশ আছে। আমি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীবাবুকে একটি টেলিগ্রাম পাঠালুম, 'আমি অমুক দিন অমুক সময় ধানবাদে গিয়ে পেঁছুব। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-এর সফরের সময় ধানবাদ এবং জামসেদপুর অঞ্চলে ঘুরব। আমার শ্রদ্ধা জানবেন।' ডাঃ রায়কে ফোনে বললুম, 'আজ্ঞে, আমি অমুক তারিখে ধানবাদ অঞ্চলে যাচ্ছি।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টেলিফোনের ওদিক থেকে কথা ভেসে এলো, 'তোমার ভাব-গতিক দেখে ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল যে, তুমি বিহারে যাবে। আমি না-হয়—' তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললুম, 'রোজই আমি খবর পাঠাব, দরকার হলে লোক পাঠাব।' সম্মতি পেলুম। তার পরের দিন শ্রীবাবুর (শ্রীকৃষ্ণ সিংহ) কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো, 'তোমার বিহারে উপস্থিতি বর্তমানে অবাঞ্ছনীয়'। আমি উত্তরে জানালুম, 'আমি অমুক দিন অমুক সময় ধানবাদে পেঁছুব। আমার শ্রদ্ধা জানবেন।' যে সাংবাদিকের সঙ্গে যাবার কথা হয়েছিল, যাবার সময় তার যাওয়া হয়ে উঠলো না। সঙ্গে গেলেন গৌরকিশোর (ঘোষ), অনিল (ভট্টাচার্য), আর কংগ্রেসের বীজেশ (সেন), আভা (মাইতি), বদ্দু (নির্মলেন্দু), আনন্দ (মুখোপাধ্যায়)। রানীগঞ্জ আর আসানসোলের মাঝে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দেখা গেল তিনটে চকচকে গাড়ি, আর ভেতরে ধানবাদ পুরুলিয়া অঞ্চলের কয়েকজন নামজাদা উকিল ও ডাক্তার। তাঁরা আমাকে খুব আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, ধানবাদে গিয়ে কোথায় থাকবো। মনে মনে একটু হাসলুম। উত্তরে বললুম যে, কোনও অতিথিশালায় বা রেল স্টেশনে। মনে হলো যেন শুনে সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন। এঁদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকেই বিহারের অত্যাচার সম্পর্কে আমি চিঠি পেয়েছিলুম।

বিকেলে যখন চিরকুন্ডা পৌঁছুলাম সেখানে বিনোদানন্দবাবু (ঝা), বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, আরও দু-একজন মন্ত্রী উপস্থিত। কুমারধুবিতে একটি সভা করে ধানবাদে পৌঁছুলুম। সেখানে ডাকবাংলোয় আশ্রয়। আমরা সকলেই বিহার সরকারের অতিথি। সকালে কয়েকটি জায়গায় ঘুরে ওখানকার এক নামজাদা বাঙালী উকিলবাবুর বাড়ি যাওয়া হলো। সেখানে অনেক বাঙালী উপস্থিত। এঁদের কাছ থেকেই চিঠি গিয়েছিল যে, ভীষণ অত্যাচার হচ্ছে। সেদিন কিন্তু অন্যরকম চেহারা। সকলেই বললেন যে, এখানে কোনও গোলমাল নেই; বিহারী-বাঙালীর মধ্যে যে কোনও প্রভেদ আছে, বোঝাই যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদানন্দবাবু বললেন, 'অতুল্যবাবু, আপনার সঙ্গে তো সাংবাদিকরা রয়েছেন— আপনি তা হলে একটা বিবৃতি দিন যে, এখানে কোনরকম বাঙালী-বিহারী প্রশ্ন নেই, সকলেই শান্তিতে আছেন।' অনিল এবং গৌরকিশোরের মত সব ঝুনো সাংবাদিকরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। আমার অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি। বললুম, 'দাঁড়ান মশাই, আগে গোটা অঞ্চলটা ঘুরি। বিহারীদের সঙ্গে দেখা করি। আমি তো কংগ্রেসের লোক, খালি বাঙালীদের কথা শুনেই বিবৃতি দেবো কেন! আর, সব জায়গায় তো আমার এখনো ঘোরা হয় নি।' গৌরকিশোর ও অনিল একটু আশ্বস্ত হলো। বিনোদানন্দবাবুও আর পীড়াপীড়ি করলেন না। সঙ্গে ফটোগ্রাফার ছিল, তারা চিরকুন্ডা থেকে জামসেদপুর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আপত্তিকর পোস্টারের ছবি তোলবার নানা চেষ্টা আরম্ভ করে। কিন্তু 'বিহার বিহারীদের' এই রকম সব পোস্টার ছাড়া আর বিশেষ কোনও পোস্টার চোখে পড়েনি। গৌরকিশোর খুব বিপদে পড়েছিল। তাকে এক বাঙালী উকিলবাবু একটি হিন্দী হ্যান্ডবিল দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, এতে বলেছে বাঙালীদের মুখ ভেঙে দাও।' গৌরকিশোর অনেক চেষ্টা করেও বুঝিয়ে উঠতে পারলো না যে, ওতে মুখ ভেঙে দেবার কথা নেই; ওতে আছে যে, বাঙালীরা অনেক কথা বলছে, বিহারীদেরও খুব জোর করে বলা উচিত—'ইস্‌কো মুহ্‌ তোড় জবাব দেনা চাহিয়ে।' ঐসব অঞ্চলে যেসব লেখাপড়া-জানা বাঙালী তাঁরা সকলেই এর মানে বোঝেন, তবু কদর্থ করার এক অদ্ভুত প্রয়াস। পুরুলিয়ার কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন মাহাতো দেখা করতে এসেছিলেন। শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত। অনিল আর গৌরকিশোরকে বললুম, 'তোমরা আগে কথা কও, তারপর আমি কথা বলবো।' অনিল আর গৌরকিশোর আলোচনা করে একেবারে চুপ। সেই মাহাতোরা পরিষ্কার বলেছেন, 'আমরা কিছুতেই বাংলায় যাব না। বাঙালীসমাজে আমাদের কোনও ইজ্জত নেই। মাহাতো উকিল, ডাক্তার, বা শিক্ষক অনেক জায়গায় বসবার আসন পায় না। কিন্তু ঘোষ, বোস, মিত্তির বা বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, বা দাশগুপ্ত তাঁরা যাই হোন না কেন, সসম্মানে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হয়।' রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-এর কাছে বিহার থেকে আমরা যতখানি জায়গা চেয়েছিলুম তার বেশির ভাগই পাওয়া গিয়েছিল। টাটার জলাধার যেখানে, সে অঞ্চলটা পাওয়া যায়নি। আর অদ্ভুত, অলীক ও অসত্য কারণের জন্য চাস ও চন্দনকৌড়ি পাওয়া যায় নি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-এর চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীফজল আলী। ন্যায়নিষ্ঠ ও অসাম্প্রদায়িক বলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আর দুজনের একজন হলেন পন্ডিতপ্রবর শ্রীপানিক্কর, দ্বিতীয়জন শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু; সত্যনিষ্ঠ ও উদারনৈতিক বলে ভারতবর্ষের সর্বত্র সুনাম ছিল। এইসব খ্যাতনামা ব্যক্তি নিয়ে গঠিত রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন রায় দিলেন—যেহেতু চাস আর চন্দনকৌড়ি দামোদরের যে তীরে, ধানবাদ

সেই তীরে অবস্থিত, অতএব ঐ দুটি থানা বিহারে থাকবে। ভারত সরকারের সার্ভে ম্যাপে, বিহার সরকারের ম্যাপে এবং স্কুল-কলেজের ম্যাপে পুরুলিয়া যেদিকে, দামোদরের সেইদিকেই চাস ও চন্দনকোঁড়ি। পশ্চিম বাংলা থেকে প্রতিবাদ হলো। বিমল (সিংহ) ছিলেন আমাদের সাব-কমিটির সম্পাদক। যদিও ফজল আলীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতুম এবং সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল—আমি একটা চিঠি দিলুম। যথারীতি জওহরলাল ডেকে পাঠালেন। জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী, গোবিন্দবল্লভ স্বারষ্ট্রমন্ত্রী। এঁরা স্বাধীন ভারতবর্ষের পথিকৃৎ, স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি—আমাদের নেতা। এসব সত্ত্বেও মিথ্যা ও অসত্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-এর সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের স্বীকৃতি পেল। বাঙালী বলে যে আপত্তি করেছিলুম তা নয়, সমস্ত সরকারী নথিপত্র এ রায় যে অসত্য তা প্রমাণ করেছে। তবুও রায় বদলানো গেল না। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা এ ঘটনা জানতে পারলুম রায়দানের পর। রায়দানের আগের দিন আমায় গোবিন্দ-বল্লভের বাড়ি ডেকে পাঠানো হলো। সেখানে জওহরলাল, গোবিন্দবল্লভ, মৌলানা এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উপস্থিত। জওহরলাল শ্রীবাবুকে বললেন, 'আপনি পাটনায় চলে যান, কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হবে না।' পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বিহার ক্যাবিনেট শ্রীবাবুর অধিনায়কত্বে যখন রাজ্যসীমা নিয়ে আলোচনা করছে সেই সময়ে রেডিও মারফত শুনলাম যে, বিহারের অমুক অমুক অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হলো। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ভারত-বর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনে এসেছিলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হবে না। অথচ—। এখানেও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিজু আর জ্ঞান (পট্টনায়ক দম্পতি) এসে হাজির হল। বিজুর মত এরকম প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মানুষ খুব কম দেখা যায়। সব সময় অস্থির। মাথায় যখন যেটা ঢুকবে তার শেষ পর্যন্ত যাওয়া চাই। সে যাওয়াটা হবে একেবারে উদ্দাম, লাভ-লোকসানের হিসেব নেই। জওহরলাল বলতেন, 'Remarkable man, but...'; পণ্ডিতপ্রবর জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন, 'A remarkable Indian, a man whose adventures would fill a book.' জুলিয়ান হাক্সলে 'কলিঙ্গ প্রাইজ' পেয়েছিলেন। মূল্য এক হাজার পাউন্ড। কলিঙ্গ প্রাইজের প্রবর্তক বিজু পট্টনায়ক।

বিজুরা আসছে পহলগাঁও থেকে। সেখানে জওহরলালের সঙ্গে কয়েকদিন ছিল। খুব উৎসাহ করে বলল, 'দাদা, সব ঠিক হয়ে গেছে। এইবারে কংগ্রেস সংগঠনকে মজবুত করতে হবে।' আমি বললুম, 'অঃ, তা উপায়টা কি?' বিজু সোৎসাহে বলল যে, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমার কাছে এটা অবশ্য পুরনো কথা। 'আবাদি

কংগ্রেসের' পর থেকেই এ নিয়ে কয়েকজন আলোচনা করছেন, এবং কয়েকটা বৈঠকও হয়ে গেছে। সঞ্জীবিয়ার বাড়িতে বৈঠক হয়েছে। মূল কথক সুব্রহ্মানিয়াম। কিন্তু কিছুই ঘটে উঠছে না। উদ্দেশ্য—মোরারজীভাই, জগজীবন রাম এবং এস কে পাতিলকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া। আমি বললুম, 'বিজু, এ তো জানা কথা। অনেক বছর থেকেই আলোচনা হচ্ছে। মোরারজীভাই, জগজীবন রাম আর এস কে পাতিলকে বাদ দিলেই কি কংগ্রেস শক্তিশালী হবে?' বিজু বলল, 'না, না। আমরা অনেকেই ছেড়ে দেব।' উত্তর দিলুম, 'তুমি কি করে অভিজ্ঞ আর প্রবীণ হলে?' বিজুর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলুম যে, পহলগাঁও-এ জওহরলাল, বক্সী (গোলাম মহম্মদ) ও বিজু আলোচনা করে ব্যাপারটি প্রায় পাকা-পাকি করে ফেলেছে।

কিছুদিন বাদেই হায়দ্রাবাদে জওহরলাল আর কামরাজের সাক্ষাৎকার এবং 'কামরাজ প্ল্যান'-এর ঘোষণা। চতুর্দিকে হইচই পড়ে গেল। কারুর কারুর কণ্ঠে আবার ধন্য ধন্য আওয়াজ। যাঁরা সমর্থনে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করলে বেশ বোঝা যেত যে, মন থেকে কারুরই সায় নেই। ওয়ার্কিং কমিটির পরামর্শে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগপত্র এ আই সি সি-তে পাঠিয়ে দিলেন। যেন সকলেই উন্মুখ মন্ত্রিত্ব ছেড়ে মাঠে বেরোবার জন্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম মোরারজীভাই। তিনি কোনও আলোচনা বা সমালোচনায় যোগ দেন নি। এ আই সি সি-র মিটিং হল। পুরো সমর্থন। আমি চা খেতে খেতে বিজুকে বলেছিলুম, 'Fraudulent'। পরের দিন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিজু অভিযোগ করল, দাদা বলছেন—'Fraudulent'; জওহরলাল আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি সভয়ে বললুম—'এ তো অনেক দিন থেকেই জানা কথা। কামরাজ কিছুদিন থেকেই ছাড়ব ছাড়ব করছে—সে একটা পথ পেয়ে গেল। আর বিজু কি করে প্রবীণ আর অভিজ্ঞ হল! বক্সী বলে উঠল, 'আমিও ছেড়ে দেব।' উত্তরে বললুম, 'তুমি তো কংগ্রেসের মেম্বার নও। তোমার ছাড়া না-ছাড়ায় কি এসে যায়।' সেই ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ বক্সী মেম্বার হয়ে গেল। সঙ্গে টাকা নেই। লালবাহাদুর টাকা দিতে গেল—নিল না। নিল ইন্দিরার কাছ থেকে। সে একটা দৃশ্য। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগপত্র গৃহীত হল মোরারজী-ভাই, জগজীবন রাম, এস কে পাতিল, লালবাহাদুর ও অন্য দুজন মন্ত্রীর। লালবাহাদুরের নাম তালিকায় ছিল না। তিনি জোর করে নাম ঢোকালেন। বাকী দুজন প্রবীণও নন, আর অভিজ্ঞও নন। খালি সংখ্যা পূরণের জন্য তাঁদের ছাড়তে হল। তারপর রাজ্য মন্ত্রিসভা। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নাম জওহরলাল করলেন। আমি বাড়িতে দেখা করে বললুম, 'এ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন হাত দেবেন না।' তারপরই আসামের বিমলা চালিহার নাম এল। আপত্তি করলুম। 'চীন যুদ্ধের ঘা এখনও শুকোয়নি। আর আপনি এখন ঐ সীমান্তরাজ্যে পরি-বর্তন আনতে চান—আমার মনে হয়, সেটা ঠিক হবে না।' তারপরই রাজস্থানের মোহনলাল সুখাদিয়ার নাম। সুখাদিয়ার বদলে যাঁর মুখ্যমন্ত্রী হবার নাম হল সেই বালকৃষ্ণ কাউল দিল্লী ছুটে এসে জানালেন যে, তিনি এক দিনও চালাতে পারবেন না। অগত্যা সুখাদিয়া রইলেন। পরেই সঞ্জীব রেড্ডির নাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কেবিনেটের অধিকাংশ মন্ত্রী আর রাজ্য কংগ্রেসের কর্মকর্তারা ছুটে দিল্লী এলেন। হইচই শোরগোল। সঞ্জীব রেড্ডিকে কেউ ছাড়তে রাজী নন। অথচ ছ'জন মুখ্যমন্ত্রী চাই। কেননা, কেন্দ্রে ছ'জন মন্ত্রী বাদ পড়ছে।

উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রভানু গেলেন। ওড়িশার বিজু। জম্মু-কাশ্মীরের বক্সী। মাদ্রাজে কামরাজ স্বয়ং। বিহারে বিনোদানন্দর নাম ছিল না। তিনি এসে জওহরলালের কাছে আছড়ে পড়লেন। আমি সংগঠনের কাজে যোগদান করবই। পঞ্চম যখন হয়ে গেল তখন অগত্যা ষষ্ঠ স্থান পূরণ করার জন্য মধ্যপ্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রী গেলেন। এই হল 'কামরাজ প্ল্যান'। যে উদ্দেশ্য সাধারণকে জানানো হয়েছিল তার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এবং এর প্রতিক্রিয়া ভাল-ভাবে ফুটে উঠল ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি মাদ্রাজ। সেখানে হল শোচনীয় পরাজয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা—কোনও রাজ্যেই কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য হল না। কারণ, পদত্যাগ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কেউ মন থেকে করেননি। তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐসব রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীরা কেউই মনে করেননি যে, 'কামরাজ প্ল্যানে' কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তি-শালী করা হল। বরং বিপরীত ফল ফলেছিল। কর্মীদের মধ্যে দ্বিধা, সংশয়। মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ ও দলাদলি চরমে উঠেছিল। মাদ্রাজে ১৯৬২-তে ডি এম কে যা পেয়েছিল, ১৯৬৭-তে কংগ্রেস তাই পেয়ে নগণ্য দলে পরিণত হয়। আর যাঁর নামে 'কামরাজ প্ল্যান' তিনি নিজে পরাজিত হন।

এমন কথা আমি বলছি না যে, কেবলমাত্র 'কামরাজ প্ল্যানে'র জন্যে বহু রাজ্যে পরাজয় ঘটেছিল। এটা একটা বড় কারণ। সুশৃঙ্খলায় যেসব রাজ্যে কংগ্রেসী দল শাসনযন্ত্র পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অস্থিরতা আনবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর দেশের মাঝেও তেমন কোনও জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়নি যে, এইরকম উদ্ভট পন্থা গ্রহণ করতে হল। পৃথিবীতে আরও বহু দেশে গণতন্ত্র চালু। কিন্তু কোথাও তো এমন প্রয়োজনীয়তা আছে—এরকম মনে করবার কারণ হয়নি।

আমরা আর্থিক অবস্থায় অনগ্রসর। রাজনীতির চিন্তাতেও আমরা নাবালক। 'কামরাজ প্ল্যান' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তখনও আমরা ভয়ের রাজত্বে বাস করতুম। পদত্যাগ না করলে বা সমর্থন না করলে যদি জওহরলাল কিছু মনে করেন!

জওহরলালের নিজেরও পদত্যাগ করার কথা উঠেছিল। সকলের কণ্ঠে তার-স্বরে প্রতিবাদ! অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে দেশে একজনও সাবালক সৃষ্টি হয়নি। সেইজন্যে জওহরলালের থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই মনোভাব থেকে আমি নিজেকেও বাদ দিচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধি কংগ্রেসনেতা ও কর্মীদের পঙ্গু করে ফেলেছিল। জওহরলাল একবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং-এ পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্যস! আমাদের সকাতর কান্নার আওয়াজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে অন্য দেশে গিয়েও পৌঁছেছিল। ব্যক্তিপূজো বোঝা যায়, ধর্মের উন্মাদনা বোঝা শক্ত নয়—কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এইরকম সার্বিক ভয় বুদ্ধির অগম্য।

স্বাধীনতার পরেই জয়পুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। দেশীয় রাজ্যে এই প্রথম অধিবেশন। উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধি-বেশনে প্রস্তাব এলো যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোনও কর্মকর্তা পর পর দুবার স্বপদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। জওহরলাল সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। সকলে নিশ্চিত জানে যে, প্রস্তাব গৃহীত হবে। জওহরলাল চলে যাবার পর আমরা দেবেনকে (দে, পরে পঃ বঙ্গের মন্ত্রী) দিয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনি—'প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রী,—তুমুল

হর্ষধ্বনি আর হাততালির মধ্য দিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হল। আমরা জানতুম যে, এ প্রস্তাব টিকবে না। ঠিক তাই হল। বিকেলের সভায় জওহরলাল এসে খুব রাগ করলেন। ফলে সমস্ত প্রস্তাবটাই বাতিল হয়ে গেল। এ ঘটনার মূলেও সেই ভীতি।

সর্বজনীন দুর্গোৎসব বোধ হয় আরম্ভ হলো ১৯২৪-২৫-এ। শ্রীরামপুরে প্রথম শুরু ১৯২৮-এ। আর এম এস মাঠে। অবশ্য আগে বারোয়ারী পুজো ছিল। কিন্তু সর্বজনীনে অন্য রূপ ফুটে উঠলো। শ্রেণী-বর্ণনির্বিশেষে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া এবং খাওয়া। এখনকার মত করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার আলো থেকে চুরি করে বা আশেপাশের বাড়ি থেকে জুলুম করে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আলো দেবার রেওয়াজ ছিল না। আর রাস্তা বন্ধ করে পুজো করার কথা তো কেউ ভাবতেই পারতো না। মাইকের প্রচলন শুরু হয়েছে, তবে হিন্দী ফিলমের গানও ছিল না; আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে সারা রাত উৎপীড়নও হতো না। রাজা, জমিদার বা একটু ধনী লোকের বাড়ি পুজো হতো। সে পুজোয় খুব জৌলুস। যাত্রা, থিয়েটার, খাওয়া-দাওয়া, কোথাও কোথাও অষ্টমপ্রহর। আবার অনেক জায়গায় দেখা যেত যেসব বর্ধিষ্ণু পরিবার অর্থাভাবে নিজেরা পুজো করতে পারতেন না তাঁরাই বারোয়ারী পুজোয় অগ্রণী হতেন। অর্থাৎ পুজোটা তাঁদেরই হতো, গ্রামের অনেকেই অর্থসাহায্য দিতেন। ছোট ছোট জমিদারবাড়িতে পুজো লেগেই থাকতো, প্রজাদেরও খুব আনন্দ। খাওয়া, যাত্রা শোনা, তার সংগে কাপড়ের প্রাপ্তিযোগ। সবই ছিল, তবে অন্তঃসারশূন্য। প্রজারা যারা খাটতো, বিনিময়ে কোনও মুদ্রা তাদের হস্তগত হতো না; লাভ ছিল যাত্রা শোনা, তার সংগে কাপড়ের প্রাপ্তিযোগ। সবই ছিল, তবে অন্তঃসারশূন্য। বলেন যে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এরকম হয়েই থাকে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে যেসব গান তৈরী হয়েছে—

'গলায় গলায় গান ছিল ভাই
গোলায় গোলায় ধান।'

—এর সংগে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রামে শতকরা দু-তিনজনের গোলায় ধান থাকতো। আর গান! সে তো বিশেষ এক শ্রেণীর জন্যেই। অবশ্য সন্ধ্যের পর সব গ্রামেই কীর্তন হতো, আপামর জনসাধারণের কণ্ঠে—

'একবার এস গৌরাংগ
সাংগোপাংগ
সহিত হৃদিপ্রাংগণে।'

—এসব কীর্তন শোনা যেত। এ গান যারা গাইত তাদের মধ্যে কোনও শ্রেণীভেদ ছিল না। এটা গ্রামের নিজস্ব সংস্কৃতি!

সর্বজনীনে খাওয়া ছিল খিচুড়ি, আর বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়ি খাওয়া ছিল নানারকম। অবস্থাভেদে খাওয়ার ব্যবস্থা। অবশ্য রামনারায়ণ যে ফলারের কথা বলে গেছেন—

উত্তম ফলার—'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু-চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।'

মধ্যম ফলার—'সরু চিঁড়ে সুখো দই
মর্তমান ফাঁপা খই।'

অধম ফলার—'গুঁমো চিঁড়ে টোকো দই
বীচে কলা ধেনো খই।'

—এ প্রভেদ আমরা দেখিনি। তিনরকমের মোণ্ডা দেখেছি—(১) ছানার মোণ্ডা, (২) চিনি দিয়ে পাক করা নারকেলের মোণ্ডা, নাম রসকরা, (৩) গুড় দিয়ে পাক করা নারকেলের মোণ্ডা, নাম নারকেল-নাড়ু। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য প্রথমটি, দ্বিতীয়টি নিজের অথবা বন্ধুবান্ধদের আশ্রিতদের জন্য, তৃতীয়টি প্রজা, কর্মচারী প্রভৃতির জন্য। কাঙ্গালীভোজন হতো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যে বাড়ির ভোজে যত বেশী খরচ হতো সে বাড়ির কাঙ্গালীভোজনে তত বেশী নিকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশিত হতো। অবশ্য যারা খেত, পর্যুষিত অন্ন পেলেও তাদের জয়ধ্বনির বিরাম ছিল না। কারণ অতি সুস্পষ্ট; অধিকাংশ দিনই তাদের অভুক্ত থাকতে হতো। মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের মধ্যে এই ভয়াবহ অনাচারের দৃশ্য লুকিয়ে ছিল। এইভাবে বর্ণনা অনেকের ক্রোধের কারণ হতে পারে; কিন্তু এখানে সত্যের এতটুকু অপলাপ করা হয়নি। যে সমাজ সগৌরবে এই প্রথা পালন করতো সেই সমাজের মধ্যে আমরা জন্মেছি।

তখনকার দিনে ছোটখাটো জমিদারও অনেকে হাতি রাখতেন। তাঁদের জমিদারির আয়ে হাতির খরচ উঠতো না। কষ্টক্লিষ্ট প্রজাদের শেষ সামর্থ্যটুকু শোষণ করে হাতির খরচ উঠতো এবং সব উৎসবের ব্যয়নির্বাহ হতো। অবশ্য কোনও কোনও পরিবার কলকাতায় অর্থোপার্জন করতেন এবং উপার্জনের ধারা ছিল একটাই। কোনরকমে কোনও ইংরাজ সওদাগরের সান্নিধ্যে গিয়ে যে-কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জন। যাঁরা বাংলাদেশের বেনদী বলে পরিচিত তাঁদের অধিকাংশেরই সম্পত্তি বা ধনলাভ হয়েছে ইংরাজের প্রতি প্রভুপরায়ণতায়। কেউ এর মধ্যে বেশী দাক্ষিণ্য পেয়ে রাজা, মহারাজা বা বড় ভূস্বামী হয়েছেন, কেউ কেউ বা দাক্ষিণ্যের স্বল্পতার জন্য রাজাবাহাদুর হতে পারেননি। ইংরাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের লোকেরা গিয়েছিল সৈন্য হয়ে, তাদের এখনো তেলেঙ্গী সেনা বলে। আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেউ কমিসরিয়েটের, কেউ বা সওদাগরী আফিসের কেরানী; নাম হয়েছিল বাবু। পুরানো কাগজপত্র একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই দেখা যাবে যে, কমিসরিয়েটের চাকরি করে বাবু গ্রামে ফিরে আসবার পরেই জমিদারবংশের পত্তন হয়েছে। আবার পুরানো বাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পিছনেও এই ইতিহাস। নতুন একজন ইংরাজ এলো, বিলেতের সঙ্গে ব্যবসার যোগাযোগ আছে কিন্তু অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। বাঙালীবাবু এগিয়ে গিয়ে টাকার যোগান দিতেন, চাকরি নিতেন মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ানের। অংশীদার হবার তো উপায় নেই, সে তো প্রায় সমকক্ষ

হওয়া। তোবা তোবা। যে মাইনে পেতেন, তা যত কমই হোক, তাতেই একটি সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের উৎপত্তি হতো। বর্তমানে যাদের স্টিবেডোর বলে তখন বলতো খালাস সরকার; অর্থাৎ যেসব জাহাজে বিলেত থেকে মাল আসতো, শ্রমিক সংগ্রহ করে সেইসব মাল খালাস করার এজেন্সি। এই কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের অর্থাগম হতো প্রচুর। কারণ, দক্ষতা সহকারে ভুল হিসেব দিতে পারলেই বাড়তি পাওনা অনেক হতো। এইসব পরিবারের দান-ধ্যান ছিল প্রচুর। কিন্তু তাঁদের কৃতকর্মের জন্য কলঙ্কবোধের কোনও বালাই ছিল না। আবার, এঁদেরই মধ্যে অনেক বিত্ত-শালী যাঁরা তাঁদের কাছে বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা রঙ্গমঞ্চ, বিশেষ-ভাবে ঋণী।

ইতিহাসকে নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। হয় দেখা যাবে ইচ্ছে করে মিথ্যার উপর যশ ও গৌরব সৃষ্টি করা হয়েছে। নয়তো দেখা যাবে ভয়ে ইতিহাস থেকে সত্যটুকু মুছে ফেলা হয়েছে। ছেলেবেলায় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কথা যখন শুনতাম গর্বে বুকটা ভরে উঠতো। বাঙালী প্রতাপাদিত্য।

'যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।'

লেখকের অদ্ভুত প্রতিভা। বড় হয়ে ঘটনাটা খানিকটা বুঝলুম। প্রতাপাদিত্য দিল্লী গিয়ে দিল্লীশ্বরের সনদ এনে মহারাজা হয়েছিলেন। আর দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেননি এমন চারজন ভূস্বামীকে হটিয়ে দিয়ে তাঁদের রাজ্য গ্রাস করেছিলেন। এই কাজে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের তিনি সাহায্য নেন। আর দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মানসিংহ যখন লড়াই করতে এলেন তখন পরাজয় এবং বন্দিত্ব। এই হলো প্রতাপাদিত্য চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্য চরিত্রে একটু চিড় ধরিয়েছেন। কিন্তু এখনো প্রতাপাদিত্য-জয়ন্তী হয়। আবার সিরাজউদ্দৌল্লার জয়ন্তী আরম্ভ হয়েছে। নবাব হবার আগেই তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা ছিল না। আঠারো বছর বয়সে নবাব হবার পর তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। হিন্দু, মুসলমান—কোনও সুন্দরীরই তাঁর কাছে অব্যাহতি ছিল না। কথিত আছে যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের এই নবাবের সামনে এনে পেট চেরা হতো; নবাব ভ্রূণের অবস্থিতি লক্ষ করতেন। দুঃখ তা নয় যে, নবাব এইসব অপকর্ম করতেন; দুঃখ এই যে, এক ঢঙে স্বাদেশিকতার মোহে আমরা এইসব জয়ন্তী আরম্ভ করেছি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনেক দুঃখে লিখে-ছিলেন, ইতিহাস=ইতি+হাস; অর্থাৎ যাহা পড়িলে হাসি আসে।

১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। "This Congress therefore, in pursuance of the resolution passed at its session at Calcutta last year, declares that the word 'Swaraj' in Art. I of the Congress constitution shall mean complete Independence, and further declares the entire scheme of the Nehru Committee's Report to have lapsed and hopes that all Congressmen will henceforth devote their exclusive attention to the attainment of complete Independence of India."

কলকাতায় সভাপতি মতিলাল, লাহোরে সভাপতি জওহরলাল। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্বের অবসান হল। জওহরলাল এবং অন্যান্যরা কথার খেলাপ করে কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব আনায় গান্ধীজী তীব্র মন্তব্য করেছিলেন,—"You may take the name of Independence on your lips, as the Muslims utter the name of Allah, or the pious Hindu utters the name of Krishna or Ram, but all that muttering will be an empty formula if there is no honour behind it. If you are not prepared to stand by your own words, where will Independence be ? Independence is a thing, after all, made of sterner stuff. It is not made by the juggling of words."

লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে সব মতান্তরের অবসান হল। স্বাধীনতা প্রস্তাবের মধ্যে আরও বলা হয়, "This Congress appeals to the Nation zealously to prosecute the constructive programme of the Congress and authorises the All India Congress Committee whenever it deems fit, to launch upon a programme of civil disobedience including non-payment of taxes, whether in selected areas or otherwise, and under such safeguards as it may consider necessary." এবং প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস পালন করবার প্রস্তাব গৃহীত হল। 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত পরে ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্ন বরাবরই জড়িয়ে ছিল। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হবার পর স্থির হয়, আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ বিশেষ স্থানে আরম্ভ হবে। গান্ধীজী গুজরাটের বরদৌলি তালুকে ট্যাক্স বন্ধের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। আন্দোলন আরম্ভ করার কিছু আগে

উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় একটি কংগ্রেসী শোভাযাত্রা বাহির হওয়ার ফলে পুলিস বাধা দেবার চেষ্টা করে। জনতার আক্রমণে থানার মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেকটর ও একুশজন কনস্টেবল আগুনে পুড়ে মারা যায়। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুতেই এই হিংসাত্মক ঘটনায় গান্ধীজী বরদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস দলভুক্ত সকলকে আইন অমান্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। এই নিয়ে সে সময়ে খুব মতান্তর হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল জেল থেকে লেখেন, 'চৌরিচৌরার ঘটনার জন্য সারা ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ভারতবর্ষের কোনও এক অঞ্চলে কোনও ঘটনার জন্য সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন বন্ধ থাকা উচিত নয়।' লালা লাজপত রায়ও কারান্তরাল থেকে অনুরূপ মন্তব্য করেন। গান্ধীজী অচল-অটল। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা তখনকার মত স্থগিত হয়। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসের আগে ঐ বরদৌলিতেই আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেটেলমেন্ট-এর ফলে বর্ধিত হারে খাজনা ধার্য হয়েছিল, তা দেওয়া হবে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোনও প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল না। তবু বরদৌলি সত্যাগ্রহ সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বল্লভভাই প্যাটেল এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যতরকম অত্যাচার করার উপায় আছে সরকার তার সবগুলোই গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধাবারও চেষ্টা করা হয়। সামান্য কয়েক গণ্ডা পয়সার জন্য লোকের সমস্ত অস্থাবর নিয়ে নেওয়া হয়। অনেক বাড়ি হয়ে ওঠে ভগ্নস্তূপ। আর মানুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন ছিল বর্ণনাতীত। কৃষকরা অচল-অটল। সেই সময় একটা ছড়া হয়েছিল 'charge of the light brigade'- এর অনুকরণে—

'Police to the right of them
Police to the left of them
Police to the front of them
Police at the tail of them
Marched the buffalo brigade'

কৃষকরা তাদের জমির ফসল পুড়িয়ে দিল, তবু সরকারকে ক্রোক করতে দিল না। সারা ভারতবর্ষের বুকে যেন একটা ভাববন্যা এল। বম্বে শহর টলমল। দিল্লীতে তখৎতাউসে সুখাসীন বড়লাটের কাছেও ধাক্কা গিয়ে পৌঁছল। চতুর্দিকেই আলোচনা। সারা দেশ থেকে নেতারা গিয়ে হাজির হলেন বরদৌলিতে আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য নয়, আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য। বোম্বাই থেকে নরীম্যান সাহেব এসে নতুন স্লোগান সৃষ্টি করলেন—'Bardolise the Country', ওদিকে বোম্বাইয়ের লাটসাহেব বিধানসভায় ঘোষণা করলেন—সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি দিয়ে বরদৌলির আন্দোলনকে দমন করা হবে। আপোসের কথা আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু গভর্নমেন্টের সব নির্যাতন ব্যর্থ করে দিয়ে বরদৌলির কৃষক-গণ জয়ী হলেন। এক পয়সা ট্যাক্স বাড়েনি। গান্ধীজী বল্লভভাইকে 'সর্দার' বলে অভিহিত করলেন এবং তিনি আমৃত্যু সেই নামেই পরিচিত ছিলেন।

১৯২৮ থেকেই দেশবাসী আইন অমান্য আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। বরদৌলির মত না হলেও আরও ছোট-বড় বহু আইন অমান্য আন্দোলন দেশের নানা স্থানেই সুপরীক্ষিত। লাহোরে স্বাধীনতা

প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই দেশবাসীর কাছে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক পুনরায় এল। চতুর্দিকে উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই—সাজ সাজ রব। কেউ ট্যাক্স বন্ধ করার কথা ভাবছে, কেউ বা মদের দোকানে ও কোর্টে পিকেটিং—এইরকম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকলেই তৈরী হচ্ছে। কিন্তু যে অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলেছিলেন, সে সম্বন্ধে কেউ সচেতন ছিলেন না।

হুগলী জেলাতেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। স্থির হল, প্রফুল্লচন্দ্র যেখানে থাকেন, সেখানে হবে প্রধান কেন্দ্র। সেখানে একটি বড় সম্মেলন করে জনসাধারণকে স্বাধীনতা প্রস্তাব, আইন অমান্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। শ্রীরামপুর থেকে আমি আর বিজয় (মোদক) বেরোলুম। তারকেশ্বর থেকে একুশ মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সর্বনাশ, অত হাঁটব কি করে? হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল, বুঝি দেশসেবাও বন্ধ হয়। প্রফুল্লদা সঙ্গে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। দিনে এক জায়গায় থামা হয়, সেখানে খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম। যে পথ পরে বহু-বার এক দিনে যাতায়াত করেছি, সেই পথ হাঁটতে লাগল সাড়ে তিন দিন। মধ্যে মধ্যে যেসব গ্রামে বিশ্রাম নিয়েছি, সেসব গ্রামের কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা যেন প্রতীক্ষা করে ছিল। অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক অভ্যর্থনায় সমস্ত মন ভরে যেত। আর লক্ষ করলুম যে, সুদূর পল্লীতেও খবরটা পেঁছে গেছে যে, গান্ধীজী এতদিন চুপ করে থেকে আবার লড়াই আরম্ভ করবেন। এখন-কার মত তো খবরের কাগজ ছিল না; যা দু-একখানা ছিল গঞ্জে বা শহরে। বাতাস যেন খবর বয়ে এনেছে। কানাকানি শুরু হয়ে গেছে যে, এবার কিছু করতে হবে। কথাগুলো এত মর্মস্পর্শী—'এবার কিছু হবে এ কথা নয়, এবার কিছু করতে হবে'; অর্থাৎ, ঐ সুদূর গ্রামের লোকও ঠিক করে ফেলেছে যে, এবার কিছু করতে হবে। কারণ তো একটাই, গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন—

'ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
এসেছে আদেশ বন্দরের কাল হল শেষ।'

বড়ডোঙ্গল সম্মেলনে (প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থান) পুরুলিয়া থেকে শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মশায় আসবেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। তা ছাড়া, তিনি পাল্কিও চাপবেন না। এই হল সমস্যা। এক অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং করা হল। দ্বারকেশ্বরে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা হল। নির্দিষ্ট দিনে সেই বাঁধের মুখে তিনি নির্দিষ্ট নৌকায় উঠলেন। সোল্লাসে গ্রামবাসীরা বাঁধ কেটে দিল। জলের টানে নৌকা ছ' মাইল এগিয়ে গেল। পরের পথটুকুও কোনক্রমে যাওয়া গেল। লোকের তো অভাব নেই—দলে দলে খালি লোক আসছে। তারা যে খবর পেয়েছে, কিছু করতে হবে। অনেকেই এসে পেঁছলেন। গোবিন্দা (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) শালপ্রাংশু মহাভুজ গৌড়কান্তি বিপ্লবী। পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ। নিবারণবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের শক্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। গোবিন্দা তাঁর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'গান্ধীজী-নির্দেশিত পথে আইন অমান্য আন্দো-লনকে আমরা সফল করব।' কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে কর্মীরা তখনও সচেতন নন। তাই জনসমাবেশ দেখে তাঁরা হতবাক্। আর কিভাবে যে লোক এসেছে, সেও একটা অদ্ভুত ঘটনা। কেউ সাত মাইল, কেউ দশ মাইল, কেউ বা পনের মাইল দূর থেকে হেঁটে এসেছে। একটা কাপড়-গামছা নিয়েই কেউ বা বেরিয়ে পড়েছে। যার সামর্থ্য আছে, সে গরুর গাড়িতে এসেছে। আবার ঘাসখেকো

একরকম ছোট ছোট ঘোড়া আছে। তা চেপেও লোক এসেছে। যেন রথের মেলায় এসে হাজির হয়েছে; অথচ রথও নেই, জগন্নাথও নেই। না আছে কাঁঠাল, বাদাম, বা পাঁপর ভাজা। বাড়ি থেকে এত কষ্ট সহ্য করে টেনে আনবার একটা জিনিসই ছিল—বাতাসে আনা খবর।

প্রফুল্লচন্দ্র সেই সমাবেশে ঘোষণা করলেন যে, বড়ডোঙগলে হবে হুগলী জেলার আইন অমান্য আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-কর্মীরা তাদের সঙ্কল্প ঘোষণা করছে যে, গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে কংগ্রেস-ঘোষিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য তারা প্রস্তুত।

১৯৫০। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন। জওহরলালের কাছ থেকে একটা চিরকুট এলো, কংগ্রেস সভাপতি পদে শ্রীশংকররাও দেওকে নির্বাচিত করলে ভাল হয়। শ্রীশংকররাও দেও সুপরিচিত। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমরা মেনে নিলুম। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি বদলে গেছে। আগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নাম পাঠাতেন এবং তার সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচিত হতেন। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি পদে গান্ধীজী সবচেয়ে বেশী ভোট পান, তারপর সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজী অস্বীকার করেন এবং সর্দার প্যাটেল অক্ষমতা জানান। ফলে, ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা নির্বাচন হয় এবং গান্ধীজীর নির্দেশে জওহরলাল সভাপতি হন। পদ্ধতি বদলে গেছে, নিয়ম হয়েছেঃ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর ডেলিগেট অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সব সদস্যই ভোটদানে অধিকারী। ব্যালট ভোট। এবং সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন। কিছুদিন বাদে জওহরলালের কাছ থেকে আবার খবর এলো যে, শংকররাও দেও নয়, আচার্য কৃপালনী। শংকররাও দেও তখন মহারাষ্ট্রে সফররত। তাঁর কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, তিনি জওহরলালের মত পরিবর্তনের কথা জানেন না। আমরা একটু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলুম, এবং বেশ বিরক্তিও হলো। আচার্য কৃপালনী আমাদের পরমাত্মীয়, চৌদ্দ বছর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তবু আমরা জওহরলালের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলুম না এবং শ্রীশংকররাও দেও তাঁর নামও প্রত্যাহার করলেন না। ইতিমধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের নাম প্রার্থীপদের জন্য ঘোষিত হয়েছে। ট্যান্ডনজীকে ভোট দেওয়াই স্থির হলো। আমরা যে আচার্য কৃপালনীর বিরুদ্ধে ছিলুম তা নয়; আমাদের মনে হয়েছিল শ্রীশংকররাও দেওকে না জানিয়ে আর একজন প্রার্থীকে সমর্থন করতে বলা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। প্রতিবাদে ট্যান্ডনজীকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সর্দার তখন জীবিত।

সর্দার ট্যান্ডনজীকে সমর্থন করছেন, এ খবরও আমাদের কাছে পেঁছে গিয়েছিল। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীর কাছে সর্দার ছিলেন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার

পাত্র। সংগঠক বলে তো নাম ছিলই, স্বয়ং গান্ধীজী সর্দার বলে অভিহিত করেছিলেন। কাশ্মীরের পাক আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন, আর দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত ও সাফল্যে দক্ষ প্রশাসক-রূপে পরিগণিত হন। দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল-তম অধ্যায় এবং তার কর্ণধার ছিলেন সর্দার। বিসমার্ক জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে সংগঠিত করে নতুন জার্মানীর প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানীতে ছোট রাজ্য-গুলি যাঁরা একত্রিত হলেন তাঁদের ভাষা, ধর্ম এবং পোশাক এক। আর যে ৬৩৫টি দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, পোশাক আলাদা, আচার বিচার আলাদা। বিসমার্কের পিছনে ছিল প্রাসিয়ার অস্ত্রবল, আর সর্দারের পিছনে ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের ইচ্ছাশক্তি এবং সর্দারের মনোবল। সর্দার প্রথম জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব অনুভব করেননি। কৃষক পরিবারে জন্ম, চুটিয়ে আইন ব্যবসা করতেন, নামও হয়েছিল খুব। এক-বার আদালতে একটি মামলায় দাঁড়িয়েছিলেন। সওয়াল করছেন। একজন সহ-কারী এসে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটি পড়ে পকেটে রেখে দিয়ে আবার সওয়াল আরম্ভ করলেন। সওয়াল শেষ হবার পর যখন আদালত ছেড়ে গেলেন কেউ কোনও ভাবান্তর লক্ষ করতে পারলো না। চিরকুটটিতে ও'র স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ লেখা ছিল। যখন গান্ধীজীকে গ্রহণ করলেন তখন সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। অখণ্ড বিশ্বাস। তা সত্ত্বেও প্রয়োজন হলে গান্ধীজীও সর্দারের কাছে রেহাই পেতেন না। কথিত আছে যে, গুজরাট বিদ্যাপীঠ আরম্ভ হবার আগে ঐ আশ্রমে যত বই ছিল গান্ধীজী একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেন। সর্দার জেল থেকে বেরিয়ে সংগে সংগে প্রতিবাদ করেন। ফলে, সব বইই ফেরত আসে এবং অনুরূপ অর্থের বই পরে সর্দার প্রতিষ্ঠানটিকে কিনে দেন। যেমন কঠোর, তেমনি কমনীয়। কর্মীদের বিপদ-আপদে তারা জানতো, সর্দার আছেন, ভয় কি? যখন ভারতবর্ষের সহকারী প্রধানমন্ত্রী, তখন অফিসাররা যেমন ভয় করতো তেমনই নির্ভরও করতো। পারিবারিক ব্যাপারেও সামাজিক পদ্ধতি মেনে চলতেন।

ট্যান্ডনজী নাসিক কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। একদিন সকালে সর্দারের বাড়িতে ডাক পড়লো। দিল্লীতে ট্যান্ডনজী তখন সর্দারের বাড়িতে আছেন। গিয়ে দেখি, যাঁরা আমাদের ছেড়ে গেছেন এমন অনেক ব্যক্তি এবং আজকের দিনে রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত এমন অনেকেই রয়েছেন। পাশের ঘরে ট্যান্ডনজী বসে। সর্দার কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন না। আলোচনা হচ্ছে পার্লামেন্টারী বোর্ডে কাঁরা সদস্য হবেন তাই নিয়ে। বিধান হচ্ছে—ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পারলামেন্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচন। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির ওপর ভার দিতে পারেন। আলোচনা শুনে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। জওহরলাল চান শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে—আমার মতে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা চাইছেন ডি পি মিশ্রকে। দ্বারিকাপ্রসাদ আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বাধীনতার আগে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খুব নাম করেছেন। তাঁর জেল, জরিমানা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ভূষণ তো ছিলই। এই দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্রকে অনেকেই চাইছেন, কিন্তু জওহরলাল গোবিন্দবল্লভ পন্থের নাম প্রস্তাব করার পর এ'র নাম প্রস্তাব করতে সকলেই ইতস্তত করছেন। আমি ছিলুম সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ এবং অখ্যাত। অতএব স্থির হলো ডি পি

মিশ্রের নাম আমাকেই করতে হবে। জওহরলালের বিরুদ্ধে বলতে হবে, এটাই খুব শক্ত। তার উপর শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের যে ক'জন অগ্রজ সব সময় স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমাকে রক্ষা করে এসেছেন তাঁদের মধ্যে পন্থজী অগ্রগণ্য। পন্থজী তখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীতে এলে জওহরলালের বাড়িতে বাস করতেন। গেলুম ত্রিমূর্তি ভবনে। পন্থজী যেখানেই থাকুন, আমার জন্যে দ্বার অবারিত। কয়েক মিনিট বাদে ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। আমার দিকে ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি অসুস্থ?' আমি তখনো কোনও কথা বলিনি, আমার চেহারা দেখেই বুঝেছেন গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। আমি যা বললুম আর উনি জেরা করে যা বার করলেন তাতে ঘটনাটা বুঝতে ও'র একটুও কষ্ট হলো না। তার পরই হাসি। পন্থজী যখন হাসতেন তখন কোনও শব্দ হতো না; যখন খুব খুশী হতেন, ও'র সর্বাঙ্গ হেসে উঠতো। আমায় যা বললেন তার মর্মার্থ হলো, 'তুমি কি পাগল হয়েছো? আমার বিরুদ্ধে নাম করবে কেন?' আমি ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। পন্থজী বললেন, 'জওহরলাল একটি নাম করবেন, তুমি একটি নাম করবে। এতে বিরুদ্ধতা কোথায়? যে বেশী ভোট পাবে সেই নির্বাচিত হবে।' আবার হাসি। আমি ভাবলুম—কি ভাবলুম আজও তা মনে আছে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

ওয়ার্কিং কমিটিতে ভোটাভুটি প্রায় কখনোই হয় না। দ্বারিকাপ্রসাদ নির্বাচিত হলেন। তারপর ১৯৫২-র নির্বাচনে দ্বারিকাপ্রসাদ কংগ্রেস ছাড়লেন। কি একটা নাম দিয়ে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন এবং নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন। একটিও আসন পাননি এবং নিজেও হেরেছিলেন। বহুদিন কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত থাকার পর আবার ফিরে আসেন। নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং উত্তরকালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ভোটাভুটির পরে প্রকাণ্ড ঝড় উঠেছিল। কিছুতেই জওহরলাল ট্যাণ্ডনজীকে সহ্য করতে পারেননি। আর আমি তো সেদিন থেকেই অপাংক্তেয়। ডাঃ রায়, গোবিন্দবল্লভ পন্থ অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। ব্যাঙ্গালোরে সাতদিন ধরে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হল। সেখানেই মোটামুটি ট্যাণ্ডনজীর মতই গ্রাহ্য হল যে, তিনি পদত্যাগ করবেন। ফলে, পরে দিল্লী অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আমি প্রস্তাব করলুম, গোবিন্দবল্লভ পন্থ সমর্থন করলেন—ট্যাণ্ডনজীর পদত্যাগপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। আর একটি প্রস্তাবে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

যেন দূরে কোনো টেলিফোন বাজছে। তখনও চিকিৎসকের আলো জ্বালা নিষিদ্ধ করে কোনো নিষেধ আসেনি, তাই যথারীতি অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছি। টেলি-

ফোনটা বেজেই চলেছে। একসঙ্গে টেলিফোন তুললুম, আলো জ্বাললুম, ঘড়ি দেখলুম। রাত আড়াইটে। বহু দূর থেকে ইংরেজীতে কেউ বললেন......সঙ্গে কথা কইতে চাই। উত্তরে আমি বললুম যে, আমি কথা বলছি। তারপরের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। মনে হল কোনো বয়স্ক লোক কান্না চেপে কথা বলার চেষ্টা করছেন। তখন আমার ঘুমে আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে। বুঝলাম, টেলিফোনে বিপর্যয়ের সংবাদ। বেশ পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করলুম যে, কোথা থেকে ফোন করছেন? উত্তর এল, 'রাষ্ট্রপতি ভবন।' কথাটা বেশ জড়ানো। মনে আতঙ্ক হল, তা হলে কি—! রাষ্ট্রপতি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলুম তিনি সুস্থই আছেন। তখনও মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত কান্নার আওয়াজ আসছে। সভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কার অসুখ?' উত্তরে যা শুনলুম, মনটা ঠিক মেনে নিতে পারল না। 'মৃতদেহ সকালে এসে পেঁাছবে'—এই হলো উত্তর। তার সঙ্গে জড়ানো কথা 'আপনি সকালের প্লেনে চলে আসবেন।' তখনও আমার মন সংবাদটা ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না। একটু যেন আচ্ছন্নভাবেই টেলিফোনটা রেখে দিলুম। তারপর কি যে ভাবলুম, তার শুরু ও শেষ কিছুই ছিল না। আবার ফোন এল। প্রফুল্লদার (মুখ্যমন্ত্রী) কাছ থেকে। বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। লালবাহাদুর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাসখন্দ থেকে মৃতদেহ কাল সকালে পালামে আসবে। ছ'টায় দিল্লী যাবার প্লেন।' আমার তখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আবার টেলিফোন এল এ আই সি সি অফিস থেকে। পরের ফোন বোধ হয় প্রাইম্ মিনিস্টারের অফিস থেকে। সেটা আমি নিজে ধরিনি।

প্রফুল্লদা দমদম যাবার পথে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। দরদী মানুষ। গাড়িতে, এয়ারোড্রোমে ও প্লেনে একটিও কথা বলেননি। কত কথাই মনে হচ্ছিল। যখন-তখন দিল্লীর বাড়িতে এসে হাজির হতেন। প্রথম কাজ দরজা-জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী হবার পর ঐ পর্দা নিয়ে আমরা কত ঠাট্টা করেছি। ঘরে যদি জায়গা থাকত, তা হলেও বসতেন না—অবিরাম পায়চারি করতেন। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে এবং প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় যে বাড়িতে ছিলেন, তার প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ ছিল। মাঠটাকেও নাতিবৃহৎ বলা যায়। ইতস্তত কতগুলো চেয়ার ছড়ানো থাকত। উনি পায়চারি করতে করতে কখনও দক্ষিণ দিকের চেয়ারের কাছে গিয়ে কথা সারতেন, তারপরেই পূব দিকের চেয়ারে। এইভাবেই সব দরকারী কথা সারা হত। ছোট্টখাট্ট মানুষটি। দৃঢ়চেতা মানুষ, কিন্তু অকারণ গাম্ভীর্যে তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। জন্মদিন নিয়ে একটা গল্প বলতেন। 'আমি কি আর মহাত্মাজীর জন্মদিনে জন্মেছি? আর আমি যখন জন্মেছি, তখন জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ ছিল না। তার উপর গরীবের ছেলে। বাড়ির কেউই তারিখটারিখ লিখে রাখেনি। ঐ অক্টোবরের প্রথম দিকে জন্মেছিলুম। তাই পরিবারের সবাই চালিয়ে দিল ওটাকে ২রা অক্টোবর বলে। ভাবল বুঝি মহাপুরুষের জন্মদিন আরোপ করলেই আমিও একজন কেউকেটা হব।' বলে হাসতেন। ওঁর হাসিটা ছিল অদ্ভুত। সামান্য হাসি ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ত। আবার নামের ব্যাখ্যাও বিচিত্র। উনি পদবী ত্যাগ করে শুধু লালবাহাদুর হয়েছিলেন। বললেন, 'আমি ত্যাগ করলেই লোকে শুনবে কেন? দিল নামের শেষে শাস্ত্রী লাগিয়ে। আমি কাশী বিদ্যাপীঠের স্নাতক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের যেমন বি-এ, বি-এস-সি প্রভৃতি দেওয়া হয়, তেমনি কাশী বিদ্যাপীঠের স্নাতক হন শাস্ত্রী। লোকে তাই লাগিয়ে দিলে আমার নামের পিছনে।' অবশ্য ওঁর ছেলে বরাবরই লিখত হরি শাস্ত্রী বলে। আর

আমাদের ধুরন্ধর সাংবাদিকরা বরাবরই ও'র স্ত্রীকে ললিতা শাস্ত্রী বলে এসেছেন।

ছিলেন উত্তরপ্রদেশের পুলিসমন্ত্রী। ১৯৫১-য় ট্যান্ডনজীর পদত্যাগের পর জওহরলাল যখন কংগ্রেস সভাপতি হলেন, তখন ও'কে নিয়ে এলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরূপে। আরও একজন সম্পাদক হয়েছিলেন। তৎকালীন মহীশূরের শ্রীনিবাস মালিয়া। আমি দিল্লীর যে বাড়িতে বাস করতুম, ঠিক তার উল্টো দিকের বাড়িতে বাস করতেন। মালিয়া ছিলেন লালবাহাদুরের বিশেষ বন্ধু। ফলে প্রায়ই আমাদের আসর বসত রাত এগারোটার পর. হয় আমার বাড়িতে, নয় মলিয়ার বাড়িতে; কখনও কখনও লালবাহাদুরের ওখানে।

স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল ১৯৫২-য়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুরো দায়িত্ব লালবাহাদুরের উপর। বোধ হয় তখন কুড়ি-একুশ ঘন্টা করে খাটতেন। আর ইলেকশন কমিটিতে সুষ্ঠুভাবে সব কাজ করে নেওয়া—সে তো ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। জওহরলাল, ট্যান্ডনজী, মৌলানা, ডাঃ রায়—এ'রা সবাই নিজ নিজ মত প্রকাশে কখনও কুণ্ঠা করতেন না। আর তা থেকেই ঘনিয়ে আসত যত বিপদ। হাওড়ার একজনের নাম বিচারের সময় ট্যান্ডনজী বললেন যে, আমি শুনেছি ও মদ খায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের সরব গর্জন, 'মৌলানাও তো মদ খায়।' মৌলানা একটু দূরে ছিলেন, পাশেই লালবাহাদুর। লালবাহাদুরকে মৌলানা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের গোলমাল?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—'হাওড়ার একজনের মনোনয়ন নিয়ে ট্যান্ডনজীর কথার উত্তর দিচ্ছেন ডাঃ রায়।' মৌলানা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ঠিক বাত।' মৌলানা মনে করলেন বাংলার মনোনয়ন নিয়ে ডাঃ রায় বোধ হয় বলেছেন যে, মৌলানা সবই জানেন। সেই প্রথম মনোনয়ন দেওয়া। কাজে কাজেই কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল খুব হুঁশিয়ার। আর আমার প্রতি বিশ্বাসের ভাব একটু কম ছিল। সেইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের তালিকার বিশ্লেষণ হল নিখুঁতভাবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা আরও একটা দোষ (?) করেছিলুম। কংগ্রেসে একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, প্রার্থীনামের তালিকা, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও দেয় অর্থ ঠিক সময়ে না দেওয়া। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ আর বিহার ছিল অগ্রগণ্য। মনোনয়নপত্র দেবার দিন অবধি পুরো তালিকা এসে পেঁছত না। আমরা যখন সময়ের আগেই সব পেঁছে দিলুম. তখন স্বাভাবিকভাবেই একটু সন্দেহ হল। ইলেকশন কমিটির সভায় লালবাহাদুর পঞ্চমুখে পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যাতি করলেন। আর শ্রীপ্রকাশজী ছিলেন স্ক্রুটিনাইজার। লালবাহাদুর তাঁকে সাক্ষী মেনে দিলেন। শ্রীপ্রকাশজী অন্য কথা বলেন কি করে? তিনিও উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করলেন। তাতেও অবশ্য নিস্তার পাওয়া গেল না। জওহরলাল পরদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ঘোষণা করলেন। ডাঃ রায়ের ভীষণ রাগ। আর উনি রাগ প্রকাশ করতে একটুও কুণ্ঠিত হতেন না। দুজনে তর্ক। আবার লালবাহাদুরকে সামলাতে হল। লালবাহাদুর সবিনয়ে জওহরলাল ও ডাঃ রায় দুজনকেই নিবেদন করলেন, 'শ্রীপ্রকাশজী তো আছেনই, আমি আর অতুল্যবাবু তাঁর সঙ্গে বসে মোটামুটি ঠিক করে ফেলব।' রাত্রে শ্রীপ্রকাশজীর মত নিয়ে আমরা গোটা কুড়িক নাম বদলে দিলুম। অর্থাৎ যাদের চাই না—এমন নাম দেওয়া হল। এবং সেই কুড়িটি নাম শ্রীপ্রকাশজী আগের নামই বসিয়ে দিলেন। ফলে জওহরলালও খুশী এবং পূর্ণ তালিকা অনুমোদনে ডাঃ রায়ও খুশী। আমার উপর ভার পড়ল যাতে ডাঃ রায় একটু দেরি করে মিটিং-এ আসেন তার ব্যবস্থা করা। সেটা খুব

শক্ত ছিল না। কোনো অফিসার এসে ডেভেলপমেন্ট-এর কথা পাড়লেই উনি মশগুল হয়ে যেতেন। মিটিং-এ শ্রীপ্রকাশ বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি তাঁর সব নির্দেশই মেনে নিয়েছেন—অনেক নামের অদল-বদল হয়েছে। মনে হল, জওহরলাল খুব খুশী। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। কিন্তু বিপদ কাটেনি। ডাঃ রায় খানিক বাদে এসে হাজির হলেন। এস কে পাতিল কুট করে কানের কাছে লাগিয়ে দিলেন যে, অতুল্য পণ্ডিতজীর কথায় অনেক নাম বদলে দিয়েছে। আর যায় কোথায়! অমনি ডাঃ রায়ের ভর্ৎসনা। লালবাহাদুর তাড়াতাড়ি ডাঃ রায়ের কাছে গিয়ে লিস্টটা ফেলে দিলেন। ব্যস, পড়ে মুখের ভাব একদম বদলে গেল। মিটিং-এর পর আমায় বললেন, 'দেখো, লালবাহাদুর লোকটা ভাল।' এবং কলকাতায় এসে সাধারণত যা করতেন না, তাই করলেন। লালবাহাদুরকে রাত্রে ডিনার খাওয়ালেন। লালবাহাদুরের খাওয়া দেখে তো ডাঃ রায়ের চক্ষুস্থির। রাত্রে দুখানা টোস্ট বা একটা চাপাটি, আলু সেদ্ধ, আর একটু দুধ। দুধটাও মাপা। সকালেও তাই। মোরারজীভাই খুব স্বল্পাহারী। কিন্তু লালবাহাদুর মাঝে মাঝে তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতেন। অবশ্য কলকাতার রসগোল্লা পেলে একটু ভাবান্তর ঘটত। কখনও কখনও দুটোও একসঙ্গে খেয়ে ফেলতেন। উত্তরপ্রদেশে টক দই খাওয়াই নিয়ম। কিন্তু কলকাতার দই পেলে লালবাহাদুর একটু খেতেনই।

পণ্ডিতজী শেষের ক'বছর আমাকে তাঁর সান্নিধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। এক-দিন বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে আমাকে বললেন, 'লালবাহাদুরকে ডেপুটি প্রাইম-মিনিস্টার করলে কি হয়?' আমি তো এক পায়ে খাড়া। আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমাদের সম্পর্ক তো আপনি জানেন।' জওহরলাল বললেন, 'ওকে রাজী করানো শক্ত হবে।' (এ কাহিনী আমি আমার 'The Split' নামক গ্রন্থে ১৯৭০-এ প্রকাশ করেছি)। আমি একটা দুষ্কর্ম করে ফেললুম। আমি জওহরলালের অভিমত লালবাহাদুরকে জানালাম। লালবাহাদুর শুনে যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। এবং উনি আমার চেয়েও বড় দুষ্কর্ম করলেন। বর্তমানে খ্যাতনামা এক সাংবাদিক তথা সম্পাদকের কাছে জওহরলালের অভিমত প্রকাশ করেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেটের তিনজন প্রবীণ মন্ত্রী জানতে পারলেন এবং পরদিনই জওহরলালের কাছে অনুযোগ, অভিযোগ। ফলে, ডেপুটি প্রাইম-মিনিস্টার হবার কথাটা আর বেশী দূর এগুলো না। তবে এটা সত্য, জওহরলাল তাঁর পরে লালবাহাদুর প্রধান-মন্ত্রী হন, এটাই চেয়েছিলেন। জওহরলাল এটাও বিশ্বাস করতেন যে, লাল-বাহাদুর ইন্দিরাকেও মন্ত্রী করবেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে প্রশাসন সম্বন্ধে ইন্দিরার অনেক অভিজ্ঞতা বাড়বে।

'পবিত্র চুল' নিয়ে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা হবার সময় লালবাহাদুরকে কাশ্মীর যেতে হয়েছিল। আমি আর কামরাজ বসে আছি—এসে হাজির। বললেন, 'দেখো, পণ্ডিতজী আমাকে এই ওভারকোটটা দিয়েছেন।' ওভারকোটটা পরে ওঁকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। লম্বা, চওড়া—দুয়েতেই একটু বড়। তবুও খুব খুশী। যেন ছোট ছেলে পুজোর সময় একটা ভাল পোশাক পেয়েছে—এই ভাব। কামরাজ একটু হেসে বললেন, 'পণ্ডিতজীর কোট, তা ভালই দেখাচ্ছে।' একটু অর্থপূর্ণ হাসিও হাসলেন। এটা ডেপুটি প্রাইম-মিনিস্টার কাহিনীর পরের ঘটনা। লালবাহাদুর একটু গম্ভীরভাবে আমাদের বললেন, 'আমাকে কিছুই মানায় না।' অবশ্য, এটা খুবই সাময়িক, ক্ষণিক ভাবান্তর মাত্র। তারপর কফি খেলেন। হজরতবালের

অবস্থা সম্বন্ধে একটু বর্ণনা দিলেন। আবার সেই আগেকার মানুষ। কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল, সদাহাস্যময়।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ যখন স্বাধীন হল, ডাঃ রায় তখন ইউরোপে। দিল্লী থেকে সরকারী সমাচার বেরোল ডাঃ রায়কে উত্তরপ্রদেশের (তখন নাম ছিল যুক্তপ্রদেশ) গভর্নর (তখনও রাজ্যপাল নামকরণ হয়নি) নিযুক্ত করা হয়েছে। জওহরলাল ডাঃ রায়কে চিঠি দিলেন গভর্নর হবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে। ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডু গভর্নরের কাজ চালাবেন। কিছু-দিন বাদে ডাঃ রায় দিল্লী এসে গান্ধীজী, জওহরলাল ও সর্দারকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে গভর্নর হওয়াও সম্ভব নয়, কলকাতা ছাড়াও সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী স্থায়ী গভর্নর হয়ে গেলেন। শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীতে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর বিধানসভার আসন শূন্য হল। সেই আসনে ডাঃ রায় বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ডঃ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) হবার পর থেকেই গোলমাল শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেন, তিনি যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী হন, তবে বিধানসভার অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য তাঁকে সমর্থন করবেন। ডাঃ রায় অসম্মতি জানান।

'৪৭ সালের শেষাশেষি ডঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ডাঃ রায়ের উপর চাপ আরও বেশী বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তখনও ডাঃ রায়ের সম্মতি পাওয়া যায়নি। এমন সময় দিল্লীতে গান্ধীজীর উপবাস আরম্ভ হল। গান্ধীজীর প্রত্যেক উপবাসের সময় ডাঃ রায় চিকিৎসক হিসাবে তাঁর পাশে থাকতেন। উপবাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় দিল্লী গেলেন। সেখানে গান্ধীজীর অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ডাঃ রায় খুব জোর দিয়ে কথা বলতেন—বাইরে থেকে মনে হত বুঝি খুব শক্ত লোক। কিন্তু কত-গুলি লোক সম্পর্কে ওঁর মনে খুব কমনীয়তা ছিল, তা সে বড়ই হন, বা ছোটই হন। তাঁদের কথা তিনি ফেলতে পারতেন না। আর, গান্ধীজীর কথা তো স্বতন্ত্র। ওঁদের দুজনের একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল। ডাঃ রায় গান্ধীজীর কাছে সম্মতি জানিয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। কলকাতায় ধীরেনদা (মুখো-পাধ্যায়) ও অমরবাবুর (ঘোষ) তৎপরতা অনেক বেড়ে গেল। অসীম উৎসাহ। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। শোনা গেল, ডাঃ রায় অনেক অনভিপ্রেত লোককে মন্ত্রী করা ঠিক করেছেন। তখন যে দুজন উৎসাহী ছিলেন, ধীরেনদা ও অমরবাবু—তাঁদের তৎপরতা বেড়ে গেল ডাঃ রায়কে নিরস্ত করার জন্য। ডাঃ রায়ের এক কথা, 'তোমরা আমায় কথা দিয়েছিলে সমর্থন করবার। এখন যদি কথা না রাখ, তা হলে আমি মন্ত্রিসভা গঠন করব না।' শ্রীকিরণশঙ্কর রায় আমায়

ফোন করলেন যে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডাঃ রায় অমুক অমুককে নিতে চাইছেন। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ও সুরসিক নেতা ছিলেন। তিনি যখন রাত বারোটার সময় ফোন করলেন, তখন অবস্থার গুরুত্ব আমরা বেশ বুঝতে পারলুম। কয়েকজন বিধানসভা-সদস্য এবং আমরা কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী উত্তর কলকাতায় একত্রিত হলুম। স্থির হল, আমাদের পক্ষ থেকে যখন ধীরেনদা এবং অমরবাবু কথা দিয়ে এসেছেন, তখন আমরা বিনা শর্তে ডাঃ রায়কে সমর্থন করব। আমাদের সকলের অভিমত জেনে দূত হয়ে প্রফুল্লদা ডাঃ রায়ের কাছে গেলেন। ডাঃ রায় অবিচলিত। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি এসবের মধ্যে নেই। প্রথমেই যখন কথার খেলাপ, পরে নিশ্চয়ই গোলমাল বাধবে। আর তা ছাড়া আমি অধি-কাংশ বিধানসভার সদস্যকেই চিনি না।' প্রফুল্লদা তখন বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি দেখালেন, যাতে ডাঃ রায়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা জানানো হয়েছে। ডাঃ রায় তখন প্রফুল্লদাকে মন্ত্রী হবার জন্য বললেন। প্রফুল্লদা বিনীতভাবে অসম্মতি জানানোয় ডাঃ রায় বললেন, 'আচ্ছা, এর মধ্যে কে কে মন্ত্রী হবে পরামর্শ করে সেই তালিকাটা আমায় এনে দিও।' আবার আমাদের সভা হল। সভা থেকে কতগুলি নাম পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং লিখে দেওয়া হল যে, এর মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছে ডাঃ রায় নিতে পারেন এবং না নিলেও কোনও আপত্তি নেই। তালিকাটি ডাঃ রায়কে দেবার পর তিনি তার মধ্যে প্রফুল্লদার নামটি লিখে দিলেন। প্রফুল্লদা আপত্তি করায় বললেন যে, আপনারা আমায় পূর্ণ সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন। আর শুরুতেই আপত্তি জানাচ্ছেন? প্রফুল্লদা তবুও আপত্তি করায় তিনি তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন, 'তা হলে আমার দ্বারা হল না।' ব্যস, মুখ চূণ করে প্রফুল্লদা ফেরত এলেন। আমরা ভাবলুম বুঝি কোনও অঘটন ঘটেছে। সব শুনে পাঁজা মশাই (যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা), নিকুঞ্জবাবু (নিকুঞ্জবিহারী মাইতি), কালীবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রফুল্লদাকে বললেন, 'আর গোলমাল করে কাজ নেই। আমরা ডাঃ রায়কে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনার মত আছে।' ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সালে ডাঃ রায় মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি জওহরলাল কলকাতায় এক মহতী জনসভায় ভাষণ দিলেন। ডাঃ রায় তখন ইউরোপে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই সভায় জওহর-লাল ঘোষণা করলেন, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। এইসব অভি-যোগ নিয়ে প্রকাশ্য তদন্ত হবে। সভাটি হয়েছিল ১৪ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯৪৯। আমরা সকলেই একটু বিস্মিত হলুম। ডাঃ রায়ের অবর্তমানে নলিনী-বাবু (সরকার) ক্যাবিনেটে সভাপতিত্ব করতেন। তাঁকেও না জানিয়ে, মন্ত্রীরা তো কেউ জানতেনই না—কি করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল এ কথা ঘোষণা করলেন? যাঁরা ডাঃ রায়কে চিনতেন, তাঁরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন যে, ডাঃ রায় হয়তো এতেই পদত্যাগ করবেন। ডাঃ রায়ের ইউরোপ থেকে ফেরবার দু দিন আগে প্রফুল্লদা আর কালীবাবু বোম্বাই গেলেন। সর্দার তখন বোম্বাইয়ে। সর্দার বলে দিলেন, ডাঃ রায় এসেই যেন বোম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ইতিমধ্যে ডাঃ রায় ইউরোপ থেকে জওহরলালের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন যে, তাঁর ফেরা অবধি যেন কোনও তদন্ত না শুরু হয়। প্রফুল্লদা আর কালীবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর ডাঃ রায় বললেন যে, আমাকে না জানিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কি করে আমার ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেন? সরকারী বিধানেও এটা অন্যায়। আর কংগ্রেসী বিধানে এটা গর্হিত। সর্দারের

সঙ্গে দেখা করে ডাঃ রায় প্রফুল্লদা এবং কালীবাবুকে নিয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। তারপরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মিটিং ডাকা হল। দিল্লী থেকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের টেলিগ্রাম, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসী দলের সভা বিধেয় নয়। আপনি তাড়াতাড়ি দিল্লী আসুন।' টেলিগ্রামটি ডাঃ রায় রেখে দিলেন। তার পরদিন আবার টেলিগ্রাম। 'জওহরলাল তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলেছেন। আপনি দিল্লী আসুন।' সে টেলিগ্রামটিও ডাঃ রায় রেখে দিলেন। পার্টি মিটিং হল। পার্টি মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল ডাঃ রায়ের উপর আস্থাসূচক প্রস্তাব। তারপর ডাঃ রায়ের দিল্লী যাত্রা।

সটান ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ সেখানে দু' ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা। বক্তৃতার মূল কথা একটিই। 'আমাকে না জানিয়ে আমার অবর্তমানে কি করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আমার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দিতে পারেন? তদন্তের আদেশ দিলে আমি দেব। আমি কংগ্রেসের আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলি। প্রধানমন্ত্রী বা কংগ্রেস সভাপতির এমন ক্ষমতা নেই যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেন। আমার বিরুদ্ধে যদি তদন্তের আদেশ দেন, তবে তা নিশ্চয়ই দিতে পারেন। তবে আমাকে জানিয়ে আদেশ দেওয়াই সভ্য সমাজের রীতি। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেস সভাপতি যে আদেশ দেবেন, আমি মেনে নেব। কিন্তু তার সঙ্গে আমি সাধারণের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাব।' ওয়ার্কিং কমিটির কারোর মুখে কোনও কথা নেই। তদন্তের আদেশ প্রত্যাহৃত হল। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং থেকে বেরিয়ে গোবিন্দবল্লভ পন্থ আমাকে বললেন, 'বিধান একজন বড় ডাক্তার জানতুম। বিধান যে একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, সেটা আজ বুঝতে পারলুম।'
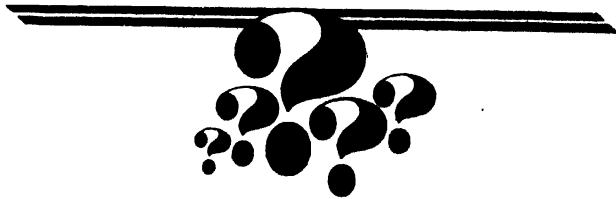
১৯২৬-২৭ সাল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে খবর এল কিরণবাবু (কিরণশঙ্কর রায়) ডেকে পাঠিয়েছেন। পরের দিন বাড়িতে গেলুম। ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে। কিরণবাবু বললেন, 'একবার দুমকা যেতে হবে। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়েছে। অনেক বাঙালীকে ধরেছে।' আমি বললুম, 'আজ্ঞে।' কিরণবাবু বুঝলেন। অতি বিচক্ষণ লোক। যেমন পণ্ডিত, তেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি সুরসিক। বাংলা পড়াতেন এবং 'সবুজপত্রে'ও লিখতেন। ব্যারিস্টারি পাস করে এলেন, কিন্তু এক দিনও কোর্টে যাননি। আমার দ্বিধাটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমার বয়স তখন বাইশ। আমি উকিলও নই, পড়াশুনাও করিনি। আমি দুমকার মত অগম্য জায়গায় গিয়ে কি করব? তা ছাড়া মনে দ্বিধাও ছিল। যাবার পর আর কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিশেষ খোঁজখবর নেবেন বলে মনে হয় না। কিরণবাবু একটু হেসে বললেন, 'কোনও অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। আমি তো আছি।'

বেরলাম দুমকার জন্য। দুমকা হল সাঁওতাল পরগনা জেলার হেড কোয়ার্টার। ওখানেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট (ওখানে বলে ডেপুটি কমিশনার)। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক, চল্লিশ মাইলের মধ্যে রেল-স্টেশন নেই। দেওঘর, রামপুরহাট, সিউড়ি, মান্দার হিল—সব জায়গা থেকেই চল্লিশ মাইল। তখন বাসের চলন হয়েছে; পুরনো মটরগাড়িও পাওয়া যায়—যাতে বনেট, বাম্পার, সবের উপর মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশজন নেওয়া যেত। আমি গেলুম রামপুরহাট হয়ে। শীতকাল। দুমকার যত কাছাকাছি পেঁছনো গেল, তত পুলিসের চেক। বাঙালী প্যাসেঞ্জার থাকলে তো কথাই নেই। নাম, গোত্র, বংশপরিচয়—সবই পুলিসের দরকার। দুমকা এখনও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খানিকটা বজায় রেখেছে। তখন তো মনে হত সবটাই বন, মাঝে মাঝে ক'টা সরকারী বাড়ি, পুলিস কোয়ার্টার, পুলিসের ব্যারাক। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শহর বলে মনে করবার কোনও কারণ হত না। জেলা শহর, সেইজন্য কিছু দোকানপাট ছিল। আর জেলা কোর্ট বলে জেলার সর্বত্র থেকেই লোকজনের যাতায়াত। সেইজন্যই বসতি। দুটো চারটে হোটেল, চায়ের দোকান, বাজারের মতনও খানিকটা ছিল। বিহারের প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা, সেইজন্য অগম্য দুমকা প্রায় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে শুধু পুলিস আর পুলিস।

আমি একটা ধর্মশালায় উঠেছিলুম। সকালবেলাই পুলিস এসে হাজির। যিনি অফিসার তিনি আবার রায়বাহাদুর। কতরকমের কথা। তার মধ্যে আবার আমার কোনও আত্মীয়স্বজন ধরা পড়েছেন কি না, তার খোঁজ নেওয়া। এই শীতে দুমকায় একটু কষ্ট হবে, তাও বললেন। কষ্ট শীতের জন্য না হলেও অন্যরকমে হল। প্রায় দোকানীই জিনিস বেচতে চায় না, হোটেলওয়ালারাও সেইরকম। কোর্টে গেলুম, সেখানে উকিলবাবুদের ব্যবহার দেখে মনে হল, আমি যেন কোনও অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। চোখ-ভরা ঔৎসুক্য, কিন্তু ঠোঁট বন্ধ। একজন উকিলবাবু একটু এদিক-ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সাঁওতাল পরগনা তো নন্‌রেগুলেটেড জেলা, এখানকার নিয়মকানুন সবই আলাদা। উকিলবাবুদের প্রতি বছর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লাইসেন্স নতুন করে নিতে হয়।' আমি মর্মে মর্মে তা অনুভব করলুম। বার লাইব্রেরীতে বসবার তো জায়গা পেলুমই না, আর আসামী পক্ষে দাঁড়াবার কোনও উকিল পাওয়া সম্ভব হল না। একটু ক্ষুণ্ণ হলুম, জেদও একটু চাপল। রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। খেয়ে এসে দেখি, যে ধর্মশালায় উঠেছিলুম তার দরজা বন্ধ। আমার দুটো কম্বলের বিছানা, আর দু-একটা কাপড়-জামার ব্যাগ গেটের বাইরে। অনেক ডাকাডাকি করায় দারোয়ান খুব কাতরভাবে জানাল যে, আমার ঢোকবার হুকুম নেই। বুঝলাম। শীতকাল। তায় আবার দুমকা শহরেই তখন নেকড়ে বাঘ, ভাল্লুক—এসব বেরোত। উপায় নেই। সেই ধর্মশালার দরজায় ঠেস দিয়ে রাত কাটিয়ে দিলুম। একটু ভয় ভয় করছিল। বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে মানুষের ভয়ই বেশী। যদি পুলিস হঠাৎ ধরে নিয়ে কোনও অজানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয় তা হলে আর কাউকে কোনও খবর দেওয়া যাবে না। যাই হোক, সে রাতও কাটল। সারা রাত্রে কতরকম আওয়াজ। শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, অর্জুন—আরও কতরকমের বড় বড় গাছ। সারা রাত্তির মনে হল, তারা যেন হাঁটা-চলা করছে। ভয়, অথচ একটা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। সকালে দেওঘর পেঁছলুম।

দেওঘর জানা জায়গা। মাতামহের একটি বাড়ি ছিল, তাই প্রতি বছরই যাওয়া হত। শশীদাকে চিনতুম। শ্রীশশীভূষণ রায়। জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার, আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সব কাজেই সাহায্য পাওয়া যেত। আর চিনতুম

বিনোদাবাবুকে। শ্রীবিনোদানন্দ ঝা। জেল-খাটা লোক। পাণ্ডা বংশে জন্ম, কিন্তু কিছুই মানতেন না। পরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। শশীদা এবং বিনোদাবাবু সব শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। দেখলুম, খানিকটা অসহায়ের মত মনোভাব। যাই হোক, ওঁরা নিয়ে গিয়ে তুললেন এক ধর্মশালার তেতলার ঘরে। তারপর খোঁজ করলুম, জানাশুনা কে তখন আছেন দেওঘরে। অমরদা আছেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বোস। যে বরদাচরণ বোসের নামে দেওঘরের স্কুল, সেই পরিবারভুক্ত। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। আর আছেন জলপাইগুড়ির 'টি কিং' নামে খ্যাত শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ। যোগেশবাবুর ছেলে তেজেশ একজন আসামী। হুগলীর পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, নদীয়ার শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল—এরকম কয়েকজন খ্যাতনামা লোকও আছেন আসামীদের মধ্যে। প্রথমে অমরদার কাছে গেলুম। তিনি সব শুনে উকিলের জন্য চেষ্টা করবেন বললেন। তারপর গেলুম শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের কাছে। সেখানে আলাপ হল শ্রীচারুচন্দ্র বোসের সঙ্গে। প্রকাশ পেল, তাঁর বড় ছেলে আমাদের অনাথদা। অনাথদার পরবর্তী কালে শিক্ষাবিদ হিসাবে খুব নাম হয়েছিল। দিল্লী ইউনিভারসিটিতে ছিলেন, বিশ্বভারতীতেও ছিলেন। যোগেশবাবু সবই শুনলেন। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি আমার মাথায় তার দুটি হাত রেখে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি ভবিষ্যতে অনেক কাজ করবে।' স্বাভাবিকভাবেই আমি একটু অভিভূত হলাম। যোগেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে সেই থেকে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ধর্মশালায় গিয়ে দেখি পুলিসের সার্চ হয়ে গেছে, অমরদার বাড়িও সার্চ হয়েছে। বিকেলে সকলে একত্রিত হলুম অমরদার বাড়িতে। স্থির হল, কেস দুমকা থেকে দেওঘরে স্থানান্তরিত করতেই হবে। শশীদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মধুপুরে মতি মিত্তির মশায়ের বাড়ি গেলাম—ওঁর তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, যদি গিরিডির কোনও উকিল পাওয়া যায়। মতিবাবুর বাড়ি সদাব্রত, উনি পাতরোলের দেওয়ান। যে পাতরোলে এখনও হাজার হাজার মানুষ দূর দূর জায়গা থেকে যায়, আর অসংখ্য ছাগবলি হয়। খুব যত্ন, খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা সবই হল। নামও খুব ওঁর। তিনি আশ্বাস দিলেন উকিল ঠিক করবার। সেখান থেকে গেলুম রামপুরহাট। তখন জে এল ব্যানার্জী মশাই রামপুরহাটের বাড়িতেই আছেন। সস্নেহে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অনুরাগমিশ্রিত ভর্ৎসনা করলেন যে, আগে তাঁর কাছে যাইনি কেন। ওইখানেই গিরিজার সঙ্গে দেখা হল। আগে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়। এই গিরিজা মুখার্জীই কর্পোরেশনের অধিকর্তা বেণীমাধব বড়ুয়ার কন্যাকে বিবাহ করে।* পরে ফরাসী দেশে যায়, সেখানে লেখাপড়ার কাজে অনেক নাম হয়। ঐখান থেকেই 'ফরওয়ার্ড' কাগজে একখানি চিঠি পাঠাই। 'ফরওয়ার্ড' কাগজের তখন অসীম প্রভাব। তারা বড় বড় করে ছাপে যে, সাঁওতাল পরগনার উকিলরা মক্কেলের কথা বেশী ভাবে না, তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক রাখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাবুর্চি-খানসামার সঙ্গে। তার পরদিন এক অঘটন ঘটল। পাকুড়ের শ্রীকালিদাস রায় কি এক কাজে রামপুরহাট এসেছিলেন। আমার মুখে সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষে দাঁড়াবার জন্য রাজী হলেন। ইতিমধ্যে আমি কলকাতাতেও অনেক খবর

* এই ভুল লেখার জন্য আমি দুঃখিত। ডাঃ বড়ুয়া ছিলেন শিক্ষাব্রতী। কর্পোরেশনের সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না।—লেখক।

পাঠিয়েছি। টাকা পাইনি, কিন্তু খবর পেয়েছি ব্যারিস্টার এস কে সেন আসবেন। অবশ্য তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সব আমাকেই করতে হল। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কোনও লোক বা টাকা পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

সেই পুরনো পথেই রামপুরহাট থেকে দুমকা গেলুম। এবারে পুলিসের ব্যবহার এবং বার লাইব্রেরীর ব্যবহারও অন্যরকম। কারণ 'ফরওয়ার্ড' কাগজে চিঠি বেরিয়ে গেছে। উপেক্ষা তো নেই-ই, বরং একটু আপ্যায়নের ভাব। দেওঘর দিয়ে শ্রী এস কে সেন ব্যারিস্টার মহোদয় এলেন, আর পাটনা থেকে এলেন শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়। কৃষ্ণবল্লভবাবু তখন বিধান পরিষদের সদস্য। আর একজন এসেছিলেন আমাদের হেমেনদা। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যাঁর গিরিশ ঘোষের উপর বই অতুলনীয়। হেমেনদা আর মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ঢাকা থেকে কলকাতা আসবার পথে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান।

দুমকায় একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। রাত্রে থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না, কৃষ্ণবল্লভবাবুও পাননি। খুব বিপদ। অথচ থাকতেই হবে, পরের দিন মামলা। আমি তখন নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে বললুম, 'মায়েরা, দুটো-তিনটে ঘর আমাদের খালি করে দিন। আমরা এই কাজে এসেছি, কিছু টাকা দেব।' সমাজের অস্পৃশ্য মহিলারা জিভ কেটে বললেন, 'বাবা, সে কি কথা! টাকা দিতে হবে না। যে ক'টা ঘরের দরকার, আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং আমাদের ছোঁয়া যদি খাওয়া চলে, তা হলে এখানেই আহারাদি করতে হবে।' তখন মনের যা অবস্থা হয়েছিল, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারব না। খালি মনে হয়েছে, এই মহীয়সী মহিলাদের সম্যক মর্যাদা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই—আমরা এত অকৃতজ্ঞ। তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। মামলা দেওঘরে স্থানান্তরিত হল। তখন আর প্রদেশ কংগ্রেস কোনও সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন আছে মনে করলেন না। আমি গিয়ে বীরেন শাসমল মশাইকে ধরলুম। সম্পূর্ণ অপরিচিত। অত্যন্ত দরদ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিলেন, দেওঘরে গিয়ে আসামী পক্ষ সমর্থন করবেন। এই শাসমল মশাই এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় ওঁর নেতৃত্বে চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন হয়। আন্দোলন সর্বত্র সাফল্য অর্জন করে। সরকারী যন্ত্র অচল হয়ে গিয়েছিল।

পরের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বিহার আইনসভার দলপতি নির্বাচন। প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণবল্লভবাবু আর বিনোদাবাবু। আমাকে ওয়ার্কিং কমিটি পাঠিয়েছেন নির্বাচন পরিচালনার জন্য। দুজনই আমার পুরাতন বন্ধু। এবং বয়োজ্যেষ্ঠ। সানুনয়ে দুজনকে বললুম, 'দুজন মুখ্যমন্ত্রী তো হবেন না, একজন মুখ্যমন্ত্রী হন এবং আর একজন সহকারী মুখ্যমন্ত্রী।' কোনও ফল হল না। নির্বাচনে কৃষ্ণবল্লভবাবু জয়ী হলেন। আমি সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললুম, 'আজ যাঁকে নেতা নির্বাচিত করলেন, ইনি দুমকায় এক নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছেন।' সভার সকলে হতচকিত। অস্ফুট গুঞ্জন। সে এক উপভোগ্য অবস্থা। কৃষ্ণবল্লভবাবু একটু দেরিতে উঠে দাঁড়ালেন। দু' হাত জোড় করে বললেন, 'আমি নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছিলাম, কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার সঙ্গে ছিলেন আজকের সভার সভাপতি।'

১৯৩০। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাবের সঙ্গে আইন অমান্য করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। আমরা বড়ডোঙ্গল কনফারেন্সের পর ওখানেই থেকে গেলুম। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় বড়ডোঙ্গলে স্থানান্তরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব। বড়ডোঙ্গল গ্রাম আরামবাগ শহর থেকে আট মাইল দূরে। ১৯২৩-এ দ্বারকেশ্বরের বন্যায় বড়-ডোঙ্গলের সাতজন লোক মারা যায়। প্রফুল্লদা রিলিফ করতে গিয়ে ওখানে বসবাস আর খাদির কাজ আরম্ভ করেন। উৎপাদনকেন্দ্র ছিল দুয়াদণ্ড গ্রাম, ওখান থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। বেশ ভাল খাদি হত। নাম ছিল। এই বড়-ডোঙ্গলেই আমাদের সদর কার্যালয় হল। ওখান থেকেই গোটা জেলার সঙ্গে যোগাযোগ। এবং জনসভা, বৈঠক আর ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা।

১৯২৫-এ দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি হয়। জ্ঞান-দা (জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী) তার ভার নেন। সেই সময় থেকেই ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতার প্রচলন করেন। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' অবলম্বনে ছবি করানো হয়, আরও নানারকম স্লাইড ছিল। কি করে তাঁতীদের আঙ্গুল কাটা হয়, কত কাঁচা মাল বিদেশে চলে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে কত বিদেশী মাল রোজ আসছে, কিছু কিছু সামাজিক অব্যবস্থার কথা—এইভাবে স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্নকে জড়িয়ে ছবি দেখানো হত। সন্ধ্যের পর অনুষ্ঠান শুরু হত। কোনও কোনও দিন পাঁচ-ছ'টি সভাও করতে হয়েছে, মানে রাত দুটো তিনটে অবধি। রোজ আট-দশ মাইল যাওয়া এবং ভোরের দিকে ফিরে আসা—এ তো লেগেই ছিল। সাধারণত আমিই বক্তৃতা দিতুম। আর সভায় লোকও হত প্রচুর, সে যত রাতই হোক। মহকুমায় ইস্কুল প্রায় ছিল না বললেই হয়, তিন-চারটি টিমটিম করে জ্বলত। ছেলেদেরও উৎসাহ খুব। বিভিন্ন জায়গায় শিবির হয়েছিল।

খবরের কাগজ ছিল না বললেই চলে। তবু সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, গান্ধীজী কি বলেন। কবে আরম্ভ করবেন। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, 'আমি আশ্রমের ৭৯ জন আশ্রমিককে নিয়ে লবণ আইন অমান্য করব' এবং ২রা মার্চ বড়লাটকে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল, 'And why do I regard British rule as a curse?

It has impoverished the dumb millions by a system of progressive exploitation and by a ruinously expensive military and civil administration which the country can never afford.

It has reduced us poltically to serfdom. It has snapped the foundations of our culture. And by the policy of disarmament, it

has degraded us spiritually. Lacking the inward strength, we have been reduced, by all but universal disarmament, to a state bordering on cowardly helplessness.

ঐ সময় আশ্রমে Reginald Reynolds নামে এক ইংরাজ বাস করতেন। তিনি ঐ চিঠিখানি নিয়ে বড়লাটের কাছে গিয়েছিলেন।

১২ই মার্চ গান্ধীজী এবং ৭৯ জন আশ্রমিকের লবণ আইন অমান্য করার যাত্রা শুরু হল। যাত্রা শুরু করবার আগে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি যখন যাত্রা শুরু করব, সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠবে।' আর সত্যিই তাই ঘটল। গুর্জরের বেলাভূমিতে ঐ শীর্ণকায়, খর্বাকৃতি, দণ্ডধারী মানুষটির এক-একটি পদক্ষেপে আসমুদ্র-হিমাচল চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রতিটি পদক্ষেপে ভারতবর্ষের নগরে-জনপদে, গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর সৃষ্টি। গান্ধীজী হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, উনি আইন ভঙ্গ করার আগে কেউ যেন না আইন ভঙ্গ করে। অধীর আগ্রহে স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, সব বয়সের এবং সকল শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষায় রইল কখন তারাও সুযোগ পাবে। সারা পৃথিবীর সংবাদদাতারা ছুটে এল। সরকারও চুপ করে বসে ছিল না। সমগ্র গুজরাট এক সামরিক ছাউনিতে পরিণত হল। আর যে পথ দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন তার বর্ণনা করা অসম্ভব। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে লোক এসে হাজির হল পথিপার্শ্বে—দেখবার জন্য নয়, সঙ্গী হতে। যখন গান্ধীজী লবণ আইন অমান্যের কথা ঘোষণা করেন, তখন অবিশ্বাসী মাথা নেড়েছিল, কারো কারো মুখে বা চাপা টিটকিরি। কলকাতার এক ইংরাজ সম্পাদকের কাগজে গান্ধীজীর খবর বেরোত, শিরোনামা—'Crank's corner'। তারপর যখন যাত্রা শুরু হল তখন আর ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে পার্থক্য রইল না। ধর্ম, জাত, প্রদেশ—সব বেড়া ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রায় তিন শ' 'খুদাই খিদমদগার' (সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খান-এর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী) বুকে গুলি খেয়ে প্রাণ দিল—কারও পিঠে গুলি লাগেনি। ২১শে মার্চ আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হল। অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হল ঃ

'This meeting of AICC approves of and endorses the resolution of the working committee passed on February 16th, authorising Mahatma Gandhi to initiate and control civil disobedience and congratulates him and his companions and the country on the march begun by him on the 12th instant in pursuit of his plan for civil disobedience.

গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন ৫ই এপ্রিল রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে (অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল); তার আগেই সর্দার গ্রেফতার হয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালও গ্রেফতার হলেন। জওহরলাল গ্রেফতার হবার আগে পণ্ডিত মতিলাল পৈতৃক বাড়ি 'আনন্দভবন' নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দান করেন, যা ১৯৪৭ অবধি কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় ছিল। এক দিকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্যাগ্রহীতে দেশ ছেয়ে গেল, অন্য দিকে গোটা দেশই এক জেলখানায় পরিণত হল। সে কি উন্মাদনা! যেখানে কাছে সমুদ্র নেই, তাঁরা অন্য উপায়ে আইন অমান্য করতে লাগলেন। যতীন্দ্রমোহন হেদুয়ায় বেআইনী পুস্তিকা বিক্রি করে গ্রেফতার হলেন। গ্রেফতারের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, সরকারী নির্যাতনও তত বাড়তে লাগল। কি অমানুষিক

সে নির্যাতন! কাঁথিতে সত্যাগ্রহীদের মলদ্বারে বেটন পুরে দেওয়া হত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রথম দিকে আন্দোলনের সুরটা ঠিক ধরতে পারেনি এবং গ্রহণ করেনি। সেইজন্য বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হল। প্রথমে সভাপতি যতীন্দ্রমোহন, দ্বিতীয় সভাপতি ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তৃতীয় শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভার নিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উৎসাহ কম থাকার জন্য সত্যাগ্রহী সংগ্রহে বা আইন অমান্য আন্দোলনে কোনও বাধা হয়নি। বহু জেলা কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। অগ্রণী ভূমিকা ছিল মেদিনীপুর জেলার। তার সঙ্গে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদা। সাধারণ জেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না। বহু বড় বড় 'অ্যাডিশনাল জেল' খোলা হল।

বম্বে শহর তো উজাড় হয়ে গেল প্রায়। তার সঙ্গে মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা। আর বিহার, ইউ পি থেকেই লক্ষের উপর সত্যাগ্রহী বেরিয়ে পড়ল। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—গ্রাম-গঞ্জের স্ত্রী-পুরুষ আসছে। যাদের তথাকথিত কোনও শিক্ষাই নেই, অথচ সুনিয়ন্ত্রিত। হিংসার প্রকাশ দু-এক জায়গায় একটু হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো নগণ্য। জুন মাসে গ্রেফতার হলেন পণ্ডিত মতিলাল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য। ওখানে গান্ধীজীর পর গ্রেফতার হন আব্বাস তায়েবজী, তারপর সরোজিনী নাইডু। ঝড় বইতে লাগল। ঠিক ঝড় নয়, একে প্রভঞ্জন বলা যায়। এ এক অদ্ভুত লড়াই। এক দিকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরাজ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী, অন্য দিকে শীর্ণকায় খর্বাকৃতি, দণ্ডধারী মহাত্মাজীর অধিনায়কত্বে নিরস্ত্র জনতা। সংকল্পে অটল, নিষ্ঠায় অবিচল, শক্তিতে অতুলনীয়। আগে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলনের পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন এই প্রথম। ১৯২১-২২-এও এই আন্দোলন হবার কথা ছিল। কিন্তু চৌরীচৌরার ঘটনার পরে গান্ধীজী বন্ধ করে দেন। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে সৈন্য নেমে পড়ল। অধিকাংশ দেশী, সঙ্গে কয়েকজন গোরা—তাদের সঙ্গে কামান। মেদিনীপুরে প্রথম টহলদারি, তারপর হুগলীতে।
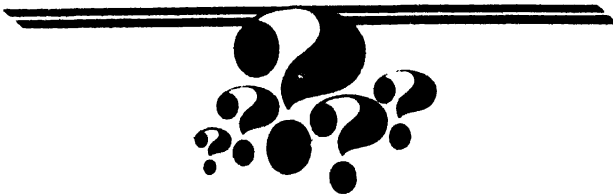
হুগলী জেলায় ঠিক হল যে, আমাদের কিছু সত্যাগ্রহী যাবেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য করার জন্য। আর গ্রামবাসীরা চৌকীদারি ট্যাক্স বর্জন করবে এবং অন্যান্যভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে। প্রথম দলে দশজন সত্যাগ্রহী থাকবেন, যাঁরা হেঁটে হাওড়া অবধি যাবেন এবং তারপর ট্রেনে গন্তব্যস্থান। এই দশজনকে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর পড়ল। আমরা অতি ভোরে বড়ডোঙ্গল থেকে হেঁটে বেরোলুম। রাস্তায় রাস্তায় গেট, মালা, চন্দন, আবার অনেকে টাকা পয়সাও দিলেন, কোথাও কোথাও বা থেমে

সভা করতে হল। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সত্যাগ্রহী এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইল। আমরা অবশ্য তাদের বড়ডোঙ্গলে গিয়ে নাম লেখাতে পরামর্শ দিলাম। মাঝে একটি গ্রামে রাত কাটিয়ে তার পরদিন রাত কাটানো হল তারকেশ্বরে। চাঁপাডাঙ্গা থেকে তারকেশ্বর চার মাইল। কি ভিড় আর কি সাদর অভ্যর্থনা! লোকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'ওরে নুন মারতে যাচ্ছে।' আবার কেউ বলছে, 'লড়ায়ে যাচ্ছে। গান্ধী ডেকে পাঠিয়েছে।' কারোর মুখে কোনও অশোভন বা অসঙ্গত টিপ্পনী নেই। যে সক্ষম, সে তো সহযোগিতা করছেই; যারা অক্ষম, তারাও নানাভাবে সাহায্য করছে। এত মালাচন্দন পেয়ে মনটা একটু বেশ খুশীই হয়েছিল। তা ছাড়া হুগলী জেলার প্রথম সত্যাগ্রহী দল। আর আমাদের জেলায় নামজাদা নেতার অভাব নেই. তাদের সকলের সঙ্গেই আমার বয়সের অনেক তফাৎ। তারকেশ্বর থেকে হরিপালে গিয়ে রাত কাটানো—সব ব্যবস্থা কল্যাণ কেন্দ্রের। আশুদার (ডাঃ আশুতোষ দাস) কল্যাণ কেন্দ্র। আর পরিচালক বিজয়দা (বিজয়কুমার ভট্টাচার্য)। সারা দিন জনসভা, আলোচনা, সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় প্রফুল্লদা (প্রফুল্লচন্দ্র সেন) এসে হাজির হলেন। এই ত্রি-মূর্তির আশুদা ছিলেন আমার অভিভাবক। আমার যা কিছু প্রয়োজন, অলক্ষ্যে থেকে উনি তার ব্যবস্থা করতেন। বিজয়দা ছিলেন—ঠিক বলতে পারব না কি ছিলেন। উনি হেডমাস্টারি ছেড়ে অসহযোগ করেন। এখন বর্ধমানের নবকলাগ্রামে ওঁর বুনিয়াদী বিদ্যালয় পঃ বঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বিজয়দা প্রতি সপ্তাহে শ্রীরামপুরে এসে আমরা যে কংগ্রেস অফিসে থাকতুম, সেটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতেন। ক'দিনের পড়ে থাকা বাসনও বাদ যেত না। আর কম্বল ও মাদুরের বিছানা, তাও ঝাড়া-মোছার হাত থেকে অব্যাহতি পেত না। অন্তত চার বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে এ কাজ করেছেন। আর প্রফুল্লদা আমার অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন যেসব অপকর্ম করতাম, তার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। এই তিনজনকে একসঙ্গে দেখে আমি ভাবলুম, আমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছেন। আমরা সোৎসাহে বর্ণনা দিলুম—পথে কত টাকা পাওয়া গেছে, কত সংবর্ধনা, কতজন সত্যাগ্রহী হয়েছে। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। প্রফুল্লদা বললেন, 'তোমার এখন কাঁথি যাওয়া হবে না। বাকী সকলকে নিয়ে গৌরবাবু যাবেন।' গৌরবাবু মানে গৌর-হরি সোম। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। বড় সরকারী চাকরি ছেড়ে অসহযোগী হয়েছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। একটু জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'তবে আমি কি হরিপালেই আইন অমান্য করে জেলে যাব?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'না। তুমি এখান থেকে বড়ডোঙ্গলে ফিরে যাবে।' আমার অবস্থা শোচনীয়। চোখ প্রায় জলে ভরে এসেছে। যে রাস্তা দিয়ে মালা পরে, চন্দন নিয়ে, সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে হেঁটে এসেছি, লোকে বলেছে নুন মারতে যাচ্ছে, গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য করতে যাচ্ছে—সেই পথ দিয়ে ফেরত যেতে হবে! নিজেকেই বোঝাতে পারছি না, লোককে কি বলব? আমি একটু ক্ষোভ-ভরা কণ্ঠে বললুম, 'আমি তা হলে শ্রীরামপুরে আমার কর্মকেন্দ্রে ফেরত যাই। সেখান থেকে আইন অমান্য করব।' তখন মনে একটু সন্দেহ হল যে, আমি কি কিছু গর্হিত কাজ করেছি? মাথা নীচু করে বসে রইলুম। মুখে কথা নেই। মনের মধ্যে লজ্জা, যন্ত্রণা, আর একটা ব্যর্থতার ভাব।

প্রফুল্লদা আমার হাতে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠি খুলে পড়বার ক্ষমতাও

নেই। তখন দুটো চোখই আছে যদিও, কিন্তু বরাবরই তো খুব খারাপ। আবার ভাবাবেগে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছে। বিজয়দা চিঠিটা পড়লেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব—আমাকে হুগলী জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সব ভার দেওয়া হয়েছে। এটাও বুঝতে কষ্ট হল। আমি সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ, স্বল্পশিক্ষিত, তা ছাড়া অভিজ্ঞতাও কম। যাঁরা ভার দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ এবং আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। একটু ভয়ও হল যে, এই বিশ্বাসের উপযুক্ত মর্যাদা যদি না দিতে পারি। ফিরে গেলুম। বিজয়কে (মোদক—বর্তমানে লোকসভার সদস্য) সঙ্গে নিয়ে গেলুম।

অনেক শিবির খোলা হল। আরামবাগের বাইরে শ্রীরামপুর শহরে ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া। কতগুলো পাড়ার প্রতি ঘর থেকে জেলে গেল। এমন বাড়িও ছিল, যেখান থেকে চার-পাঁচজনও আইন অমান্য করেছে। সদর মহকুমাতেও উৎসাহ কম ছিল না। তবে শ্রীরামপুর মহকুমা আর সদর মহকুমায় মোটামুটিভাবে স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনই হয়েছিল। বড়ডোঙ্গলের হরিনারায়ণ, বলাই, কেষ্ট এবং তাদের মা বারবার জেলে গেছে। বাড়ি তল্লাশির নামে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোনও আন্দোলনেই তারা পেছিয়ে থাকেনি। হরিনারায়ণ জেল থেকে বেরিয়ে আর এক জেল-ফেরতের কলেরায় সেবা করতে গিয়ে প্রাণ দিল। হাজরা মশাইরা তিন ভাই। তিন ভাই-ই জেলে। জয়া, বিজয়, তীর্থ, পেয়ারী—চার মামাতো-পিসতুতো ভাই। এক পরিবারভুক্ত। চারজনই জেলে। আর কত নাম করব। গোষ্ঠ বেরা, সামান্য নিঃস্ব কৃষক। সে যে-কোনও স্বাধীন দেশে জন্মালে নিঃসন্দেহে বড় সেনাপতি হত। ১৯৩২-এ একটা গ্রামে পুলিস অত্যাচার করেছিল। খানাকুল থানার খাড়োল নামে গ্রাম। গ্রামের সব লোক এস-ডি-ও-কে চিঠি দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 'আমাদের গ্রামে পুলিস অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছে। আমরা গ্রামের সমস্ত অধিবাসী জিনিসপত্র রেখে, দরজা খুলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' গ্রামের এক অদ্ভুত অবস্থা। কয়েকটা কুকুর উচ্ছিষ্ট খেতে না পেয়ে ঘেউ-ঘেউ করে কাঁদছে। সব দরজা হাট করে খোলা। যত দূর মনে হচ্ছে, গ্রামবাসীদের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতেও কোনও জিনিস খোয়া যায়নি। পরস্পরের প্রতি একটা দায়িত্ব-বোধের জ্ঞান খুব দেখা গিয়েছিল। একক মানুষ যারা জেলে গিয়েছিল, গ্রামের যারা জেলের বাইরে ছিল, তারা সেই লোকটির চাষ তুলে দিত। নকুণ্ডা গ্রামের জাগরণও অদ্ভুত। বিশ্বনাথ, সুধীর, অতুল, গগন, যতীন—সকলেরই চাষ উপ-জীবিকা। সকলেই তো জেলে গেল। অতুল আবার মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমি চুনট গ্রামের চন্দ্রবাড়িতে দশ মাস ছিলুম। চন্দ্র ছিল যারা সমাজে জল আচরণীয় নয়, সেই গোষ্ঠীর। একখানি ঘরে তারা স্বামী, স্ত্রী, আমি ও ছাগল, আর বাইরে ঢেঁকি ও রান্নার জায়গা। ভাণ্ডারহাটির রায়দের বাড়িতেও অনেক দিন ছিলুম। আর কতরকমের গান। বালির সুধীর—তারা তিন ভাইই জেলে গিয়েছিল। সে যখন গান ধরত 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', চারদিকের লোক সব কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে শুনত। পারশামপুরের নারাণ চক্রবর্তী। কি গলা!—

> 'চাষী ধর কষে লাঙ্গল,
> আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদলশ্যাম,
> মোদের মাঝেই লুকিয়ে আছে
> রাবণ-অরি রাম।

আবার—'জগন্নাথের জাত যদি নাই,
তবে কেন জাতের বড়াই।'

গ্রামে গ্রামে সভা, বৈঠক, যেখানেই পাঁচজন লোক—সেখানেই এইসব গান। আমরা চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধের সঙ্গে জমিদারি খাজনা বন্ধ, সেটেলমেন্ট বয়কট করেছিলুম। জীবিকার একমাত্র সম্বল জমি চলে যাচ্ছে—তবু কারো দৃকপাত নেই। চুনট গ্রামের একজন গ্রামবাসীর বাড়ি থেকে পুলিস একজন সত্যাগ্রহীকে ধরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা এস-ডি-ও-কে চিঠি লিখে জানাল, 'আমাদের বাড়িতে বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাস করে। আমাদেরও গ্রেফতার করা হোক।'

একদিন ভোরবেলা দেখি বড়ডোঙ্গলে যে কার্যালয়ে আমরা ছিলুম, সশস্ত্র পুলিস তা ঘেরাও করে ফেলেছে। সঙ্গে আবার দুজন গোরা সার্জেন্ট। গ্রেফতার হলুম। আমরা বোধ হয় সেদিন এক দলে সাতজন ছিলুম। বিজয়ও ছিল। অপরাধ তখনও জানি না। বড়ডোঙ্গল থেকে আরামবাগ হয়ে চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত একুশ মাইল হাঁটতে হাঁটতে সিপাইদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। ওয়ারেন্ট নিয়ে দেখা গেল, আমরা ৩০২ ধারা অর্থাৎ খুন, ঘর জ্বালানো, ঘর লুঠ করা প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্কার্য করেছি এবং করেছি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানায়। আসার পথে বহু গ্রামবাসী শাঁখ বাজাল এবং পুলিশের অনুমতি পাওয়ার পর খাওয়াও মিলল। আরামবাগ শহরে কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য ছিল না। সব শহরেরই প্রায় এক রূপ। শহরের যারা যোগদান করত, তাদের কথা বাদ দিলে অধিকাংশই বিশেষ করে উকিলবাবুরা উদাসীন এবং অনেকে বিরুদ্ধেও থাকতেন। আরামবাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বিনোদবিহারী রায়—তাঁর বাড়ি ও সাহায্য সব সময় আমাদের জন্য খোলা থাকত। আর ছিলেন ডাঃ জীবনহরি সামন্ত। যদিও সরকারী ডাক্তার, তবুও গ্রাহ্য করতেন না। ডাঃ প্রভাকর মুখুজ্জে আর তীর্থপদ রায়—এঁরাও ছিলেন। বিনোদবাবুর ছেলেরা, বলাই ও গোপাল সে ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা এখনও সব কাজের সঙ্গে যুক্ত। তারপরই হুগলী জেল ও সেখান থেকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল।

মেদিনীপুর জেলের খুব হাঁকডাক ছিল। তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের সব দাগী আসামীদের জায়গা। আমাদের তো যথোচিত সম্ভাষণ করে জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। প্রথমেই বিপত্তি হল জেলারকে নিয়ে। তিনি সকলকেই 'তুমি' বলছিলেন। যখন অনুকূলদাকেও 'তুমি' বললেন তখন ঠিক করলুম যে, একটু মজা করতে হবে। অনুকূলদা অর্থাৎ অনুকূল চক্রবর্তী। বড়ডোঙ্গলে খুব বড় ওষুধের দোকান। প্রফুল্লদার সুখ-সুবিধা সবই দেখতেন। আর সব সময় সব কাজে লেগে পড়তেন। আমার সঙ্গে যতবার জেলে ছিলেন, সীমাবদ্ধ জায়গায় যতটা

স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়, চেষ্টা করেছেন। বার-বার জেলে যাওয়ায় এবং ডিসপেন্সারীতে নজর না দেওয়ায় সেটা উঠে যায়, জমি-জায়গাও যায়, কিন্তু ও'র মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ ছিল। বড়ডোঙগলে আমাদের শিবিরে তখন আশি জন। শিবিরে আমাদের নিয়ম ছিল গ্রামের লোকেরা যা শাক-সবজি দিত, তাই রান্না হত। কিছু কেনা হত না। একদিন কোন সবজি নেই, অনুকূলদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হবে। উনি একটু হাসলেন। খাবার সময় দেখি ছেলেরা খুব ফুর্তি করে সজনে ডাঁটা দিয়ে খাচ্ছে, কারোর কোন অভিযোগ নেই। খোঁজখবর নিয়ে টের পেলুম, অনুকূলদা রটিয়ে দিয়েছেন যে, সজনে ডাঁটা খেলে বসন্ত হয় না। ব্যস্, আর যায় কোথায়! চা খাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে, অথচ কাপ নেই। মাটির ভাঁড় কেনাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। আড়াল থেকে শুনলুম অনুকূলদা বোঝাচ্ছেন যে, আজকাল আর কেউ কাপে চা খায় না। সব তো স্বদেশী হয়েছে, সকলেই নারকোলের মালায় চা খায়। ব্যস এই ছিল অনুকূলদার প্রকৃতি। সহজে সমস্যার সমাধান। আমাকে যখন জেলার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?' আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম, 'লিখে নাও অমুক।' জেলার রেগে আগুন। 'তুমি' বলায় ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। জেলার বললেন, 'আমি তো তোমার চেয়ে বয়সেও বড়।' উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে অনুকূলদা তো আপনার চেয়ে বয়সে বড়। আর তা ছাড়া জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের বয়স তো আপনার চেয়ে কম। তাকেও তো আপনি বলেন।' অবশ্য তুমি বলার জন্য ফল ভোগ করতে হল। আমাদের নিয়ে গিয়ে পুরে দিল ঐ ৯৪ ডিগ্রী, না ৯৬ ডিগ্রী সেলে।

আর আমাকে তুলল, চারটে কন্ডেমড্ প্রিজনার-এর যে সেল, অর্থাৎ ফাঁসির আসামীর যে সেল, সেই সেলে! মেদিনীপুরের এই ৯৪ বা ৯৬ ডিগ্রী সেল খুব মাথা খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এখানে যারা ঢুকত, তারা আকাশ, সূর্য, চন্দ্র বা পৃথিবীর মাটি কিছুই দেখতে পেত না। সাধারণত সেলের হয় একটা ছ' ফুট×সাড়ে তিন ফুট দরজা, আর মাথার দিকে একটা আড়াই ফুট×এক ফুট গবাক্ষ। দরজার সামনেটা খোলা। আর দরজাটায় কতগুলো লোহার গরাদ। তার মানে সামনে এক ফালি মাটিও দেখা যায়, আকাশও দেখা যায়। মেদিনীপুরের এই সেল-গুলো দোতলা। তার মানে মুখোমুখি দুটো সেল। ওপরটা ঢাকা, আর সামনে চাইলে আর একজন কয়েদী। সেলের মধ্যে বিছানা হল দু'খানা কম্বল, আর ঘরের কোণে দুটো টুকরি—আলকাতরা মাখানো। একটা মলত্যাগ, আর একটা প্রস্রাবের জন্য। আমার পাশের সেলে তখনকার পীর পাগারো ছিলেন। তাঁকে বেলুচিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আনা হয়েছিল ফাঁসি দেবার জন্য। পীর পাগারো সারা রাত চেঁচাতেন। আমার খুব ভয় করত। সারা রাত ঘুমুতে পারতুম না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসতে তাঁকে অভিযোগ করলুম, 'আমরা তো বিচারাধীন কয়েদী। আমরা যে খুন করেছি, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আমরা এখানে থাকব কেন ? সাধারণত এইসব সেলে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীরাই থাকত। জেলার আমার উপর রাগ করে অহেতুক এখানে রেখেছেন।' বলে তাঁকে জেলের দরজার গল্পটা শুনিয়ে দিলুম। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বোধ হয় ছিলেন পাঞ্জাবী। নাম মনে হচ্ছে অনন্ত সিং। জেলখানার সুপারিন্টেন্ডেন্টের যতটা ভদ্র হওয়া যায়, তিনি তার চেয়ে বেশী ভদ্র ছিলেন। ক'দিনের মধ্যেই আমরা বিচারাধীন ওয়ার্ডে বদলি হলুম।

ওয়ার্ডে থাকবার কথা প'চাত্তর জনের। আমরা ছিলুম এক শো প'য়তাল্লিশ জন। তবে আশপাশটা বেশ খোলামেলা। ওয়ার্ডের চারদিকে রেলিং ঘেরা, তার

মধ্যে অনেকটা প্রশস্ত জায়গা ছিল। আমরা অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলুম। এই শ্রেণীবিভাগটা করেন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট। অদ্ভুত। শ্রেণীবিভাগের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, চাকুরেদের মাইনে—এইসব বিচারের ভিত্তিতে। আমরা তো তৃতীয় শ্রেণীর ছিলুমই, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি প্রথম ভারতীয় Assay Master, তখনকার দিনেই হাজার-বারো শ' টাকা মাইনে পেতেন, তিনিও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। বিচারাধীন কয়েদীরূপে কয়েক মাস থাকবার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। অন্য ওয়ার্ডের একজন রাজনৈতিক বন্দীকে ডাণ্ডা-বেড়ি পরাবার সাজা হল। ডাণ্ডা-বেড়িটা বেশ রোম্যান্টিক জিনিস। পায়ে মলের মত দুটো বালা, সেখান থেকে দুটো দণ্ড উঠে গেছে, উঠে গিয়ে হাঁটুর উপরে আবার দুটো বালা। মাঝখানে একটা শিকল দিয়ে উপরের দুটো বালা, আর পায়ের দুটো বালা একসঙ্গে গাঁথা। অর্থাৎ কোনরকমে পা নাড়ানো যাতে না যায়। হয় সোজা দাঁড়িয়ে থাক, নয় সোজা শুয়ে থাক। শোয়াতেও অস্বস্তি কম নয়। মেদিনীপুর জেলে তখন প্রায় দু' হাজারের মত রাজনৈতিক বন্দী। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সব খবর পৌঁছে গেল যে, প্রতিবাদে আমরা সবাই লক্-আপ হব না। জেলখানার নিয়ম ভোর পাঁচটায় গুনে-গুনে সবাইকে বার করা এবং বিকেল পাঁচটায় সবাইকে গুনে-গুনে ঘরে বন্ধ করা। এই দরজা বন্ধকে লক্-আপ বলে। আমাদের ওয়ার্ড জেলখানার অফিস থেকে বেরিয়ে সামনে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ওপর খানিকটা নেতৃত্বের ভার এসে পড়েছিল। সন্ধ্যের পর সহকারী জেলার, ডেপুটি জেলার এসে অনেক বোঝালেন। আমরা অচল, অটল। তারপর আটটার সময় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এলেন, দু' ঘন্টা ধরে বোঝালেন এবং শেষে বলে গেলেন যে, তাঁর আর কিছু করবার নেই। এবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে যা করবার করবেন। সাড়ে দশটার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেব ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিড সাহেব এলেন। সঙ্গে অনেক পুলিস, জেলের ওয়ার্ডার এবং কিছু সাধারণ কয়েদী। পেডি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে ঢুকবে?' আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম, 'না।' তারপর আরম্ভ হল খেল। লাথি, লাঠি এবং হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া ওয়ার্ডের মধ্যে। পেডি সাহেবের পা যেমন মোটা, বুট তেমনি ভারী, আর মজবুত। লাঠির চেয়ে সেই বুটের লাথি বেশী আহত করছিল। কারুর কারুর হাত-পা ভাঙ্গল। তাই দেখে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিড সাহেব ভাবলেন, আমিই বা কম যাই কেন? আমি চোখে বেটন পুরে দেব। চোখে বেটন পুরলে বেশ লাগে কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে রক্ত গড়িয়ে ঠোঁটে পড়লে নোনতা লাগে, আর স্বাভাবিকভাবেই অপর চোখটা বুজে যায়। ফলে কিছুই দেখা যায় না। আমাদের সঙ্গে ঐ ওয়ার্ডে যোগজীবন পাল বলে একটি ছেলে ছিল। তার বাড়ি মেদিনীপুর, কাজ করত আরামবাগে। তার পিঠটা ছেঁচা বাঁশের মত হয়ে গেছিল, তবু সে নড়েনি। আমি অবশ্য তিন-চার দিন বাদে তার পিঠ দেখতে পেলুম। সেই তিন-চার দিন প্রায় অন্ধ হয়ে ছিলুম। আমাদের ঘরে পুরে দিতে আধ ঘন্টা লেগেছিল। তারপর অন্যান্য ওয়ার্ডে গিয়ে বীরদর্পে পেডি কয়েদীদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে জেলখানা ত্যাগ করল। উপোস আরম্ভ হল। চার দিন উপবাসের পর কৃষ্ণ দাসের (তিনি সাত মাস মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী ছিলেন) কথায় অনশন প্রত্যাহৃত হল। কৃষ্ণ দাস তখন ঐ জেলেই ছিলেন। এ ক'দিন কোনও চিকিৎসাও হয়নি। বাংলা ছড়ায় আছে, 'কানা, খোঁড়া দু'গুণ বাড়া' আমি তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়তে

পেরেছিলুম; কারণ, একসঙ্গে কানা খোঁড়া আর নুলো হয়ে গিয়েছিলুম। এই যোগজীবন এখন কর্পোরেশনে এক সামান্য চাকরি করে। কিন্তু ওর মনোবল আর সাহস অসামান্য। মেদিনীপুরে ওর নিজের বাড়িতে গেল না বলে সম্পত্তি হারাল, আর জেলে গিয়ে স্বাস্থ্য হারাল। তবু এখনও মুখে হাসি লেগে আছে। ত্যাগ ও নির্যাতনের কথা বর্তমানে শুনে থাকি। এই ত্যাগ আর নির্যাতন ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারিনি। আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে নিজের স্বাধীনতা। তার জন্যে আবার ত্যাগের বড়াই করা কেন? ত্যাগীদের 'তাম্রপত্র' এবং 'পেন্সন'-এর ব্যবস্থা হয়েছে। ভাল। যাঁরা অভাবগ্রস্ত, তাঁদের পেন্সন পেয়ে নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে পেন্সন ও তাম্রপত্র দেওয়া হচ্ছে তাতে অমর্যাদাই বাড়ছে, তার পেছনে কোনও মর্যাদা নেই। দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষকে দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে জেলে থাকার রেকর্ড সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এই রেকর্ড সংগ্রহটা অত্যন্ত কলঙ্কময় ঘটনা। জেলখানার রেকর্ড সংগ্রহ করতে কত যে ঘুষ দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা সরকারে আছেন, তাঁরা অনায়াসে জেলখানার রেকর্ড দেখে যোগ্য ব্যক্তিকে মর্যাদা সহকারে পেন্সন দানের ব্যবস্থা করতে পারতেন। আমার তাম্রপত্র বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকবার চার-খানা চিঠি পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। চিঠিগুলি যেন আদালতের সমন। আর যাঁরা তাম্রপত্র নিতে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনার সীমা থাকেনি। আমার এখনও গ্রহণ করবার সুযোগ ঘটেনি। যাঁদের ঘটেছে, তাঁদের মুখে শুনেছি, কঠোর-তম ভাষায় নিন্দা করলেও সঠিক নিন্দা করা হবে না। তাম্রপত্র যাঁরা দিতে এলেন, তাঁরা সভায় এসেই মঞ্চে বসে একটু মৃদু হাসলেন। তাঁদের গলায় মালা-চন্দন পরানো হল; যেন তাঁরাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা। তারপর একে একে নাম ডাকা হয়, যেমন আদালতে চিৎকার করে ডাকা হয়, 'রামখেলাওন সিং, হাজির হো।'—ঠিক সেইভাবে। দুঃখ তা নয় যে, মর্যাদা দানের নামে হসনীয় ব্যাপার ঘটছে; দুঃখ এই যে, এই ব্যাপারের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রদ্ধেয় শ্যামানন্দ সেন প্রমুখ জড়িয়ে আছেন।
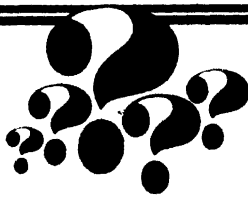
কয়েকদিন বাদে জেলের অফিস থেকে খবর এল যে, আমাদের বিরুদ্ধে পুলিস তখনও খুন ডাকাতি গৃহদাহ লুট—এ সম্বন্ধে কোনও প্রাথমিক রিপোর্ট দেয়নি। অর্থাৎ চার্জশিট। বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। প্রশ্ন থেকে যায় যে, কেনই বা ধরা হল, কেনই বা মুক্তি পেলুম। যাই হোক, ওয়ার্ডের সকলের কাছে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে অনেকের অনেক ফরমাশ নিয়ে বিকালে জেল-গেটে এলুম। আমাদের সঙ্গে যা দু-একটা জিনিসপত্র ছিল জেলের অফিস থেকে সব ফেরত দিল এবং জেলারের তখন অন্য মূর্তি। আমরা যেন তাঁর কত আপন-লোক। জেলার মুক্তির আদেশ পড়ে শোনালেন। তারপরেই আবার সেই জেলগেটেই

গ্রেপ্তার। এবারে অভিযোগ হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের। আমরা নাকি হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য করেছি। বিচার হবে আরামবাগ কোর্টে। ওয়ার্ড থেকে যখন বেরিয়ে আসি অনেকে তাঁদের বাড়িতে খবর দেবার কথা বলেছিলেন। সে কাজ আর হল না। আমরা হুগলী জেলে গিয়ে হাজির হলুম।

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলন যেমন তীব্র আকার নিয়েছে তেমনি সরকারও গ্রেপ্তার, ধরপাকড় বাড়িয়েছে এবং নানারকম অর্ডিনান্স জারি করেছে। বড়লাট সাহেব ২৭শে এপ্রিল তারিখে ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্ট আরও কঠোর করে এক অর্ডিনান্স জারি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর 'নবজীবন প্রেস'—যেখান থেকে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা বেরুত সেগুলো বন্ধ হল এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত হল। গান্ধীজী সাইক্লোস্টাইল করা 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় লিখলেন— 'Revival in the form of an Ordinance, of the Press Act that was supposed to be dead was only to be expected, and in its new form, the Act contains additional provisions making the whole piece deadlier than before.

'Whether we realise it or not, for some days past, we have been living under a veiled form of Martial Law. After all, what is Martial Law, if it is not the will of the Commanding officer? For the time being, Viceroy is that officer and wherever he considers it desirable, he supersedes the whole of the Law, both common and statute, and imposes Ordinances on a people too submissive to resent or resist them. I hope, however, the time for tame submission to dictation from the British rulers is gone for ever.

'I hope that the people will not be frightened by this Ordinance, Pressmen, if they are worthy representatives of public opinion, will not be frightened by the Ordinance, let us realise the wise dictum of Thoreau that it is difficult, under tyrannical rule, for honest men to be wealthy, and if we have decided to hand over our bodies without murmur to the authorities, let us also be equally ready to hand over our property to them and not sell our souls.

'I would therefore urge Pressmen and Publishers to refuse to furnish security, and if they are called upon to do so, either to cease publication or challenge the authorities to confiscate whatever they like.'

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় পত্র-পত্রিকা বন্ধ হল। কলকাতায় একটি দৈনিক পত্রিকা জামানতের টাকা জমা না দিয়ে কাগজটি প্রকাশ বন্ধ করে দিল—'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ১৯৩০-এর ২রা মে থেকে ১৯৩০-এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ ছয় মাস 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩০-এর ২রা মে থেকে ১৯৩০-এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ ছয় মাস 'আনন্দবাজার'-এর তখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা নয়। তবুও 'আনন্দবাজার'-এর কর্তৃপক্ষ আনন্দবাজার-এর কর্মীদের এই ছয় মাসের পুরা বেতন দিয়ে দেন। সম্পাদক সত্যেন মজুমদার

জনুন মাসের প্রথমেই গ্রেপ্তার হন। আমরা যারা 'আনন্দবাজার'-এর প্রকাশকাল থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলুম, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আরও উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করেছি। 'আনন্দবাজার'-এর প্রফুল্ল সরকার মশাইকে চিনতুম। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল সুরেশদার (মজুমদার) সঙ্গে। সেই প্রথম যখন 'আনন্দবাজার' বেরোয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে, নীচের একটা ছোট্ট ঘরে—যার আয়তন আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যে লিফ্‌ট আছে তার চেয়েও ছোট। সেই ঘরে সুরেশদা বসে থাকতেন। পরনে একটা ওপেন-ব্রেস্ট কোট আর টেবিলের উপরে গোল-পাকানো চাদর এবং এক তাড়া বিড়ি। গেলেই খানিকক্ষণের মধ্যে পুঁটি-রাম—অর্থাৎ রাধাবল্লভী। এটা ওটা সেটা কত কথাই হত। কিছু কিছু কাজও করতে দিতেন। এমন মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমাদের সমাজে কত-রকমের দলাদলি। বার লাইব্রেরীতে দলাদলি। আমি নিজে দেখেছি লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক সাহিত্যিকের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আর এক সাহিত্যিকের প্রস্থান। ডাক্তারদের মধ্যেও খেয়োখেয়ি কম নয়। রাজনীতিতে একই দলভুক্ত হলেও কথা বন্ধ এমন ঘটনা অনেক আছে। সুরেশদার এইসব বালাই ছিল না। যে দলেরই হোক আর যে মতেরই হোক, তাঁর দরজা সবাইকার জন্য খোলা। একজন দেশ-কর্মীর মধ্যে এটা একটা অপ্রচলিত ঘটনা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মাস্টার মশাইয়ের কথা। রাজনৈতিক জগতে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। আমি কিন্তু সত্যই তাঁর কাছে পড়েছি। তারপর হুগলী বিদ্যামন্দিরে থাকতে অনেক বেশী করে জেনেছি। আত্মসমাহিত মানুষ। সব সময়েই যেন ভিতরে ভীষণ প্রদাহ। যারা কাছে যেত তারাও অভিভূত হয়ে পড়ত। এই মানুষকেও দলাদলির শিকার হতে হয়েছিল। হাওড়া টাউন হলে একটি কন-ফারেন্স হয়। সেখানে মাস্টারমশাইয়ের নামে নানাবিধ রটনা করে তাঁকে নিমন্ত্রণ অবধি করা হয়নি। যতীন্দ্রমোহন কয়েকদিন বাদেই ঐ হাওড়াতে কালীবাবুর বাজারের কাছেই মাস্টারমশাইকে নিয়ে বিরাট এক সম্মেলন করেন। এই কর্দমাক্ত রাজনীতির মধ্যে সুরেশদা ছিলেন মুক্তপুরুষ।

মাস্টারমশাইয়ের কথা উঠলেই আমার আর একজনের কথা মনে হয়। বোধ হয় ১৯২৬ সাল। হ্যারিসন রোড দিয়ে যেতে যেতে একটা সাইনবোর্ড দেখলুম—'Workers and Peasants Party'! একটু অবাক হলুম। ওয়ারকার্স'রা সঙ্ঘ-বদ্ধ। তাদের সংগঠন হচ্ছে। কিন্তু কৃষকদের কথা কে ভাবছে! বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে লিখেছিলেন সেই ভাব তো বিশেষ কারো লেখায় নেই। আরও অনেকে লিখেছেন বটে কিন্তু সেগুলো তো সব কাব্য। বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র কম। যাই হোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলুম। ঘরে একজন বসে আছেন। মুজফ্‌ফর আহমেদ মশাই। আমি জানতুমও না, চিনতুমও না। সামান্য কথাবার্তা হল। তারপর দু-একবার দেখাও হয়েছে। এঁর কথায় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। দেখে মনে হয় সাধক। নরম মানুষ কিন্তু তপশ্চর্যায় কঠোর ও কঠিন।

আরামবাগে বিচারের পর গিয়ে হাজির হলুম দমদম অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেলে। সেটা তিন-চার দিন আগে খোলা হয়েছে। আমরা সতেরো শোর কিছু উপরে। কোনও ব্যবস্থা নেই। সবটাই বিশৃঙ্খলা। এইখানেই আলাপ হল শ্রীদেবেন সেন, শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ চন্দ্র, শ্রীকিরণ সেন প্রভৃতি অভয় আশ্রমের কর্মী-দের সঙ্গে। অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেশদার সংগঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই ছেলেদের নিয়ে

অভয় আশ্রম গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র কিছুদিন এই অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সুরেশদা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেটা তাঁর পরিচয় নয়। তাঁর পরিচয় শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে। আই এন টি ইউ সি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সরল ও নির্ভীক। এঁরা সব ছিলেন বিশেষভাবে গান্ধীভক্ত। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খাদি প্রতিষ্ঠানের পরে এই অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। অভয় আশ্রম সম্পর্কে একটা মজার কাহিনী আছে। ১৯২১-এ যেখানে যত আশ্রম হয়েছিল, সব জায়গায়ই নিরামিষ খাদ্য। অভয় আশ্রম সে পথ নিলেন না। সুরেশদা সোজা গান্ধীজীকে গিয়ে বললেন, বাংলা দেশে আমাদের মাছ খেতে দিতে হবে। অবশ্য গান্ধীজী এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এই অভয় আশ্রমেরই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

ফোনের আওয়াজ হলো। তখন রাত সাড়ে নটা।

'তোমাকে একবার দিল্লী যেতে হবে।'

এপার থেকে আমি বললুম, 'আজ্ঞে, আমি গেলে কাজ হবে না। আমি যাই বলি, একটু সন্দেহ করেন।'

'ওঁকে বলেছো?'

'আজ্ঞে আগে দার্জিলিঙ আর দিল্লী ঘুরে আসি, তারপরে বলবো। ও ভারটা আমার। তবে আপনাকেও বলতে হবে।'

খানিকক্ষণ বাদে, 'তা হলে চলো, দার্জিলিঙ ঘুরে আসা যাক।'

কথা হচ্ছিল ডাঃ রায়ের সঙ্গে।

আমরা দার্জিলিঙ গিয়ে পৌঁছলুম। সেখানে পশ্চিমবঙ্গেব রাজ্যপাল ডঃ কাটজু তখন রয়েছেন। তবে শিগগীরই চলে যাবেন। ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষিত হয়েছে।

দার্জিলিঙ শহর আমার বেশ ভাল লাগে। যেন পুরনো হয় না। আর শুকনা থেকে দার্জিলিঙ যাবার যে রাস্তা, অপূর্ব। শুধু রাস্তা তৈরি করবার মুনশী-য়ানা নয়, আশপাশ সবুজে, শ্যামলিমায় সমুজ্জ্বল। দক্ষিণে উটি ও কোদাই-কানাল এবং উত্তরে কাশ্মীর ভ্যালী ছেড়ে দিলে ঠিক এইরকম হরিতের শোভা আর কোথাও দেখা যায় না। আমি অবশ্য ভারতবর্ষের কথা বলছি। এ যেন মহাসমারোহ। সারা দিনরাত চেয়ে থাকলেও ক্লান্তি হয় না। বরং দৃষ্টির স্বচ্ছতা বাড়ে। পাগলাঝোরার যেমন অবিশ্রাম আর্তনাদ, আবার তাগদার পথে স্নেহধারার তেমন অস্ফুট গুঞ্জন। অবশ্য চা চাষের পর জায়গায় জায়গায় শ্যামলিমায় ক্ষুন্ন হয়ে গভীর ক্ষতের দাগ হয়েছে, কিন্তু তবু ভুবনমনোমোহিনী।

ডঃ কাটজু মধুরভাবেই আপ্যায়ন করলেন। অতি সদাশয় ভদ্রলোক। ওঁর

সম্পর্কে ও'র এক বিদেশী বন্ধু একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ডঃ কাটজু যখন এলাহাবাদে ওকালতি করতেন, ঐ বিদেশী বন্ধু সস্ত্রীক ও'র বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। সেই সময়কার বর্ণনায় বলছেন যে, বাড়িতে এলাহী কান্ড। আয়া, পাচক, বেয়ারা, খানসামা প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর। আর ডঃ কাটজু যখন মন্ত্রী হন তখন ঐ বিদেশী সস্ত্রীক এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন অন্য দৃশ্য। একটি লোক ছিল, সে আর ডঃ কাটজুর স্ত্রী দুজনে মিলে রান্না, কাপড় কাচা, বাজার-দোকান করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা—সবই করতে হতো। মাইনে তো মোটে পাঁচশো টাকা।

ডঃ কাটজুর সঙ্গে আমাদের দরকার ছিল। রাজ্যপাল হিসাবে পরামর্শ। আর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সমর্থন। আমাদের কথা শুনে উনি একটু বিস্মিত হলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি পাওয়া গেল। অবশ্য কথা ডাঃ রায়ই বলছিলেন। ডাঃ রায় যখন বললেন যে, অতুল্যকে দিল্লী যেতে বলেছি, ডঃ কাটজু একটু হাসলেন। অতি শ্রদ্ধা সহকারে ডাঃ রায়কে জানালেন যে, ডাঃ রায়ের নিজের আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমিও তাই চাইছিলুম। ডঃ কাটজুর কথা শুনে আমার বেশ ভালই লাগলো।

কয়েক দিন বাদে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দিল্লী গেলুম। ডাঃ রায়ের মুখে সব শুনে জওহরলাল আমার দিকে চাইলেন। আমি দেখলুম প্রসন্ন দৃষ্টি। যাক, ফাঁড়া কেটে গেল। আমরা একটা অচলিত প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলুম। ডাঃ রায়ের মনে কোনও উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলুম। বিশেষ করে যে মানুষটির কথা বলবার জন্যে আমরা দিল্লী গিয়েছিলুম তিনি এতই সহজ, সরল ও সাধারণ ছিলেন যে, দিল্লীর ঐ রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁকে অপছন্দ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমরা কলকাতা ফেরত এলুম। ডাঃ রায়ের নির্দেশে বস্তির মধ্যে একতলা একটা ছোট বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। যে মানুষটির কাছে গেলুম তিনি তখন আদুড় গায়ে লুঙ্গি পরে নৈশভোজ সারছিলেন। নৈশ-ভোজের উপকরণ অতি উপাদেয়, পাউরুটি আর গুড়। তার সঙ্গে অবশ্য কলের বিশুদ্ধ পানীয় ছিল। পাশে এক বিরাট অ্যালসেসিয়ান কুকুর। সেও ডালমাখা ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করছিল। সবটাই অদ্ভুত। আমি যখন বললুম যে, ডাঃ রায় আপনাকে তাঁর বাড়িতে একবার যাবার কথা বলেছেন, সেইজন্য আমি এসেছি—সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন সময় ডাক কেন?' আমি খানিকক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললুম, 'আজ্ঞে আমি জানি, কিন্তু বলতে তো পারবো না।' খুব হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুই তো সেইরকম করলি। অমুক বলেছিলেন, "জানি কিন্তু বলবো না"।' যাই হোক আমরা ডাঃ রায়ের কাছে এসে উপস্থিত হলুম। খানিকক্ষণ অপ্রাসঙ্গিক কথা হবার পর ডাঃ রায় বললেন, 'আপনাকে গভর্নর হতে হবে।'

ভূত দেখার মত মুখ করে উত্তর হলো, 'কোথাকার? কেন? আমি তো কাউকে কিছু বলতে যাইনি। আমি তো বেশ ভালই আছি।'

ডাঃ রায়ের সোজা উত্তর, 'আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের কাজের জন্যে আপনাকে দরকার।'

সশব্দে হেসে উত্তর হলো, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে তো ভারত সরকারের অনুমতি মিলবে না, আর পণ্ডিতজী আঁতকে উঠবেন।'

আমি তখন বললুম, 'দাদা, আমরা সব্বাইকার মত নিয়ে এসেছি, মায়

জওহরলালের।'

উনি ডাঃ রায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তো ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে বেশ ভাল আছি, অত বড় বাড়িতে এসে কি করবো? আর তা ছাড়া ও-বাড়িতে আমাকে মানাবেও না।' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ঐ অর্বাচীন আপনার স্নেহের সুযোগ নিয়ে আপনার মত করিয়েছে। এর আগেও একবার বিপদে ফেলেছিল। আমাকে অব্যাহতি দিন।'

তারপর ডাঃ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কথা আরম্ভ করলেন এবং পরিশেষে সম্মতি পাওয়া গেল।

আমি ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। এরকম লোক পৃথিবীতে এখনো জন্মায় এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। খ্রীষ্টান কথাটার সঙ্গে আমাদের মানসলোকে একটা ছবি ভেসে ওঠে, তিনি তৃণের ন্যায় ছোট, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, সদাবিনম্র এবং কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ। ডঃ হরেন্দ্রকুমারের মধ্য দিয়ে এই বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ডঃ কাটজু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে চলে যাচ্ছেন, রাজ্যপালের আসন খালি। ডাঃ রায় একান্তভাবেই ডঃ হরেন্দ্রকুমারকে চেয়েছিলেন। বাধা অনেক। প্রথম ছিল একটা অনুক্ত নিয়ম, যে প্রদেশের অধিবাসী সেই প্রদেশের রাজ্যপাল হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, ও'র অতি সাধারণত্ব অনেকের কাছেই ও'র অযোগ্যতার কারণ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, প্রয়োজন হলে মধুর ভাষায় অপ্রিয় কথা বলতে ও'র বাধতো না। তবুও উনি রাজ্যপাল হলেন। তার আগে ছিলেন ভারতীয় গণ-পরিষদে সহকারী সভাপতি। সভাপতি ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তারও আগে হরেনদা ছিলেন অধ্যাপক। আমি একবার সত্যি ও'কে বিপদে ফেলেছিলাম। কেন জানি না এই অধমের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অকৃপণ ও অযাচিত। ১৯৪৯-এর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে তদবির-কারক এলেন তিনজন। বোম্বাই-এর আবিদ আলী, রাজস্থান থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য গোকুলভাই ভাট, আর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসরানী। এ'দের সংযোজক ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীকলা ভেঙ্কটরাও। সেবার নির্বাচন হয়েছিল পুরাদস্তুর আইনমাফিক। বিভিন্ন দল থেকে নাম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় জেলায় বাইরে থেকে রিটার্নিং অফিসার গিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন। সে এক অসাধারণ নির্বাচন। সবটা তদবির করতেন ঐ তিনজন। একবার ঐ তিনজনকেই দিল্লী যেতে হলো। ও'দের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের কাজ বন্ধ থাকলে অযথা বিলম্ব হবে অথচ সর্বজনস্বীকৃত নাম পাওয়া যায় না। সেই দলাদলির মধ্যেও যেমনি হরেন্দ্রকুমারের নাম উপস্থাপিত হলো, সব্বাই মেনে নিলেন। ও'কে অবশ্য অনেকটা সময় দিতে হয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু অশালীন মন্তব্য শুনতে হয়।

অত কষ্ট করে পাউরুটি আর গুড় খেয়ে থাকতেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। মধুপুরের একটি বাড়িও বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছেন। মধুপুর থেকে গিরিডি যাবার পথে যে নাতিবৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা আছে সেইটিই হরেন্দ্রকুমারের বিশ্ববিদ্যালয়কে দান। কোনও গূঢ় কারণে বাড়িটি এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় আছে; বিশ্ববিদ্যালয় বাড়িটি কোনভাবেই ব্যবহার করছেন না। আর কয়েক বছর বাদেই বাড়িটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে। ও'র আর একটি কীর্তি—চন্দ্রকোনার কাছে যক্ষ্মারোগীদের আফটার-কেয়ার কলোনী।

বছরখানেক বাদে একদিন সকালে ডাক পড়লো। গিয়ে দেখি একটা চিঠির

খসড়া করছেন। চিঠিটা পড়ে শোনালেন। মর্মার্থ হচ্ছে, 'কলকাতার রাজভবনের কাছে ডিহি শ্রীরামপুর। অত দূরে বোম্বাই আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না!' ঘটনাটা বললেন। দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল চিঠি দিয়েছেন যে, তিনি যদি বোম্বাই-এর রাজ্যপাল হয়ে যান তা হলে ভাল হয়। ব্যস, চিঠি পাওয়ার পরই উনি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আমার কাছে শুনে ডাঃ রায় এসে সব বন্ধ করলেন। দিল্লীকে লিখে দিলেন যে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমারকে এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছাড়তে পারবো না। দিল্লীর রাজপুরুষদের ওঁকে বোম্বাই পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ(?); কলকাতায় বিদেশী অতিথিদের অনেক ভিড়। ডঃ হরেন্দ্রকুমারের মত সাধারণ লোক তাঁদের ঠিক আপ্যায়ন করতে পারছিলেন না। অতএব মহামাননীয় দিল্লীর রাজপুরুষরা তাঁকে বোম্বাই পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমাকে ডঃ হরেন্দ্রকুমার ও ডাঃ রায় একবার খুব বিপদে ফেলেছিলেন। একদিন সন্ধেবেলা হরেনদা ডেকে বললেন, 'ওহে, দিল্লী থেকে চিঠি এসেছে, বিধানসভায় মহিলার সংখ্যা খুব কম, একজন মহিলাকে পরিষদে মনোনয়ন দিতে পারলে ভাল হয়।'

তখন মাত্র একটি আসনই খালি ছিল। আমাদের তখনকার বিধান-পরিষদে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনয়নের সংখ্যা ছিল বারো। সেই দিন রাত্রে ডাঃ রায় ডেকে বললেন, 'ওহে, একজন খ্রীষ্টানকে নেওয়া হয়নি, যদি একজন খ্রীষ্টানকে নেওয়া যায় তো ভাল হয়।' আমি তো প্রমাদ গুনলাম। মোটে একটি আসন খালি। রাজ্যপাল চাইছেন মহিলা, মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন খ্রীষ্টান। আসনটা ওঁদের দুজনের পরামর্শ করে পূরণ করবার কথা। অতএব আমায় খুঁজে আনতে হবে। বিপদ থেকে মুক্ত হবার কোনও পথই খুঁজে পেলুম না। পরের দিন সকালবেলা হঠাৎ অধ্যাপক সুশীল দত্তর কথা মনে পড়লো। রামবাগানের দত্তবাড়ির খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একজন। সুশীলবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আদর-আপ্যায়নের পর সুশীলবাবুকে বললুম, 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলা; নামও শুনিনি, চোখেও দেখিনি। খানিক বাদে সুশীলবাবুর স্ত্রী এলেন। বাঙালী, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহস্থবধূর মত আধা-অবগুণ্ঠনবতী হাসি-হাসি মুখ। কমনীয় অথচ মর্যাদাময় চেহারা। আমি একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বললুম, 'আপনি কি অনুগ্রহ করে এম এল সি হবেন?' উনি একবার স্বামীর দিকে চাইলেন, একবার আমার দিকে চাইলেন। অর্থ অতি পরিষ্কার যে—আপনি কি বলছেন মশাই, আমি বুঝতেই পারছি না। আমার তখন নাছোড়বান্দা অবস্থা। অতি কষ্টে সমস্যা সমাধানের সূত্র পেয়েছি—মহিলাও হবে, খ্রীষ্টানও হবে। আমি সুশীলবাবুর শরণাগত হলুম এবং সম্মতিও মিলল। পরে লাবণ্যপ্রভা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি ও মহিলা বিভাগের সভাপতি হয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে যে একবার কাজ করেছে তার ওঁকে ভোলা শক্ত। যেমন চরিত্রমাধুর্য, সেই রকম কর্মনিষ্ঠা।

কলকাতা থেকে প্রতি বছরই পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হত। হুগলী জেলার হরিপাল থানার জেজুড় গ্রাম। পুজো হত এবং গ্রামের মধ্যে এক-খানিই, তবে প্রাণহীন। আমরা সে সময় বুঝতে পারতুম না, তবে পরে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছিলুম। ঠাট বজায় রাখতে হবে, অথচ কলসী শূন্য। অবস্থাটা ঢাকা দেবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। ফলে, আমরা একদম ছেলেবেলায় যা দেখে-ছিলুম, অর্থাৎ সমস্ত পরিবারের সকলে একসঙ্গে খাওয়া, তার সঙ্গে লোকজন, গ্রামবাসী, যেখানে যত আত্মীয়, সকলে একত্রিত হয়ে কয়েকদিন একসঙ্গে থাকা-খাওয়া—সবই উঠে গিয়েছিল। 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি'র মত সকলে আলাদা আলাদা খাওয়া, কেবলমাত্র পুষ্পাঞ্জলি, শান্তিজল এবং বিজয়ার প্রণামটা একসঙ্গে ছিল। আর এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা ঢাকা দেবার হসনীয় প্রহসন প্রত্যেক বছরই অভিনীত হত। নিয়ম, প্রথা—এ সবই মানবার এবং মানিয়ে নেবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। একটা প্রথা বেশ মনে আছে। গ্রামেরই একটা বোজা খালে ঠাকুর বিসর্জন হত। বিসর্জন দিয়ে ফেরবার পথে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তার তলায় দাঁড়িয়ে আমরা ঊর্ধ্বমুখে প্রণাম করতুম। আর বামুনজ্যাঠা শ্রীগোবর্ধন চাটুজ্যে মহাশয় বলতেন, 'ঐ নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল।' ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য ঠেকলেও এটা সত্যিই ঘটত। পাখিও উড়ত না, আমরা দেখতেও পেতুম না, কিন্তু আমরা প্রণাম করতুম। আমাদের ছোটবেলায় দেখতুম, এক জোড়া নীলকণ্ঠ পাখি কেনা হত এবং বিসর্জনের পর ঐ বটগাছ থেকে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হত। '২৯ সালের পর আমার আর বাড়ির পুজো দেখা হয়নি, তবে শুনেছি প্রথাটা এখনও আছে। আসতে হত একটা জমির পাশ দিয়ে। জমিটার নাম ছিল 'ইস্কুলডাঙার মাঠ'। অনেক দিন কৌতূহল চেপে রেখে একদিন বামুনজ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা, আশেপাশে ত্রিসীমানায় তো কোনো ইস্কুল নেই। তবে ইস্কুলডাঙার মাঠ নাম হয় কি করে?' বেশ মনে আছে, তিনি সদর্প ভঙ্গীতে বলতেন, 'আরে! ইস্কুল থাকবে কি করে? তা হলে শোন। ঐখানে একটি মাইনর ইস্কুল ছিল। ইস্কুলে প্রাইজ বিতরণের দিন আমাদের বাড়ির কর্তারা কোনো কারণে স্বগ্রামে এসেছিলেন। তাঁরা নিমন্ত্রণের চিঠি পাননি। ব্যস। আর যায় কোথায়? রাত্তিরে কয়েক শ' লোক ইস্কুল-বাড়ি ভেঙে, চাষ করে, ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে দিয়েছিল। সকালে গ্রামের লোক উঠে সবিস্ময়ে দেখে একদা যেখানে ইস্কুল ছিল, সেখানে চাষ করা জমিতে পাটগাছ বেরিয়ে গেছে। মামলা হল। শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম, যিনি পুরস্কার দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন খাস ইংরেজ। তিনি বললেন যে, ইস্কুল-বাড়ি ছিল। টাকার প্রভাবে কমিশন বসল এবং আরও বড় ইংরেজ অফিসার এলেন। অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি এসে রায় দিয়ে গেলেন যে, ওখানে কোনো দিন কোনো বাড়ি থাকা সম্ভব ছিল না, ওটা চাষের জমি। ব্যস,

মামলা জিত হয়ে গেল।' এই সব পূর্বকাহিনী যখন আমরা শুনতুম, তখন বেশ মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা হত।

গ্রামে যাত্রার দল ছিল। হরিনামের দলও ছিল। এই দুটো জায়গায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেত। যারা সাধারণত বাবুদের কাছে বসত না, বা বসবার সুযোগ পেত না, তারাও দেখতাম পাশাপাশি বসে গান গাইছে।—

'ওহে দয়াময়, ওহে সদয়
চরণ দাও হে দীনে,
আমার কে বা আছে, কার কাছে
গিয়ে শীতল হব প্রাণে॥'

আরও কতরকমের কীর্তন। কলকাতায় হত জন্মাষ্টমীর সময় নানারকমের পুতুল আর গ্রামে গ্রামে নন্দোৎসবে খুব আড়ম্বর।

'নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া
হাতে লাঠি, স্কন্ধে ভার, নাচে থইয়া থইয়া।
নন্দ নাচে রে
দিয়ে করতালি নন্দ নাচে রে।
শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥'

সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা নেই—আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ নৃত্য করছে, আর আখর দিচ্ছে।

যাত্রাতেও তাই। প্রজা বা অধমর্ণ, যারা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকত—তারাও রাজারানীর পার্ট করছে। জমিদারও পদাতিক হত, আবার প্রজাও রাজা হত। তাতে আভিজাত্যে বাধত না। এটা সত্য যে, 'গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান'—এ একদম কবির কল্পনা। গ্রামে হয়তো দু-তিনজনের গোলায় ধান থাকত, আর গ্রামসুদ্ধ লোক তাদের কাছে 'বাড়ি' নিত। 'বাড়ি' নেওয়া মানে, এক মন ধান যে ধার নেবে, এক বছরে তাকে দেড় মন দিতে হবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে পুরুষানুক্রমেও বাড়ি শোধ হয়নি। কিন্তু এখনকার মত এমন থাক ছিল না। পরিণত বয়সে বহু গ্রামে বাস করেছি। এক অস্পৃশ্যের বাড়িতে দশ মাস ছিলুম—কিন্তু সেদিনের চেহারা আর দেখতে পাইনি। আমরা সব প্রজা, কর্মচারী বা অন্যান্য তথাকথিত অস্পৃশ্য—এদের বাড়িতে কত খেয়েছি। আর ডাকা হত দাদা, খুড়ো, জ্যাঠা, মেসো—এসব বলে। পরে অবশ্য এগুলো একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল অসহনীয়, কিন্তু তার মধ্যেও পারস্পরিক একটা আত্মীয়তাবোধ সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা যেত। আমাদের ফণীদা চাকরি থেকে অবসর নেবার পর প্রায়ই গ্রামে যেতেন। ফণীদা ছিলেন প্রিয়ব্রত বোস—স্বদেশী যুগের 'যুগান্তর'-এর প্রথম সম্পাদক দেবব্রত বোসের ভাই। সিমলায় বড় চাকরি করতেন। গায়ে গেঞ্জি আর আধময়লা কাপড় পরে সারা গ্রাম চক্কর দিতেন। তখনকার দিনে এটা কোনো অভিনব দৃশ্য ছিল না। স্বাতন্ত্র্য ছিল, কিন্তু পার্থক্যবোধ ছিল না বললেই চলে। আর বামুনদিদি, কায়েতমাসী কুমোরপিসী, ময়রাগিন্নী—এঁরা তো ছিলেনই। আমাদের বাড়িতে দুটি পরিচারিকা ছিলেন। একজনের নাম মুকি, আর একজনের নাম পুকি। যাঁদের জল সমাজে চলত না, সেই পরিবার থেকে তাঁরা এসেছিলেন। আমরা বা দিদিরা তাদের চোখ-রাঙানিতে তটস্থ হয়ে থাকতুম। মা-জ্যাঠাইমারাও রেহাই

পেতেন না। আমার এক কাকাবাবু ডাক্তার ছিলেন। বাইরে চাকরি করতেন। গ্রামে ফিরে এসে গ্রামেরই যাত্রার দলে ঢুকে গেলেন—অবশ্য শখের দল। ডাক্তার, বড় ঘরের ছেলে, কিন্তু যাত্রার আখড়ায় কারোর সঙ্গে তাঁর কোনো তফাত দেখা যেত না। আর গ্রামে এমন দু-চারজন থাকতেন, যাঁরা পালা লিখতেন, কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন, সুর দিতেন—তাঁদের প্রভাব ছিল অসামান্য। একবার 'জনা' অভিনয় হল—গিরিশচন্দ্রের। সেই প্রথম শুনলাম 'প্রতিবিধিৎসিতে'র কথা। অশিক্ষিত যারা অভিনয় করত তাদের উচ্চারণ কি অপূর্ব! আমি একবার খুব বিপদে পড়েছিলুম। তখন বোধ হয় বয়স আমার সাত বছর। ভেতর-বাড়ি থেকে ঠাকুরবাড়ি হয়ে বাইরে আসছিলুম। আলো অনেক ছিল, কিন্তু একটু অস্পষ্ট ভাবও ছিল। আমি দেখলুম যে, যিনি রানী, তিনি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। মাথায় বজ্রাঘাত হল! রানী কি করে বিড়ি খাবে? রানী তো মায়ের চেয়েও বড়। তিনি তো মহাসম্মানিতা! ব্যস, সেইদিন থেকে কয়েক বছর যাত্রা দেখাই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতুম, 'ওরা খারাপ।' ঠাকুর বিসর্জনের পর শান্তিজল নেওয়া হত। তারপর দুর্গানাম লেখা। আমি ১০২ জনকে প্রণাম করতুম। আর একটা প্রথা ছিল। রাত বারোটার পর আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে ঐ গ্রামেরই খানিকটা দূরে সাধারণের ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করা। এই যাতায়াতের সময় কোনো কথা কওয়া চলবে না। বারো বছরের পর এই কাজ করার অধিকার জন্মাত। নতুন কাপড় পরে গায়ে চাদর দিয়ে যেতে হত। যাঁরা নতুন কাপড় কিনতে পারতেন না, পুরনো পাটের কাপড় পরে যেতেন। বারো বছরের আগে অবধি মনের মধ্যে বেশ একটা কৌতূহল, উত্তেজনা এবং কবে বারো বছর হবে—এর জন্য একটা আলোড়ন ছিল। এর নাম 'যাত্রা করা'। এই যে যাত্রা করা হত, এর পর আর বাড়ি থেকে পাঁজি দেখে যাতায়াত করার দরকার হত না।

কালীপুজোতেও গিয়েছি। তবে ধুম একটু কম ছিল। পুজোর পরদিন দুপুরবেলা বলিদানের মাংস দিয়ে পুরোহিত-বাড়িতে খাওয়া হত। বলিদান করতেন কামাররা। আর তারপরই পুরুতঠাকুররা বলতেন, 'ইস, কতটা মাংস-সুদ্ধ মুণ্ডু নামিয়েছে।' কারণ, মুণ্ডুটা পেতেন কামাররা। একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, বলিদানের মাংস ছাড়া অন্য মাংস বাড়িতে ঢুকত না বা রান্না হত না এবং তাতে পেঁয়াজ দেওয়া নিষিদ্ধ। কোনো দিন কারোর মাংস খাবার ইচ্ছে হলে তাদের বাগানে গিয়ে ইটের উনুন তৈরি করে সেখানেই ব্যবস্থা করতে হত। পুরোহিত-বংশ আমাদের বাড়িতে ব্রাহ্মণের রান্না খেতেন। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের জন্য ব্যবস্থা ছিল পাকা ফলারের, অর্থাৎ লুচি। অনেকে আবার নুন দেওয়া তরকারি খেতেন না। আমরা যখন যারা জল আচরণীয় নয় তাদের বাড়ি খেতুম তখন বেশির ভাগ সময়ই ভিজে ভাত সামান্য একটু শাকপাতা দিয়ে খেতে হত। মাঝে মাঝে গেঁড়ির ঝোলও ছিল। কিন্তু খেতে লাগত অপূর্ব। এটাও আমরা দেখেছি যে, বাড়িতে যাদের ঝি-চাকর বলা হত, তাদের অসুখ-বিসুখে মা-দিদিরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের যেমন সেবা করতেন, তারাও সেই সেবা পেত। এটা ঠিকই যে, সমাজ ছিল ক্ষয়িষ্ণু, পার্থক্য ছিল হিমালয়সদৃশ্য; কিন্তু আত্মীয়তাবোধ ছিল। এমনও দেখেছি যে, প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য কর্তারা সর্বস্বান্ত হতেন। মিথ্যা মামলা এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি ছিল। একটা বিশেষ ধারা অনু-যায়ী, বিনা প্রমাণে গরিব লোককে গ্রেপ্তার করা হত। গ্রামের পাঁচজন বর্ধিষ্ণু

লোক যদি সাক্ষ্য দিতেন যে, এদের কি করে সংসার চলে জানি না, তা হলেই তাদের সাজা হয়ে যেত। জুলুম ছিল, অত্যাচার ছিল, এটা সত্য—কিন্তু একটা একাত্মবোধের সুরও ছিল।

মধ্যপ্রদেশের কয়েক জায়গায় মিটিং সেরে বিদিশায় গিয়ে পৌঁছলুম। সঙ্গে শঙ্করদয়াল। শ্রীশঙ্করদয়াল শর্মা ব্যারিস্টারি পাস করে এসে অধ্যাপনা করতেন। তারপর ভূপালের মুখ্যমন্ত্রী হন। নূতন মধ্যপ্রদেশ গঠিত হবার পর বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। অবিভক্ত কংগ্রেসের ছিলেন সাধারণ সম্পাদক, বিভাগের পর কংগ্রেস সভাপতি হন, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এঁর বাড়িতে অনেকবার অতিথি হয়েছি এবং মধ্যপ্রদেশে বহু জায়গায় ওঁকে সঙ্গে করে ঘুরেছি।

এই বিদিশায় অশোক ছিলেন পিতা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের ভাইসরয়। অশোক বিদিশার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং অশোকের সভায় হেলিওডোরাস নামে একজন গ্রীক এসেছিলেন। তাঁর নামে স্মৃতিস্তম্ভ আছে। স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে, 'পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব হেলিওডোরাস'। ভাবাও শক্ত, সেই সময় একজন গ্রীক এসে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। আজকের দিনে এই দৃশ্য পথেঘাটে দেখা যায় যে, ইংরাজ বা আমেরিকানরা পথে পথে বৈষ্ণব পদাবলী ধরেছেঃ

> 'ও কুব্জার বন্ধু,
> তুমি কেমনে পাশরিলে
> রাই মুখ ইন্দু।
> ওহে ও পাগধারী,
> তুমি কেমনে রইলে ভুলে
> নবীনা কিশোরী॥'

সঙ্গে সঙ্গে 'রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ বল রাধে॥'

কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগে একজন গ্রীক এসে বৈষ্ণব হয়ে গেল, তা ভাবাও মুশকিল। এ কথাও ভাবতে হবে যে, তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়েছে। এই বিদিশার একটু দূরেই সাঁচী স্তূপ—১৬ মাইল দূরে। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্যের অস্থি নিয়ে দুটি বড় স্তূপ, সঙ্গে আরও অনেক। আজ সাঁচী তোরণদ্বারের নক্শা অনুযায়ী তোরণ ভারতবর্ষের যে-কোনও স্থানে যে-কোনও উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, লুম্বিনীতে যে মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি একসময়ে সারা ভারতবর্ষকে ধর্মে প্লাবিত করেন। বুদ্ধদেব সনাতন ধর্মানুযায়ী বহুদিন কৃচ্ছ্রসাধন করবার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বসে সংকল্প করলেন,

> 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
> ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি ॥'

অপূর্ব ! মানব-ইতিহাসে বোধ হয় আর কেউ এমন সংকল্প নিয়ে বসেননি। বুদ্ধত্ব লাভের পর সব জিনিসই যুক্তিগ্রাহ্য এটা বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে জড়বাদের আরও প্রাধান্য দিলেন। এ সম্বন্ধে Spengler খুব ভাল বলেছেন, 'Each Culture, further, has its own mode of spiritual extinction, which is that which follows of necessity form its life as a whole. And hence Buddhism, stoicism and Socialism are morphologically equivalent as end phenomena

For even Buddhism is such. Hitherto the deeper meaning of it has always been misunderstood. It was not a puritan movement like, for instance, Islamism and Jansenism, not a Reformation as the Dionysiac wave was for the Apollinian world, and, quite generally, not a religion like the religions of the Vedas or the religion of the Apostle Paul, but a final and purely practical world-sentiment of tired megalopolitans who had a closed-off Culture behind them and no future before them. It was the basic feeling of the Indian Civilization and as such both equivalent to and 'Contemporary' with stoicism and socialism. The quintessence of this thoroughly worldly and unmetaphysical thought is to be found in the famous sermon near Benares, the Four Noble Truths that won the prince-philosopher his first adherents Its roots lay in the rationalist-atheistic Sankhya philosophy, the world-view of which it tacitly accepts, just as the social ethic of the 19th Century comes from the Sensualism and Materialism of the 18th and the Stoa (in spite of its superficial exploitation of Heraclitus) is derived from Protagoras and Sophists. In each case it is the all-power of Reason that is the starting-point from which to discuss morale and religion (in the sense of belief in anything metaphysical) does not enter into the matter Nothing could be more irreligious than these systems in their original forms—and it is these and not derivatives of them belonging to later stages of the Civilization, that concern us here.

Buddhism rejects all speculation about God and the cosmic problems; only self and the conduct of actual life are important to it. And it definitely did not recognize a soul. The standpoint of the Indian psychologist of early Buddhism was that of the western psychologist and the western 'Socialist' of today, who reduce the inward man to a bundle of sensations and an aggregation of electro-chemica. energies The teacher Nagasena tells King Milinda that the parts of the car in which he is journeying are not the car itself that 'Car' is only a word and that so also is the soul. The spiritual

elements are designated Skandhas, groups, and are impermanent. Here is complete correspondence with the ideas of association-psychology, and in fact the doctrines of Buddha contain much materialism'

অশোকের কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত। কত শিলালিপি, তাম্রলিপি, কত স্তম্ভ তাঁর শাসনকালের এবং তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। অশোক সম্বন্ধে H. G. Wells লিখেছেন, 'পৃথিবীতে অনেক সম্রাট ও রাজা এসেছেন। কিন্তু একমাত্র অশোকই ধ্রুবতারার ন্যায় আপন দীপ্তিতে ভাস্বর।' একবার ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলীতে আমি, কামরাজ আর সঞ্জীব রেড্ডী অশোকের অনুশাসন দেখতে গিয়েছিলুম। আমরা কোদাল নিয়ে জীপে করে গিয়েছিলুম। এখন অবশ্য যথোচিত মর্যাদা সহকারে সংরক্ষিত হয়েছে। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার যে সাম্রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছিলেন, সাত বছরের মধ্যেই তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। চন্দ্রগুপ্তের জীবন অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। গ্রীক রাজা সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে এসে লিখেছিলেন যে, এই সাম্রাজ্যের সভ্যতা গ্রীক সভ্যতার মত। উপরন্তু এখানে কোনও দাসপ্রথা নেই। আরও লিখেছিলেন, 'They live happily enough, being simple in their manners, and frugal. They never drink wine except at sacrifice .....The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledges and deposits and confide in each other.. ...Truth and virtue they hold alike in esteem......The greater part of the soil is under irrigation and consequently bears two crops in the course of the year......It is accordingly affirmed that famine has never visited India, and that there has never been a general scarcity in the supply of nourishing food.'

অশোকের নামে কত কীর্তিস্তম্ভ আছে। আমাদের জাতীয় পতাকা অশোক-চক্রলাঞ্ছিত। কিন্তু যে মানুষটি তৎকালীন ভারতবর্ষের মাটি থেকে সব বিদেশীকে হটিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কোথাও তেমন স্মৃতিস্তম্ভ নেই। আমি ইতিহাসের অনেক দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে ভারতীয় সরকার ও মহীশূর সরকারকে জানিয়েছিলুম। কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের যখন ৫০ বছর বয়স, তিনি ছেলে বিন্দুসারকে রাজত্বের ভার দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সঙ্গে সাথী মাত্র একজন—জৈন ভিক্ষু ভদ্রবাহু। পাটলিপুত্র থেকে হেঁটে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত মহীশূর রাজ্যের 'শ্রবণবেলগোলায়' যান। আজকের দিনে কি এ কথা কল্পনা করা যায়, যখন যে মহাদেশকে আজ আমরা ভারতবর্ষ বলি, তার কোনও মানচিত্র ছিল না, যাতায়াতের পথ ছিল না, সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হেঁটে চলেছেন। সাম্রাজ্য স্থাপনে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণেও তিনি ক্লিষ্ট হননি। যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তা হেলায় ফেলে দিয়ে পঞ্চাশোর্ধ্বে একজন মানুষ দৈহিক কষ্টে ক্লিষ্ট না হয়ে শত শত ক্রোশ অতিক্রম করেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনে এটা ঘটেছে, কিন্তু একজন সম্রাটের পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হল? আমি শ্রবণবেলগোলায় গিয়েছিলুম। এখন যাতায়াতের কোনও অসুবিধা নেই। টুক্ করে পেঁছে গিয়ে-

ছিলুম। শ্রবণবেলগোলায় বসে ভাবছিলুম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কি করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন? কি সেই মানসিক দৃঢ়তা, যার ফলে এ জিনিস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল?

বোধ হয় ১৯৩৯ সাল। বর্ধমান জেলার শিয়াড়াবাজারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হল এবং অবাক কাণ্ড, সেই প্রস্তাবে আমাকেও নিন্দা করা হল। আমি তো মহা খুশী! ডঃ ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, তাঁর সঙ্গে নাম যুক্ত হল। তা ছাড়া সংবাদপত্রে ছাপার অক্ষরে নাম বেরিয়েছে, যেটা আমার ভাগ্যে খুব কমই ঘটত। আমি ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, আর ডঃ ঘোষ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিষদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। আনন্দ প্রকাশ করবার একটা সুযোগও ঘটে গেল। তখন আমি শ্রীরামপুরে জেলা কংগ্রেস অফিসে বাস করি। একদিন দেখি রাস্তা দিয়ে তুষার (চট্টোপাধ্যায়) তার দলবল নিয়ে যাচ্ছে। তুষার কম্যুনিস্টদের মধ্যে বেশ ভাল পড়াশুনা করেছিল। নম্র ও বিনয়ী এবং আদর্শবাদী। তুষারকে বললুম, 'ওহে, তোমরা সবাই ব'সো, ভাল করে খাওয়াব।' তুষার তো খুব খুশী! খাওয়া-দাওয়ার পর তুষার জিজ্ঞেস করলে, 'অতুল্যদা, খাওয়াটা কিসের?' 'তোমরা ডঃ ঘোষের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করেছ, তারপর আবার কাগজে নাম বেরিয়েছে। এর চেয়ে বড় খাওয়াবার কারণ আর কি হতে পারে?'

কম্যুনিস্টরা তখনও কংগ্রেসের মধ্যে আছে। তবে মাঝে মাঝে খুব বিপত্তি হয়। কংগ্রেসের নামে জনসভা ডেকে সেখানে খালি লাল পতাকা তোলা হয়, কংগ্রেসের পতাকার কোনও চিহ্নও থাকে না। জওহরলালের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করায় কংগ্রেস থেকে সার্কুলার আসে, কংগ্রেসের নামে যে সভা ডাকা হবে, সেখানে কংগ্রেস পতাকা তুলতেই হবে। সার্কুলার এলেও সব সময় তা রক্ষিত হত না, ফলে অনেক অশান্তির উদ্ভব হত। আর কম্যুনিস্টরা তখন থেকেই আমাদের অস্পৃশ্য ভাবতে আরম্ভ করেছে। সে এক বিচিত্র অবস্থা! যারা এক-সঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে জেলে থেকেছি—তারাও দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। অথচ কংগ্রেসী ভাই বা কংগ্রেসী আত্মীয় এক বাড়িতে থাকা-খাওয়ায় এদের কোনও আপত্তি ছিল না। আর কম্যুনিস্ট কর্মীরা যেন একান্ত অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করত, যেন লোকে মনে করে তারা কখনও হাসে না। অবশ্য ব্যতি-ক্রম যে ছিল না, তা নয়। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা গোপালন তাঁর রাজনীতিক জীবন আরম্ভ করেন কংগ্রেসের কাজের মধ্য দিয়ে। যেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হোক, সে কেরালায় হোক বা পঃ বঙ্গেই হোক, সব সময় হাসিমুখে কথা কইতেন। লোকসভায় অনেক দিন একসঙ্গে ছিলুম। নম্র ও মিতভাষী, কিন্তু ব্যবহারে

কোনরকম কাঠিন্য ছিল না। আর ছিলেন আমার বঙ্কিমদা (মুখোপাধ্যায়)। ইউ পি-র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ও এটোয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। খেতে ভালবাসতেন। সব সময় মুখে পান। আর ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক কোনও দিন ম্লান হয়নি। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে আমার কাছে খবর পাঠান যে, দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন। একদিন সকালের দিকে অনিল (ভট্টাচার্য) এসে হাজির। অনিলের সঙ্গে গেলুম। বঙ্কিমদা তখন হাসপাতালে—অপারেশন হবে। ডাক্তাররা সবিনয়ে জানালেন, 'আর তো এখন দেখা হবার উপায় নেই। ওঁকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হবে খানিকক্ষণ বাদে।' আমি বারান্দায় বসে রইলুম। মনে করলুম, অপারেশনের পর খবরটা নিয়ে যাব। আধ ঘন্টা বাদে দুজন ডাক্তার ছুটতে ছুটতে এলেন। আমার সঙ্গে দেখা না করে বঙ্কিমদা অপারেশন টেবিলে যেতে রাজী হননি। আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন। চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, মুখে অল্প হাসি। কোনও আশ্বাসের কথা আমার মুখে এল না। আমাকে বললেন, 'তুমি এসেছ, আমি নিশ্চিন্ত।' আমাকে একটা দায়িত্ব দিলেন। অবশ্য সে দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ যাঁর সম্বন্ধে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি। এরকম প্রাণখোলা, বন্ধুবৎসল, আদর্শবাদী ও কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ সব কর্মীদেরই অভিভূত করতে পারেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর আমি কয়েকদিন বাড়িতে এনে খাইয়েছিলুম। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

একটা বিষয় আজ অবধি বুদ্ধির অগম্য থেকে গেছে। রাজনীতি করার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক ত্যাগ করার প্রয়োজন কি? অবশ্য কম্যুনিস্ট পন্থীরা গোড়া থেকেই নিজেরা অস্বাভাবিক হবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একজনের কথা মনে পড়ছে। সামাজিকভাবে যাকে বলে সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান ও সৎ। তার নামের সঙ্গে এই বিশেষণগুলি সব যুক্ত হতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। ধূমপানকে একদম ঘৃণা করত। কম্যুনিস্ট হবার পর একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেল। দেখে আমার টুর্গেনিভ-এর 'ভার্জিন সয়েল'-এর কথা মনে পড়ত। 'ভার্জিন সয়েল'-এ আছে—শহর থেকে ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মেশবার জন্য কমদামী ভদ্‌কা খাওয়া শুরু করত। ফলে অনেক সময়ই উদ্ভব হত হাস্যকর পরিস্থিতি। কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসও বিচিত্র। অনেক পুরনো দল। ১৯২৬-এ বোধ হয় উদ্ভব। চীন আক্রমণের সময় দু'ভাগ হল। তারপর সি পি আই-কে তো এখন আঙুলে গুনে পাওয়া যায়, আর সি পি আই (এম)ও স্থানীয় দলে পরিণত হয়েছে। অথচ এঁদের মধ্যে ত্যাগী, আদর্শ-বাদী, কষ্টসহিষ্ণু নেতা ও কর্মীর অভাব নেই। স্বাধীনতার আগের কথা বাদ দিই। পরেও কত অবস্থার মধ্য দিয়েই এই দলের বিবর্তন হল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়', জাতীয় পতাকার অসম্মান, তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, বড়া—বহু জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা—এইসব নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি বাইরে যেরকম অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে, তেমনি নিজেদের মান-সিক অস্থিরতাও প্রকাশ পেয়েছে। বামপন্থী, বিপ্লবী—এসব বহু কথাই শোনা যায়। এর কোনটারই সম্যক অর্থ এখনও জনসাধারণের কাছে পরিস্ফুট নয়। যেমন এঁরা ভারতবর্ষের মূল ধারার সঙ্গে নিজেদের মেশাতে পারেননি, তেমনি ভারতবাসীর জীবনস্রোতকে পাল্টাতেও পারেননি। বিপ্লব শব্দ নানাভাবে ব্যবহৃত

হয়। এখনও এর শেষ কথা জানা যায়নি। যেমন—সমাজতন্ত্রের আদর্শ। এর যে কত ব্যাখ্যা আছে, তা বোধ হয় কোনও পণ্ডিতই নির্ধারণ করতে পারবেন না। বর্তমান পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে দেশভেদে, কালভেদে এর ব্যাখ্যা হয় এবং এক ব্যাখ্যার সঙ্গে আর এক ব্যাখ্যার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চীনের ভারতবর্ষ আক্রমণ নিয়ে কম্যুনিস্টদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। আবার তারপর সি পি আই (এম এল)-এর সৃষ্টি হল। যাদের নকশালপন্থী বলা হয়, তাদের মধ্যে যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি তাদের অধিকাংশই আদর্শবান, কর্তব্য-নিষ্ঠ, সৎ ও পরিশ্রমী। সব কম্যুনিস্ট দলই বামপন্থী এবং বিপ্লবী বলে অভিহিত। অথচ এঁদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মাঝে মাঝে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসবার জন্য এঁরা অনেকে একত্রিত হন। আগেকার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সে বন্ধনও বেশী দিন টেকে না। সেইজন্যই দুঃখও হয়, বিস্ময়ও জাগে যে, ভারতবর্ষের এতগুলি সুসন্তান, তাঁরা কেবল 'বামপন্থী ও বিপ্লবী' রয়ে গেলেন। বিশেষ কোনও পন্থা দেখাতে পারলেন না। সরকারে এসেও এঁরা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেন, কোনও বিশেষ চিহ্ন রেখে যেতে পারেন না।

ভূমিরাজস্বের কথাই যদি ধরা যায়, দেখা যাবে তার পিছনে কোনও নূতন চিন্তা নেই। সেই গতানুগতিক সিলিং এবং কাঙালী বিদায়ের আদর্শে উদ্বৃত্ত জমি ১ বিঘে, ৫ কাঠা, ১০ কাঠা—এইভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ। যাঁরা বিতরণ করেন তাঁরা জানেন যে, এতে ভূমিহীনদের কোনও অর্থনৈতিক কল্যাণ হবে না। ভূমির উপর যারা নির্ভরশীল তাদের যদি স্বাবলম্বী করতে হয়, তা হলে তাদের সেই পরিমাণ জমিই দিতে হবে, যাতে তাদের পরিবার প্রতিপালন সম্ভব। শ্রমিকদের ও আপিসের কর্মীদের যদি মিনিমাম ওয়েজেস হয়, তা হলে সেই নীতিতে যারা ভূমির উপর নির্ভরশীল, তাদের কেন সংসার চালাবার মত পরিমাণের জমি দেওয়া হবে না। ভূমির উচ্চতর সিলিং বাঁধা আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন ন্যূনতম মালিকানার সিলিং। যাঁরা জমির উপর নির্ভরশীল নন—যেমন, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকে-দের জমি কেন থাকবে—এই প্রশ্ন স্বভাবতই ভূমিহীনদের মনে ওঠে। বিপ্লবী এবং বামপন্থী বলে যাঁরা অভিহিত, তাঁরা অন্তত সৃষ্টিধর্মী এমন একটা কিছু করুন, যাতে বোঝা যায় যে, তাঁরা গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর।

এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন যে, "কণ্টকল্পিত"-র মধ্যে এসব জিনিস আনছেন কেন? স্বাভাবিকভাবে এ জিনিস এসে পড়েছে। ভারতবর্ষের ভূমি সমস্যা একটা বড় সমস্যা। কংগ্রেস অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধেছে। এতে কোনও সমস্যারই সমাধান হয়নি। যারা জীবনে কোনও দিন জমির মালিক ছিল না, কিছু জমি পেয়ে সাময়িকভাবে তারা উল্লসিত হয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু মূল সমস্যাই চাপা পড়ে গেছে। ভূমিহীনদের সমস্যা মেটাতে গেলে ভূমির উপর যারা নির্ভরশীল তাদের মর্যাদা দিতে হবে। যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করেন তাঁরা কি করবেন তাঁরা জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ সেইসব একনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী কর্মীদের দিকে চেয়ে আছে, যাঁরা ভূমি সমস্যা সমাধানের পথে দেশকে এগিয়ে দিতে পারবেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি—অন্যান্য পেশায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা সংঘবদ্ধ বলে তাঁদের খানিকটা মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু

ভূমির উপর যাঁরা নির্ভরশীল তাঁদের ওপর দাক্ষিণ্য দেখানো হয়েছে বটে, তাঁদের সমস্যা সমাধানের বিশেষ সুরাহা এখনও হয়নি। যে-কোনও ভারতবাসীর পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এই ধারণা নিয়েই এই প্রসঙ্গ "কষ্ট-কল্পিত"-র মধ্যে টেনে এনেছি।

আমার এগারো বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর চুঁচুড়ায় মাতামহ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট স্বাভাবিকভাবেই থাকি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন বঙ্কিমযুগের এক জ্যোতিষ্ক। মাতামহের বাড়িতে থাকার জন্য সেকালের এবং পরে যাঁরা স্বনামধন্য হয়েছেন এরকম বহু সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদের সংস্পর্শে আসি। মাতামহ মাস্টারমশাইকে (বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) ডেকে বললেন, 'জ্যোতিষ, একে একটু দেখো।' মাস্টারমশাই তখন মাতামহের বাড়ির কাছে গঙ্গার ধারে যাবার রাস্তায় একতলা বাড়িতে থাকতেন। তার একটু দূরেই থাকতেন সুসাহিত্যিক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। মাস্টারমশাইয়ের অধ্যাপকের চাকরি যায় দেশপ্রীতির জন্য। তারপর জেলখানার মধ্যে ও জেলখানার বাইরে তাঁকে অনেক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। আরও দশ-বার বছর বাদে হুগলী বিদ্যামন্দিরে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। এরকম পূতচরিত্র আদর্শবান মানুষ কম দেখা যায়। পরে শ্রীযোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে কিছুদিন পড়েছিলুম। পরবর্তী কালে যোগেশ চৌধুরী মহাশয় শিশিরকুমারের সাথী হয়েছিলেন এবং তিনি নাট্যকাররূপে সুপরিচিত। যখন কবিতা পড়াতেন তখন তাঁর পড়ার গুণে শক্ত কবিতাও সহজ হয়ে উঠত। আরও বেশী বয়সে ডঃ জুভেরীর পার্ক সার্কাস ফ্ল্যাটে গিয়ে ইংরেজী কবিতার পাঠ গ্রহণ করেছি। ডঃ জুভেরী ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং যত দূর মনে হচ্ছে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যান।

মাতামহ সতের বছর 'সাধারণী' সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং পাঁচ বছর 'নবজীবন' মাসিক। ও'রা সকলেই 'Comte'-এর ভক্ত ছিলেন। এবং Neo-Hinduism-এর প্রবক্তা। যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ—এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দু-ধর্মে থেকে তার ব্যাখ্যা করা—তারই চেষ্টা করতেন। 'সাধারণী'তে সাহিত্যিক, রাজনীতিক সব প্রবন্ধ থাকত, আর 'নবজীবন'-এ যুক্তিবাদের উপর যে হিন্দু-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তা প্রতিপাদনেরই প্রচেষ্টা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মদের সঙ্গে বেশ বিরোধ ঘনিয়ে উঠত। মাতামহের সহকর্মী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ইনি বহু দিন 'সাধারণী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় চুঁচুড়ার বাড়িতে চকদীঘির উপেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় আসতেন। তাঁকে আমরা বলতুম আঙুল-কাটা দাদু। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সহমরণের (?) আদর্শে তিনি নিজের হাতের একটা আঙুল কেটে স্ত্রীর চিতায় দিয়েছিলেন। ও'র একটা কবিতার কথা মনে আছে—

'ক্যাঁক শিয়ালী কদমতলায়,
সরকার গুরুর পাঠশালায়
একমেব ক্ষুদ্র ছাত্র,
সিংহরায় উপেন্দ্র
বসিয়াছে পাঠশালে,
বারো শো ছিয়াশি সালে
সঙ্গে সহযোগী যোগী
বসুজ যোগেন্দ্র।'

যোগেন বসু মহাশয় পরে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র বার করেন।* উপেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। যোগেন্দ্র বসু মহাশয় অনেক বই লেখেন। তার মধ্যে 'মডেল ভগিনী' খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বইটি ব্রাহ্মদের বিদ্রূপ করে লেখা। সে সময় আরও ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ঐ ভুবনমনোমোহিনী' গানের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভা হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয় যে, মা-কে মনোমোহিনী রূপে অভিহিত করে রবীন্দ্রনাথ অমার্জিত অপরাধ করেছেন। সেই সময় রবীন্দ্র-নাথের 'ঘরে বাইরে' বইও পোড়ানো হয়। 'ঘরে বাইরে' বই-এ এক জায়গায় আছে যে সন্দীপ বলছেন, 'রাবণ সেও এমনি করে মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি, অত বড় বীরের অন্তরের মধ্যে ওই এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্য সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতীনাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত।' রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বলানোয় 'ঘরে বাইরে'র বহ্নি-উৎসব। অক্ষয়চন্দ্রের এক গোষ্ঠীভুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ সে সময় অনেকেই উপভোগ করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের সম্পর্কে কোনও চিড় ধরেনি। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা চুঁচুড়ায় মাতা-মহের বাড়িতে থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেন। আর আমার ছোট মামা শান্তি-নিকেতনে শিক্ষিত।

যোগেন্দ্র বসু মহাশয়ের বেশ কয়েকখানি বই তখন প্রচলিত ছিল। একটা বই-এর নাম বোধ হয় 'কালাচাঁদ'। তাতে শ্বশুর বলছেন—

'রুই-এর মুড়ো কাষ্ঠ-মুড়ো
দাও গো আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘৃত-মুড়ো
দাও জামাইয়ের পাতে।'

আর একখানি বই, নাম মনে হচ্ছে 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'। তাতে আছে শিয়ালমারা ও সনাতন দাস বলে দু'জন কাশীতে ভণ্ডামির সাহায্যে কিছু অর্থ উপার্জনের আশায় এক সংকীর্তনের দল বার করেন। বিশাল জনতা এই সংকীর্তনের সঙ্গে কাশীর রাজপথ পরিক্রমা করছিল। এমন সময় শিয়ালমারা ও সনাতন দাসের স্বগ্রামবাসী একজন ভণ্ডামি বুঝতে পেরে ওঁদের কাছে এসে খোল বাজাতে অনুরোধ জানান। ওঁরা দুজনেই খোল বাজাতে জানতেন না, অথচ প্রকাশ করলে

* 'বঙ্গবাসী'র সে সময় খুবই রমরমা। ভারতবর্ষের দুটি sedition কেস 'মণিপুর বিদ্রোহ' এবং 'consent act'—যা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে খুব আলোড়ন হয়।

ধরা পড়ে যাবেন সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর খোল তুলে নৃত্য করতে লাগলেন আর মুখে বললেন—'প্রভু শ্রীখোল রে, তোমার অঙ্গে কি করে আমরা চপেটাঘাত করব! এই অঙ্গে মহাপ্রভু চপেটাঘাত করেছিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে হরিধ্বনি উঠল। আমাদের বাড়িতে একটা সুবিধা ছিল যে, বই সম্বন্ধে পাঠ্য-অপাঠ্য কোনও বিচার ছিল না। যেসব বই নাকি ছোটদের পড়া উচিত নয় সেসব বই অনায়াসে আমরা পড়তে পারতুম। কলকাতার সমাজে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীদের ব্রাহ্মদের প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। আর ব্রাহ্মদের ছিল উন্নাসিক ভাব।

সমাজের মধ্যে যাঁরা কোর্ট-কাছারি, বিদ্যালয় বা অফিসে যেতেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আর যাঁরা জমিদারি আয়ে বাড়িতে বসে খেতেন তাঁদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল বিচিত্র। সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে শয্যাত্যাগ। তারপর মুখ ধোয়া প্রভৃতি প্রাতঃকালীন কাজ করতে করতে একঘন্টা কেটে যেত। অবশ্য এসব কাজেও তাঁরা খানসামার সাহায্য নিতেন। এগারোটার সময় প্রাতঃকালীন জলযোগ। তারপর বাইরে থেকে যেসব প্রজাপাঠক আসত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। গোমস্তা, নায়েবমশাইরা হাজির থাকতেন। তবে তাঁদের হিসাবপত্র দেখবার বাবুমহাশয়ের সময় হয়ে উঠত না। পরে আশ্রিত-বর্গ এসে দেখা করতেন। এই কাজ শেষ হত প্রায় দেড়টা নাগাদ। তারপর স্নান। স্নান করবার সময় দুজন খানসামার প্রয়োজন হত। স্নান করে উঠে ফরাসডাঙ্গা বা শান্তিপুরের চুনট-করা ধুতি বুকের নিচে থেকে পরতে হত। এটাই নাকি ছিল নিয়ম। আড়াইটার সময় খেতে বসতেন। সেই সময় গৃহিণী বা মাতাঠাকুরাণী বা অন্য কোনও বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে দুটো-চারটা কথার আদানপ্রদান হত। আহার্যের অধিকাংশই হয়তো স্পর্শই করতেন না। তবুও মাছ এবং বিশ-পঁচিশ রকমের ব্যঞ্জন, দই, পরমান্ন, মিষ্টান্ন ও নানারকমের ফল সাজানো থাকত। ভোজনের পর সকাল থেকে গুরুতর পরিশ্রমের জন্য একটু বিশ্রাম করতে হত—প্রায় দু-ঘন্টা। পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় নিদ্রাভঙ্গ। তারপরে আবার সাজসজ্জা। বস্ত্র পরিবর্তন। গিলে-করা পাঞ্জাবি। অঙ্গে উত্তরীয়। হাতে ছড়ি। এই প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতে হতে সন্ধ্যা নেমে আসত। তখন ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকদের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা। তারপর দুয়ারে প্রস্তুত জুড়িগাড়ি করে বাগানবাড়ি। যাঁরা বাগানবাড়ি যেতেন না তাঁদের বাড়িতে তাস, পাশা, দাবা আরম্ভ হত। এবং চলত রাত বারটা অবধি। কোনও কোনও বাড়িতে গানের মজলিসও বসত। আমরা যে সমাজে মানুষ হয়েছি তার অভিজাত সম্প্রদায় বলে অভিহিত অনেকের সম্পর্কে আমি যে বর্ণনা দিলাম একটুও অতিরঞ্জিত নয়। অবস্থাবিশেষে কিছু তারতম্য ছিল, কিন্তু সাধারণত এই ছিল প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। সম্পদের তারতম্যের জন্য কোথাও মাত্রা একটু বেশী, কোথাও মাত্রা একটু কম। আমাদের পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত বাড়ির প্রবেশদ্বারের দু পাশে থাকত দুটো রুপোর ঘড়া। ঘড়ার মধ্যে থাকত আতর। যাঁরাই যেতেন খানিকটা তুলো ভিজিয়ে নিয়ে কানে লাগাতেন। কাছেই একটা বাড়িতে ছিল জলের ফোয়ারা। সেই ফোয়ারা দিয়ে যে জল উৎসারিত হত তা হয় গোলাপজল, নয়তো অন্য কোনও সুগন্ধি জল। পয়সার তো অভাব ছিল না। পূর্বপুরুষরা যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তা বিক্রি করলেই পয়সা আসত। আর বিক্রি করা মানেই তো একটা সই। যাঁরা বড় বড় ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন বা বড় জমিদারী বা নগদ টাকা, দু-এক পুরুষেই তা কর্পূরের মত উবে যেত। এজন্য মনে কোনও গ্লানি ছিল না, খেদও ছিল না। এর বাইরেও একটা সমাজ

ছিল—যাঁরা বিত্তশালী।

উপযুক্ত জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে শ্রম এবং শ্রমিকের অমর্যাদায়। সঙ্গতি থাক বা না থাক, দৈহিক পরিশ্রমকে সব সময়েই অবজ্ঞা করা হয়েছে। ফলে, আজও দৈহিক পরিশ্রম বাঙালী সমাজে লজ্জাকর। বর্তমানে স্কুলে পড়ানো একটি বইয়ে একজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালীর লেখা আছে—'অতঃপর তিনি ব্যাগ নামক একটি বস্তুর মধ্যে দুখানি বস্ত্র রাখিয়া ভদ্রবেশী মুটে সাজিয়া তাহা বহন করিলেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখনও এই লেখা বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে।

'৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব চলছে, তখন আমার মা মারা গেলেন। আমি তখন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার একটি গ্রামে। কলকাতায় এলুম। আমি সাবালক হয়ে অবধি কোনও অশৌচ পালন করিনি। অন্যান্য সামাজিক কর্মও অনেক আমার করা হয়নি। কোনও দিনই পূজা করিনি। মন্দিরে গেছি বটে, কিন্তু বিগ্রহ দেখার জন্য যে পুণ্য, তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর মানে এ নয় যে, যাঁরা এসব করেন, তাঁদের আমি অশ্রদ্ধা করি, বা অমর্যাদা করার কথা ভাবতে পারি। এ সবই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার বা Invention হয়েছে, সবই বিশ্বাসের জন্য হয়েছে। জড়বাদীরা যতই বলুন অন্ধবিশ্বাস হলো কুসংস্কার। এর পেছনে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। আর অনেক আবিষ্কার তো ভুল করে বেরিয়েছে। Koestler তাঁর Sleep-walker-এ এর ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক কি না জানি না, কিন্তু এই যে হাজার হাজার লোক গঙ্গাজল নিয়ে হেঁটে তারকেশ্বর যাচ্ছে এরা নিশ্চয়ই কোনও সত্য উপলব্ধি করেছে। তা নইলে বৈশাখের খরদাহ মাথায় নিয়ে এবং পায়ের তলায় গরম পিচ নিয়ে এরা কিসের জন্য যায়? যারা যায়, তারা কোনও দিন তারকনাথ কি পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে তা বিচার করেনি; কোন্ রাজা বা জমিদার স্বপ্ন দেখে তারকনাথকে বসিয়েছেন, তারও আলোচনা করেনি। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে তারা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে যায়। তার্কিক হয়তো বলবেন, আফিং-এর যেমন নেশা, ভক্তির নেশাও সেইরকম। বেশ তো, নেশাই না-হয় হল, তাতে ক্ষতি কি? রাজনীতির নেশা হলে সেটা কুসংস্কার হয় না, আর ভক্তির নেশা হলেই সেটা কুসংস্কার হবে? তিরুপতিতে সহস্র-লক্ষ লোক মস্তক মুণ্ডন করে। যাদের মস্তক মুণ্ডিত হয়, সেটা তাদেরই মাথা। এর জন্য অপর কাউকে তো ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না। তা হলে এ নিয়ে তর্ক কেন? আর তর্কেরও তো শেষ কারোর জানা নেই। এ বিষয়ে Camus তাঁর Myth of Sisyphus-এ ভাল বলেছেনঃ

'And here are trees and I know their gnarled surface, water

and I feel its taste. These scents of grass and stars at night, certain evenings when the heart relaxes—how shall I negate this world whose power and strength I feel? Yet all the knowledge on earth will give me nothing to assure me that this world is mine. You describe it to me and you teach me to classify it. You enumerate its laws and in my thirst for knowledge I admit that they are true. You take apart its mechanism and my hope increases At the final stage you teach me that this wondrous and multi-coloured universe can be reduced to the atom and the atom itself can be reduced to the electron. All this is good and I wait for you to continue. But you tell me of an invisible planetary system in which electron gravitate around a nucleus. You explain this world to me with an image. I realise that you have been reduced to poetry : I shall never know. Have I the time to become indignant? You have already changed theories. So that science that was to teach me everything ends up in a hypothesis, that lucidity founders in metaphor, that uncertainty is resolved in a work of art. What need had I of so many efforts? The soft lines of these hills and the hand of evening on this troubled heart teach me much more. I have returned to my beginning. I realize that if through science I can seize phenomena and enumerate them, I cannot for all that apprehend the world. Were I to trace its entire relief with my finger. I should not know any more. And you give me the choice between a description that is sure but that teaches me nothing and hypotheses that claim to teach me but that are not sure. A stranger to myself and to the world, armed solely with a thought that negates itself as soon as it asserts, what is this condition in which I can have peace only by refusing to know and to live, in which appetite for conquest bumps into walls that defy its assaults? To will is to stir up paradoxes. Everything is ordered in such a wav to bring into being that poisoned peace produced by thoughtlessness, lack of heart or fatal renunciations.'

কলকাতায় দুজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, যাঁরা নিজেদের আমার অভিভাবক মনে করেন, তাঁরা এসে বললেন যে, নিরামিষ খেতেই হবে। দুজনেই সংবাদপত্রের ধুরন্ধর। সামাজিক চাপকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু এ'দের চাপ তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তা হলে তো পাবলিক লাইফ শেষ হয়ে যাবে। একজন হলেন 'যুগান্তর'-এর শ্রীমান অনিল ভট্টাচার্য, দ্বিতীয়জন হলেন 'আনন্দবাজার'-এর শ্রীমান শিবদাস ভট্টাচার্য। তখন ডাঃ রায়ের সংগে পঃ বাঙলায় নির্বাচনী সফর করছি। ডাঃ রায়ের সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাবার একটা নিজস্ব ধারা ছিল। মুখ ফুটে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন না। যত জায়গাতে খাওয়া হল, গিয়েই ডাঃ রায় ঘোষণা করতেন যে, তিনি নিরামিষ খাবেন। আমি নিরামিষ খাচ্ছি মাতৃবিয়োগের

জন্য, অতএব আমার সাথী তাঁকে হতেই হবে। কিন্তু এর অন্য কোনরকমে প্রকাশ ছিল না। ট্রেনে যাবার সময় বা বাইরে গিয়ে স্থানাভাবের জন্য যখন এক ঘরে শুয়েছি, তখন লক্ষ করেছি, রাত্রে বাইরে যাবার দরকার হলে টর্চলাইটের মুখটা নীচের দিকে করে যেতেন, পাছে সংগীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এ আই সি সি-র অধিবেশন আজমীরে। রাত্রে বললেন, 'ওহে, কাল সকালে এখান থেকে চিতোর যাব।' আমি তো থ। আজমীর থেকে চিতোর যাবার তখন একটাই পথ ছিল—নাথদ্বার ও উদয়পুর হয়ে। উনি ভিলওয়াড়ার পথ নিলেন—যেখান দিয়ে যাবার কোনও রাস্তা তখনও তৈরী হয়নি।

সব বড় বড় ঝকঝকে গাড়ি করে আমরা আজমীর থেকে বেরোলুম। সঙ্গে প্রফুল্লদা (সেন) ও আরও কেউ কেউ ছিলেন। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করলুম, 'আজ্ঞে, এ গাড়ি করে তো এ পথ দিয়ে যাওয়া যাবে না।' উনি হাতের একটা ম্যাপ দেখিয়ে বললেন, 'সব ঠিক আছে।' বুঝলাম অনেক কষ্ট আছে এবং সে কষ্ট ওঁকেই বেশী সইতে হবে। যদিও জানতুম, যতই কষ্ট হোক, তা প্রকাশ কখনও করবেন না। ষোল মাইল গিয়েই গাড়ি অচল। সামনে নদী এবং তাতে তখন জল। কয়েকখানি জিপ ছিল। জিপে চড়ে নদী পেরিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। লোকের উঠোন দিয়ে, গ্রামের পড়া জায়গা দিয়ে, মাঝে মাঝে ছোটখাট শহর—তার গলি-ঘুঁজি দিয়ে বেলা দেড়টার সময় একটা ছোট শহরে গিয়ে পেঁছিলুম। আমি বললুম যে, আমার খিদে পেয়েছে। অগত্যা সবাইকে নামতে হল। আহার্য মিলল কিছু চিপিটক, দধি ও দুগ্ধ। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার শুভযাত্রা আরম্ভ। পথে এমন একটা খাল পড়ল, যেখানে গাড়ি থেকে সবাইকে নামতে হবে। আমরা ডাঃ রায়কে নামতে দিলুম না। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর তিনি বসে রইলেন। শুধু পায়ে কাদাজল ভেঙে যাওয়ার ফলে একজনের পায়ে ফুটল কাঁটা। সন্ধ্যে-বেলা আমরা চিতোর গিয়ে পেঁছিলুম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেডিকেল অফিসার প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা আমাদের পেঁছিনো সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কি করা যায় এই ভেবেই বিব্রত। সেই স্বল্পান্ধকারে জিপে চড়ে এক চক্কর ঘুরে নেওয়া হল। তার-পরেই পোড়োবাড়ির মত একটা ডাকবাংলো। প্রথমেই ডাঃ রায় চাইলেন একটা জোর আলো। তখনও চিতোরে ইলেকট্রিক যায়নি এবং ডাক্তারবাবুকে নির্দেশ দিলেন ছুরি, ফরসেপ, একটা সন্নার মত জিনিস প্রভৃতি এবং খানিকটা স্পিরিট নিয়ে আসতে। হাত-মুখ ধোয়া নেই, বিশ্রাম নেই, বসে গেলেন সংগীর পায়ের কাঁটা তুলতে। কাঁটা ফোটার জায়গাটা একটু ফুলে গেছল। সুতরাং হ্যারিকেনের মাথায় নুনের পুঁটলি রেখে সেখানে সেঁক দেওয়া—সেটাও নিজের হাতেই করলেন। যার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল সে তখন লজ্জায় আধমরা—মোটে বাইশ বছরের তফাত। আর স্বয়ং ডাঃ রায়! কয়েকখানা তোয়ালে এবং সাবান যোগাড় হল। অফিসারদের মধ্যে একজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেশ যত্ন করে খাওয়ালেন। খবর পাওয়া গেল যে, খানিক বাদেই একটা ট্রেন আছে, যেটা পরের দিন সকাল আটটায় আজমীর পেঁছিবে। কতগুলো চাদর বালিশ যোগাড় হল ট্রেনে পেতে যাবার জন্য। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জাকর পরিস্থিতি হল পায়ে কাঁটা ফোটা সংগীকে নিয়ে। ডাঃ রায় তার চাদর বালিশ বিছিয়ে দেবেনই। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি!

পরের দিন সকালে আজমীর স্টেশনে পেঁছিতেই আমার কাছে জওহরলালের একখানি চিঠি এল যে, আমি যেন কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। একই

বাড়িতে এক দিকে ডাঃ রায়, আর এক দিকে আমরা ছিলুম। আমি স্নান সেরে, নাকে-মুখে কিছু গুঁজে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জওহরলালের কাছে হাজির হলুম। জানতুম, অনেক তিরস্কার এবং কড়া কথা শুনতে হবে। জওহরলালের কথা একটাই। 'তোমরা বিধানকে নিয়ে ও পথে গেলে কেন? আর গেলেই যখন এখানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে না কেন?' জওহরলাল ক্রমাগত বলছেন, আর আমি শুনেই যাচ্ছি। আমার তো উত্তর দেবার কিছুই নেই। বেশ বুঝতে পারছি, ঐদিনই আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ। এমন সময় কানে এল, 'কই, অতুল্য কোথায়?' ডাঃ রায় এসে হাজির। জওহরলালের তখন অগ্নি-শর্মা মূর্তি। 'বিধান, তুমি অচেনা জায়গায়, অজানা পথে আমাদের কাউকে না বলে গেলে কেন? কাল সারা রাত আমাদের খুব দুশ্চিন্তায় কেটেছে।' ডাঃ রায় একটু হেসে বললেন, 'তোমাকে কতবার বারণ করেছি, ঐ শরীর নিয়ে অত ঘুরো না, আর অত জনসভা করো না। তুমি কি সেসব কথা শুনেছ?' আমার দিকে চেয়ে ডাঃ রায় বললেন, 'ওহে, তুমি এখনও সকালের খাওয়া খাওনি। তাড়াতাড়ি যাও।' আমি জওহরলালের দিকে চাইলুম। তিনি যেতে বললেন। তারপর জানি না দুজনের কি কথা হল।
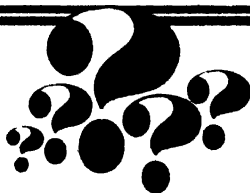
১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলন আরামবাগে একটা ভিন্ন রূপ নিল। চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল সেট্‌লমেন্ট বয়কট ও জমিদারের খাজনা বন্ধ আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনে কর্তাদের কাছ থেকে আপত্তির ঝড় উঠল। বাংলা দেশের কোথাও খাজনা বন্ধ আন্দোলন হচ্ছে না, তোমরাই বা করবে কেন?—এই হচ্ছে যুক্তি। তখন সতীশ দাশগুপ্ত মশায় প্রাদেশিক আইন অমান্য কমিটির সভাপতি। তাঁর কাছে গিয়ে বক্তব্য রাখলুম। বক্তব্য হচ্ছে সোজা—'যেসব জমিদার সরকারের কাছে কালেক্টরির খাজনা জমা দেবে, তাদের খাজনা প্রজারা দেবে না। এটা অসহযোগ সত্যাগ্রহের একটা অঙ্গ।' দু'দিন ধরে আলোচনা হল। শেষে সতীশবাবু রায় দিলেন, 'হ্যাঁ, খাজনা বন্ধ আন্দোলন করা চলবে।'

১৯৩১-এ জেল থেকে বেরিয়ে আরামবাগে গিয়ে হাজির হলুম। তখন মেদিনীপুরে গোরা সৈন্য ও কামান সহ মিলিটারি ঘোরা হয়ে গেছে আর আরাম-বাগে ঘুরছে। জনসাধারণ এতে একেবারেই ভয় পায়নি। এটা তারা আন্দোলনের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিল। মেদিনীপুরে সৈন্যরা অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল। সে তুলনায় আরামবাগে অত্যাচার হয়নি বললেই চলে। ওরা এক-একটা মাঠে গিয়ে ছাউনি ফেলত। ঘোড়ার পিঠ থেকে কামান নামিয়ে দু'-চারবার কামানের আওয়াজ করত। তারপর সারা দিন হল্লা। রুট-মার্চ যেটা করত, সকালের দিকে। ওরা কাউকে গ্রেপ্তারও করত না, মারধরও করত না। খালি প্রবল পরাক্রান্ত সর-

কারের শক্তি দেখানোই ছিল ওদের দায়িত্ব। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খানাকুল থানার ঘেসুয়া গ্রামে শিবির করলুম। আমি ও দু'-একজন থাকতুম শ্রীলক্ষ্মী জানার বাড়িতে। অতি দরিদ্র কৃষক। ভরসার মধ্যে ছিল দু'-খানি ঘর। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই বড়ডোঙ্গল। সেখানে হাবুর মা'র বাড়িতে ছিল আর একটি শিবির। এই মহীয়সী মহিলার কাজ ছিল সকাল থেকে রাত দশটা এগারোটা অবধি কংগ্রেস কর্মীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আর যারা অসুস্থ হয়ে আসত তাদের সেবা করা। শিবির ছিল প্রায় দশ মাস। বাড়ি-ছাড়া ছন্নছাড়া ছেলেরা পুরো মাতৃস্নেহে পালিত হত। এখানে অবশ্য গ্রামবাসীরাই আহার্যের ব্যবস্থা করে দিত। আর জানা মশাই তার কষ্টের অন্নের ভাগ আমাদের দিতেন। আমরা কিছু যোগাড় করে দিতে চাইলে দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলতেন, 'আমরা তো অভুক্ত থাকি না, যা আছে ভাগ করে খাওয়াই তো ভাল।' কতগুলি গ্রামে বেশ একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, যে পরিবারের সব কর্মক্ষম লোকেরই জেল হত, গ্রামের সর্বসাধারণ মিলে তাদের জমি চাষ করে দিত। এই সময় একদিন একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটল। হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কলেজ-ফেরত তরুণ ইংরেজ হাতি করে বড়ডোঙ্গল গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণকে বোঝানো যাতে খাজনা, ট্যাক্স দিয়ে দেয়, সেট্‌লমেন্ট বর্জন না করে। আমরা বিনোদ বেরা মশাইকে পাঠিয়ে দিলুম। বেরা মশাই-এর বয়স সত্তর বছর। নিরক্ষর এবং অতি দরিদ্র কৃষক। বেরা মশাইকে সাহেব অনেকক্ষণ বোঝাবার পর বেরা মশাই সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা হাকিম বাহাদুর, আমরা যদি আপনাদের দেশে গিয়ে আপনাদের দেশকে আমাদের অধীন করে রাখতুম, তা হলে আপনারা কি করতেন?' ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো চুপ।

আমাদের হিসেবে একটা ভুল হয়েছিল। আমরা খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় মনে করেছিলুম, যেসব অঞ্চলে বন্যার জন্য চাষ হয় না বা যেসব অঞ্চলে সেচ পায় না, সেইসব অঞ্চলেই আন্দোলন জোর হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অন্য-রকম। শস্যে সমৃদ্ধ ও উর্বর অঞ্চলেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনে শক্তি যোগাল। এবং যেসব অঞ্চলে প্রতি বছর চাষও হয় না, তারা সকলেই সুড়সুড় করে খাজনা দিয়ে দিল। অর্থনীতিবিদদের এই ঘটনা ভাল করে বিশ্লেষণ করা উচিত।

কয়েকদিন বাদে দেখলুম যে, অনুকূলদা (চক্রবর্তী) একটু অস্থির ভাব দেখাচ্ছেন। আমি একটু বিস্মিত হলাম। অনেক জেরা করে বেরোল যে, আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী—যে আমার আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে কয়েক দিন আগে কয়েকটি detonator ও আরও কিছু সাজসরঞ্জাম এনেছে। আরামবাগ কোর্ট বা জেলখানা উড়িয়ে দেবার আলোচনাও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সহকর্মী এসব এনেছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার হতে বললুম। গ্রেপ্তার হওয়া তো খুব সহজ ছিল। কারণ, আমাদের সকলকে ধরার জন্য পুলিস খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমার সহকর্মীটি গ্রেপ্তার হলেন। তারপর অনুকূলদাকে দিয়ে ঐসব জিনিসগুলি আনিয়ে আমাদের যেসব অঞ্চল বন্যাঞ্চল ছিল, সেইসব অঞ্চলের মাটিতে পুঁতে ফেলা হল। দাসপুর দারোগা হত্যা কেসে আমিও গ্রেপ্তার হয়েছিলুম, অনুকূলদাও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। দাসপুর হল ঘাটাল মহকুমায়। ঘাটাল মহকুমায় ১৯৩০-এ বহু লোক আইন অমান্য আন্দোলন করে জেলে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু দারোগা হত্যার পর পুলিসের অত্যাচার চরম হয় এবং সাতখানি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৩২-এর আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমায় তেমন সাড়া পাওয়া

যায়নি। এর কারণ অতি সুস্পষ্ট। অহিংস ও গণ-আন্দোলন যেখানে হয়েছে, সেখানে মানুষ জেনেশুনে, বুঝে চরম অত্যাচার সহ্য করেছে। দু'টাকা চৌকিদারি ট্যাক্স না দেবার জন্য চাষ করবার বলদ পুলিস নিয়ে গেছে। সেট্‌লমেন্ট বর্জন করায় জীবিকার একমাত্র সম্বল চাষের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। তাতেও মানুষ দমেনি। কিন্তু তারা জানল না, বাইরের মানুষ এসে দু'জন দারোগা, তিনজন কনেস্টবলকে খুন করে গেল, আর অত্যাচার হল গ্রামবাসীদের ওপর—এর সমর্থন গ্রামের লোকেরা করতে চায়নি। গ্রামের লোক সক্রিয় অংশ নিয়েছে, আরামবাগের নকুণ্ডা গ্রামের অতুল সামুই-এর মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল, তার জায়গায় আরও পাঁচজন লোক এগিয়ে এল। বদনগঞ্জে গুলি চলে, তাতেও লোক ভয় পায়নি, বরং সে অঞ্চলে আন্দোলন আরও জোরদার হল। জনসমর্থনের উপর অহিংস গণ-আন্দোলন যেখানে দানা বেঁধেছে সেখানে চরম নির্যাতন ভোগ করতে গ্রামবাসী প্রস্তুত। কিন্তু যে কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত নয় এমন সহিংস কাজের জন্য যদি তাদের উপর অত্যাচার হয়, তারা সেখানে তা বরদাস্ত করতে চায়নি।

১৯৩২ সালের আন্দোলনে জেলে যাবার পর আমি জেলে সবটা সময়ই প্রায় শয্যাগত হয়ে ছিলুম। পঞ্চুদা (ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়) বলে দিয়েছিলেন, 'তোমার জেলে যাওয়া চলবে না। টিউবারকিউলসিস টেস্ট পজিটিভ হয়েছে।' কিন্তু পঞ্চুদার কথায় তো সরকার চলত না। তাই জেলে আমায় যেতেই হল। হিজলী জেল। হিজলীতে দুটো জেল ছিল। একটা আমাদের মত ডিভিসন থ্রি কয়েদীদের জন্য, আর একটা বিনা বিচারে আটক বন্দীদের জন্য। আমাদের জেলে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লদা, অজয়দা (মুখোপাধ্যায়), চারুবাবু (ভান্ডারী), ক্ষিতীশবাবু (দাশগুপ্ত), আরও অনেকেই ছিলেন এবং এঁরা সকলেই ডিভিসন থ্রি। যত দূর মনে হচ্ছে ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত মশায়ের ডান্ডাবেড়িও হয়েছিল। তখন নিয়ম ছিল, একজন জেল ওয়ার্ডার উঠে বলত, 'সরকার সেলাম।' সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে উঠে সরকারকে সেলাম করতে হত। অস্বীকার করলেই সাজা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা এসব করতাম না। ফলে 'খাড়া হাতকড়া' 'ডান্ডাবেড়ি' প্রভৃতি নানারকম সাজা পেতে হত। ঐ জেলে সশ্রম কয়েদীদের কোনও কাজ করতে হত না। তবে সকলকেই কয়েদীদের পোশাক অর্থাৎ জাঙ্গিয়া ও কুর্তা পরতে হয়েছিল। অন্যান্য জেলে কাজ করতে হয়েছে। পঃ বাংলার বিখ্যাত বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ্ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ঘানি ঘুরিয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন নারকোল ছোবড়া পিটে তা থেকে রোজ পঞ্চাশ-ষাট গজ দড়ি তৈরি করতেন। যে দড়িগুলো পানবিড়ির দোকানে দেখা যায় ঝুলতে, যা থেকে বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে নেওয়া হয়। জেলে যতদিন ছিলুম, সব সময়টাই হাসপাতালে কেটেছে। অবশ্য আরও কেউ কেউ দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিলেন। আমার বিশিষ্ট বন্ধু, রাজসাহী জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীমানসগোবিন্দ সেন—তাঁর সত্তর পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল। তিনিও শয্যাগত ছিলেন। এই সময় জেলের চিকিৎসক আমাকে ভুল করে নিওস্যালভারসন ইঞ্জেকশন দেন। আমার হয়ে ছিল টিবি। এই ইঞ্জেকশনের ফলে আমি প্রায় মৃত্যুশয্যায়। তিনটে ইঞ্জেকশন দিয়ে তিনি আর দেননি। কিন্তু তার ফলে যা ক্ষতি হবার তা তো হলই। আমার অবস্থা দেখে জেলখানায় বেশ একটা শোরগোল হল। ফলে আই জি অব প্রিজন্‌স্ এলেন তদন্তে। ডাক্তার তো সাসপেন্ড হলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর জেলে বদলি হয়ে গেলুম—অবশ্য শুয়ে শুয়ে। এই সময় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। আমার স্ত্রী এবং আমার এক বন্ধুর স্ত্রী ঐ

সময় কাশীতে ছিলেন। হঠাৎ জেলখানার মধ্যে খবর এল যে, কাশী থেকে লোক এসেছে। বিশেষ জরুরী। আমি তো শয্যাগত। বিশেষ অনুমতি নিয়ে প্রফুল্লদা দেখা করতে যান। কাশী থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা আমার খবর জানতে চেয়েছেন। গোড়ায় আমরা মনে করেছিলুম স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খবর নিতে চেয়েছিলেন। তারপর যা জানা গেল সে এক অদ্ভুত কাহিনী। আমার স্ত্রী এবং আমার বন্ধু-পত্নী ভৃগুর কাছে গিয়ে আমার সমাচার জানতে চান। ভৃগু অনেক ছক-টক কেটে তাঁদের জানিয়ে দেন যে, আমি রাজকারাগারে আছি এবং আমার ওপর বিষপ্রয়োগ হচ্ছে। তিনি আরও কিছু কিছু বলেছিলেন যা সম্পূর্ণভাবে মিলে গিয়েছিল। এ ব্যাপারটি অবিশ্বাস করার মত। কিন্তু এটা সত্যিই ঘটেছিল, কি করে ঘটেছিল তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই।
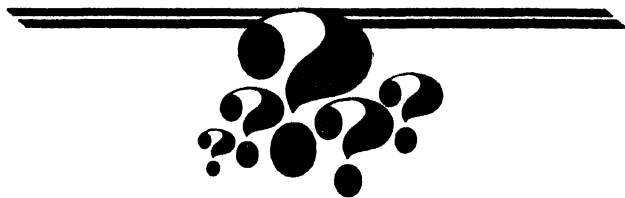
এরনাকুলামের সভা সেরে আমরা গেলুম আলোওয়ে। আলোওয়ে পেঁছিবার আগে রাস্তার ধারে আলোওয়ে নদী, তাতে একটা ছোট নদী এসে মিশেছে। সঙ্গে ছিলেন, কে সি এব্রাহাম; মাস্টারমশাই বলে পরিচিত, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন, তারপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। আর ছিলেন টি ও বাওয়া, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তাঁরা নদীর ধারে ছোট্ট ইঁটে গাঁথা মন্দিরের মত দেখিয়ে বললেন, ঐখানে শঙ্করাচার্যকে কুমিরে ধরেছিল। কিংবদন্তী যে, শঙ্কর যখন সন্ন্যাস নিতে চান তখন মা আপত্তি করেন। কিছু দিন বাদে শঙ্কর যখন নদীতে স্নান করছিলেন তখন একটি কুমির তাঁকে ধরে। কাছেই মা ছিলেন, শঙ্কর চেঁচিয়ে তাঁকে বলেন. 'আমাকে যদি সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও তা হলে কুমির আমাকে ছাড়বে, নয়তো কুমির আমাকে জলে টেনে নিয়ে যাবে।' মা অনুমতি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। শঙ্কর জন্মেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। সেই সময় থেকে বর্তমান কাল অবধি ঐ জায়গায় মেলা হয়ে আসছে। বিরাট মেলা। আলোওয়ের কাজ সেরে আমরা কালাডি গেলুম—শঙ্করের জন্মস্থান। ওখানে শঙ্করাচার্যের নামে একটি কলেজ আছে। কালাডিতে গিয়ে মনে হল যে, ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণে এই কেরলে এমন একজন জন্মেছিলেন, যাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যা এখনও সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও অবাক বিস্ময়ে ভাবতে হয় যে, মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে শঙ্করের মৃত্যু হয়—এর মধ্যেই তিনি বর্তমান যে ভারতবর্ষ, তখনকার দিনে এই ভূখণ্ড পায়ে হেঁটে পর্যটন করেছিলেন। রাস্তা ছিল না, মানচিত্র ছিল না, গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে শ্বাপদশঙ্কুল পথ অতিক্রম করে উত্তরে বদরিকাশ্রমের কাছে জ্যোতির্মঠ, পূর্বে পুরীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদামঠ ও দক্ষিণে রামেশ্বরক্ষেত্রে শৃঙ্গেরীমঠ স্থাপন করেন। হিমালয়, বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের কূল ছুঁয়ে এলেন; আর যাত্রা করেছিলেন ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত

থেকে। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলুম যে, কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল। কাশীতে তৎকালীন পন্ডিতাগ্রগণ্যদের পরাস্ত করেন। এটা কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু পায়ে হেঁটে সমগ্র ভারত পরিক্রমা—কি সে শক্তি যার ফলে এ জিনিস সম্ভব হয়েছিল!

পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য ও মাদ্রাজের মালাবার অঞ্চল নিয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছে। পুরাণে আছে—পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ থেকে এই ভূখন্ড তুলে আনেন। সেদিন কালাডিতে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শুনলাম। পন্ডিতেরা কিংবন্তীর উপর নির্ভর করে অনেক সময় ইতিহাস রচনা করেন। এই রচনার সময় কতকগুলি কিংবদন্তী গ্রহণ করেন এবং কতকগুলি বর্জন করেন। কালাডিতে যে কথা সর্বজনস্বীকৃত তা ছিল—সাক্ষাৎ শিব শঙ্করাচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কালাডির কাছে বৃষপর্বতে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির। বহু দিন সন্তানসন্ততি না হওয়ায় শঙ্করাচার্যের পিতা শিবগুরু এবং মাতা বিশিষ্টাদেবী এই চন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দিরে পুত্র কামনায় শিবের আরাধনা করেন। তাঁদের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কিরকম পুত্র চাও? স্বল্পায়ু সর্বজ্ঞ পুত্র, অথবা দীর্ঘায়ু মূর্খ পুত্র। পিতামাতা উভয়েই সর্বজ্ঞ পুত্র কামনা করেন। এই হল শঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত। জন্মগ্রহণের পর অল্প বয়সের মধ্যে শঙ্কর সর্ব শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আট বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত হয়। তিনি স্মৃতি, শ্রুতি, উপনিষদ, পুরাণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্র ও ইতিহাস পাঠ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে যে, প্রতি দিন শঙ্করের মা বাড়ি থেকে আলোওয়ে নদীতে স্নান করতে যেতেন। একদিন স্নান করে ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে, শঙ্কর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন যে, মা পথকষ্টে ক্লান্ত হয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছেন। সেইদিন সারা রাত শঙ্কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে মায়ের কষ্ট লাঘব হয়। সে বছরই বর্ষাকালে গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখে যে, নদী তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এইরকম বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শঙ্কর যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যান তখন মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, মায়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকবেন। কয়েক বছর পরে শঙ্কর যখন কালাডি থেকে বহু দূরে, একদিন তিনি মুখে মাতৃদুগ্ধের আস্বাদ পান। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—মায়ের অন্তিম সময়ে তাঁর কাছে থাকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। তিনি আকাশপথে মায়ের অন্তিমশয্যায় এসে উপস্থিত হন ও মায়ের মৃত্যুর পর শেষকৃত্যাদি নিজেই সম্পন্ন করেন।

শঙ্করের দেহাবসানের স্থান সম্পর্কেও অনেক মত-পার্থক্য আছে। এক মতে, তিনি কেরলের ত্রিচুর গ্রামে পরলোকগমন করেন; অপর মতে কাঞ্চীতে। আর একটি মত আছে যে কেদারনাথে তিনি পরলোকগমন করেন। সেখানে বসে বসেই একটি জানা কাহিনী শুনলুম যে, শঙ্কর যখন কুমারিল ভট্টের শিষ্য মন্ডন মিশ্রের সহিত শাস্ত্র আলোচনা করবার জন্য যান তখন মন্ডন মিশ্রের বাড়ির দ্বার রুদ্ধ ছিল। বারবার অনুরোধ করাতেও দরজা খোলা হয় না। দ্বাররক্ষী বলে যে, মন্ডন মিশ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন; অতএব সেদিন সাক্ষাৎ হবে না। শঙ্কর তখন আকাশপথে মন্ডন মিশ্রের বাড়ি প্রবেশ করেন। পরে দু'জনে তর্কযুদ্ধ হয়। বিচারক ছিলেন মন্ডন মিশ্রের সহধর্মিণী ভারতী দেবী।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেরলের লোকেরা বোধ হয় সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন অফুরন্ত সেইরকম গৃহস্থের বাড়িও মনে হয় গাছপালা দিয়ে সাজানো। গ্রাম এবং শহরের সব বাড়িই সাজানো-গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। অধিবাসীরা পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন অতি সামান্য। কিন্তু তার কোথাও মলিনতা নেই। বারবার করে সমগ্র কেরলের শহর এবং গ্রাম ঘুরেছি। এর পরিচ্ছন্নতার কোনও তুলনা নেই। আর একটা জিনিস বাঙালীদের লক্ষ করবার বিষয় যে, হাজার হাজার নারকেল গাছ, কিন্তু কোথাও ডাব কিনতে পাওয়া যায় না। একবার কোট্টায়ামের পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, সঙ্গে ছিল অনিল (ভট্টাচার্য) ও বরুণ (সেনগুপ্ত)। অনেক খুঁজেও যখন ডাব পাওয়া গেল না, অনিল তখন পথের পাশে একটি গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে আমরা সবিস্ময়ে দেখলুম, অনিল ফিরে আসছে—সঙ্গে দুটি লোক, তাদের হাতে ডাব। আমরা কোনও আলোচনা না করে ডাব খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়লুম। সেই খাওয়া ডাবগুলি ঐ দুজন গ্রামবাসী সযতনে নিয়ে গেল। এখানকার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মত খাওয়া ডাব ওদের কাছে বর্জনীয় নয়। সমগ্র কেরলে বহু নারকোল-ছোবড়ার শিল্প আছে। কয়েক লক্ষ লোক এই শিল্পের মাধ্যমে তাদের পরিবার প্রতিপালন করেন। অনিলকে ডাব সংগ্রহ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

কেরলে আর একটি জিনিস দেখেছিলুম—যা ভারতবর্ষের অন্য কোনও গ্রামে দেখেছি বলে মনে হয় না। গ্রামে চাষীরা ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে জমিতে চাষের কাজ করছে। একটি-আধটি গ্রামে নয়, অনেক গ্রামেই এ দৃশ্য দেখেছি। কেরলে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান তিন সম্প্রদায়ই বেশ প্রতিপত্তিশালী। সাম্প্রদায়িকতাও যথেষ্ট আছে। স্বামীজী লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কেরলেই সব থেকে বেশী। এসব সত্ত্বেও কেরলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি লক্ষণীয়। 'মালয়ালম মনোরমা' ও 'মাতৃভূমি' নামক সংবাদপত্রের প্রচার আমাদের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রের কাছাকাছি। এ কয়েক বছরের মধ্যেই বহু শিল্পপতি গিয়ে কেরালায় বৃহৎ শিল্পের কারখানা খুলেছেন। তা ছাড়া ছোটখাটো শিল্প তো অনেক আছে। অথচ রাজনীতিক অস্থিরতার জন্য কেরলের খ্যাতি (?) আছে। কোনও মন্ত্রিসভাই প্রায় পুরো সময় থাকতে পারে না। অথচ অগ্রগতি অব্যাহত। রাজনীতির ছাত্রদের কাছে এ একটি চর্চা করবার মত বিষয়।

কেরালায় একটি জিনিস দেখেছি, যা আমাদের এসব জায়গায় চোখে পড়ে না। রাস্তার ধারে সারি সারি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা। পতাকা ছিঁড়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া বা নষ্ট করার প্রতিযোগিতা নেই। কোন্ দলের পতাকা কত উঁচুতে উড়ছে তারই প্রতিযোগিতা। আমাদের এখানে পতাকা অভিবাদন হয়। ওখানে পতাকাদণ্ড পোঁতা একটা অনুষ্ঠান। এমনও জায়গা আছে—যেখানে একটা গোটা সুপারি গাছ এনে পতাকাদণ্ড করা হয়েছে। সেখানেও উচ্চতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আরও অদ্ভুদ ব্যাপার দেখলুম। আমি একটি জায়গায় সভা করছি, দেখলুম কিছু দূরে অন্য একটি দলের পতাকা নিয়ে অনেক লোক আসছে। আমি মনে মনে ভাবলুম এবার বুঝি সংঘর্ষ আসন্ন, যেমন মাঝে মাঝে আমাদের এদিকে হয়ে থাকে। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনও উদ্বেগ দেখলুম না। অনুসন্ধানে জানতে পারলুম—যে জমিতে আমাদের সভা হচ্ছে ছ'টা অবধি সেই জমি আমাদের নেওয়া আছে। তারপর সাড়ে ছ'টায় অন্য পতাকাধারী ঐ দল এসে সেখানে সভা করবে। আমাদের কাছে এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা; কিন্তু কেরলে

এ একেবারেই স্বাভাবিক। কেরলে কোথাও কোথাও এমন ব্যবস্থাও আছে যে, কন্ট্রাক্টর সভার জমি, ডায়াস, বসবার আসন এবং মাইকের ব্যবস্থা করে দেবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের বক্তা, পতাকা এবং অনুগামীদের নিয়ে যাবেন। একই মাঠে একই ডায়াসে পর পর বিভিন্ন দলের কয়েকটি সভাও হয়। সংঘর্ষের কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর কারোর মনে উদ্বেগও নেই। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব দলই তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যান। যতবারই কেরালা গেছি এই দৃশ্য দেখেছি। মনে মনে অনেক ভেবে দেখেছি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এইরকম সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলেরা আচরণ করেন না কেন?

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু গ্রামে খাদি উৎপাদন ও শহরে খাদি প্রচার আরম্ভ হয়। ১৯২৩-এ প্রফুল্লদা (সেন) বড়ডোঙ্গালে পাকাপাকিভাবে বাস করার পর ওখান থেকে ছ' মাইল দূরে খানাকুল থানার দুয়াদন্ড গ্রামকে অবলম্বন করে খাদি উৎপাদন কেন্দ্র চালু করেন। ওখানকার কাটুনীরা যখন কেন্দ্রে সুতা জমা দিতে আসত—তখন সে একটা দেখবার মত দৃশ্য। পাঁচ মাইল ছ' মাইল সাত মাইল দূরে থেকে কাদাজল ভেঙে আসত—কোনও রাস্তা তো ছিল না, বিনিময়ে পেত ছ' পয়সা, আট পয়সা, দশ পয়সা, বার পয়সা। তাতেই কি উল্লাস, কারণ জীবনে তারা এক পয়সাও রোজগার করেনি। কখনো এই ছ' পয়সার বিনিময়ে দু পয়সার সরষের তেল, এক পয়সার 'কেরাচিন' এবং তিন পয়সার লঙ্কা হলুদ নুন ও অন্যান্য সব মসলা। আর কি আনন্দ। জীবনে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, যা কখনো ভোলা যায় না। অভাব দারিদ্র্য হতাশার মধ্যে এইসব গ্রামের লোকের কাছে চরকা একটা আত্মপ্রত্যয়ের সুর এনে দিয়েছিল। আবার যারা 'স্বয়ং কাটুনী' হত, তাদের কথা আলাদা। লোকে বাড়িতে যেমন গরদ কেটে বা পাটের কাপড় আলাদা করে রেখে দেয় এবং প্রাত্যহিক পূজার সময় পরে, সেই মনোভাব নিয়েই তারা খদ্দর ব্যবহার করত। আরামবাগ খাদির খুব নাম হয়। প্রথমে দোকান হয়েছিল কোম্পানীর বাগান (বর্তমান রবীন্দ্রকানন)-এর কাছে একটা ঘরে—লেখা থাকত 'আরামবাগ খাদি বিক্রয় কেন্দ্র উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক পরিচালিত'। ঐসব কেন্দ্রে বেশ পছন্দসই পাতলা ধুতিও কিছু তৈরী হত। মোহনবাগান ক্লাবের বর্তমান সভাপতি একজন নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। পরে কোম্পানীর বাগানের পাশ থেকে উঠে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে দোকান নেওয়া হয়, নাম হয় 'খাদি মন্ডল'। এটা কালক্রমে কংগ্রেসীদের একটা বড় আড্ডায় পরিণত হয়।

দুয়াদন্ড এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু কর্মী পাওয়া যায় যাঁরা সব আন্দোলনেই যোগদান করেন। একজনের নাম মনে পড়ছে। নাম ছিল মুকুন্দ, আমরা

'প্রভু' বলে ডাকতুম। অদ্ভুত চরিত্র। প্রফুল্লদা'দের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে তাড়ি খেত এবং অন্যান্য নেশাও ছিল। তারপর সব ছেড়ে দেয় এবং সব সময়েই এক পায়ে খাড়া। এদের বাড়ি ছিল, স্ত্রী-পুত্র ছিল কিন্তু তারা যেন কংগ্রেসের কাজে সাহায্য করবার জন্যই। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র শেষ অংশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ভারতীর বাড়িতে সব্যসাচী এসেছেন। সেখানে ভারতী আছেন, সুমিত্রা আছেন, অপূর্ব আছেন, শশী আছেন। ডাক্তার ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবেন। খুব দুর্যোগ। যেমন বজ্রের আওয়াজ তেমনি ঝড় ও বৃষ্টি। হীরা সিং এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। ডাক্তার মুখ তুলে চাইলেন। হীরা সিং-এর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'রেডি।' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন 'কখন?' হীরা সিং জবাব দিলেন 'নাউ।' বিদায় সম্ভাষণ করে ডাক্তারের বেরোতে কয়েক মিনিট দেরি হল। দেখা গেল হীরা সিং সেই দুর্যোগে বৃষ্টি ও বজ্রপাত মাথায় করে খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন—ডাক্তারের সঙ্গে যাবেন। এ-চরিত্র গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি দেখেছি। মুকুন্দ ছিল এই হীরা সিং। অনুকূলদার (চক্রবর্তী) কথা আগেই বলেছি। বাড়ি আছে স্ত্রী আছে কন্যা আছে ব্যবসা আছে জমি-জায়গা আছে; কিন্তু কিছুর মধ্যেই অনুকূলদা নেই। সব সময়ই একপায়ে খাড়া। সব আন্দোলনেই জেলে গেছেন। ফলে, ব্যবসা বিষয় সম্পত্তি সবই গেছে, কিন্তু মুখের হাসিটি কোনও দিন যায়নি। এঁরা কোনও দিন দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, নির্যাতন, ত্যাগ স্বীকার—এসব কথা ব্যবহার করেননি; স্বাভাবিকভাবেই আইন অমান্য আন্দোলন করতেন, জেলে যেতেন, সর্বস্বান্ত হতেন। সেজন্য কোনও দিন কিন্তু মনে করেননি যে, বেশী কিছু করছেন; তাই দাবিবোধও কোনও দিন এঁদের মনে হয়নি। স্বাধীনতার পর আমাকে একদিন বললেন, 'অতুল্য, আমাকে কেউ কেউ বলছে যে, আমরা নাকি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। কথাটা শুনে খুব মজা লাগল। আমরা আবার ত্যাগ স্বীকার করলুম কোথায়? আমরা তো আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য কাজ করেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ব্যস, আমরা খুশী। এর আবার দেনা-পাওনার কথা ওঠে কেন? এদের সব মাথা খারাপ।'

সে সময়কার অনেক গল্প আছে। খদ্দরের মশারি ওঠেনি। সেইজন্য প্রফুল্লদা'রা অনেক সময় কেরোসিন তেল মেখে শুতেন, যাতে মশার কামড় কম লাগে। গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলারা বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, এদের মাথা খারাপ। তাঁরা খুব সহানুভূতি সহকারে প্রায়ই অনুরোধ-উপরোধ করতেন চিকিৎসা করানোর জন্য। কেউ কেউ আবার বলতেন, 'বাবারা, একবার বাড়ি ঘুরে এসো। অনেকদিন বাড়িছাড়া।' কিন্তু স্নেহের প্রাচুর্যে কর্মীরা, বিশেষ করে বাইরে থেকে যাঁরা যেতেন, তাঁরা একেবারে অভিভূত। কেউ বা বাড়ি থেকে চালকড়াইভাজা এনে দিত, কেউ বা খুদ ভেজে গুড় মিশিয়ে খুদের মোয়া, আবার পুঁইডাঁটা, একফালি লাউ বা কুমড়ো—এসবও আনতেন। একটা অতি উপাদেয় খাদ্য ছিল—নাম 'গেঁড়ি চাটুই' অর্থাৎ বিনা তেলে গেঁড়ি সেদ্ধ করে লংকা নুন দিয়ে তৈরী। পান্তাভাতের সঙ্গে অপূর্ব খেতে লাগত। আবার দুটো ন্যাটা মাছ দুটো বেলে মাছ—এইরকম মাছ ছোট-ছোট ডোবা থেকে ধরে এনেও কেউ কেউ দিয়ে যেত। আর অসুখ করলে তো কথাই নেই। তখন খুবই ম্যালেরিয়া হত। আমি গোঁড়া লেবু খাওয়ার প্রচলন করেছিলুম। বৃদ্ধাদের খুব আপত্তি। বলতেন 'বাবারা, খেও না। ওতে অকল্যাণ হবে।' নিজেদের কাজ তো নিজেদেরই করতে হত। কিন্তু অসুখ করলে ঐসব বৃদ্ধারা এসে ঘরদোর পরিষ্কার

করে কাপড়চোপড় কেচে দিয়ে যেতেন। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রভেদ ছিল না। যখন আন্দোলনের সময় এইসব খাদিকেন্দ্র পুলিস বন্ধ করে দেয় এবং ঘরগুলো তালাবন্ধ করে, তখন ঐসব মহিলারা ঝাঁটা কাটারি হাতে করে পুলিসকে কাটতে এসেছিলেন। ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। আমাদের বয়স কম, বাড়িঘরদোর ছেড়ে গেছি। ও'রা ও'দের ব্যবহারে, স্নেহে, যত্নে আমাদের মনটাকে ভরিয়ে দিতেন।

বাংলা দেশে খদ্দরের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল 'খাদি প্রতিষ্ঠান'। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্বাদপুত, এবং শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সোদপুরে অনেকটা জায়গা নিয়ে এই আশ্রম। খাদির সবরকম কাজই সেখানে শেখানো হত। চরকা তৈরি, তুলো থেকে পাঁজ তৈরি, তাঁত বোনা, বিভিন্ন রঙ তৈরি করতে শেখা। আরও ছিল মক্ষিকাপালন। কাগজ তৈরিও শেখানো হত। মনে হচ্ছে চামড়ার কাজেরও সূত্রপাত হয়েছিল। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। খাওয়া ছিল অত্যন্ত সহজ। নিরামিষ। ইকমিক কুকার প্রণালীতে ডাল এবং একটা তরকারি। তরকারি মানে কতগুলো সবজি একসঙ্গে মিশিয়ে রান্না করা নয়। আলু-আলু, পটল-পটল, কুমড়ো-কুমড়ো, লাউ-লাউ ঝিঙ্গে-ঝিঙ্গে। তার সঙ্গে প্রথম পাতে একটু ঘি এবং শেষে দই ও গুড়। ভোর চারটেয় উঠতে হত। তারপর প্রার্থনাসভা। আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে পাঁচদিন ছ'দিন করে থেকে আসতুম। চারটেয় উঠতুম কিন্তু প্রার্থনা সভায় যেতুম না। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠ সতীশবাবু সস্নেহে আমার অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে আমায় ছাড় দিয়েছিলেন। সব কাজই নিজেদের করতে হত। পায়খানার মল পরিষ্কার পর্যন্ত। গান্ধীজী তখন কলকাতায় এলে অনেক সময় খাদি প্রতিষ্ঠানে থাকতেন। সতীশবাবুর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী—তাঁর নজর ছিল সব দিকে। কার অসুখ করেছে, কার কি পথ্য দরকার—কোনটাই তাঁর নজর এড়াত না। খাদি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কাপড়ই তৈরী হত। ও'দের লক্ষ্য ছিল কম দামে যাতে খাদি বিক্রি করা যায় এবং সুতোকাটা যাতে শেখানো যায়। আর একটা বড় কাজ খাদি প্রতিষ্ঠান করেছিল। গান্ধী-সাহিত্য খুব সস্তা দরে প্রচার করা। গান্ধীজীর বই বাংলায় অনুবাদ করে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে নব্বই-এর ঊর্ধ্বে সতীশবাবু বাঁকড়োর এক গ্রামে জমির ফলনশক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন—তাঁর এখনও পরিশ্রমের অন্ত নেই। 'খাদি প্রতিষ্ঠান' আশ্রম যেখানে ছিল, তার সব জমিটি প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। অনেক লোক সেখানে বাড়ি করেছেন।

কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম'। তারও খুব নাম হয়েছিল। সংগঠক ছিলেন ডাঃ সুরেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রকে অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিছু দিন অভয় আশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্নদা চৌধুরী, দেবেনদা (সেন), নৃপেনদা (বোস), অমূল্য চন্দ্র, কিরণ সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, যাঁরা পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকে সুরেশবাবু একত্রিত করেন। এ'দেরও অনেক খাদির কাজ ছিল। তার সঙ্গে বহু গ্রামে কেন্দ্র করে স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে কর্মীরা জড়িত থাকতেন। সুরেশদা আই এন টি ইউ সি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অনেক বছর সভাপতিও ছিলেন। কিছু দিন পঃ বঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এবং পঃ বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি। আমি ছিলুম সেই প্রদেশ

কংগ্রেস কমিটির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। যতদিন সতীশবাবু, সুরেশদা, নৃপেনদা—এ'দের সঙ্গে মিশেছি, এ'দের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছি।

পৃথিবীতে কিছু লোক এমন আছেন, যাঁদের দেখলেই মনটা ভরে ওঠে এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। নির্মলদা (বোস) ছিলেন এরকম একজন লোক। প্রফুল্লদা ছিলেন আমার রাজনৈতিক বিষয়ে অভিভাবক আর নির্মলদা ছিলেন অভিভাবক। ভুল-দোষ যাই হোক না, কোনটাই নির্মলদাকে স্পর্শ করত না। কিন্তু রেহাইও ছিল না। সুবিধে পেলেই জিজ্ঞেস করতেন, 'তুমি ও কাজটা কেন করেছ হে? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটু বোঝাও তো।' ব্যস্, তিরস্কারও নেই সমর্থনও নেই। আমার মনে হত এই একজনের সদাজাগ্রত দৃষ্টি আমার সব কাজ লক্ষ করছে। স্নেহেরও অন্ত ছিল না। ভোর ছ'টার একটু আগে রাস্তায় সাইকেলের আওয়াজ হল ক্রিং-ক্রিং করে। আমরা ভাবলুম খবরের কাগজ। শুকদেব বলে উঠত যে, নির্মলদা এসেছেন। সিঁড়ি দিয়ে গলার শব্দ ভেসে আসত, 'আমি কিছু খাব না।' এসে অনেকক্ষণ অপরেশের (ভট্টাচার্য) চরকা কাটা দেখতেন। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে এক গ্লাস দুধ হাতে ধরিয়ে দিতেন। আমরা যদি বলতুম যে নির্মলদা, আপনি কিছু খাবেন না বলেও আবার খাচ্ছেন যে! অটল গাম্ভীর্য সহকারে উত্তর,—'আরে দুধ কি খাওয়া!' খানিক বাদে শুকদেব এসে বলত, 'আজকে অমুক এসেছে। গরম লুচি ভাজা হচ্ছে, আর আলুচচ্চড়ি।' সঙ্গে সঙ্গে নির্মলদা বলে উঠতেন, 'গরম আলু! আচ্ছা আনো। আচ্ছা, শুধু আলু খাব না, লুচিও নিয়ে এসো।' কে বলবে যে, ইনি গান্ধীজীর সেক্রেটারীর কাজ করেছেন। মন্দিরশিল্প ও অ্যানথ্রোপলজি সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান এবং সত্যিকারের একজন পণ্ডিত মানুষ। আমি রাঁচীতে অসুস্থ হয়ে ছিলুম। এক মাইল দূর থেকে দাঁতন করতে করতে আসতেন আর দু' মাইল দূরের ছোট্ট নদীটাতে গিয়ে মুখ ধোয়া—এ ছিল নিত্যকার অভ্যাস। অনেক অনুরোধের পর যখন ট্রাইবাল কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন, তখন কিছু দিন দিল্লীতে আমার বাড়িতে ছিলেন। আশেপাশে পার্লামেন্টের মেম্বার এসে জুটত। গম্ভীরভাবে তাদের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনা করতেন যে, কারোর বোঝবার ক্ষমতা ছিল না যে, এই লোকটির পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। সরকারী কোয়ার্টার যখন পেলেন—সেটা আমার বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে। একদিন দেখি দুপুরবেলা একটা বাটি হাতে করে আসছেন। 'ওহে, ঝিঙেটা বড্ড ভাল রান্না হয়েছে।' খেতে খেতে ভাল লেগেছে। হেঁটে চলে এসেছেন। এই ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বোস। গান্ধীজীর সেক্রেটারী, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। নির্মলদা বোলপুরে খাদির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। খাদির কাজ বন্ধ—তবে জায়গাটা ট্রাস্ট করে দিয়ে গেছেন।

নৃপেনদা এই বয়সে এখনও খাদির কাজ চালাচ্ছেন। অভয় আশ্রমের সে জৌলুস আর নেই, কিন্তু নৃপেনদা আগে যা ছিলেন, এখনও তাই আছেন। ১৯৪২-এ জেলখানায় আমি যখন অত্যন্ত অসুস্থ হই, নৃপেনদা চপলকে (তালুকদার) নিয়ে যে যত্ন করেছিলেন একমাত্র মায়েরাই সেরকম যত্ন করতে পারেন। কুমিল্লায় চিকিৎসাশাস্ত্রে খুব নাম হয়েছিল। দেশবিভাগের পর চলে আসেন। সবই বদলে গেছে, মানুষটি এখনও বদলাননি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেভাবে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখনও মনোভাব তা থেকে একটুও বদলায়নি।

নিয়মমাফিক জ্বরে ভুগছি। প্রতি বছরই বর্ষার তিন-চার মাস আমাকে জ্বরে ভুগতে হয়। ডাক্তারদের নির্দেশে প্রতি বছরই আমাকে জ্বর সারাবার জন্য শুকনো জায়গা—যেমন রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডার্মা, গিরিডি এইসব জায়গায় গিয়ে মাস-খানেক থাকতে হ'ত। একবার ব্রঙ্কাইটিস থেকে নিউমোনিয়া হয়, তার ফলেই এই বিপত্তি। বর্ষাকালে বুকটা বেশ ভরে ওঠে। একে ডাক্তাররা নাম দেন 'ব্রঙ্কিয়াল প্যাচ'। জ্বরের মধ্যেই মোহনলাল (সুখাড়িয়া) একদিন দেখতে এলেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মোহনলাল রাজস্থান যাবার অনুরোধ করলেন। বললেন যে, শুকনো জায়গায় গেলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। আমি তো হাসি চাপতে পারলুম না। 'গ্রীষ্মকালে কেউ রাজস্থান যায় ? তোমার মাথা খারাপ।' এইসব কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় আমার ডাক্তার অমরনাথ (মুখোপাধ্যায়) এলেন। মোহনলালের কাছে সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন, 'এবার আর ছোট-নাগপুর নয়, এবার রাজস্থানই যান; আমারও আর একবার রাজস্থান দেখা হয়।' অগত্যা রাজস্থান যাওয়াই স্থির হল। জয়পুর থেকে দেড় মাইল দূরে একটা গ্রামের মধ্যে ছিলুম। শরীরের উপর জায়গাটার আশ্চর্য রকম প্রভাব দেখা গেল। সাত দিনের মধ্যে জ্বর সেরে গেল এবং একটু একটু বেড়ানো সম্ভব হল। সেবার অনেক দিন ছিলুম—আর হাতে প্রচুর সময়। কোনো কাজ তো ছিল না! যে বাড়িতে ছিলুম তার আশেপাশে কোনো বাড়ি ছিল না, চাষের জমি। বর্ষার সময় জল পেয়ে চতুর্দিক সবুজে সবুজ। আর অজস্র ময়ূর। ময়ূরের ডাকটা যদি বাদ দেওয়া যায় তা হলে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর জীব পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ময়ূর আগেও দেখেছি, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ দেখলুম, আর সেও ডজনে-ডজনে।

রাজস্থান বাঙালীদের কাছে অনেকটা তীর্থস্থানের মত। রাজস্থানের চারণ-কবিরা যেমন পূর্বে দেশপ্রেমের গান গাইতেন, বাংলা দেশের বহু ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকও রাজস্থানের উপর তেমনি কত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, ছড়া লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর তা ছাড়া সাবিত্রী পাহাড়ে বাঙালী মেয়েরাই যায়। অন্যান্য রাজ্যের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। যত বাঙালী নাথদ্বারে যায় তার চেয়ে বেশী যায় চিতোরে—পদ্মিনীর জহরব্রতের জায়গায়। একবার গেলুম হলদিঘাট। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, কাজে কাজেই যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হল না। আমরা সারা দিন রইলুম। খাওয়া হল একটা গাছপালা-ঢাকা জায়গায় রান্না করে। গ্রামবাসীরা বললেন, অনেক বাঙালী আসেন আর তাঁরা যাবার সময় খানিকটা করে হলদিঘাটের মাটি নিয়ে যান। এক জায়গায় 'চৈতকের চবুতারা' আছে। কথিত আছে যে, রানা প্রতাপ যখন তাঁর প্রিয় অশ্ব চৈতকের পিঠে চেপে হলদিঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, চৈতক একটা গভীর খাদ লাফিয়ে পার হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। গ্রামের লোক কত কথাই বললো, কত গল্পই করলো।

সাধারণ লোক চাঁদা দিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর বেদী তৈরী করে চৈতকের মূর্তি স্থাপন করেছেন। সেখানেও বাঙ্গালীরই ভিড় হয় বেশী।

আশেপাশে প্রায় পনেরো-কুড়িখানা গ্রামে খুব গোলাপ ফুলের চাষ হয়। কথিত আছে—ওই জায়গায় এসে মোগল সম্রাটের সেনাপতি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং প্রায় দু' বছর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঐখানেই থাকেন। সেই সময় তাঁরা আশেপাশে অনেক গোলাপ গাছ বসিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঐখানে গোলাপ গাছের উৎপত্তি। আর তার আয়েতেই পনেরো কুড়িখানা গ্রামের এখনও জীবিকা নির্বাহ হয়। মোহনলালের স্ত্রী ইন্দু অপূর্ব মহিলা। গ্রামের লোকের সঙ্গে এমনভাবেই মিশলেন যে, মনে হল যেন তাদের মধ্যেই বাস করেন। ইন্দুর যা কার্যক্ষমতা দেখেছি তা ভোলবার নয়। উদয়পুরে যেখানে মোহনলাল বাড়ি করেছে, সেটা একটা পোড়ো জলা জায়গা। ইন্দুর একার চেষ্টায় সেখানে প্রচুর সবজি হয়। আর বহু আঙ্গুরের লতা। পোড়ো জায়গা দেখে এসেছিলুম, পরেরবারে গিয়ে দেখলুম কৃষিতে সমৃদ্ধ। এই জায়গার উৎপন্ন সবজি বিক্রি করে ওখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে এক গ্রামের মধ্যে ইন্দু গম চাষ আরম্ভ করেছে। একবার আমেদাবাদ যাবার পথে উদয়পুরে নেমেছিলুম। বাড়িতে গিয়ে শুনলাম গমের খামারে আছে। অন্য গাড়ি যায় না; একটা জীপ নিয়ে গেলুম। একটা অতি ছোট গ্রাম—তারই খানিকটা নিয়ে গমের চাষ। দূর থেকে দেখতে পেলুম গম ঝাড়াই-এর কাজ হচ্ছে। অনেকগুলি লোক; তার মধ্যে একজনের কাপড়-জামা সাদা ধবধবে। কাছে গিয়ে চিনতে পারলুম—মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল। তাঁর স্ত্রী ইন্দু কয়েকজন কৃষাণের সঙ্গে গত চার দিন ধরে এ কাজ করছেন। আমি যেতেই দুজনে হই-হই করে কাছে চলে এলেন। তারপর আমরা গিয়ে দুটি ছায়াবহুল গাছের নিচে কয়েকটা খাটিয়া পাতা ছিল, তাতে বসলুম। কাছেই দোচালা টিনের ঘর একখানা, তার সঙ্গে রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। এইখানেই গত চার দিন ওঁরা বাস করছেন এবং মাঝে মাঝে এসে থাকেন। অবশ্য ইন্দুর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। জয়পুরে মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে তাঁকে খাবার ঘরের টেবিলে খুব কম দিনই দেখেছি। তাঁর খাওয়ার আসর বসে রান্নাঘরে। পরিচারক-পরিচারিকা ও আরও দু-চারজন আশপাশের বর্ষীয়সী মহিলাও থাকেন। সবাইকার হাতে থালা। গরম গরম রুটি সেঁকা হয়; খাওয়া ও তার সঙ্গে গল্প। খাওয়া অতি সাধারণ। রুটি, ডাল, একটা সবজি। মাঝে মাঝে মাছ বা মাংস। মোহনলাল নিরামিষ খাওয়াই পছন্দ করতেন কিন্তু ইন্দু এবং ছেলেমেয়েরা আমিষভোজী। রাজস্থানে তো আগে কিছুই পাওয়া যেত না। ভূট্টা আর সবজির মধ্যে ছিল পদ্মবীজ। অবশ্য ভুট্টার নানারকম খাবার তৈরী হত। রাজস্থানের মন্ত্রী মথুরাদাস মাথুর নিজে খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। একবার ভুট্টারই চোদ্দ রকম পদ করে খাইয়েছিলেন। ভাকড়া বাঁধের কল্যাণে এখন প্রচুর সবজি হয় এবং সর্বত্রই পাওয়া যায়। গঙ্গানগর জেলায় বর্তমানে মাল্টা এবং মোসম্বি জাতীয় লেবু প্রচুর ফলে এবং বাইরে চালানও যায়।

গমের খামার থেকে রাত্রে আমায় চলে আসতে হল উদয়পুর শহরে। ওঁরা দুজনেই আমাকে থাকতে দিলেন না। উদয়পুর শহরে আগেও বহুবার গেছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম শহর। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর বড় বড় লেক। আমার মনে হয় উত্তর ভারতের মধ্যে উদয়পুরই সবচেয়ে পরিষ্কার এবং সৌন্দর্যশালী শহর। প্রকৃতিই যেন সাজিয়ে রেখেছেন। বিশেষ করে বর্ষাকালে শোভা হয় অতি মনোরম। উদয়পুর হল মানিকলাল বর্মার জায়গা। যখন অন্যান্য

দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি তখন উদয়পুরের মহারানার নেতৃত্বে উদয়পুর ও আরও বারোটি রাজ্যের ভারতভুক্তি হয়। মানিকলাল বর্মা ছিলেন তার সংগঠক। নম্র বিনয়ী অথচ দৃঢ়চেতা মানুষ। রানা প্রতাপ যেখানে জন্মেছিলেন সেইখানে একটা টিলার উপর রানা প্রতাপের একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মূর্তিকে ঘিরে চারদিকে ছোট্ট বাগান। শুনলাম যত দর্শক আসে তার বেশির ভাগই বাঙ্গালী।

চিতোরে গিয়ে হাজির হলুম। আগেও এসেছি, কিন্তু এবারে হাতে অনেক সময়। চিতোর দুর্গের সাতটি তোরণ প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছিল; এখন মেরামত হয়েছে। দুর্গের আয়তন বিশাল। দুর্গের সীমানার মধ্যেই এখনও অনেকগুলি গ্রাম আছে। গ্রামবাসীরা কতরকম গল্প করলেন। বেশির ভাগই রানাদের শৌর্যবীর্যের গল্প। সব কথা ছাপিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে দুজন মহীয়সী মহিলার গল্প করলেন; সে কতরকমের গল্প। একজন হলেন ধাত্রী, আর একজন হলেন রাজমহিষী। উদয়-সিং-এর মা কর্ণবতী যখন জহরব্রত নিয়ে নিজের জীবনকে আহুতি দেন, তখন ধাত্রী পান্নাকে বলে যান, 'আমার ছেলেকে দেখো, তোমার ওপর ভার রইল।' পরে রণবীর যখন মেবার রাজ্যের রক্ষক হন তখন তিনি উদয় সিংকে হত্যার সংকল্প করেন। ধাত্রী পান্নার মহা মুশকিল। উদয় সিংকে নিয়ে পালিয়ে যাবার উপায় নেই এবং তার মৃত্যু আসন্ন। চিন্তায় কোনো পথ পায় না। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। একেবারে দিশাহারা। তারপর কঠিন সংকল্পে এই রাজপুত মহিলা মনঃস্থির করে ফেললেন। গভীর রাত্রে রণবীর যখন উদয় সিংকে কাটতে এলেন, একই-রকম বিছানায় শোয়া সমবয়স্ক নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। এক দিকে প্রভু-ধর্ম, অন্য দিকে নিজের গর্ভজাত সন্তান। নিজের গর্ভজাত সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া প্রভুর সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও এরকম ঘটেছে কি না জানি না। কোনো ভাষাতেই এ কাজের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারা যায় না। এ এক অনন্যসাধারণ প্রভুভক্তি।

আর নাম শুনলুম রাজমহিষী মীরার। গল্প আছে যে, মীরা যখন একেবারে শিশু তখন বাড়ির সামনে দিয়ে খুব সেজেগুজে বর ও বরযাত্রী যাচ্ছিল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে আব্দার ধরলো—আমারও অমনি বর চাই। দু' দিন গেল, পাঁচ দিন গেল, দশ দিন গেল, মীরা কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানল না—সেই আব্দার ধরেই আছে। মীরার বাবা ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। মীরাকে কোনো রকমেই বোঝাতে না পেরে একটি কৃষ্ণমূর্তি তাকে দিয়ে বললেন—এই তোমার বর; একে ভাল করে সাজাও, যত্ন কর, তা হলে বরও তোমাকে খুব ভালবাসবে। সেই থেকে আরম্ভ হল মীরার কৃষ্ণভজনা। তিনি আকুল কণ্ঠে গান করেন—

'প্যারে দরশন দিজ্যো আয় তুম বিন রহো না যায়।
জল বিন কমল, চন্দ্র বিন রজনী, ঐ সে তুম দেখ্যা বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন, বিরহো কলিজা খায়॥'

অশেষ রূপলাবণ্যময়ী মীরার বিবাহ হল যুবরাজ কুম্ভের সঙ্গে। পিতার মৃত্যুর পর কুম্ভ মেবারের রানা হলেন। মেবারের রানারা শৈব। আর রানার সহ-ধর্মিণী বৈষ্ণব। স্বাভাবিকভাবেই অশান্তি সৃষ্টি হল। কালক্রমে কুম্ভের পক্ষে মীরাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। একদিন মাহারানা কুম্ভের কানে এলো মীরার ভজন—

'মেরে তো গিরিধর গোপাল দূসরা না কোই।
মাতা ছোড়ী, পিতা ছোড়ে, ছোড়ে সগা সোই॥'

রানা কুম্ভ আর সহ্য করতে পারলেন না। মীরা মেবার থেকে নির্বাসিতা হলেন। মীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মেবার ত্যাগ করে বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে মীরার দোঁহা ছড়িয়ে পড়ল। রোজ অগণিত বৈষ্ণবের সমাগম হতে থাকে। শেষ জীবনে মীরা দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণমন্দির স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, রানা কুম্ভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মীরাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দ্বারকায় যান। মীরা তাঁকে দেখে ঠাকুর প্রণাম করবার জন্য মন্দিরে ঢোকেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, মীরা তখনও মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন নি। তখন মন্দিরের দ্বার ভেঙে রানা কুম্ভ এবং তাঁর সঙ্গীরা দেখেন যে, মন্দিরের মধ্যে মীরা নেই। তাঁর দেহ শ্রীকৃষ্ণের দেহের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। খালি মীরার ওড়নাখানি দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পড়ে রয়েছে। চিতোরে মীরার মন্দির আছে। সেখানে অনেক রাত অবধি মীরার ভজন শুনেছিলুম। পরিবেশটা অদ্ভুত লাগছিল।

চিতোরে যেসব দর্শক যান তাঁদের অধিকাংশই বাঙালী এবং বাঙালী মহিলারা সকলেই একটা পাঁচিলে-ঘেরা জায়গা থেকে খানিকটা মাটি তুলে আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসেন। পদ্মিনীর জহরব্রতের জায়গা। পাঁচ শ কি ছ'শ মহিলা জহরব্রত নিয়েছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু অসম্মান এবং অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পদ্মিনী ও রাজপুত মহিলারা যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক নেই। জায়গাটা দেখলে মন এখনও শিউরে ওঠে। সজ্ঞানে সশরীরে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন এবং সে কাজ সহাস্যে—কতখানি মর্যাদাবোধ থাকলে তবে যে এটা সম্ভব তা আমাদের সমাজকে শিক্ষা করতে হবে। সমাজে মেয়েদের এখনও কোনো মর্যাদা নেই। বাড়ি থেকে যখন গরু-ছাগল যায় তার বদলে আমরা টাকা পাই। বাড়ি থেকে যখন মেয়ে যায় তার সঙ্গে টাকা দিতে হয়। এই কলঙ্কময় অধ্যায় সমাজজীবনে এখনও প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতামাতা যতই শিক্ষিত হন, পাত্রপাত্রী যতই আদর্শবাদী হন—এই কদাচারের যূপকাষ্ঠে সকলেই সসম্ভ্রমে নতিস্বীকার করেন। মনে হয় এই সমাজের আর পরিবর্তনের কোনো আশা নেই। পুরুষদের দ্বারা এ অনাচার কখনও দূর হবে আমি মনে করি না। একমাত্র মেয়েরাই নিজেদের তেজস্বিতায় সমাজ থেকে এ গ্লানি দূর করতে সক্ষম।
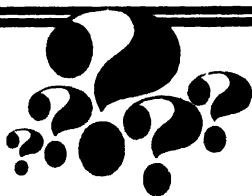
ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস-সেবী মোরারজীভাই-এর নাম করেন। আমরা কয়েকজন লালবাহাদুরের নাম করি। আবার বোম্বাইয়ের এক জনসভায়

এস কে পাতিল প্রভৃতি আমার নাম প্রস্তাব করেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র মারফত জানিয়ে দিই—আমার নাম যেন না করা হয়, আমি প্রার্থী হব না। কিন্তু সংবাদপত্রে আমার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও দুখানি কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত সাপ্তাহিকে উল্লেখ করা হয় যে, আমরা জওহরলালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালকে চিঠি দিই যে, তাঁর সমর্থনপুষ্ট দুইখানি পত্রিকায় এইসব অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। জওহরলাল উত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন, -'You appear to think that in my opinion your activities are directed against me or are prejudicial to the interest of the Congress I can assure you that at no time have I thought that your activities were directed against me. I have considered you always a dynamic and leading personality of the Congress and one who has played a dominating role in Bengal. I have not the slightest grievance against you. Sometimes I have thought that you have been a little hard on people in the Bengal Congress who may not have wholly agreed with you. Even so, I had not enough knowledge to judge.'

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে ঐ চিঠিতেই লেখেন, 'When Prafulla Sen wrote to me about you, I replied to him quite frankly that while normally I would have welcomed your candidature, in the particular circumstances now I thought that Kamraj would be the best person for us to choose. I had, as a matter of fact, not mentioned Kamraj's name to anybody else except, I think, Lal Bahadur Shastri.

'I am sorry that you should have suspected me of holding views about you which are far from true. If I had any grievance against you I would have spoken to you myself directly. You have been in all these years a tower of the Congress, especially in West Bengal, and I have admired your energy and ability in Congress work.'

মুশকিল হল কামরাজের ইচ্ছা ছিল যে, লালবাহাদুর কংগ্রেস সভাপতি হন। লালবাহাদুরের কিন্তু ঘোরতর অসম্মতি। দিল্লীতে আমরা তিনজনে—আমি, শ্রীনিবাস মালিয়া ও লালবাহাদুর—এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। শেষে স্থির হল—আমরা কয়েকজন কামরাজের সঙ্গে মিলিত হব এবং তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। কিছুদিন বাদে তিরুপতিতে আমি, মালিয়া, কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডি, নিজলিংগাপ্পা মিলিত হলুম। আমাদের সঙ্গে আরও অনেকে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী সরস্বতী পণ্ডিত, তাঁর কন্যা শ্রীমতী সারদা মুখোপাধ্যায়—বর্তমানে অন্ধ্রের রাজ্যপাল, শ্রীরাজাগোপালন—একাধিকবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্রন— বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বদু, আমার পুত্রবধূ এবং আরও অনেকে। শ্রীনিবাস মালিয়া ছিলেন জওহরলালের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক—১৯৫২-তে যখন জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি তখন লালবাহাদুরের সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। আর বহু বছর পার্লামেন্টে কংগ্রেসের ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন।

তিরুপতির বর্ণনা বহুভাবে বহু জায়গায় বেরিয়েছে। এখানে এসে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। অনেকে তিরুপতিতে মাথা ন্যাড়া করেন। সে বছর এই চুল বিক্রি করে তিরুপতির আয় হয়েছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা। এখন নাকি সত্তর লক্ষে পেঁীছেছে। আমি ১৯৬৩-র কথা বলছি, তখন মন্দিরের আয় ছিল বারো কোটি টাকা। এখন নিশ্চয়ই আরও অনেক কোটি বেশী। অথচ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দির যেমন বিশাল ও বিরাট, এ মন্দির তার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়—তার ওপর মন্দির। নীচে থেকে উঠতে হয়। সে রাস্তাটি প্রায় বারো মাইল। রাস্তাটি তিরুপতির নিজস্ব। এখানে যেসব বাস চলাচল করে তাও তিরুপতির নিজস্ব। নীচে কলেজ, মহিলা কলেজ, মেডিকেল কলেজ, দুটি বড় বড় ইস্কুল, হাসপাতাল--সবই তিরুপতির আয় থেকে পরিচালিত হয়। নীচে বাজার, হোটেল, আর কতকগুলি বড় বড় 'চউর'—অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের থাকবার জায়গা। পাহাড়ের ওপর পরিবেশ অতি মনোরম। একটি ছোট পুকুর আছে, কুণ্ড এবং ঝর্নাও আছে। আর একটি অভিনব ব্যবস্থা দেখলুম। যে-কোনও ভক্ত বাড়ি করতে পারেন। বাড়ি এগারো মাস ভোগদখল করবেন তিরুপতি, আর এক মাস ভক্তের দখলে। ভক্তের মৃত্যুর পর বাড়িটি তিরুপতির সম্পত্তি হয়ে যাবে। ছোট ছোট বাড়ি চমৎকার। দুখানা ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি স্নানের ঘর। তখন প্রতি দিনের ভাড়া ছিল দু' টাকা। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা বেশী যাতায়াত করতেন তাঁরা আগে থাকতে চিঠি লিখলে তাঁদের তিন দিনের জন্য একটি বাড়ি দেওয়া হত। চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি।

মন্দিরের গর্ভগৃহে ভেঙ্কটেশ বা বালাজীর মূর্তি। কালো পাথরের অনুপম কমনীয় মূর্তি। সাত ফিট উঁচু, পূব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, চারটি হাত। এ মন্দির কখনও লুণ্ঠিত হয়নি, তাই এতে যে কত সোনা-রূপো হীরা-চুনি-পান্না আছে তা একমাত্র ন্যাসরক্ষকরাই জানেন। মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গ গহনায় সাজানো হয়। সপ্তাহে এক দিন খালি ফুলের গয়না। মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প চালু আছে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণে মতান্তর হয়। লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চলে যান। এবং নারায়ণ এই পাহাড়ের উপরে এসে বাসস্থান করলেন। স্থানীয় এক রাজার গোরুগুলি গোচারণের পর যখন ফিরে যেত তখন দেখা যেত বাঁটে দুধ নেই। অনেক অনুসন্ধান করে টের পাওয়া গেল যে, গাভীরা নিজেরা এসে নারায়ণের মাথায় সব দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। রাজা সেইখানেই মন্দির করে নারায়ণকে স্থাপন করেন। এ হল গল্পকথা। যে লেখা অনুশাসন পাওয়া যায় তাতে অষ্টম শতাব্দীর উল্লেখ আছে। পরে শৈব এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে মন্দির নিয়ে অনেক বিতণ্ডা হয়। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ আসেন। তখন থেকেই নারায়ণ বিগ্রহ বলেই এঁর পরিচয়। কাছে যে পুকুরটি আছে তার নাম স্বামী পুষ্করিণী। ওখানকার সকলেই বলেন--এই পুকুরে স্নান করলে সব রোগ ভাল হয়, মায় পাগলামি। পুকুরের গল্পটি আরও ভাল। নারায়ণ এখানে চলে আসবার পর নারায়ণের স্নান করার জন্যে গরুড় পুষ্করিণীটি বহন করে নিয়ে আসে।

আমরা পাঁচজন—কামরাজ, শ্রীনিবাস মালিয়া, নিজলিঙ্গাপ্পা, সঞ্জীব রেড্ডি ও আমি--দু' দিন ধরে আলোচনা করলুম। প্রায় অচল অবস্থা। শেষে আপস সূত্র পাওয়া গেল। কামরাজ লালবাহাদুরকে রাজী করাবার চেষ্টা করবেন এবং তাঁর নাম প্রস্তাব করবেন। লালবাহাদুর যদি কোনও মতে সম্মত না হন তা হলে আমি কামরাজের নাম উত্থাপন করবো। একটি শর্ত ছিল যে, ওয়ার্কিং কমিটির

মিটিং-এর আগে জওহরলালকে সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। তারপরের ঘটনা সর্বজনবিদিত। কামরাজের নামই প্রস্তাবিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। আমাদের এই তিরুপতি যাওয়া নিয়ে পরে অনেক উদ্ভট কথা উঠেছে। এক খ্যাতনামা সাংবাদিক—যিনি পরে সম্পাদক হয়েছিলেন, তিনি—জওহরলালের মৃত্যুর পর একটি বইয়ে লেখেন যে, আমাদের সঙ্গে লালবাহাদুরও তিরুপতিতে উপস্থিত ছিলেন। এর সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য সাংবাদিকদের এক মস্ত গুণ—তাঁরা অপরের মিথ্যা প্রমাণ করতে যত তৎপর, নিজেদের মিথ্যা স্বীকার করতে তাঁদের অনাসক্তি অধিকতর প্রবল। তিরুপতিতে আমাদের উপস্থিতি নিয়ে বোম্বাইয়ের এক সাপ্তাহিক লেখে যে, আমরা 'সিনডিকেট' (?) গঠন করবার জন্যই তিরুপতিতে সমবেত হয়েছিলুম। জওহরলালের চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা তিরুপতি গিয়েছিলুম। কিন্তু সে কথা শোনে কে!

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হবার পর ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়নি। সেই সময়েই শ্রীমতী ইন্দিরার ধারণা হয় যে, সি পি আই-কে সঙ্গে না নিয়ে কাজ করলে কংগ্রেস আর কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। এবং পরে লোকসভা নির্বাচনেও বিপর্যয় হতে পারে। সি পি আই-কে সঙ্গে নেওয়ার পথে সব চেয়ে বড় বাধা ছিলুম আমরা কয়েকজন। অতএব বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ও রেডিও মারফত অনবরত প্রচারিত হতে লাগলো যে, প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রবীণ নেতাদের না সরিয়ে দিলে কংগ্রেসের বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী রূপায়িত হতে পাবরে না। যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারে বহু বছর মন্ত্রী আছেন তাঁরা এইসব রটনা আরম্ভ করলেন যাঁরা কোনও দিন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন না তাঁদের বিরুদ্ধে। আমার কথা তো আলাদা। আমার বন্ধুবান্ধবদের মর্মান্তিক দুঃখ যে, আমার মৃত্যুর পর তাঁরা শোকপ্রস্তাবে লিখতে পারবেন না, ইনিও একজন মন্ত্রী ছিলেন। যাঁদের বিরুদ্ধে শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন কামরাজ। অথচ কামরাজ যখন কংগ্রেস সভাপতি সেই সময়েই (১) রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ, (২) শহরে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (ceiling of urban property), এবং (৩) শস্যবীমা প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাবই কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার আগেই গৃহীত হয়েছিল। 'প্রিভি পার্স' রদের প্রথম বই ভারতবর্ষের কংগ্রেসীদের মধ্যে আমি লিখি এবং তা প্রকাশিত হয় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে। ১৯৬৩ সালে সাতজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি আর কামরাজ জওহরলালকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব দিয়েছিলুম। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়; কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরার অধিনায়কত্বে মন্ত্রিসভা তার রূপ দিতে সক্ষম হননি। মন্ত্রিসভার এই শৈথিল্যের জন্য 'সিনডিকেট'কে (?) বলা হল প্রতিক্রিয়াপন্থী আর যাঁদের অকর্মণ্যতার জন্য প্রস্তাবগুলি রূপ গ্রহণ করতে পারলো না তাঁরা হলেন বিপ্লবী ও অগ্রগতির অগ্রদূত।

কামরাজের মৃত্যুর পর শ্রীমতী ইন্দিরা ও তাঁর সহকর্মীগণ সোচ্চারে বলে উঠলেন যে, কামরাজ নিজে কংগ্রেসে যোগদান করতেন এবং তাঁরই অধিনায়কত্বে তামিলনাড়ুর সংগঠন কংগ্রেস কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হত। এ প্রচারের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৬৩-এর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে কামরাজ আমাকে

বলেন যে, 'জয়প্রকাশকে সমর্থন করতে হবে। আমি যেন কলকাতা থেকে সমর্থন করে বিবৃতি দিই, তিনি বাঙ্গালোর থেকে বিবৃতি দেবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিই যে, আমি বর্তমানে প্রায় অন্ধ। আমার পক্ষে কোনও সক্রিয় কাজ করা সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁর বিবৃতিতে তিনি আমার নাম উল্লেখ করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে আমি সইও দিতে পারি। কামরাজ আমায় জানান যে, তিনি মাদ্রাজে গিয়ে আমায় খবর দেবেন। কামরাজ মাদ্রাজ থেকে আমায় খবরও দিয়েছিলেন। যিনি বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এখনও জীবিত। কিন্তু যে সময়ে কামরাজ আমাকে মাদ্রাজে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন সে সময় পর্যন্ত কামরাজ আর অপেক্ষা করতে পারেননি—তার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

পৃথিবীতে এমন এমন মিথ্যা প্রচারিত হয় যার প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। দক্ষিণের কয়েকজনকে বাদ দিলে আমি ছিলুম কামরাজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোক। যে প্রচারকে অবলম্বন করে শ্রীমতী ইন্দিরা ও তাঁর সহকর্মীগণ তামিল-নাড়ুর সংগঠন কংগ্রেসকে ভাংগতে চেয়েছিলেন সে যে কত বড় মিথ্যা তা তামিল-নাড়ুর দুই কংগ্রেসের কর্মীরাই জানেন। কিন্তু সরকারী প্রচারযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এমনভাবে সরবে ও সশব্দে মিথ্যা প্রচার হয়েছিল যে, অনেকের বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কামরাজ সব সময়েই বলতেন যে, দরকার হলে আমরা যেমন অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিশেষ বিশেষ কাজকে রূপ দেবার জন্যে একযোগে কাজ করি, সেইরকম সংগঠন কংগ্রেসও ক্ষেত্রবিশেষে কংগ্রেসের সঙ্গে 'অ্যালায়েন্স' করতে পারে।
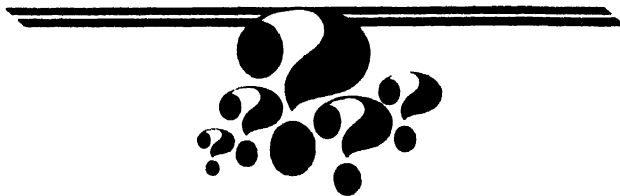
১৯৪২ সালে 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগে আমার জন্যে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটি মেসে ঘর নেওয়া হয়। পঞ্চুদার মতে (ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়), আমার জেলে যাওয়া বা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা অনুচিত হবে। কিন্তু পঞ্চুদার কথায় তো ইংরাজের সাম্রাজ্য চলতো না। অতএব আন্দো-লন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নামে ওয়ারেন্ট বার হয়ে পড়েছিল। আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কারণ, আমি তো বাস করতুম কংগ্রেস অফিসে। কলকাতার ঐ মেসে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত আরম্ভ করি। এবং যেসব জায়গায় আন্দোলন হচ্ছিল সেইসব জায়গার সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মেসবাড়িটি যে ভদ্রলোকের তিনি তেতলায় থাকতেন, একতলা ও দোতলা নিয়ে মেস। আমি স্বনামেই ছিলুম, আর একখানি ভাল আলো-বাতাসযুক্ত ঘরও পেয়েছিলুম। কালক্রমে আমার নাম বিশেষ কেউ জানতো না, সকলেই দাদা বলেই ডাকতো। মেসে দু-তিনজন আমার প্রকৃত পরিচয় জানতেন। আর বাকি সকলের ধারণা ছিল—আমি শরীর খারাপের জন্য আছি, আর কলকাতায়

ব্যবসা উপলক্ষে কিছু কাজকর্ম আছে। সাধারণত রাত্তিরে বেরোতুম না। আমাদের ধারণা ছিল—দিনের বেলা কলকাতায় লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়ায়, অতএব পুলিসের নজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল কম। সন্ধ্যের পর ছিল মেসের লোকেদের তাস-দাবার আড্ডা, আর সকালে ছিল কিছু ছাত্রদের পড়াশুনোর জায়গা। দুপুর আর বিকেলে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত লোকেরা আসতেন। তবে তাঁরা ভিড় করে আসতেন না। সেইজন্য কারোর মনে কোনরূপ সন্দেহ হয়নি। এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল, মধ্যে হয়তো তিন-চার মাস জেলও খেটে এসেছেন। মেসে সকলেই ছিলেন প্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। আমার শরীর অসুস্থ, কিন্তু কোনও দিন সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি হয়নি।

ঘোরাঘুরিও বেশ ছিল। জামশেদপুরে গিয়েছিলুম টাকা তুলতে। আন্দোলনের কাজে হুগলী জেলার বহু জায়গায় এবং বর্ধমান, মালদহ ও বাঁকুড়া জেলাতেও যাতায়াত ছিল। ঐসব জেলায় গিয়ে যাঁদের বাড়ি উঠতুম তাঁদের আতিথেয়তায় কোনও দিন কার্পণ্য দেখিনি। বিপদের সম্ভাবনা জেনেও তাঁদের মনে কোনও দিন কুণ্ঠা বা ভীতি লক্ষ করিনি। কলকাতায় মানিকতলা বাজারের ওপরের একটা ঘর থেকে নিয়মিত বুলেটিন ছাপা হত। এ কাজের দায়িত্ব ছিল বদ্রু, অখিলেশ (ভট্টাচার্য) ও অপরেশের (ভট্টাচার্য) ওপর। কিছু দিন বাদেই বুলেটিন ছাপার স্থান বদলাতে হয়। কাছেই একটা বাড়িতে আমার স্ত্রী তখন বাস করতেন। সেই বাড়ি থেকেই বুলেটিন ছাপা আরম্ভ হয়। একদিন আমি হাওড়া স্টেশন থেকে বরাবর ঐ বাড়িতে আসি। বাড়িতে দু'দিক দিয়েই আসা যেতো—সারকুলার রোড দিয়ে এবং বিডন স্ট্রিট দিয়ে। আমি বিডন স্ট্রিট দিয়ে ঢোকবার সময় মনে হল পুলিসের নজরে পড়েছি। বাড়িতে ঢুকেই একটি ছেলেকে দেখতে পাঠানো হল। সে এসে বললে যে, দু'দিকেই পুলিস বসেছে—সারকুলার রোডের দিকে এবং বিডন স্ট্রিটের দিকে। আমার পুলিসের বুদ্ধির ওপর অসীম শ্রদ্ধা (?) ছিল, সেজন্য আমি কিছু বাদে সারকুলার রোডের দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যা ভেবেছিলুম তাই। আমি বিডন স্ট্রিট দিয়ে ঢুকেছিলুম বলে সেই দিকেই পুলিসের নজর, আর সারকুলার রোডের পুলিসেরা বেশ নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল। আমি নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলুম। অপরেশ প্রভৃতি তখন সাইক্লোস্টাইল মেশিন সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে সময় জেলে যাওয়ার লোক পাওয়ার অসুবিধা ছিল না, কিন্তু সাইক্লোস্টাইল মেশিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বদ্রুদের বাড়ির একজন পুরোনো চাকর যমুনা বস্তায় করে প্রথমে নিয়ে গেল ঘুঁটে, তারপর নিয়ে গেল গুল, তারপর নিয়ে গেল সাইক্লোস্টাইল মেশিন। পুলিস প্রথমটা টিপে-টাপে দেখেছিল : ঘুঁটে আর গুল দেখে কিছু বলেনি। দেখা গেল যে, আওরঙ্গজেবের সময় প্রহরীরা যেমন বুদ্ধিমান (?) ছিল, '৪২ সালে ইংরাজের পুলিসরা তাদের চেয়ে কিছু কম বুদ্ধিমান নয়। সে গিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজী, এ গেলেন সাইক্লোস্টাইল মেশিন। আকাশপাতাল তফাৎ। কিন্তু পদ্ধতিটা এক।

১৯৪২ সালের ৭ই-৮ই আগস্ট বোম্বাই শহরে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকে–'The peril of today, therefore, necessitates the independence of India and the ending of British domination. No future promises or guarantees can affect the present situation or meet that peril They cannot produce the needed psychological effect on the mind of

the masses. Only the glow of freedom now can release that energy and enthusiasm of millions of people which will immediately transform the nature of the war.

The A.I C.C. therefore repeats with all emphasis the demand for the withdrawal of the British Power from India. On the declaration of India's independence, a Provisional Government will be formed and Free India will become an ally of the United Nations, sharing with them in the trials and tribulations of the joint enterprise of the struggle for freedom'

প্রস্তাবে আরও থাকে— 'The committee appeals to the people of India to face the dangers and hardships that will fall to their lot with courage and endurance, and to hold together under the leadership of Gandhiji, and carry out his instructions as disciplined soldiers of Indian freedom. They must remember that non-violence is the basis of this movement. A time may come when it may not be possible to issue instructions or for instructions to reach our people, and when no Congress Committees can function When this happens, every man and woman, who is participating in this movement must function for himself or herself within the four corners of the general instructions issued. Every Indian who desires freedom and strives for it must be his own guide urging him on along the hard road where there is no resting place and which leads ultimately to the independence and deliverance of India.'

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জওহরলাল এবং সমর্থন করেন সর্দার বল্লভভাই। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট হয় কমবেশী চারশ' এবং বিপক্ষে তেরো। এই তেরোজনের মধ্যে বারোজন কমিউনিস্ট এবং এদের সঙ্গে আর একজন যিনি ভোট দেন তাঁর ছেলে কমিউনিস্ট। বিতর্কে উত্তর দিতে গিয়ে জওহরলাল তীব্র ভাষায় কমিউনিস্টদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, কমিউনিস্টদের পেছনে কোনও জনসমর্থন নেই। প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, —'With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace amongst ourselves and with all nations.'

তিনি আরও বলেন,'I take up my task of leading you in this struggle, not as your commander, not as your controller, but as the humble servant of you all and he who serves best becomes the chief among them. I am the chief servant of the Nation that is how I look at it, I want to share all the shocks that you have to face.'

গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেন,—'I have pledged the Congress and the Congress will do or die.'

সরকারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন

এবং তাঁকে রাখা হয় পুনায় লেডি থ্যাকার্সের বাড়িতে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যারা এবং বহু এ আই সি সি-র সদস্য গ্রেপ্তার হন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের রাখা হয় আহম্মদনগর ফোর্টে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সমস্ত প্রদেশ এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি ও বহু মহকুমা এবং তালুক কংগ্রেস কমিটি বেআইনী ঘোষিত হয়। বোম্বাই থেকে ফেরবার পথে অনেকে গ্রেপ্তার হন। যাঁরা বোম্বাই যাননি, স্ব স্ব ক্ষেত্রেই তাঁদের ধরা হয়। এবং যাঁদের পাওয়া যায়নি তাঁদের 'ফেরার' বলে ঘোষণা করে তাঁদের নামে হুলিয়া জারি করা হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার ও নির্যাতনের বন্যা শুরু হয়ে যায়। দুটি নমুনা দিলেই যথেষ্ট হবে। বাংলা অ্যাসেম্বলীতে তৎকালীন চিফ মিনিস্টার স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, মেদিনীপুর জেলার কন্টাই এবং তমলুক মহকুমায় ১৯৩টি কংগ্রেসীদের বাড়ি সমস্ত তৈজসপত্র সহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তরে স্যার এলান হাটলে লিখিত উত্তরে বলেন, নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে এরোপ্লেন থেকে জনতার ওপর মেশিন গান চালানো হয়েছে—(১) পাটনা জেলার বিহার শরিফ থেকে বারো মাইল দূরে গিরিয়াক, (২) ভাগলপুর জেলার সাহেবগঞ্জ রেলের লাইনের ওপর, (৩) নদীয়া জেলার রানাঘাটের কাছে, (৪) মুঙ্গের জেলার হাজিপুর থেকে কাটিহার লাইনের ওপর (৫) তালচের শহর থেকে দু-তিন মাইল দক্ষিণে। সরকারের লিখিত স্বীকারোক্তি এই। তা ছাড়া বেত মারা, গুলি করা ছিল প্রাত্যহিক কাজ। এসবই ঘটেছিল ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালের মধ্যে, অর্থাৎ এক মাস পাঁচ দিন।

কয়েকমাস বাদে গ্রেপ্তার হলুম। ধরা পড়ার দু' দিন আগে অবশ্য খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু তখন শরীরের যা অবস্থা আর গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। প্রথমে নিয়ে গেল লালবাজার। সেখান থেকে ইলিসিয়াম রো, বর্তমান লর্ড সিনহা রোড। সেখানেই গোয়েন্দাদের সব জিজ্ঞাসাবাদ করার জায়গা। অবাক কাণ্ড—আমায় কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসাও করলে না, কাছেও এলো না। নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমন সময় একদিন বিকেলে বদুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। আমি দূর থেকে বদুকে দেখে খুব উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বললুম, 'বদু, এয়েচিস? আয়, অনেক কথা আছে।' অফিসাররা আমায় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ওকে চেনেন?' উত্তরে বললুম, 'চিনি মানে? ওর বাবা আমার বন্ধু, মাকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, মামা আমার সহকর্মী। আমি তো অনেক দিন বাড়ি ছাড়া—আমার পরিবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ওঁরাই বহন করেন। ভালই হয়েছে ওকে এনেছেন, অনেক কথা বলবার আছে, তারপর তো আপনারা ওকে ছেড়েই দেবেন।' সেই অল্প বয়সেই বদু অনেক কাজ করত। বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিয়ে আসতো, আর বুলেটিন বার করবার পুরো দায়িত্ব ছিল। পরে শুনলাম সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বদুকে ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে যেদিন আমাকে কোর্টে হাজির করলো, আমি বিচারকের কাছে অভিযোগ করলুম, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, অনর্থক আটকে রেখে দিয়েছে। আমি ওঁদের কত ডাকাডাকি করি, ওঁরা কাছেই আসেন না।' বিচারক একবার মুখ তুলে চাইলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু একটা বললো। উত্তরে বিচারক বললেন যে, ওঁর নামে যখন আরামবাগ, শ্রীরামপুর ও হুগলীর ওয়ারেন্ট আছে, আমি ওঁকে শ্রীরামপুরে পাঠাবার অর্ডার দিচ্ছি। শ্রীরামপুরে গিয়ে যখন পৌঁছলুম

তখন আটটা বেজে গেছে। শ্রীরামপুরের বন্ধুবান্ধবরা খবর পেয়েছিলেন। পুলিসের অনুমতি নিয়ে সেইখানেই খেয়ে নিলুম, তারপর সাব-জেলে গেলুম। সাব-জেলের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধবান্ধবরা তখন সঙ্গের সাজেন্টকে বললেন, আপনারা ওঁর জন্য এস ডি ও-র অনুমতি নিয়ে আসুন, নইলে তো সাব-জেলের দরজা খুলবে না। সার্জেন্ট একটু দোনামনা করছিলেন। সঙ্গের পুলিসরা ও'কে বোঝালো—যদি জেলখানায় ঢুকতে না দেয় তো সারা রাত পুলিসের গারদখানায় থাকতে হবে, সে বড় কষ্টকর। এস ডি ও-র বাড়ি গিয়ে যখন পেঁছিলুম তখন নটা বেজে গেছে। খবর পেয়ে এস ডি ও বেরিয়ে এলেন। নামটি ভুলে গেছি—লম্বা ছিপ-ছিপে চেহারা। সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন, আই সি এস—তখনও গায়ে কলেজের গন্ধ। তিনি সব শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক বাদে বললেন, এখন জেলখানায় খুব অসুবিধা হবে বিছানাপত্তরের; যাই হোক আমি ব্যবস্থা করছি। উনি সাব-জেলে খবর পাঠিয়ে দিলেন, আর আমার বন্ধুবান্ধবদেরও বিছানা দেওয়ার অনুমতি মিললো। সাব-জেলে যখন আবার এলুম তখন অন্যরকম অভ্যর্থনা। একটা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আছে—জেলের দুখানি কম্বল পাতা। খানিক বাদে বাইরে থেকে বিছানাও এসে গেল। রাতটা তো কেটে গেল। সকালবেলা একটু বেলা হতেই এস ডি ও সাহেব এসে হাজির। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা, কয়েকখানি টোস্ট ও ডিম। বললেন, তোমার বন্ধুবান্ধবদের অনুমতি দিয়েছি, তোমার কাপড়চোপড়, বই ও তিনবার খাবার দিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুও রোজ দুবার করে আসবেন। এটাও জানালেন যে, তিনি তার পরদিন আবার আসবেন।

কোনবারই গ্রেপ্তার হবার পর কেস ডিফেণ্ড করা হয়নি। এবারে আমার শরীরের কথা ভেবে আমার বন্ধুবান্ধবরা ঠিক করলেন যে, মামলা চালানো হবে। প্রায় দু' মাস শ্রীরামপুর সাব-জেলে ছিলুম। আভাস (বন্দ্যোপাধ্যায়) তিন বেলা খাবার নিয়ে আসতো—তা ছাড়াও মাঝে মাঝে বই ও কাপড়চোপড়। আর এস ডি ও সাহেব তো রোজ আসতেন। সাব-জেলে তো খবরের কাগজ নেওয়া হত না। আর পলিটিকাল প্রিজনার মাত্র আমি একা। এস ডি ও সাহেব নিজের কাগজটি রোজ পাঠিয়ে দিতেন। মামলায় আমার পক্ষে দাঁড়ালেন শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশাই। সব নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন কিন্তু আমার মামলায় নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ম জেরায় সাক্ষীরা নাস্তানাবুদ। সব সাক্ষী যে মিথ্যা বলছে তা প্রমাণিত হল। অনেকে মনে করলেন যে, আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রায়ের আগের দিন এস ডি ও সাহেব বলে গেলেন যে, তোমাকে তো ছাড়তে পারবো না, জেল দিতেই হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে ধন্যবাদ জানালুম। সত্যই এই তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটটি আমার পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন। জেলখানার নিয়ম-মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হতেই হত। কিন্তু তা ছাড়া যতরকম সুবিধে দেওয়া যায় সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীরামপুর থেকে আলিপুর জেলে। সেখানে সশ্রম দণ্ডাজ্ঞা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডি আই আর।
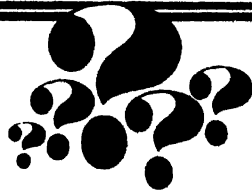
১৯৩৬-এর প্রথম দিকে। আরামবাগ মহকুমায় ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পেঁাছলুম কামারপুকুরের পাশে ইন্দিরা গ্রামে। কবিরাজ অবনীপতি সেনগুপ্তের বাড়ি। তাঁর বাড়িতেই কংগ্রেস অফিস এবং তিনিই ওখানকার নেতা। সেখানে অনেক লোক দেখে জিজ্ঞেস করলুম যে, ব্যাপারটা কি? শুনলুম তাঁরা আমার কাছেই এসেছেন, কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী যাতে পালিত হয়। গ্রামবাসীরা খুব ক্ষুব্ধ। মিশন থেকে আগে নাকি ঘোষণা করা হয়েছিল, শতবার্ষিকী উৎসব ওখানেই পালিত হবে; কিন্তু পরে সেটা নাকচ হয়ে স্থির হয়েছে যে, সেটা জয়রামবাটীতেই পালিত হবে। আমি তত আমল দিলুম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের একটা গ্রামে মিটিং করতে চলে গেলুম। যাবার সময় বলে গেলুম যে, এটা মিশন এবং গ্রামবাসীদের নিজস্ব ব্যাপার, এর সঙ্গে আমরা লিপ্ত হতে চাই না। রাত্রে ফিরে এসে দেখি, গ্রামবাসীরা অভুক্ত অবস্থায় সেইভাবেই বসে আছেন। আমি খুব বিপদে পড়লুম। আমাদের পরিবারের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। আমার ভগিনীপতি শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, যিনি পরে ভবানীপুর মিত্র ইনসটিটিউশন স্কুলের হেড মাস্টার হয়েছিলেন, তিনি দীক্ষা নেন সারদা দেবীর কাছে। আমার দিদি, আমার স্ত্রী - সকলেই মিশনে দীক্ষা নিয়েছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ মিশনের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করা খুবই দুরূহ বলে মনে হল। অন্য অসুবিধাও ছিল। মাঝে এক দিন সময়, অর্থাৎ ছত্রিশ ঘন্টা বাদেই উৎসব আরম্ভ করতে হবে। এক দিকে রামকৃষ্ণ মিশন, অন্য দিকে রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর ও আশেপাশের অধিবাসীরা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং কামারপুকুরের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। ঐ মানুষটিকে নানা দিক দিয়ে ভেবেও বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। প্রায় অর্ধশিক্ষিত মানুষ, কিন্তু বহু শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ তাঁর কাছে মাথা নত করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত--এঁরা তো সব দিক্‌পাল ছিলেন। আর কত গল্প! জন্মবৃত্তান্তও অদ্ভুত। জন্মাবার পর গিয়ে পড়লেন ধান সেদ্ধ করবার উনানের মধ্যে। আরও কত কাহিনী প্রচলিত আছে। ছেলেবেলায় পাশের গ্রাম আনুড়ে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে গেছেন। সেখানে গিয়ে প্রথম ভাবসমাধি হল। তারপর দক্ষিণেশ্বরের কথা। ভৈরবী এলেন, তোতাপুরী এলেন; সাধনার আর শেষ নেই। বহু পণ্ডিত আসতেন। তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা হত—একদম সাধারণ কথা। এসব যাঁরা দেখেছেন এবং লিখে গেছেন, তাঁদের কথা অবিশ্বাস করবার মত নয়। ইতিহাসে লেখা আছে যে, বাবর হুমায়ুনের রোগ নিজের শরীরে নিয়েছিলেন। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা আছে—মথুরবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী যোগমায়া দেবীর

অসুখ নিজের শরীরে গ্রহণ করেন এবং তাতেই যোগমায়া দেবীর রোগমুক্তি হয়। নৌকা করে যাচ্ছেন গঙ্গা দিয়ে। হঠাৎ পিঠে হাত দিয়ে 'উঃ উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখা গেল পিঠে যেন কেউ চাপড় মেরেছে—পাঁচ আঙুলের দাগ। অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারা গেল যে ঠিক সেই সময়ে গঙ্গাবক্ষে এক-জন মাঝির পিঠে একজন চাপড় মেরেছে। বিশ্বাস করা যায়, অবিশ্বাসও করা যায়। তবে যুক্তি দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন ঘটনা অনেক ঘটতে দেখা যায়। আমি নিজেই এ জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। আমার এক বন্ধু পা ভেঙে আরামবাগে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ির একটি ছেলে আট বছর আগে আমেরিকা যায়। সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত, কিন্তু পা ভাঙার খবর পায়নি। কোনরকমেই তার জানবার কথা নয়। হঠাৎ একদিন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে আমার বন্ধুর কাছে ফোন এল। সেই ছেলেটি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'জেঠু, তোমার শরীর কি খারাপ?' তাকে জিজ্ঞেস করায় জানা গেল, তার হঠাৎ মনে হয়েছে যে, তার জেঠু অত্যন্ত অসুস্থ এবং সেইজন্যই সে ফোন করেছে, যদিও সে কখনও ফোন করে না। সেইজন্যই এসব ঘটনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিশেষত্ব ছিল, তিনি সাধারণ মানুষের মত বাস করতেন এবং সেই জীবনযাপনের মধ্যেই এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে অবিশ্বাসীর মাথাও আপনা-আপনি ওঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। এ একটা অপরূপ জীবন। তাঁর জন্য মন্দির হয়েছে, তাঁকে ভগবান বলে পুজো করবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এসবই বাহ্য। মানুষ নিজের সাধনায় যে একটা অসাধারণ অবস্থায় পৌঁছতে পারে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওঁর জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সেটা ওঁরই সাধনার ফল। পরে হয়তো দৈব শক্তি আরোপ করা হয়েছে। সাধারণত তাই হয়ে থাকে। যীশু খৃষ্টের বেলায় তাই হয়েছে। তাঁর পরম পণ্ডিত শিষ্যরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে গেছেন যে, তাঁর মধ্যে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। আমার মনে হয় ওগুলো না করলেও যীশু খৃষ্ট যীশু খৃষ্টই থেকে যেতেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। ডঃ সুশীল দে 'Chaitanya & Baishnavism' বইয়েতে দেখিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের শিষ্যরা মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের কোনো পাণ্ডিত্য ছিল না বললেই হয়। আমি মনে করি, এতে কিছু এসে যায় না। এখনও যে গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে সন্ধ্যের পর নানাভাবে সংকীর্তন হয়, সেটা চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই।

আমাদের মনে একটু খটকা লাগে। খৃষ্টকে ভগবানের পুত্র বলা হয় এবং তাঁকে দেবতা হিসেবেই ভজনা করা হয়। আমার এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। ভগবান কোথায় আছেন, তা জানি না এবং তাঁকে খোঁজ করবারও চেষ্টা করিনি। যাঁরা মনে করেন যে, ভগবান আছেন, তাঁদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু 'Vatican' প্রাসাদে খৃষ্টকে বসাতে মন কিছুতে চায় না। মনে হয় এ যেন একটা অসঙ্গতি। এ যেন তাঁকে উপেক্ষা করে তাঁর নাম গ্রহণ করা। ঠিক তেমনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঠিক মনে অনুরূপ একটা অনুভূতি জাগে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বুঝতে পারি। তাঁর নিজের হাতে তৈরী পঞ্চবটী বনের মধ্যেও তাঁকে মানায়। রানী রাসমণির রাজৈশ্বর্য এই পঞ্চবটী বন তৈরী করে দেয়নি। নিজেরাই গাছ লাগিয়েছিলেন, দড়ি-বাঁশেরও সংস্থান জোটেনি। গঙ্গার বানে দড়ি বাঁশ সব ভেসে এল, তাই দিয়েই পঞ্চবটীর জায়গাটা

ঘেরা হল। এই শ্রীরামকৃষ্ণকে বেলুড়ের বিশাল মন্দিরের মর্মরবেদীতে ঠিক স্থাপন করতে পারছি না। প্রশ্ন উঠতে পারে—আমি কে স্থাপন করবার! বড় বড় পণ্ডিত এবং শ্রদ্ধেয় সাধকরা এ কাজ করেছেন। আর এখন আমার চারদিকে যারা আছে—আমার পুত্র, পুত্রবধূ, এবং আমার এক বন্ধুর পুত্র ও পুত্রবধূ, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মতোই এবং তাদের মেয়েরা, যাঁদের আমার পৌত্রী বলে অনেকে মনে করেন—তারা সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সেইজন্যই ভয়ে ভয়ে এসব কথা লিখছি। অনধিকারচর্চা হলেও যে কথাগুলো অনেকের মুখে শুনেছি এবং নিজেও মনে করি, তাই লিখে ফেললাম। শ্রীরামকৃষ্ণ রানী রাসমণির গালে চড় মেরেছিলেন—এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। মনে হয়, রক্তমাংসের শরীর—আমার একান্ত আপন। ভগবান ভাবলেই ভয় হয়; মনে হয় অনেক দূরের জিনিস।

এইসব খ্যাতনামা লোকদের জন্মস্থান হয়ে একসময় হুগলী জেলার বেশ নাম হয়েছিল। আরামবাগ মহকুমার দুই প্রান্তে দুই মহারথী। গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে যুগপ্রবর্তক রামমোহন। আর এই রাধানগরের পাশের দুখানি ছোট্ট গ্রামে একটিতে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আর একটিতে সর্বাধিকারীরা—প্রসন্নকুমার, দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ। এঁদের মাঝখানে আরামবাগ থানার আরাণ্ডি গ্রামে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ি। গঙ্গার ধার ধরে যদি যাওয়া যায়, দীনবন্ধু লিখেছিলেন, 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।' শ্রীরামপুরে গোপীনাথ সাহা, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে ডি ঘোষের বাড়ি কোন্নগরে, চন্দননগরে কানাইলাল দত্ত, চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হুগলীতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আবার চুঁচুড়া থেকে স্টেশনের তলা দিয়ে তিন মাইল গেলেই সুগন্ধ্যা, যেখানে স্যার তারকনাথ পালিতের জন্মভূমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের জন্য এর দান অবিস্মরণীয়। খন্যান গ্রামে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বলাগড়ে স্যার আশুতোষ, হরিপালে গিরিশচন্দ্রের পিতৃভূমি, সেখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে গুলটে গ্রামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার তার পাঁচ মাইল দূরে বাগাণ্ডায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈকালায় চন্দ্রনাথ বসু—যাঁর সঙ্গে এককালে রবীন্দ্রনাথের মসিযুদ্ধ হয়েছিল। সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে পানিসিয়ালায় হাইকোর্টের জজ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় সভাপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র, বাহির গড়ায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পিতৃভূমি, আর শ্রীরামপুরে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মভূমি, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, যাঁর সুযোগ্য বংশধর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এককালীন রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, গুড়াপে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রামগোপাল ঘোষ এবং রেভারেণ্ড কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে।

আর এক দিকেও হুগলী জেলার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলকে বহু উত্থানপতন দেখতে হয়েছে। সপ্তগ্রাম রাজধানী ছিল—তার আর এখন কোনো চিহ্ন নেই। হুগলীর ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজ চার্চ পর্তুগীজদের চিহ্ন বহন করছে। হুগলী শহরে থাকতেন মোগল সম্রাটের সুবেদার। চুঁচুড়ায় ডাচ, চন্দননগরে ফরাসী, গরুটিতে ইংরাজদের কুঠি। শ্রীরামপুরে দিনেমার—এই সব শক্তির আনাগোনায় গঙ্গার ধারে

একটা অদ্ভুত সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

কামারপুকুর যাতায়াত আগে দুর্গম ছিল। এখন অবশ্য কামারপুকুর এবং দেড় মাইল দূরে সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী কলকাতা থেকে সহজেই যাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে যখন আমাদের রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী পালন করতে বলা হল তখন যাতায়াতের কোনো পথই ছিল না অথচ ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে করতে হবে। প্রথমে জলের ব্যবস্থা করা হল—নিকটবর্তী দামোদরের খালকে কেটে মণ্ডপের জায়গায় আনা হল। সারা রাত এবং সকালের খানিকক্ষণ সময় বাঁশ বনে বাঁশ কেটে ত্রিশ হাজার লোকের মত মণ্ডপের বাঁশ সংগ্রহ হল। আরামবাগ মহকুমার সর্বত্র কর্মীরা চলে গেলেন সাইকেলে খবর দিতে, অনেকে আবার শ্রীরামপুর এবং হুগলীতেও খবর দিতে গেল। রাত্রের মধ্যে ত্রিশ হাজার লোকের খাবার উপযুক্ত চাল, ডাল, তরিতরকারি আসতে শুরু করল। তার সঙ্গে সঙ্গে শতরঞ্জি, পাল, আলো এবং রান্নার বাসন। বিকেলে জয়রামবাটীর রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে স্বামীজী-দের আমন্ত্রণ করে এলুম যে, তাঁদের কাজ তাঁরাই এসে পরিচালনা করবেন। তাঁরা সকলেই এসেছিলেন। মহামর্যাদায় রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। ত্রিশ হাজার লোক প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সে প্রায় এক রাজসূয় যজ্ঞ। আমার সঙ্গে দুর্গা (চক্রবর্তী), কালী (সিংহ), শান্তিমোহন (রায়), বেণীমাধব (রায়) প্রমুখ আরামবাগের প্রথম সারির কর্মীরা ছিলেন বলেই কামারপুকুর গ্রামের সর্ব-সাধারণের সহযোগিতায় এ-কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।
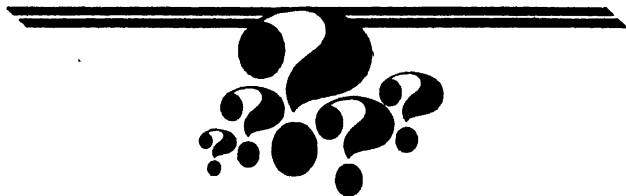
১৯৫০-এ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলুম। ডঃ প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ নাম প্রস্তাব করেন এবং নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হয়। আমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও কাগজপত্র, ফাইল পাওয়া যায়নি। টেলিফোন লাইন কাটা, বিল বাকি, ইলেকট্রিক লাইনও তাই। প্রেসে ধার ছিল বিশ হাজার টাকা। অফিসটি ছিল ডঃ রায়ের বাড়ির প্রায় পাশে বললেই চলে; পরে ওখানে বি পি এন টি ইউ সি-র অফিস হয়। দোতলায় একটা লম্বা হল আর দুখানি ঘর—এই ছিল অফিসের আয়তন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় নিয়ে বাংলা দেশের একটা ঐতিহ্য (?) ছিল। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব—এসব প্রদেশেই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিজস্ব বাড়ি ছিল। আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। দেশবন্ধু, সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র —এঁরা তো ছিলেনই, আরও অনেকেই ছিলেন; কিন্তু কেউ কোনও দিন বাড়ি করার কথা ভাবেননি। ফলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় প্রায় ভ্রাম্যমাণ ছিল বললেই চলে। কিছু দিন ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে; কিছুদিন ছিল বউবাজারে; আবার কিছুদিন মৌলালীতে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভা-

পতিরূপে অফিস হাতে পেলুম বটে, কিন্তু কোনও রেকর্ড নেই। আর এক গাদা ঋণের বোঝা। তার ওপর আরও বিপদ হ'ল—কয়েক মাসের মধ্যেই ডঃ ঘোষ, ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন সেন, শ্রীঅন্নদা চৌধুরী, ডঃ নৃপেন বসু প্রভৃতি অনেকেই কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি করলেন। আমরা অথই জলে। জেলার কর্তাদের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই; অনেক জায়গায় পরিচয়ও কম। সেই সময় নদীয়ার তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদহের সৌরীন্দ্র মিশ্র, মুর্শিদাবাদের শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ির খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাঁকুড়ার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বর্ধমানের যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, মেদিনীপুরের নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—এঁরা এগিয়ে এলেন। চব্বিশ পরগনার বিপিনদা, শ্রীপ্রফুল্লনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহৃদয়নাথ চক্রবর্তী ছিলেন আর কলকাতার কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীসুরেশ মজুমদার এঁদেরও পাওয়া গিয়েছিল।

বহু জায়গায় জেলা কংগ্রেস অফিস ছিল না। কারণ, তার আগেই বাংলা বিভাগের জন্য বড় ঝড় বয়ে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বটে, পশ্চিম বাংলা যেন খানিকটা পঙ্গু। দেশবিভাগজনিত সমস্যা তখনই গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যদিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশবিভাগ হয়েছিল কিন্তু তার চাপ পশ্চিমবঙ্গের ওপর যতটা পড়ে আর কোনও প্রদেশকে তার এক শ' ভাগের এক ভাগও সহ্য করতে হয়নি। রাজনীতিক্ষেত্রেও তখন কমিউনিস্ট পার্টি খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে। তেলেঙ্গানা অনুসরণে বড়া-কমলাপুর, কাকদ্বীপ, নন্দীগ্রাম ও আরও কয়েকটি জায়গায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'—এ স্লোগান তো ছিলই, তার ওপর লেগে ছিল নানারকম আন্দোলন। ডঃ রায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে জলপাইগুড়িতে মেডিকেল স্কুলের সংলগ্ন ভবনের শিলান্যাস করতে গিয়ে পারেননি, মালদহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ ঘোষ জনসভায় এমনভাবে প্রহৃত হন যে, হাসপাতালে যেতে হয়। এই পটভূমিকায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব আমরা পেলুম। এক বছর বাদেই ১৯৫২-এর গোড়ার দিকে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। একটা দিকে খুব সুবিধা ছিল—ডঃ রায়ের অধিনায়কত্বে যে মন্ত্রিসভা, তার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সদাসর্বদাই পরামর্শ করে কাজ হত। ফলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এ অবস্থাতেও মাঝে মাঝে উদ্ভব হত গভীর সঙ্কটের।

সাধারণ নির্বাচনের প্রায় ছ' মাস আগে কোচবিহারে পুলিসের গুলি চলে এবং ছ'জন নাগরিক নিহত হয়। চতুর্দিকে খুব উত্তেজনা, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রিসভার মধ্যেও। কুমারসিং হলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভা হল। দু-তিন ঘন্টা আলোচনার পর সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল যে, পুলিসের গুলিচালনা গর্হিত হয়েছে। প্রস্তাবটি একতরফা হয়েছিল। সরকার পক্ষের যে কিছু বলার থাকতে পারে বা এ নিয়ে সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত করা হোক—এরকম কোনও কথা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না। আমি সভাপতি হিসাবে প্রস্তাবটি আউট অফ অর্ডার করতে পারতুম, কিন্তু তা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লদা, কালীবাবু, তারকদা, অজয়দা, নিকুঞ্জবাবু, পাঁজামশাই এবং আরও আমার চেয়ে বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁদের আলোচনার পর যে সাহস থাকলে

প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত করা যায় তা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই ঘটলো। রাত্রে টেলিফোন বাজলো। সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে বেশ পরিষ্কারভাবে বললেন, 'অতুল্য, আমি পদত্যাগ করছি।' আমি আমার বাড়িতে বসেই টেলিফোনের সামনে হাত কচলাতে কচলাতে বললুম, 'আজ্ঞে, সভায় সাতজন মন্ত্রী ছিলেন এবং বহু প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আলোচনায় যোগদান করেন।' উত্তর এল, 'আমি ওসব জানি না। তুমি তো সভায় সভাপতিত্ব করেছ। তোমরা একবার সরকারের কৈফিয়ত চাইলে না বা তদন্তের যে প্রয়োজন আছে তাও প্রস্তাবে উল্লেখ করনি।' ডঃ রায়ের কথা শুনে মনে হল যে, একটা পথ খুঁজে বার না করলে মহা-বিপর্যয় হবে। ডঃ রায় যেরকম শান্তভাবে বললেন, তাতে মনে হল—এটা হুমকি নয়, সিদ্ধান্ত। অনেক ভেবে কোনও কূলকিনারা পেলুম না। টেলিফোন করে বললুম যে, 'আমাকে তিন দিনের সময় দিন।'

পরদিন সকালে প্রবীণ এবং বয়স্ক নেতা এবং সহকর্মীদের এক জায়গায় জড় করলুম। সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলায় তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন যে, ডঃ রায় যা বলেছেন তা অনুচিত নয়। সিদ্ধান্ত হল যে, পাঁচ দিনের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি জরুরী সভা ডাকা হোক। সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, সরকারের পক্ষে সর্বদা চেষ্টা করা উচিত যাতে গুলি চালাতে না হয়। গুলিচালনায় কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনু-রোধ করা হ'ল—তাঁরা যেন এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেন। গুলিচালানো সঙ্গত হয়েছিল কি না—এটাও যেন তদন্তের বিষয়বস্তু হয়। আরও অনেক কথাই প্রস্তাবের মধ্যে ছিল, তবে এইটিই হল মোদ্দা কথা। গুলিচালনার প্রস্তাব নিয়ে এত বিসংবাদ, এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। ডঃ রায় সহ গোটা ক্যাবিনেটের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ে-ছিল যে, কোনও স্থানে যদি সরকারী কর্মচারী কোনও অসঙ্গত বা গর্হিত কাজ করে তা হলে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রচার ও সত্যাগ্রহ করতে পারবে। প্রস্তাবটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমি জানি না ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সমগ্র মন্ত্রিসভার উপস্থিতিতে এরকম কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কি না। আমার ধারণা—আর কোথাও হয়নি।

সামনেই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পূর্ণ নতুন। আগেকার কোনও নির্বাচনের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। আগে শিক্ষা ও ট্যাক্স দেওয়ার যোগ্যতার ওপর ভোটার হত। আর '৫২ সালের নির্বাচনে কোটি কোটি ভোটার। এ আই সি সি থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করবার জন্য নানারকম পরামর্শ এসেছিল। সে এক প্রকাণ্ড ফিরিস্তি। আমরা প্রাদেশিক ইলেকশন কমিটিতে স্থির করেছিলুম যে, সাধারণত জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো। ইলেকশন কমিটির কাজ খুবই কঠিন ছিল। এইরকম নির্বাচন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কারোরই ছিল না। সেইজন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপারিশগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হতো। ইলেকশন কমিটির মিটিং সাধারণত সন্ধ্যার পর ডঃ রায়ের বাড়িতে হতো। এবং রাত্রি যত দীর্ঘ হতো, একে একে প্রফুল্লদা, কালীবাবু এঁরা চলে যেতেন। শেষ অবধি থেকে যেতুম আমরা দুজন। যখন যে জেলার সম্বন্ধে আলোচনা হত সেই জেলার সভাপতি ও সম্পাদক ইলেকশন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রার্থীদেরও আসতে বলা হতো। অবশ্য আমরা না ডাকলেও বহু প্রার্থী এবং তাঁদের সমর্থক

মিটিং-এর সময় ঠিক হাজির হতেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যই শুনতে হতো। কখনও বিজয়বাবু (নাহার), কখনও বা বিজয়ানন্দ (চট্টোপাধ্যায়) সেইসব সাক্ষাৎকারের নোটও লিখতেন। তারপর সভার অনুমোদন নিয়ে দিল্লীর জন্য প্রার্থী-তালিকা ও তাঁদের পরিচয় ও গুণাগুণ তৈরি করা হতো। এমনও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল যেখানকার জন্য প্রার্থী খুঁজে বার করতে হতো। অবশ্য এমন ক্ষেত্র খুব কমই ছিল। তখন ছিল চোদ্দটি অ্যাসেম্বলী মেম্বারের আসন নিয়ে দুটি লোকসভার আসন। একটি সাধারণ এবং একটি তফশীলভুক্ত। কোথাও কোথাও সাতজন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার নিয়ে একটি লোকসভার আসন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তিনজন লোকসভার সদস্যের জন্য একটি কেন্দ্র ছিল, অর্থাৎ একুশজন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার। একটি সাধারণ, একটি তফসীলভুক্ত এবং একটি ট্রাইবাল। বর্ধমান সদর, আসানসোল মহকুমা নিয়ে দুটি লোকসভার আসন ছিল—একটি সাধারণ ও একটি তফসীল। সাধারণ আসনের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। তিনি নিজেই প্রার্থী ছিলেন। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিসে চুঁচুড়ায় মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হয়। মনোনয়নপত্র দাখিল করবার শেষ দিন সকাল দশটার সময় কলকাতায় শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায় জানালেন যে, তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাজ-কারবার আছে, অতএব তাঁর মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। আমাদের মাথায় তো বজ্রাঘাত হল। তিনটের মধ্যে চুঁচুড়ায় মনোনয়নপত্র পেশ করতে হবে—আর যেসব ভোটার স্বাক্ষর করবেন তাঁরা বর্ধমানের ঐ কেন্দ্রের ভোটার হওয়া চাই। আমি বর্ধমান কংগ্রেস অফিসে ফোন করে দিলুম যেন একটার মধ্যে চুঁচুড়ায় বারোজন ভোটার পাঠানো হয়। ডঃ রায়ের নির্দেশে আমি চুঁচুড়ায় চলে গেলুম, আর ধীরেনদা (মুখোপাধ্যায়) বেরোলেন প্রার্থী খুঁজতে। আমি তখন হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি। সেখানেই খবর এলো যে, প্রার্থী পাওয়া গেছে—তিনি কলকাতা থেকে বেরোচ্ছেন। আড়াইটা অবধি কেউ এলেন না। ঠিক আড়াইটার পরই কলকাতা থেকে একজন ডঃ রায়ের একটি চিঠি ও একটি ভোটার লিস্ট নিয়ে এলো। ডঃ রায়ের চিঠিতে লেখা, 'তোমার ভোটার লিস্ট পাঠালুম—তুমি ডামি হিসবে নাম দিয়ে দাও।' আমি মনোনয়নপত্র পেশ করলুম দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। প্রার্থী এসে হাজির হলেন দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে। তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করা হল; আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

স্ক্রুটিনির দিন দেখা গেল যে, প্রাথী নির্বাচন-কেন্দ্রে নাম লেখেননি—সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়নপত্র বাতিল। আমি কংগ্রেসের একমাত্র প্রার্থী রইলুম। জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। জওহরলালের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন ভাল ছিল না। আমি ভাবলুম, আমি যদি নাম প্রত্যাহার করে নিই, জওহরলাল সাগ্রহে মত দেবেন। জওহরলালের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালুম যে, আমার পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো অসম্ভব; অতএব আমাকে নাম প্রত্যাহার করবার অনুমতি দেওয়া হোক। টেলিগ্রামের কথা শুনে ডঃ রায় ভৎর্সনা করলেন এবং জওহরলাল টেলিফোনে তসম্মতি জানালেন। আমি নিরুপায়। আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলুম যে, ঐ নির্বাচন-ক্ষেত্রে আমি যেতে পারবো না।

নির্বাচনে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। সাধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে যতই বিশ্লেষণ করা যাক, ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক বলা খুব শক্ত। '৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। অন্তত অনেক জায়গার চেয়ে যে বেশী—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কাঁথি

ও তমলুক মহকুমার খানিকটায় ইংরেজ-রাজ ছিল না বললেই চলে। সেই মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করলো মাত্র ১১টি আসনে। আর আরামবাগের অবস্থাও তাই। সেখানে স্বয়ং প্রফুল্লদা পরাজিত হলেন। অথচ কোচবিহার—যেখানে ছ'মাস আগে গুলি চলেছিল, সেখানে কংগ্রেস সব ক'টি আসনে জয়লাভ করেছিল। নির্বাচনে প্রফুল্লদা, কালীবাবু, তারকদা, হৃদয় চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরাজিত হলেন। পরাজিতদের মধ্যে সাতজন মন্ত্রী। বেশ মনে আছে—জওহরলাল আমায় ধমক দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়েছে বটে, কিন্তু এতগুলো নেতা ও মন্ত্রীর পরাজয়ে কংগ্রেসের বেশ মর্যাদাহানি হয়েছে। সে চিঠির উত্তর দেন ডঃ রায় এবং খুব কড়া ভাষায়। চিঠির সারমর্ম হল—পশ্চিমবঙ্গের যা সমস্যা, অন্য যে-কোনও প্রদেশে এরকম সমস্যা হলে সেখানেও সংখ্যাধিক্য হত না। কেবলমাত্র সংগঠনের শক্তিতে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

'৫২ সালের নির্বাচনে একটা শিক্ষা আমরা লাভ করেছিলুম যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্যাতন, ত্যাগ, কারাবরণ—কেবলমাত্র এই মূলধন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না। সর্বভারতীয় প্রশ্নও নির্বাচনের সময় এসে পড়ে। স্থানীয় সমস্যাও মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটা খুব ভাল দিক আমাদের কাছে ফুটে উঠেছিল যে, ভোট দেওয়ার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনও সম্পর্ক ছিল না। মুসলমান অধ্যুষিত কেন্দ্রে হিন্দু জয়লাভ করেছে, আবার হিন্দু অধ্যুষিত কেন্দ্রে মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করেছে। সাধারণ আসন থেকে তফসীল-ভুক্ত প্রার্থী জয়লাভ করেছে।

ভবনগর থেকে আমি, জগজীবন রাম ও আমার পুত্রবধূ বেরোলুম সোমনাথের উদ্দেশ্যে। সেই সোমনাথ, হিন্দুদের যে মন্দির সতের বার লুণ্ঠিত হয়েছিল। অবাক কাণ্ড। চারিদিকে হিন্দু রাজ্য, মুষ্টিমেয় বিদেশী সৈন্য এসে বারবার আঘাত করেছে—কিন্তু আশেপাশের কোনও হিন্দু রাজা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করবার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টান জগৎ হাজার মাইল দূর থেকেও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসেছে। আর সোমনাথ তো তৎকালীন ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত অঞ্চল। ধর্মরক্ষার জন্যও কেউ এগিয়ে আসেনি, আর দেশরক্ষার কথা তো স্বতন্ত্র। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষ বলে কোনও দেশ থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করতেন না। আর সাধারণ হিন্দুরা ধর্ম সম্বন্ধে তাদের কার্যকলাপ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। সেইজনাই অবাক লাগে যখন দেখি দ্বারকাতেই সারদামঠ। শঙ্করাচার্যও তো হিন্দু ছিলেন, তবে তিনি কেন ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ

নির্মাণ করলেন?

সোমনাথপত্তন্ একসময়ে বড় বন্দর ছিল। দেশবিদেশের জাহাজ এসে তো লাগতই, আবার গুর্জরের এই বেলাভূমিতে গ্রীস, রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশের সার্থবাহীদের যাতায়াতে সোমনাথ মহাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আবার সোমনাথ থেকে চীনের সঙ্গেও বাণিজ্যের পথ খোলা ছিল। আর মন্দির, যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, শুধু যে স্থাপত্যশৈলীতে মন্দিরের বিশিষ্ট স্থান ছিল, তা নয়, ধনরত্নও অগাধ ছিল। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায় যে, মন্দিরের গর্ভগৃহে এমন সব রত্নরাজি ছিল যে, সেখানে আলো জ্বালার প্রয়োজন হত না। ঐসব রত্নের দ্যুতিতে গর্ভগৃহ আলোকিত হয়ে থাকত। আর অলিন্দ ও নাটমন্দিরে প্রজ্বলিত সহস্র বর্তিকার মৃদু কম্পনের সঙ্গে যখন অনন্য-সাধারণ রূপযৌবনশালিনী দেবদাসীরা নৃত্য করতেন, তখন মনে হত যেন স্বর্গের ইন্দ্রদেবের নৃত্যসভা। মন্দিরের বিশাল চত্বরের চতুর্দিকে বহু শত বিপণী। বহু বিদেশাগত দুর্লভ আপণদ্রব্যে সুসজ্জিত সেই চত্বর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের আগম-নিগমে মুখরিত হয়ে থাকত। আর পত্তনে শোভা পেত দেশ-বিদেশের সুসজ্জিত অর্ণবপোত। সর্দার বল্লভভাইয়ের উদ্যোগে পূর্বতন সোমনাথ মন্দিরের ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসাবশেষের পাশেই নতুন বিশাল মন্দির তৈরী হয়েছে—পুরাতন ভারত-বর্ষের এক মহাসমৃদ্ধ স্মৃতির প্রতি নূতন ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সোমনাথের পাশেই দ্বারকা। সেখানে এখনও লোকে একটি গাছ দেখিয়ে বলে যে, সেই গাছে শ্রীকৃষ্ণ শরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাতেই তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। আরও কত জায়গা দেখায়, আরও কত গল্পই যে আছে! একটু দূরেই বেড়দ্বারকা—সমুদ্রপথে যেতে হয়। গুজরাটের সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গাগুলিতে অনেক স্মাগলিং-এর সুবিধাও আছে। আরবদেশ থেকে বড় বড় 'Dhow' করে বহু দ্রব্য এখানে আসে, আইন অনুসারে যা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে গেলে বহু টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। সেজন্য গোপনে এই ব্যবসা বেশ ভালই চলে। গুজরাটের যেখানেই গিয়েছি, সাদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি ছিল না। আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে মনে হত যে, নিজেদের আত্মীয়কুটুম্বের বাড়িতেই এসেছি। আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল আহারের ব্যবস্থায়। পুরি, কোথাও কোথাও বা রোটি, তার সঙ্গে শ্রীখণ্ড, ধোকড়া আর লাড্ডু বা জিলাবী। অবশ্য আচার থাকত নানারকমের। একটি জায়গায় আমরা আগে থাকতেই বললুম যে, আজ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কিছুটা সবজি থাকা চাই। সবজিও এল প্রচুর—অর্থাৎ বড় বড় পেঁয়াজ। গুজ-রাটের নিরামিষাশীর সংখ্যাই বেশী। গুজরাটের পরই আমার মনে হয়, বাংলা দেশে। দক্ষিণে কিছু ব্রাহ্মণ আছেন নিরামিষাশী। তারপর গ্রামের পর গ্রামে গেলেও কোনও নিরামিষ রান্নাঘর পাওয়া যায় না। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছলুম গির ফরেস্ট-এর ধারে। অরণ্য বলতে আমাদের যেমন বড় বড় গাছ, মাইলের পর মাইল গেলেও সূর্য দেখা যায় না—এরকম একটা ধারণা আছে, 'গির ফরেস্ট' সেরকম কিছু নয়। উচ্চতায় আমাদের বাবলা গাছের মত, কয়েক মাইল জুড়ে একরকম গাছ আছে। তারই মধ্যে পশুরাজ সিংহ সদর্পে তাঁর রাজ্য শাসন করেন। মহা আগ্রহে সেখানকার অফিসাররা আমাদের সিংহ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বনের এক ধারে আমরা দাঁড়ালুম, সেখান থেকে দেখা গেল গজ ষাটেক দূরে একটা মোষ বাঁধা হয়েছে। সেখান থেকে আরও গজ পঞ্চাশেক দূরে একটি সিংহ বেশ গম্ভীরভাবে বসে আছে। ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি সিংহ এসে সেখানে উপস্থিত হল। আমি

কৌতূহল সংবরণ করে আস্তে আস্তে গাড়িতে এসে বসলুম। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বোধ হয় জৈন।' আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ায় সে খুব খুশী হল। জগজীবন রাম এবং আমার পুত্রবধূ বেশ ধীর-স্থিরভাবেই একটি সিংহের লম্ফন, তারপর মোষের রক্তপান, তারপর আরও কত-গুলি সিংহের আবির্ভাব—সব দেখে গাড়িতে এসে আমাকে বিশদ বর্ণনা দিলেন। শুনলুম, এরকমভাবেই নাকি সিংহ দেখানো হয় এবং তাই-ই প্রথা। সব জিনিস-টাই আমার অসুন্দর ও বীভৎস বলে মনে হয়েছিল। নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বলতেন যে, সময় সময় অশ্লীলতাও হয়তো সহনীয় হয়, কিন্তু অসুন্দরতা মানব-সমাজের পক্ষে অসহ্য। আমি তাঁর এ মনোভাবের পুরোপুরি সমর্থক।

গুজরাটে গেলেই গান্ধীজীর কথা আপনা-আপনি এসে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আমরা যে তাঁকে শুধু দেখেছি, তা নয়, তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমাদের জীবনও সার্থক হয়ে উঠেছে। যে মাটিতে তিনি হেঁটেছিলেন, যে বাতাসে তিনি নিশ্বাস নিতেন, সেই মাটির স্পর্শ আমরা পেয়েছি, সেই বাতাস প্রতিনিয়ত আমাদের সেবায় নিযুক্ত আছে। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। গুজরাটের এই খর্বাকৃতি শীর্ণকায় মানুষটি কোনও লোকোত্তর কাজ করেননি। যা করেছেন, সবই লোকায়ত্ত। 'Child is the father of man'—বহু দিনের এই প্রবচনকে নস্যাৎ করে দিয়ে পৃথিবীর মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, কেবলমাত্র নিজের সাধনা দ্বারা, কোনও অলৌকিক শক্তির সাহায্য না নিয়ে মানুষ যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তা প্রমাণ করতে পারে। বাল্যকালে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে নাচ শিখতে গেলেন এবং বিদেশী বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে হলেন অত্যুৎসাহী। ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেন। তাঁর প্রথম কেসের অভিজ্ঞতার কথা নিজেই লিখেছেন। (অতি সহজ কেস, একবার উঠে দাঁড়িয়ে গুটি কয়েক কথা বলা।)

'It was an easy case. I charged Rs. 30 for my fees The case was not likely to last longer than a day'

'This was my debut in the Small Causes Court, I appeared for the defendant and had thus to cross examine the plaintiff's witnesses. I stood up, but my heart sank into my boots. My head was reeling and I felt as though the whole court was doing like-wise I could think of no question to ask. The judge must have laughed, and the vakils no doubt enjoyed the spectacle. But I was past seeing anything. I sat down and told the agent that I could not conduct the case'

My Experiments with Truth—page 120

ব্যারিস্টারি হল না। এ ছাড়াও আরও অনেক পারিবারিক অশান্তি ঘটে গেছে। এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার একটা আহ্বান এলো। কিছু আইন সংক্রান্ত কাজও বটে, আর কোনও কোনও ব্যবসাও সংশ্লিষ্ট ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত-কায়দের হাতে বারবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি এসবও ওঁর শরীরের উপর বর্ষিত হয়। গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি করতে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অসম্মান ও অমর্যাদা দেখে সেখানে মর্যাদা রক্ষার লড়াই শুরু করে দিলেন। সে এক অভিনব সংগ্রাম। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়ে

সেখানকার মানুষকে খানিকটা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর পথে এগিয়ে দিলেন। আর তখন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল আত্মানুসন্ধান। কিছুটা নামও হল। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনার খবরাখবর ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। মহামতি গোখেল গান্ধীজীকে পুরো সমর্থন করেছিলেন। তিলকের আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা জানাবার জন্য ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে গান্ধীজী সভা করেন। কোনও জায়গায় বেশী সমর্থন পান, কোনও জায়গায় কম। তখনও কিন্তু ইংরাজের ন্যায়নীতির উপর গভীর আস্থা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'Natal Indian Congress' স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি আশ্রমও করেন। 'Boer War' যখন আরম্ভ হয় তখন ইংরাজের পক্ষে একটি 'Ambulance Corps' সংগঠন করেন। প্রথম 'বিশ্ব মহাযুদ্ধ' যখন হয়, তখনও ইংরাজের পক্ষ নিয়ে সেখানে সেবাকার্য করেছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পর ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই সূত্রে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের কোথায় বসবাস করবেন, তা স্থির করতে পারেননি। গুরুকুল দেখতে যান। আশ্রমের সকলে গুরুকুলে কিছুদিন থাকবার পর শান্তি-নিকেতনে এসে থাকেন। শান্তিনিকেতনে থাকা সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজের কথায় বলেছেন, —'So they were first put in the Gurukul, Kangri, where the late Swami Shraddhanandji treated them as his own children. After this they were put in the Shantiniketan Ashram, where the poet and his people showered similar love upon them. The experiences they gathered at both these places too stood them and me in good stead.'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে দুজনের মধ্যে মসিযুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক কোনওদিন ম্লান হয়নি।

১৯১৫-এর ২৫শে মে আমেদাবাদের কাছে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হয়। শুরুতে ছিল পুরুষ-মহিলা মিলে পঁচিশজন। কয়েক মাসের মধ্যেই গান্ধীজীকে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। এক 'অস্পৃশ্য' পরিবারের পিতা, মাতা ও কন্যাকে গান্ধীজী আশ্রমের পরিবারভুক্ত করে নেন। ফলে আশেপাশে চতুর্দিকে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। অস্পৃশ্যরা এসে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবে, থাকবে— এটা সেখানকার অধিবাসীরা সহ্য করতে পারলেন না। আশ্রমে সমস্ত প্রকার সাহায্যদান বন্ধ হল। অবস্থা এমন হল যে, আশ্রমের ব্যয়নির্বাহ করা যায় না। একদিন সকালে গান্ধীজী যখন শুনলেন যে, সেদিন আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না, উনি সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্য পল্লীতে আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর অবশ্য অযাচিতভাবে এক অপরিচিত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্থসাহায্যের ফলে তখনকার মত সমস্যার সমাধান হয়। এর পরে অবশ্য এখান থেকে আশ্রম উঠে গিয়ে সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হয়। সেখানকার ঘটনাও সুবিদিত। একটি গরু রোগ-যন্ত্রণায় ভুগছিল। সেই গরুটির বাঁচবার কোনও আশা ছিল না। ঔষধ প্রয়োগ করে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করা হল এবং তার ফলে আবার চতুর্দিকে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জৈন সমাজের মধ্যে বাস করে এ যে কত বড় অপরাধ তা সুবিদিত। পুনরায় সমস্ত সাহায্য বন্ধ হয়।

গান্ধীজীকে বারবার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু যতই সংকট

হোক, উনি হয়তো সাময়িকভাবে কাজ স্থগিত রেখেছেন, কিন্তু কোনওদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। সমস্ত জীবনব্যাপী যুদ্ধ করেছেন। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে, সেইরূপ ঠিক সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে। বর্তমানে গান্ধীজীকে মহামানব বলে ঘোষণা করা হচ্ছে—পূজাপাঠও আরম্ভ হয়ে গেছে। ও'র জীবনে কিন্তু কেউ কোনও অলৌকিক শক্তি দেখেনি। একজন সাধারণ মানুষ সাধনার দ্বারা কত দূর পোঁছতে পারে, গান্ধীজী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ও'র বিষয় যত আলোচনা হতে আরম্ভ করবে, দেখা যাবে সাধারণ মানুষের যেসব দোষত্রুটি আছে, সেসব দোষত্রুটি নিয়েই সাধনা করে গেছেন। কোনও সংঘাতই ও'কে আদর্শভ্রষ্ট করতে পারেনি। ও'র পরিচয়ে কোনও দেবত্ব নেই। উনি মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষ যে সাধনার ফলে মহৎ ও মহীয়ান হতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গান্ধীজীর দেহাবসানের পর জওহরলাল বলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ আমরা—মাটি দিয়ে তৈরি ছিলুম। গান্ধীজী আমাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন। কি কারণে বা কাদের দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এক নিরস্ত্র অসহায় জাতিকে গান্ধীজী শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন। যে মানুষের ইংরাজের ন্যায় ও নীতির উপর শ্রদ্ধা ছিল অসীম, তাদের নিয়ে তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪২ অবধি নানা আন্দোলন করে ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বলেন (Quit India)। এই সময়ের মধ্যে যে কেবলমাত্র ভারতবাসীর মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল তা নয়, প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নিজের সঙ্গেও কম লড়াই করতে হয়নি। বর্তমানে 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর কথা উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্যে এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেছে। এখনও এর সঠিক ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেনি। 'সর্বাত্মক বিপ্লব' না বলেও গান্ধীজী নিজের জীবনে সর্বপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। যখন শুরু করেছেন আন্দোলন, তখন আপসহীন সংগ্রামের কথা মুখে একবারও উচ্চারণ করেননি, বরং মাঝে মাঝে আপসও করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর শক্তিও কমেনি, ভারতবর্ষেরও অমর্যাদা হয়নি। দেখা গেছে যে, আপসসের পর ভারতবর্ষ অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে এবং গান্ধীজীর আদর্শের উপর বিশ্বাস এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। এতবড় একটা জীবন, অথচ কোথাও অসাধারণত্ব নেই। এই মহাজীবন সাধারণ মানষকে আত্মপ্রত্যয়ে শক্তিশালী করে তোলে এবং এই পথেই মানুষের মর্যাদার প্রতি মানুষ আরও আস্থাশীল হয়।
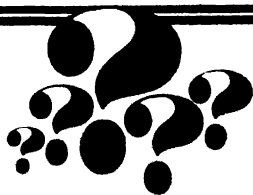
আলিপুর জেলে সশ্রম দণ্ডাজ্ঞা শেষ হতেই জেল গেটে আবার D I R-এ গ্রেপ্তার হলুম। এবারে ডিভিসন-১ কয়েদী। এর আগে কোনবারই ডিভিসন-১ হইনি। ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট ডিভিসন ঠিক করে দেন। কিন্তু এটা করা হয় অদ্ভুতভাবে। প্রথম ভারতীয় সহকারী Assay Master ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন

ডিভিসন-৩। আবার অনেকে ডিভিসন-১ হয়েছিলেন, যাঁদের অনেকের সরকারী-মতে ডিভিসন-১ হবার যোগ্যতা ছিল না। ডিভিসন-৩দের পরতে হত জেলের পোষাক—জাঙিগয়া, কুর্তা, আর তার সঙ্গে গামছা; সবই জেলের তাঁতে বোনা। তার সঙ্গে দু'খানা কম্বলও মিলত। একখানা মাথায় দাও, আর একখানা পেতে শোও। অবশ্য কোন কোন পুরনো জেলে মাথার দিকটা উঁচু করে বাঁধান থাকত। গ্রীষ্মকালে অবশ্য কম্বলে শুতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু সকলেই তো জেনেশুনে জেলে যেতেন। সেইজন্য কষ্টটা সহনীয় হতে সময় লাগত না। অনেকে আবার জাঙিগয়া পরতে চাইতেন না—তা নিয়েও অনেক অশান্তি। যাঁরা জাঙিগয়া পরতে চাইতেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কম্বল পরতেন, আবার কেউ কেউ বিবস্ত্র হয়েই থাকতেন। প্রথম প্রথম জেলখানার বাবুরা আমাদের নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাঁদের কোন সংজ্ঞা ঠিক হয়নি। সমাজবিরোধী কাজ করে যারা আসত—তারা তো সাধারণ কয়েদী, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন করে যাঁরা জেলে আসতেন, তাঁদের কি বলা হবে? সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যাপারে খুব গণ্ডগোল ছিল। আমরা স্বেচ্ছায় কাজ করতুম, কিন্তু অনেকে করতেন না, ফলে একটা ধস্তাধস্তি লেগেই থাকত। জেল কোডে একটা করে মশারি দেবার কথা থাকত, কিন্তু সাধারণতঃ দেওয়া হত না। পরে অনেক চেষ্টা করে বাইরে থেকে মশারি আনার ব্যবস্থা করা হয়। আর জেলের সঙ্গে বাগান ছিল, সেখানকার সাধারণ কয়েদী ও ডিভিসন কয়েদীদের খাওয়ার দুর্দশার অন্ত ছিল না। লাঠির মত মোটা আর পাথরের মত শক্ত কাটোয়ার ডাঁটা যতদিন পাওয়া যেত, ব্যস্—আর অন্য তরকারীর দরকার নেই। তার সঙ্গে লাল রঙের মোটা চাল, আর পোকা ধরা ডাল। যত ইচ্ছে খাও—তোফা। অবশ্য চেষ্টাচরিত্র করলে রুটি পাওয়া যেত। হপ্তায় দু'দিন আধ ছটাক করে মাংস বা গুড় বা আলুর দম পাওয়া যেত। সরকারী উৎসবের দিনে খাওয়াটা একটু ভাল করবার চেষ্টা ছিল।

ডিভিসন-১দের কারাবাসে আটক থাকার কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো রাজকীয় ব্যবস্থা। পরিধানের জন্য ধুতি অথবা পাজামা এবং শার্ট। ডিভিসন-৩এর তিনমাসে একবার ইন্টারভিউ এবং ডিভিসন-১ কয়েদীদের পনের দিন অন্তর একবার। চিঠি লেখা এবং পাওয়ার ব্যবস্থাও অনুরূপ। ডিভিসন-১ কয়েদী ইচ্ছে করলে বাড়ী থেকে খাট, গদি, বিছানা—সব আনতে পারে, বাড়ী থেকে রোজ খাবারও আসতে পারে। প্রত্যেকের জন্য খাট গদি বালিশ এবং চাদর। শীতকালে ডিভিসন-৩এর কম্বলের কুর্তা, ডিভিসন-১এর ফ্লানেলের শার্ট। ডিভিসন-৩এর খাদ্য তালিকা আগেই দিয়েছি। ডিভিসন-১এর খাদ্যতালিকা—সকালে টোস্ট মাখন ডিম দুধ। দুপুরে ভাত ডাল তরকারী মাছ এবং দই। রাত্রেও অনুরূপ। মাছ অথবা মাংস। অবশ্য D I R-এর যা ব্যবস্থা ছিল, তার কাছে ডিভিসন-১ কয়েদীর ব্যবস্থা অনেক কম। দুমাসে তিন শিশি জবাকুসুম তেল, অনুরূপ গায়ে মাখা সাবান, ছ'টা ধুতি বা পাজামা, দু'বছর অন্তর একটু ভাল কাপড়ের গরম কোট এবং একটি পশমী চাদর। দু' বছর অন্তর এক জোড়া ঘোড়তোলা জুতো, আর বছরে এক জোড়া করে স্যাণ্ডেল। খাওয়া প্রায় ডিভিসন-১-এর মতনই। তার চেয়ে একটু ভাল। আর গায়ের লেপ, খাটের মশারি এসব তো ছিলই। ছাড়া পাওয়ার সময় এগুলো সঙ্গে আনা যেত। অর্থাৎ বিনা বিচারে যাঁরা আটক আছেন, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একটু বেশী করে দিয়ে যদি তাদের মন একটুও ভোলান যায়—তারই একটু

অপচেষ্টা।

আমি আলিপুর জেলে 'মেসডেম' ওয়ার্ডের একটি সেলে ছিলুম। চারটি সেল নিয়ে একটি ওয়ার্ড। ওরই একটিতে জওহরলাল ছিলেন। 'মেসডেম' কথাটি হল 'misdemeanour' কথাটির অপভ্রংশ। এর বাংলা কি হবে জানি না। Oxford Dictionary-তে বলে 'Indictable offence less heinous than felony'। আমি তো বিনা বিচারে আটক ছিলুম, অতএব আমার সঙ্গে 'felony' কথা আসে কি করে বুঝি না। আর জওহরলাল যে কি 'felony' করেছিলেন তা আমার জানা নেই। 'felony'-র অর্থ ইংরাজী অভিধান মতে legally graver than misdemeanour। মনে হল যে এই চারটি সেল নিয়ে এই ওয়ার্ডটি তৈরী হয়েছিল স্বভাব-দুর্বৃত্তদের জন্য। ওয়ার্ডটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সেলগুলির সামনে ছোট্ট একটি উঠোন, আর পেছন দিকে প্রশস্ত মাঠ। পেছনে মাঠ থাকলে কি হবে, দেখবার তো উপায় নেই, জানলা বলে কিছু নেই। মাথার উপরে ৩ ফুট × ৯ ফুট গবাক্ষ। আমার ঘরের পিছন দিকে একটা চাঁপা গাছ ছিল। শুনলুম, কোন এক সাহেবের দ্বারা রোপিত। আর কাজ করবার জন্য ছিল দুজন ফালতু। একজনের বাড়ী মেদিনীপুরে—তার নাম গোবর্ধন। আর একজন বরিশালের—তার নাম নিতাই। জেলখানার এই ফালতু ব্যাপারটি সভ্যতার মানদণ্ডে বর্তমানে একেবারে সঙ্গতিহীন। চুরি করেছে বা ডাকাতি করেছে বা দাঙ্গা করেছে—সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। তা বলে এরা জামা কাচবে, এঁটো বাসন মাজবে, ঘর ঝাঁট দেবে, এমন কথা জেল কোডের কোথাও নেই। সশ্রম কারাদণ্ডর মধ্যে গৃহভৃত্যের কাজ কি করে এসে গেল এটা বোঝাই শক্ত। আর তারাও কয়েদী, আমরাও কয়েদী; তবু তারা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন তারা আমাদের ক্রীতদাস। গোবর্ধনের নাম হয়ে গিয়েছিল গোবরা—সে খুব গপ্পে লোক। প্রায়ই আমাদের জেলখানার সাহেব ভূতের গল্প শোনাত। আর নিতাই একটু গর্ব করে বলত যে, বাবুমশাই, গোবরার সঙ্গে বেশী কথা বলবেন না, ও চোর। নিতাই এসেছিল দাঙ্গা করে। জেলখানায় চোর বা ছিঁচকে চোরদের কেউ আমল দিত না। ইজ্জত ছিল, যারা ডাকাতি বা দাঙ্গা করে আসত।

D I R-এ আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী মশাই ও তাঁর ভাই বীরেন গাঙ্গুলী, নৃপেনদা (বোস), বসন্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্র ননী মজুমদার, আনসার জারোয়ানী, জয়নগরের বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, দক্ষিণ কলকাতার বিমল ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখার্জী, ধীরেন দত্ত ও আরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি। জেলখানায় শুনেছি এবং দেখেছি খুব দলাদলি এবং গণ্ডগোল হত। আমাদের জেলে সে-রকম কিছু ছিল না। আমার ঘরে পড়ার একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সুধীর দাশগুপ্ত, শান্তি দাশগুপ্ত (পরে মিনিস্টার হয়েছিলেন), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিত দত্ত (জেলখানায় নাম ছিল রাধিকা), আরও কয়েকজনের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। নিয়মিত আড্ডা হত ও পড়া হোত। অভয়াশ্রমের অমূল্যপ্রসাদ চন্দ্র (রমাপ্রসাদ চন্দ্র মশায়ের পুত্র) নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। পরে দিল্লীতে আত্মহত্যা করেন। বাংলার ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র—এসবও যেমন নিয়মিত পড়া হত, তেমনি কিছু কিছু Bertrand Russell, D. H. Lawrence, Whitehead, Shakespeare, Whitman, T. S. Eliot—এঁদেরও আনাগোনা ছিল। আর গানের আসর তো খুব বড় করেই বসত। ধীরেন দত্ত একটা সিটিং-এই ২০।২৫ খানা রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারত। এসবের সঙ্গে ছিল পাশা, তাস,

দাবা ও আরও অন্যান্য খেলা। আমার ঘর ছাড়া অন্যান্য ওয়ার্ডেও গান এবং খেলা হত। কিন্তু পড়াশুনার আড্ডাটা আমার ঘরেই ছিল। চারজন এম-এ দেয়। ন'জন দেয় বি-এ পরীক্ষা। ইন্টারমিডিয়েটের ছিল এগারজন. আর ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য ছিল উনিশজন। বেশ একটা সুস্থ পরিবেশ। পারস্পরিক অসুখ-বিসুখেও সাহায্য পাওয়া যেত। আমি তো শয্যাগত ছিলুম বললেই হয়। নৃপেনদা (বসু) আর চপল (তালুকদার)—এই দুজনের জন্যই বোধহয় সেযাত্রা রক্ষা পেলুম। নৃপেনদা ডাক্তার হলে কি হবে, কিন্তু স্নেহে একেবারে মায়ের মতন।

ঠিক হল থিয়েটার হবে। সকলে তো আমাকে ধরলে, অভিনয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলুম। কিন্তু রিহারসেলের সময় কথাগুলো এত আস্তে আস্তে বলতুম যে অভিজ্ঞরা আমায় বাতিল করে দিলেন। আমি হলুম প্রম্পটার। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু অলক্ষ্যে যদি বিধাতাপুরুষ বলে কেউ থাকেন, তিনি একটু মুচকি হাসলেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য মশায়ের একখানি বই অভিনয় হবে। থিয়েটারের দিন সকালে যার মেন পার্ট—চরিত্রটি হচ্ছে অধ্যাপক অতুল ঘোষের, সে আলিপুর জেল থেকে বদলি হয়ে গেল। অতএব আবার অভিজ্ঞরা স্থির করলেন যে আমাকেই নামতে হবে। জীবনে সেই প্রথম ও শেষ অভিনয়। যাঁরা আমার পরম শত্রু(?) তাঁরা সোৎসাহে বললেন যে অভিনয় খুব ভাল হয়েছে, আবার করতে হবে অর্থাৎ আমাকে নিয়ে মজা করতে চান।

জ্যোতিষচর্চাও জেলে খুব হত। অমূল্যচন্দ্র এবং আরও দু-একজন--তাঁরা ঠিকুজী কুষ্ঠি তৈরী করতেন এবং সেখানেই ভিড় বেশী হত। আমাদের ঘরে একজন হস্তরেখাবিশারদ ছিলেন। তাঁর দু-একটা গণনা অভ্রান্তভাবে মিলেছিল। আর যায় কোথায়? খুব ভীড়। আমাদের সঙ্গে নিবারণ পোদ্দার বলে একজন ছিলেন। অবশ্য শেষের কবিতা অনুযায়ী তাঁকে নিবারণ চক্রবর্তী বলে ডাকা হত। হস্তরেখাবিশারদ তাঁর হাত দেখে গণনায় যা বলেছিলেন সবই মিলে গেল। গোলমাল বাধল তাঁর মায়ের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। তারপর দু' হপ্তা যায়, পাঁচ হপ্তা যায়, দু'মাস যায়, মায়ের মৃত্যুসংবাদ আর আসে না। জেলে হৈ-হৈ, সকলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করল, কিন্তু নিবারণবাবু বিশ্বাসে অটল। চারমাস বাদে নিবারণবাবু একটি চিঠি পেলেন যে তাঁর এক মাসীর মৃত্যু হয়েছে। ব্যস, নিবারণবাবুর উল্লাস দেখে কে! এই মাসীর কাছে তিনি এক বছর বয়স থেকে এগার বছর অবধি ছিলেন এবং তাঁকেই মা বলে ডাকতেন। আবার হৈ-হৈ। শান্তি দাশগুপ্তকে হস্তরেখাবিশারদ বলেছিলেন যে শান্তিবাবু যখন একটা বয়সে পৌঁছবেন, সেইসময় তাঁর নিশ্চিত বিবাহ হবে। শান্তিবাবু এবং আরও অনেকেই অবিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে গণনা অভ্রান্ত। শান্তিবাবু একটি বিয়ের বরযাত্রী হয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে বিয়ের দিন বিকালে বর কলেরায় আক্রান্ত হয়। অতএব সেই কন্যাকে শান্তিবাবু বিয়ে করেন। একেবারেই অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু হস্তরেখাবিশারদ গণনা করে যে বয়স বলেছিলেন, ঠিক সেই বয়সেই বিবাহ হল।

মাঝে মাঝে জেলখানায় ফিস্টও হত। আমাদের মত লোক যারা জীবনের অনেকটা অংশ কংগ্রেস অফিসে কাটিয়েছে, তাদের কাছে প্রাত্যহিক খাবারটাই ছিল রাজসিক। আর ফিস্টের খাবার দিন মনে হত যেন কোন নবাবের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছি। এসব সত্ত্বেও মনের মধ্যে সবসময় একটা বাইরে বেরোবার আকাঙ্ক্ষা থাকত। আমরা জেলের মধ্যে, অথচ বাইরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের উত্তাল

তরঙ্গ তখনও স্তিমিত হয়নি। নানা ঘটনা দুর্ঘটনার সংবাদ যখন এসে পৌঁছত, তখন মানসিক অবস্থাও সেইভাবে ওঠা-নামা করত। আর একটা বড় বিসদৃশ ঘটনা মনকে যথেষ্ট পীড়া দিত। একই অপরাধে বন্দী, একই জেলে আছি, অথচ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী ও প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের খাওয়া-দাওয়ার এত পার্থক্য যে মনের দিক থেকে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আবার তাদের সঙ্গে যদি সাধারণ কয়েদী অর্থাৎ ফালতুদের ব্যবস্থার কথা মনে পড়ত, তখন হত মনের ভেতর একটা তীব্র জ্বালার অনুভূতি। মধ্যযুগের জেলখানার বর্বরতার কথা আমরা পড়েছি ও শুনেছি। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে এই বিংশ শতাব্দীতেও মধ্য-যুগের ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। এখনও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী পুরো মানুষের মর্যাদা পায় না। স্বাধীন দেশের মানুষের যে একটা মর্যাদা, সে যেখানেই থাকুক, সেটা তার প্রাপ্য। অপরাধ যদি করে থাকে, তার দণ্ডভোগ নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে জীবনধারার মধ্যে এত পার্থক্য থাকবে কেন? এই যে দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য উৎসব জেলখানার মধ্যে করতে দেওয়া হয়, এগুলো আর কিছুই নয়, কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক অব্যবস্থা ঢাকা দেবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

দিল্লী থেকে সকালে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছন হল। আমি পন্থজীর সঙ্গে ছিলুম। লক্ষ্ণৌ-এ যুবসমাবেশে পন্থজীর বক্তৃতা। সেখান থেকে আমরা রাজ-ভবনে গেলুম। মধ্যাহ্নভোজন সেরে যাওয়া হবে আসাম। রাজভবন থেকে এয়ার-পোর্টে যাবার পথে শ্রীমান নারায়ণ গাড়িতে উঠলেন। তখন ডেবরভাই কংগ্রেসের সভাপতি, আর শ্রীমান নারায়ণ অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। গাড়িতে কথায় কথায় শ্রীমান নারায়ণ বললেন, "এখনও এক বছর হয়নি, কি করে চালিহা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? ডেবরভাই আপনাকে জানাতে বললেন যে এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।" আমি নির্বাক শ্রোতা। অনেকক্ষণ শুনে পন্থজী ঘাড় নেড়ে বললেন, "শ্রীমান নারায়ণ, আইন করা হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য। আর এ তো আমাদের সংগঠনের আইন, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে লঙ্ঘন করলে আইনের মর্যাদা আরও বাড়বে।" শ্রীমান নারায়ণ আরও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পন্থজী চুপ। আমরা এয়ারপোর্টে হাজির হলুম।

ফকরুদ্দিন, বিমলা চালিহা, মিসেস থঙ্গম্যান, কামাখ্যা (ত্রিপাঠী) আর দেবু (বড়ুয়া)—এঁরা পাঁচজন লোকসভার সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী এঁরা আসাম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। বিষ্টুবাবু (মেধী) ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কামরাজের সঙ্গে কথা কয়ে স্থির হয় যে বিষ্টুবাবু মাদ্রাজের রাজ্যপাল হবেন। পন্থজী এবং জওহরলাল দুজনেই এ-ব্যাপারের সবটা জানতেন। আইনসভার নির্বাচনে মিসেস থঙ্গম্যান হেরে গেলেন, বিমলা চালিহারও পরাজয়

হল। ফকরুদ্দিন, কামাখ্যা ও দেবকান্ত নির্বাচিত হন। দেবকান্তর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা শুরু হয়। পার্টি থেকে চালিহাকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু কিছুদিন আগেই ওয়ার্কিং কমিটিতে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, নির্বাচনে যারা হেরে যাবে, এক বছরের মধ্যে তারা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না। অবশ্য এটা ছিল সুপারিশ, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি-র সামনে উপস্থাপিত হয়নি। ডেবরভাই এই সুপারিশকে আইনসঙ্গত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। পন্থজী অবশ্য তাঁর মিষ্ট অথচ দৃঢ় অভিমত দিয়ে ডেবরভাই-এর যুক্তি খন্ডন করেন। ফকরুদ্দিন হলেন অর্থমন্ত্রী। ওঁর অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ভাষা আন্দোলন নিয়ে সংঘর্ষ হয়। অনেক জায়গায় অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। পাশাপাশি তিনখানা দোকান, অসমীয়া হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের দোকান পোড়েনি, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর দোকান পুড়েছে। সেই সময় সুচেতা (কৃপালনী) আসামে অনেক কাজ করেছিলেন। সুচেতার একটা সুবিধে ছিল। ওঁর কাছে অসমীয়া, বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবী -এসবে কোন প্রভেদ ছিল না এবং একথা সকলে বিশ্বাস করত। আমার বেশ মনে আছে, আমরা একজায়গায় গিয়েছিলাম খোলা গরুর গাড়ি চেপে। রাস্তা ডুবে গিয়েছিল, ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখা গেল যে অসমীয়া হিন্দু এবং বাঙালী হিন্দুরা দুটো সামিয়ানার নীচে বসে হরিনাম করছে—আলাদা আলাদা। তখন অনেক রাত, তবু সুচেতার উৎসাহের অন্ত নেই। খানিক বাদেই দেখা গেল, সুচেতার সঙ্গে বাঙালী অসমীয়া সব হিন্দুরা একসঙ্গে সংকীর্তন করছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখলে মনে হবে না, এরাই কয়েকদিন আগে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল। সুচেতা চলে এলেন, আমি থেকে গেলুম। আসামে আমাকে যেতে হয়েছিল, আমাকে কংগ্রেস সভাপতি পাঠিয়েছিলেন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি—দু'জনেরই আমন্ত্রণ ছিল। সেইসময় ফকরুদ্দিনের কাজ করবার যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছি, তা ভোলবার নয়। অনেক বাঙালী হিন্দু গৃহহীন হয়েছিলেন। তাঁরা সাময়িকভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে স্থান পেলেও তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছিল। সেই ব্যবস্থাপনায় ফকরুদ্দিনের পারদর্শিতা অনন্যসাধারণ। কোথাও গৃহনির্মাণের করোগেটের টিন আসতে দেরী হচ্ছে। ফকরুদ্দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলছেন যে অমুকদিন অমুক সময় টিন এসে পৌঁছান চাই এবং এলে আমায় খবর দেবেন। নতুন করে টিউবওয়েল বসাতে হবে, দেরী হয়ে যাচ্ছে—সেখানেও ফকরুদ্দিন। ওষুধ গিয়ে পৌঁছয়নি, বড় বড় ডাক্তাররা ছোটাছুটি করছেন। তা নইলে ফকরুদ্দিনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। একজন মন্ত্রী চেষ্টা করলে গোটা সরকারকে চালিয়ে নেওয়া যায় এবং যথোচিতভাবে আর্তত্রাণ করা যায়। সেদিন ফকরুদ্দিনের কর্মদক্ষতা দেখে যেমন বিস্মিত হয়েছিলুম, তেমনি ওঁর ওপর শ্রদ্ধাও বেড়েছিল। কোন কোন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে ওঁর ওপর সাম্প্রদায়িকতার দোষ চাপাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। অনেকভাবে অনেকদিন আমি মিশেছি, মতদ্বৈধ হয়েছে, অনেক তর্ক হয়েছে, কিন্তু হৃদ্যতা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাপ আসামের লোক, উত্তরভারতে চাকরির জন্য যান এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। ফকরুদ্দিন ব্যারিস্টারী পাস করে আসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে জেল খেটেছেন, অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছেন, রাজ্যে এবং কেন্দ্রে তো মন্ত্রী ছিলেনই, পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হন। কংগ্রেস যখন ভাগ হয়, উনি একদিকে আর আমি একদিকে। তবু

দেখা হলে হৃদ্যতার অভাব হয়নি। বিধান শিশু উদ্যান উদ্বোধনের সময় সসঙ্কোচে রাষ্ট্রপতিকে লিখলুম, "রাষ্ট্রপতি মহোদয়, যদি আপনার সময় ও সুবিধেমত এসে বিধান শিশু উদ্যানের উদ্বোধন করেন, তাহলে আমরা বাধিত হব।" উত্তর এল ফকরুদ্দিনের কাছ থেকে। "দাদা, আপনাদের যেদিন সময় আর সুবিধে হবে, সেদিনই আমি যাব।" উদ্বোধন করতে এলেন। তখন সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা। কিছু অবুঝ পুলিস কর্মচারীদের অযথা হস্তক্ষেপের ফলে একবার মনে হয়েছিল রাষ্ট্রপতিকে এনে কাজ নেই। অবশ্য তৎকালীন পুলিস কমিশনার বিচক্ষণতা ও কার্যদক্ষতা সহকারে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। গোড়ায় ঠিক ছিল, শিশু উদ্যান উদ্বোধন করে অরুণাচল যাবেন। যেমনি আমার মুখে শুনলেন যে শিশু উদ্যানের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে-বেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, অমনি সব বাতিল হয়ে গেল। শিশু উদ্যানে ডাঃ রায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করার কথা। পুলিস কর্তৃপক্ষ মঞ্চ থেকে মর্মর মূর্তি অব্দি গাড়ী করে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি গট্‌গট্ করে হেঁটে চলে গেলেন, কারুর কথা শুনলেন না। জনসভা শেষ হবার পর রাজভবনে ফিরে গেলেন এবং আবার সন্ধ্যেবেলা এলেন। হেঁটে ঘুরে ঘুরে সবটা দেখলেন। আমি যখন বললুম যে পুলিসের পক্ষ থেকে মঞ্চের একপাশে শৌচাগার করার কথা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির নাকি হাঁটতে কষ্ট হয়। উনি হেসে বললেন যে রাষ্ট্রপতি ভবনেই তো তাঁকে রোজ দু'মাইল করে হাঁটতে হয়। শিশু উদ্যান দেখে মহা খুশী। আমাকে বললেন যে, "আপনি তো বেশ আছেন, এত বড় বাগান।" আমি বললুম, "ভাইসাহেব, তোমার তো মোগল গার্ডেন আছে।" সংগে সংগে উত্তর, "ওখানে তো আমি আবদ্ধ। চারদিক পাঁচিল ঘেরা।" প্রায় দশ বছর আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তখন থেকেই শরীর খারাপ। Emergency সই করার পর মনও ভেংগে পড়েছিল। সেই সদাহাস্যময় মানুষটির আর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যেত না। একদিন বাড়ীতে আমায় বললেন, "দাদা, বাতাঞ্জন কি কাবাব খাবেন?" আমি তো থ। মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খালি হাসছেন। শেষে কৌতূহল না চাপতে পেরে জিজ্ঞেস করলুম যে ওটা কিসের মাংসের কাবাব? হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসি আর থামে না। বললেন, "আপনারা যাকে বেগুন পোড়া বলেন, এটা তাই। গালিব খুব খেতে ভালবাসতেন।" বাঁকুড়ায় যখন পূর্বাঞ্চলের সব প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলন হল কামরাজ ছিলেন সভাপতি। বাঁকুড়া ছোট শহর। অত সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশ, কেউ কেউ একটু অসুবিধা অনুভব করছিলেন। ফকরুদ্দিনের স্বাভাবিক, অমায়িক ব্যবহারে বেশ একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সামান্য কথায় বলা যায় না। পাহাড়, জংগল, জলপ্রপাত, ব্রহ্মপুত্র আর নানারকমের উপজাতি—এইসব মিশে একটা বিচিত্র অঞ্চল। ভারতবর্ষের মধ্যে সবশেষে আসামে ইংরাজের আধিপত্য জারি হয়। এখন আসামের অনেক অংশ বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিমলা চালিহার সময় অনেক সমস্যাই ছিল। চালিহা স্বভাবে ছিলেন শান্ত ও ভদ্র। কিন্তু শাসনকার্যে বেশ দক্ষতা ছিল। ওঁর শরীর ক্রমাগত অসুস্থ হওয়ায় জীবনের শেষের দিকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। গঠনমূলক কর্মীরূপে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহুদিন 'নিখিল ভারত কাটুনী সংঘে'র সদস্য ছিলেন। রচনাত্মক কাজে গভীর আগ্রহ ছিল। আর আদর্শের দিক দিয়ে ছিলেন গান্ধীবাদী। মাঝে

মাঝেই শরীর খারাপ হত, কিন্তু গ্রাহ্য করতেন না। আমি একবার জোর করে জয়পুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নাগাল্যান্ড সম্বন্ধে জয়প্রকাশের শান্তিমিশনের খুব বড় সমর্থক ছিলেন। যখনই দিল্লীতে শান্তিমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে, বিমলা চালিহা প্রবলভাবে নানা যুক্তি দিয়ে শান্তি-মিশনের সার্থকতা বুঝিয়েছেন।

কামাখ্যা (ত্রিপাঠী) ছিল একজন দক্ষ শ্রমিক সংগঠক এবং তার INTUC-র সংগে যোগাযোগ বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কামাখ্যাদের আদি বাস উত্তরপ্রদেশ, কিন্তু সেজন্য আসামে ওর কাজকর্মে কোন অসুবিধা হয়নি। দেবকান্ত (বড়ুয়া) তো সুপরিচিত। আমার সংগে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এক পরিবারভুক্ত বললেই চলে। সুকবি, সুসাহিত্যিক; কেবলমাত্র অসমীয়া ভাষা নয়, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। ১৯৫২-তে লোকসভায় কংগ্রেস দলের ডেপুটি চিফ্ হুইফ্ ছিল, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে জওহরলাল ওকে অনেক কাজের দায়িত্ব দিতেন।

চীন বমডীলা আসার পর কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি অনেকদিন আসামে ছিলুম। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ ত' ছিলই আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও বহুবার যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেইসময় যে সব বিচিত্র ঘটনা আসামে দেখেছিলুম, তা ভোলবার নয়। অবশ্য তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। গৌহাটি থেকে ডিব্রুগড়ের দিকে যাচ্ছি, দেখলুম, মাইল পোস্টগুলোয় মাইল লেখা অংশটা মোছা, আর বড় রাস্তার ধারে ধারে ছোট রাস্তার মুখে যে সব গ্রামের নাম লেখা বোর্ড, সেগুলোর নাম লেখা অংশটুকু মোছা। গোড়ায় ঠিক খেয়াল করিনি, পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এগুলো সব মুছে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬২ সালেও কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের ধারণা ছিল, চীনা সৈন্যরা গ্রামের নাম পড়ে ও মাইল পোস্টের মাইল দেখে ধীরে ধীরে এগুবে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বাবার সংগে কলকাতা আসতে যেমন রাস্তার ধারে মাইলপোস্টের ইংরাজী সংখ্যা পড়ে ইংরাজী ১, ২.. শিখেছিলেন, ভারত সরকারের ধারণা হয়েছিল, চীনা সৈন্যরা বোধ করি সেইভাবে এগিয়ে যাবে। প্রকারান্তরে অবস্থা তাই ছিল। আসাম থেকে কলকাতা অব্দি প্রতিরোধ করবার মত কোন বাহিনী ছিল না। তেজপুরের ঘটনা আরও বিচিত্র। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারী ব্যাংকে নথিপত্র ও কারেন্সী নোট পোড়ান হয়। এই দহনকার্য সর্বসমক্ষেই হয়েছিল। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এইসব কার্য করা হয়, অথচ স্থানীয় লোকদের বলা হচ্ছিল, তারা যেন স্থানত্যাগ না করে। চীনা সৈন্য কাছাকাছি আসার জন্য আসামের অধিবাসীদের মনে একটা মিশ্র ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে যাকে demoralisation বলে সেটা ঘটল কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব কার্যকলাপে। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল গ্রামত্যাগ। নওগাঁতে এক সময় ৫০,০০০ লোক এসে হাজির হয়েছিল। চা-বাগানের ম্যানেজাররাও অদ্ভুত মনোবল (?) দেখিয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী সব পদস্থ কর্মচারীই সব ফেলে রেখে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে যানবাহনের অভাবের জন্য অনেকে পালিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। সেই সময় দেবকান্তর সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরেছিলুম। রাজ্য সরকার নিরুপায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ভয় উৎপাদনের সবরকম অপচেষ্টা হয়েছিল। আসামের অনেক অঞ্চলের

লোককেই প্রতি বছর ধনপ্রাণ নিয়ে বিপর্যস্ত হতে হয় ব্রহ্মপুত্রের বন্যার তান্ডবলীলায়। কিন্তু স্বয়ং সরকারের পক্ষ থেকে যদি ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা সামাল দেওয়া খুব শক্ত। রাজ্য সরকার এবং মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে জনস্রোত সামাল দেওয়া প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। যে যেমন অবস্থায় ছিল চলে এসেছে। ইস্কুল-কলেজ সব ভর্তি। তেজপুর হাসপাতালের কথা আগেই বলেছি—জওয়ানদের কান্না, শীতবস্ত্রের অভাবে ১৪,০০০ ফিট ওপরে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। তার উপর কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে 'ফ্রস্ট'-এ। জওয়ানদের অভিযোগ, তারা দেশরক্ষার জন্য লড়াই করতে পারল না—অসহায় অবস্থা। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও আসামের জনসাধারণ ও নেতাদের মনোবল অটুট ছিল। আমরা অনেকেই একসঙ্গে ঘুরেছি। নিজেরা অনেক বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি, দেশরক্ষার কথা বলেছি। কিন্তু এক আক্রমণে আমরা অর্থাৎ যারা দেশের কর্ণধাররূপে বিবেচিত হতুম, তারা কত বড় অপদার্থ তা প্রমাণিত হয়। এর ওপর আসামবাসীদের আর একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের উপদেশ দেবার জন্য দলে দলে নেতা, উপনেতা, পার্লামেন্টের সদস্য, আরও অনেক দায়িত্বশীল নাগরিক আসতে আরম্ভ করেন। যে সব আসামের অধিবাসী সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছে, সরকার তাদের দিকে নজর দেবে, না এইসব গণ্যমান্য অতিথিদের সাড়ম্বর অভ্যর্থনার আয়োজন করবে—এই বিভ্রাটের সম্মুখীন হতে হয়। রাজ্যপাল একদিন করুণ সুরে আমায় বলেন, "যাঁরা আসছেন তাঁরা আমাদের অতিথি, সব সময়ই বরেণ্য। তাঁদের সাহায্য এবং সহানুভূতি আমরা চাই। কিন্তু সাময়িকভাবে যদি তাঁদের আসা-যাওয়াটা বন্ধ করা যায়, তাহলে ভাল হয়।"
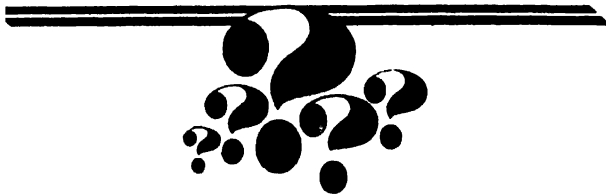
১৯৫২-এর সাধারণ নির্বাচনে, প্রফুল্লদা, কালীবাবু (মুখোপাধ্যায়), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হৃদয় চক্রবর্তী প্রমুখ অনেক মন্ত্রী ও নেতা পরাজিত হলেন। ডঃ রায় প্রফুল্লদাকে মন্ত্রিসভায় নেবার জন্য আগ্রহী। প্রফুল্লদা কিছুতেই মত দিলেন না। সেই সময় জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি। জওহরলালের একটা সারকুলার ছিল, যাঁরা সাধারণ নির্বাচনে এসে এসেমবলীর প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরাজিত হবেন, তাঁদের যদি আবার প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা আনা যায় তবেই তাঁদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া যাবে। আমার খুব অস্বস্তিকর অবস্থা। ডঃ রায় প্রফুল্লদা এবং কালীবাবুকে চান কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির সারকুলার এবং প্রফুল্লদার নিজেরও ঘোরতর আপত্তি। সমস্যার সমাধান হয় না। ডঃ কাট্‌জু এখানকার রাজ্যপাল, পরে কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টার হয়েছিলেন। তিনি একটা সূত্র বার করলেন। লোকাল বডিজ কনস্টিটিউএন্সি দ্বারা যাঁরা উর্ধ্বতন আইন পরিষদে নির্বাচিত হবেন তাঁদেরও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত বলা চলবে। ব্যাখ্যা হিসাবে এতে কোন

অসংগতি নেই। কিন্তু প্রফুল্লদার খুঁতখুঁতনি যায়নি। জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতিরূপে যখন এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে চিঠি দিলেন তখন প্রফুল্লদার আপত্তি দূর হল। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন মিউনিসিপাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আমরা প্রফুল্লদা, কালীবাবু, তারকদা, হৃদয় চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে এলুম।

তারকদা ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষ। বাল্যকালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তখনকার বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার জেল হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক যখন গঠিত হয় তাতে যোগদান করেন। পরে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৫২ নির্বাচনে নদীয়া জেলার সবক'টি আসনে আমরা জয়লাভ করি, কেবল ওঁর আসনে পরাজয় হয়। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। ওঁর পরাজয়ের কাহিনী বিশ্বাস করতে কারোর প্রবৃত্তি হয়নি। নদীয়ার সমস্যা ছিল অনেক। দেশ বিভাগের ফলে নদীয়া জেলার খানিকটা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সব জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে নদীয়া জেলা তাদের মধ্যে প্রধানতম। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দেশবিভাগ সমস্যায় বিপর্যস্ত। সবটাই কিন্তু পূর্বাঞ্চল। পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার জন্য যে সমস্যা হয়, দুই দেশের সরকার আপস আলোচনায় তা সমাধানের একটা উপায় বার করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বা তৎকালীন নেতারা মুখে যতই আপত্তি করুন, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিময় হয়েছিল। অর্থাৎ এদিককার পাঞ্জাব থেকে প্রায়—প্রায় কেন, সব মুসলমানই ওদিককার পাঞ্জাবে চলে যান এবং ওদিককার পাঞ্জাবের সব হিন্দু এদিককার পাঞ্জাবে চলে আসেন। অবশ্য তাও রক্তপিচ্ছিল পথেই হয়েছিল। প্রথম দিকে হিন্দুদের যে ট্রেনগুলি নিয়ে আসে তার কামরাগুলি মৃতদেহে ভর্তি আর মুসলমানদের যে ট্রেনগুলি নিয়ে যায় তার কামরাগুলিরও অবস্থা অনুরূপ। এসব সত্ত্বেও একটা সামঞ্জস্য হয়। কেবলমাত্র পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্যে দুই দেশের সরকার "রেঞ্জ-বদল" অর্থাৎ পারস্পরিক জমি বিনিময় মেনে নেন এবং ইভাক্যুয়ী প্রপার্টি অ্যাক্টও হয়। যে সব হিন্দু আসেন তাঁরা মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি, চাষের জমি এবং পেশা সবই পান। কষ্ট সেখানেও হয়েছিল খুব তবু তারই মধ্যে খানিকটা আশার আলো ছিল। এখান থেকে তিন লক্ষ মুসলমান চলে যায়, ফিরে আসে সাত লক্ষ। এটা আমার অভিযোগ নয়, সত্য ঘটনার বিবৃতি। আমরা মন থেকে ধর্মানুযায়ী লোক বিনিময় প্রথা স্বীকার করে নিতে পারিনি। ফলে আপসে জমি অদলবদলও হয়নি বা ইভাক্যুয়ী প্রপার্টি অ্যাক্ট হয়নি। আজ দেশ বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব নিতে কংগ্রেসেরও অস্বীকার করা উচিত নয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যখন কংগ্রেস দেশ বিভাগের কথা ভাবেওনি সেই ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ওঁদের কাগজে দেশ বিভাগের সমর্থনে লিখতে আরম্ভ করেন। তাতে যে মানচিত্র বেরিয়েছিল তাতে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা, দিনাজপুর জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলাকে ভারতবর্ষ থেকে বাইরেই দেখানো হয়েছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু মহাসভা—তাঁরাও এ ব্যাপারে কংগ্রেসের পুরো সমর্থক ছিলেন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীভূপতি মজুমদার এই দুজন কংগ্রেসী নেতা ছাড়া আর কোন নেতা দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি।

নদীয়া জেলায় যে চাপ পড়ে তার জন্যে তারকদার অসামান্য কর্মদক্ষতা দেখেছি। সে সময় তারকদার সঙ্গে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরবার সুযোগ

আমার হয়েছিল। আর সমস্যা কি একরকমের? যেখানে দেড়হাজার বসতির ব্যবস্থা করতে হবে, দেখা গেল দুদিনের মধ্যে পাঁচহাজার বসতি হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেড়হাজারের জন্যে যে নলকূপ, ত্রিপল ও আহার্যের আয়োজন হয়েছে তাই নিয়ে পাঁচহাজারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ এক জায়গায় নয়, এ প্রায় নদীয়া জেলার সর্বত্র। সরকারী কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন এত সামান্য যে কোন ছকেই একে কেউ ফেলতে পারছেন না। সেই সময় দেখেছি তারকদার কর্মদক্ষতা। তিনি যে সবাইয়ের কষ্টের অবসান করতে পেরেছিলেন তা নয়। তবু যাহোক করে একটা ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। কাঠামোটা ভেঙে পড়েনি। তারকদার চেষ্টার ফলেই স্থানীয় লোকেরা গভীর মমত্ববোধ নিয়ে সহযোগিতা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে সব ব্যবস্থা হয়েছিল তা সমস্যা পুরোপুরি সমাধানের জন্য নয়, তা একান্ত সাময়িক। আর যেগুলিতে পুরোপুরি সমাধানের ভার নেওয়া হয়েছিল তার পরিণতি হয়েছিল যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রথম দিকে বিভিন্ন শিবির থেকে কয়েক হাজার ছিন্নমূল বাঙ্গালী সেখানে গিয়েছিল। মনে অনেকেরই ছিল প্রত্যাশা। একবার আমরা দেখতে গেলুম। অনেকেই ছিলেন। প্লেন থেকে বাস্তারে নামা হল। গাড়িতে ছিলেন ডঃ রায়, প্রফুল্লদা, মিঃ জনসন (তখন ওখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত) আর তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কাটজু। আমিও সে গাড়িতে ছিলুম। পথে যেতে যেতে দেখা গেল যে সব বাঙ্গালী ওখানে বন কেটে চাষ করবেন বলে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই রাস্তা মেরামতের জন্য খোয়া ভাঙ্গায় লিপ্ত। জেরা করে আরও জানা গেল যে পঁয়ত্রিশটি ইঁদারার মধ্যে তিরিশটিতে জল নেই। টিউবওয়েলগুলিও প্রায় সেই রকম। অর্থাৎ খাবার জল দূরের কথা, চান কাপড় কাচার জলেরও অভাব। অথচ যাঁরা সেখানে গেছেন তাঁরা এই আশ্বাস পেয়েই গেছেন যে তাঁদের গতরে খেটে জমিতে ফসল ফলাতে হবে এবং সেচের জলও পাওয়া যাবে। অনেক জায়গায় গিয়েছিলুম। সর্বত্রই শিবির। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় যেমন শিবিরে ছিলেন সেখানেও সেই একই অবস্থা। প্রাথমিক আরম্ভে এইরকম। পরে অবশ্য শ্রীসুকুমার সেন (ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকশন কমিশনার) যাবার পর কিছুটা সুরাহা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কোন আয়োজনই যথেষ্ট ছিল না। রায়পুরের কাছের ক্যাম্পটিতে থাকবার কথা তের হাজার, সেখানে ছিল সাঁইত্রিশ হাজার। পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে অকর্মণ্যতা আমরা দেখিয়েছি তা স্বাধীন ভারতবর্ষে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

ক্যাম্পগুলির নাম ছিল "ট্রানজিট ক্যাম্প" অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা এসে প্রথমে এখানে উঠবেন। এখানে সাময়িকভাবে বাস করবার পর তাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যাবেন। পরিকল্পনা ছিল এই, অথচ স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য যে আয়োজন করার প্রয়োজন তা কিছুই করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়ই হিসাব দিতেন যে ছ'বছরে ট্রানজিট ক্যাম্পগুলির জন্য ৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ৮৪ কোটি টাকা শুনতে অনেক কিন্তু যার পেছনে কোন পরিকল্পনা নেই এবং সবই অস্থায়ী সেখানে ৮৪ কোটি কেন, হাজার ৮৪ কোটি টাকাও কিছু নয়। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে তাদের কোথাও পাঠানো হল না অথচ এই ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি বরাবর অস্থায়ী থেকে গেল। আট, দশ, বার, ষোল বছর ধরে এই ট্রানজিট ক্যাম্পের অধিবাসীদের কেবল মাত্র সরকারী ডোলের উপর

নির্ভর করে থাকতে হল। ফলে কৃষক অথবা শিল্পী অথবা ছোটখাটো দোকানদার কেউই নিজের বৃত্তি অবলম্বন করতে সক্ষম হল না, প্রকারান্তরে তাদের ভিক্ষুকে পরিণত করা হল। সরকার এবং কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক যুক্তি দেখানো হল ঠিকই। যুক্তিগুলো যে অসার ছিল তাও নয়। একটা বড় যুক্তি ছিল যে পশ্চিম জার্মানীতে ৪৪ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছিল। তাদের ছ'বছরের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম জার্মানী এ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁরা কত লোকের ব্যবস্থা করতে হবে জানতেন এবং নির্দিষ্ট দিনের পর আর উদ্বাস্তু আসেনি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ১৯৪৭ সালে এ দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভা কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট দেন যে এখানে বিশেষ উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। তারপর কোন বছর আসে পঞ্চাশ হাজার, কোন বছর আসে তিন লাখ, কোন বছর আসে এক লাখ। যেমন সংখ্যার কোন স্থিরতা ছিল না, কোন নির্দিষ্ট সময়ও ছিল না। সেইজন্য সরকারের পক্ষে কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়নি। এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বই লেখা যায়, সমস্যার সমাধান করা যায় না। সমস্যা এমন জটিল হয়ে উঠেছিল যে লোকের চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো যে একেবারে ভেঙে পড়েনি তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য অধ্যায়। এর সংগে ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের এই সমস্যার প্রতি গভীর ঔদাসীন্য ও এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড অজ্ঞতা। ভিন্ন রাজ্যের অনেকেই প্রশ্ন করতেন, যখন পাঞ্জাবে পুনর্বাসন সম্ভব হল, পশ্চিমবংগে হল না কেন! দুটো সমস্যা যে সম্পূর্ণ আলাদা, অনেক দেশ-নেতার এ জ্ঞানও ছিল না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও এ বিষয়ে জানবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল তাও মনে হয় না।

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির উপর অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোলকাতার কথা আলাদা, সেখানে চাপ সবচেয়ে বেশী। একটা লক্ষণীয় বিষয়, যেখানেই উদ্বাস্তুরা বসবাসের জন্য ও চাষের জন্য সামান্য জমি পেয়েছেন সেখানকারই চেহারা বদলে গেছে। এবং তার ষোল আনা কৃতিত্ব যেসব উদ্বাস্তু সেখানে গেছেন তাঁদের। যেমন শিলিগুড়ি। লোকসংখ্যা ছিল আট হাজার, এখন হয়েছে আশি হাজার। উত্তর-বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বলাও চলে। জলপাইগুড়ির মাল নামক গ্রামে প্রথম যখন গিয়ে-ছিলুম একটা ছোট্ট ভাংগা বাড়িতে একটা ইস্কুল ছিল এবং কয়েক ঘর লোকের বাস। এখন এক সমৃদ্ধ জনপদ। বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে ছিন্নমূল যেসব নরনারী এসেছেন তাঁরা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বৃদ্ধি করেছেন তাই নয়, নিজেদের চেষ্টায় অনেক অঞ্চলকে সমৃদ্ধও করেছেন। অন্যান্য রাজ্যে কোন ব্যবস্থা না ক'রে উদ্বাস্তু পাঠানোর ফলে সেই সব জায়গায় পুনর্বাসন এক বিভীষিকায় পরিণত হয়। ফলে বহু জায়গাতেই পুনর্বাসন না হয়ে সে জায়গা-গুলি অশান্তির পীঠস্থান হয়ে ওঠে। স্বাধীন হবার পর চোদ্দ পনেরো বছর ধরে কেবলমাত্র সাময়িক সাহায্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পুনর্বাসনের পরি-কল্পনা থাকলেও তা ছিল অবহেলিত। এখনও পশ্চিমবঙ্গে বহু অঞ্চল আছে যেখানে উদ্বাস্তুদের বসবাস হয়েছে বটে, কিন্তু তার পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না বলে ভিত্তিটা অর্থনৈতিক হয়নি। ঋণ দেওয়ার নিয়মও ছিল অদ্ভুত। যে অভাবগ্রস্ত মানুষ, তাকে যদি গরু কেনবার জন্য ঋণ দেওয়া হয় আর সেই ঋণ যদি দেওয়া হয় আংশিকভাবে, তবে তাঁর পক্ষে গরু কেনা কখনও সম্ভব হয়

না। যে গরুর আড়াইশ' টাকা দাম তার জন্য যদি প্রথমে একশ টাকা দেওয়া এবং বিভিন্ন দফায় দেওয়ার শর্ত থাকে তাহলে টাকাটা দেওয়া হয় বটে এবং অভাবগ্রস্ত লোক টাকা পায় বটে, কিন্তু গরু কোনদিন কেনা হয়ে ওঠে না। ঠিক গৃহ নির্মাণের ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিও তাই। চুন কেনার পয়সা থাকে তো সিমেন্ট কেনার পয়সা থাকে না। ঘরের মেঝে হয়তো করা যায় কিন্তু ছাদ করা যায় না। এই সামগ্রিক অব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা যে এখনও বেঁচে আছি এবং রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারি, এ পৃথিবীর সর্বকালের পরমাশ্চর্য ঘটনা।
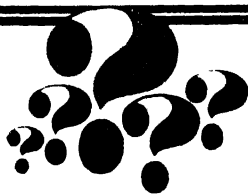
এখন যা নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, এটা গঠিত হয় রাজ্য পুনর্বিন্যাসের সময়। তার আগে নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদ বাদ দিয়ে অন্ধ্র প্রদেশের বাকী অংশটা ছিল মাদ্রাজের মধ্যে। নিজামের রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবার পর হায়দ্রাবাদে রাজধানী হয়। হায়দ্রাবাদের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। প্রথম আসফ জা-কে নিজাম-উল-মুল্ক করে দিল্লীর সম্রাট পাঠিয়ে দেন। ইনিই নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ আছে যে, প্রথম আসফ জা হায়দ্রাবাদ আসবার আগে দিল্লীর বিখ্যাত পীর নিজামুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রসাদস্বরূপ একখানি সিল্কের রুমালে কয়েকখানি রুটি বেঁধে দেন। গুনে দেখা যায় যে, সাতখানি রুটি আছে। সেই থেকে প্রচার হয়ে আসছে যে, নিজামের বংশ সাত পুরুষ থাকবে। সত্যই তাই ঘটেছে। স্বাধীনতার পর যখন নিজামের রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটা সপ্তম পুরুষেই ঘটে।

হায়দ্রাবাদে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান ও জিনিসের মধ্যে চার মিনার বলে একটা জায়গা আছে। চার মিনারের নাম এখন অবশ্য অনেকেই জানেন; কারণ ওটি একটি বিশেষ ব্র্যান্ড সিগারেটের নাম। চার মিনার তৈরির কাহিনীও বেশ একটু রোম্যান্টিক। তখন হায়দ্রাবাদ রাজ্য ছিল না; পাশেই গোলকুণ্ডার সুলতান ছিলেন মহম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৮৯)। তারপর অবশ্য ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা ফোর্ট দখল করেন (১৬৮৭)। এই মহম্মদ কুলির ছেলে ভাগমতী বলে একটি মেয়েকে, যেখানে এখন চার মিনার, সেখানে দেখেন। ব্যস্, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমে পড়া এবং তারপরই বিবাহ। এই কারণে জায়গাটিকে স্মরণ করবার জন্য সেখানে চার মিনার তৈরী হয়। হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির পর প্রথম যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সঞ্জীব রেড্ডী তার মুখ্যমন্ত্রী হন। সঞ্জীব রেড্ডীর ব্যাপারটা অদ্ভুত। কতবার যে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন, তা মনে রাখা খুবই কষ্টকর। একবার তখনও হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি হয়নি, অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আছে, কিন্তু তার শাসনকার্য পরিচালিত হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাধ্যমে। সঞ্জীব রেড্ডী মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী। অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচন হবে। অনেকেরই মনোমত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব তীব্র হবে, কারণ অধ্যাপক

রঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। অধ্যাপক রঙ্গের তখন খুব নাম, প্রতাপও দোর্দণ্ড। দিল্লী থেকে নির্বাচন পরিচালনা করতে গেলেন শ্রী এস কে পাতিল। সঞ্জীব রেড্ডী ততদিনে নির্বাচনদ্বন্দ্বে নেমে পড়েছেন। পাতিল অনেক বোঝালেন, 'তোমার তো কম বয়স, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো।' সঞ্জীব রেড্ডী অচল, অটল। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন নির্বাচনে সঞ্জীব রেড্ডী হেরে যাবেন, কিন্তু উনি জিতলেন। সেই হল মন্ত্রিত্ব ছাড়ার শুরু। তারপর যে কতবার ছেড়েছেন ইয়ত্তা নেই। কামরাজ প্ল্যানের সময় এ আই সি সি-র নির্দেশমত সব মন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঞ্জীব রেড্ডীও পিছিয়ে ছিলেন না। জওহরলালের উপর ভার ছিল পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবার। জওহরলাল সঞ্জীব রেড্ডীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। সঞ্জীব রেড্ডী মহাখুশী। কিন্তু বিপদ এল অন্য দিক দিয়ে। কামরাজ এবং আমি দুজনেই আপত্তি করলুম। আমাদের যুক্তি ছিল—সঞ্জীব রেড্ডী মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে আটাশ মাস কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। আবার তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা কেন? জওহরলাল শুনেও শুনলেন না। সেই সময় অন্ধ্র মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রীরা এসে জওহরলালকে জানিয়ে দিলেন যে, সঞ্জীব রেড্ডীকে পদত্যাগ করতে দেওয়া উচিত হবে না। আবার রাজ্যপালও তাঁর সরকারী রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের সংগে এটাও লিখলেন যে, সঞ্জীব রেড্ডী সেই সময় পদত্যাগ করলে অন্ধ্রের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকপক্ষে, সঞ্জীব রেড্ডীকে পদত্যাগ করতে বলার কোনও যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। দিল্লীর জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস সভাপতি হয়ে আসতে চাননি। জওহরলালের নির্দেশেই তাঁকে সভাপতি হয়ে আসতে হয়। অনুরোধ নয়, নির্দেশ।

অন্ধ্রের ইতিহাস যেমন নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে, সঞ্জীব রেড্ডীও সেইভাবে নানা স্তর অতিক্রম করে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এই অন্ধ্রের তেলেঙ্গানাতেই কম্যুনিস্টরা আন্দোলন শুরু করে। সে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। কম্যুনিস্টরা যেমন আওয়াজ তুলেছিলেন 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়', তেমনি মনে করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের দিকে দিকে তেলেঙ্গানার মত মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হবে এবং ভারত সরকার বিপর্যস্ত হয়ে আর শাসনকার্য চালাতে পারবেন না। নিজাম-রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তির সময়েও গণ্ডগোলের অপচেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অতীব বিচক্ষণতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কোনও আন্দোলনই সফল হতে পারেনি। সঞ্জীব রেড্ডী এসে লালবাহাদুরের মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। এইভাবে বারবার অন্ধ্র ছেড়ে এসেছেন, মন্ত্রীর আসনও অবহেলায় ছেড়েছেন, আবার সসম্মানে ফিরে এসেছেন।

১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তখন সেখানে সঞ্জীব রেড্ডীর স্থান হল না। সকলেই একটু বিস্মিত। সঞ্জীব রেড্ডী কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাকে বললেন, 'অশোক সেন মশাইকে স্পীকার করতে হবে।' আমি অশোককে জিজ্ঞেস করায় সে তীব্র অসম্মতি জানায়। আমি শ্রীমতী ইন্দিরাকে তার অসম্মতির কথা জানালে তিনি বলেন, 'যে-কোনরকমে অশোক সেনকে রাজী করাতেই হবে। ব্যর্থ চেষ্টা! অশোক কিছুতেই রাজী হয়নি। শ্রীমতী ইন্দিরা ডেকে বললে সে হয়তো মন্ত্রী হতে রাজী হত, কিন্তু স্পীকার-পদের প্রতি তার প্রবল অনীহা ছিল। তখন খোঁজ খোঁজ চলেছে। অনেকেই রাজী নয়। কারণ অতি সুস্পষ্ট। কারণ চতুর্থ

লোকসভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য ছিল সামান্য এবং বিরোধী দল ছিল খুবই শক্তিশালী। অনেকেরই লোকসভা পরিচালনা করা সম্পর্কে মনে দ্বিধা ছিল। লোকসভার স্পীকার নিয়ে যখন এরকম টালমাটাল অবস্থা তখন কামরাজ একদিন রাজাকে (কে সি পন্থ) ডেকে বললেন, "সঞ্জীব রেড্ডীকে স্পীকার করে নাও না। খুবই ভাল হবে তা হলে।' রাজা গিয়ে পার্টি মিটিং-এ এ কথা প্রকাশ করায় চারিদিক থেকে হইহই করে সমর্থন। শ্রীমতী ইন্দিরা বিশেষ পছন্দ করেননি। কিন্তু ব্যাপারটা তখন তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে। সঞ্জীব রেড্ডী স্পীকার হলেন। এ মানুষটির মধ্যে কোনও হেলদোল দেখিনি। তোমরা চাও, আমি আছি; না চাও, নেই। সব নির্বাচনের আগে অবধি এরকম 'ক্যাভেলিয়ার' মনোভাব। একবার নির্বাচিত হলে তখন একান্ত নিষ্ঠায় নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। তার মধ্যে কেউ কখনও খুঁত ধরতে পারেনি। স্পীকার-পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বিরোধী দলও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মবলঙ্কারের পর এরকম সুনাম আর কোনও স্পীকার অর্জন করতে পারেননি।

রাষ্ট্রপতির আসন যখন শূন্য হল, স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস দল থেকে সঞ্জীব রেড্ডীর নাম ওঠে। তখনও কোনও তরফ থেকে আপত্তির কথা শোনা যায়নি। আর, তা ছাড়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসী দলের মধ্যে এর আগে বহুবার মতদ্বৈধ হয়েছে। কিন্তু তা কখনও বাইরে প্রকাশ পায়নি। রাজেন্দ্রবাবু যখন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হন, তখন জওহরলাল তীব্র আপত্তি করেছিলেন এবং তিনি জোর দিয়েই ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি করতে চান। অনেকে মিলে যখন জওহরলালকে বলা হয় যে, রাজেন্দ্রবাবুকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি করা উচিত, তখন মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল সেটা মেনে নেন। ডঃ জাকির হোসেন যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন কামরাজ চেয়েছিলেন যে, ডঃ রাধাকৃষ্ণন পুনর্নির্বাচিত হন। আমরা কয়েকজন আপত্তি করি। শেষ অবধি পার্লামেন্টারী বোর্ডেও আলোচনা হয়, কিন্তু কামরাজ আমাদের কথা মেনে নেন। জওহরলাল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি ছিলেন বহু দিনের প্রবীণ ও শ্রদ্ধাভাজন নেতা। তা সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশের মতের কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন। কামরাজ অখ্যাত অবস্থা থেকে কংগ্রেস সভাপতি হননি। তার পিছনে বহুদিনের সুনাম ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর ছিল। কামরাজও জাকির হোসেনের বেলায় আমাদের মত মেনে নিয়েছিলেন, কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয়নি। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। মনোনয়নপত্র পেশ করার আগে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী পার্টি কমিটির মিটিং-এর জন্য সঞ্জীব রেড্ডী ইউরোপ গিয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে যখন শুনলেন কংগ্রেসের কোনও কোনও মহল তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়াটা ঠিক পছন্দ করছে না, সংগে সংগে মনঃস্থির করে ফেললেন। কামরাজের বাড়িতে কামরাজকে ও আমাকে বললেন, 'এই গোলমালের মধ্যে আমার না দাঁড়ানোই উচিত।' কামরাজ জানালেন, 'তুমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে এস।' কামরাজ আমাকে আগেই প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি যেতে বললেন। আমার উপস্থিতিতে শ্রীমতী ইন্দিরার কাছে কুশলপ্রশ্নাদির পর সঞ্জীব রেড্ডী জানালেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি-পদে দাঁড়াতে অনিচ্ছুক। শ্রীমতী ইন্দিরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে আমরা চাই। আমি মনোনয়নপত্রে আপনার নাম দিয়ে প্রস্তাব করব এবং আমি নিজে আপনার মনোনয়নপত্র পেশ করব।' এবং শ্রীমতী ইন্দিরা নিজে সঞ্জীব

রেড্ডীর নাম রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য প্রস্তাব করেন। এর আগের এবং পরের ঘটনা সত্য এবং মিথ্যার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ বঞ্চনার আর কোনও নজির নেই পৃথিবীতে। পার্টির দলপতি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নাম প্রস্তাব করে পরে পিছন থেকে ছোরা মেরে হারিয়ে দিলেন—এ ঘটনা সত্য হলেও বিশ্বাস করা কঠিন। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডী মাত্র ষোল-সতেরটি পার্লামেন্টারী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যে মনোনয়নপত্রে সই করে সে ভোট দেয়, কখনও বিরুদ্ধে যায় না। আর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যতরকমের গর্হিত কাজ করা সম্ভব ভারতের প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা সবই করেন। কংগ্রেসের আশি বছরের ইতিহাসে কংগ্রেস দলেরই প্রধানমন্ত্রী নিজে এক মসীময় কালিমালিপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এর নজির নেই যে, দলপতি নিজে অগ্রণী হয়ে দলের মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। এ পরাজয়ে সঞ্জীব রেড্ডীর কোনও ক্ষতি হয়নি, গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান চিরকালের জন্য সভ্যসমাজে হেয় হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই জয়লাভ করেছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, সেই সঞ্জীব রেড্ডীই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং তা হলেন সর্বসম্মতিক্রমে। এই সম্মতিতে লোকসভার কংগ্রেসী দলের পূর্ণ সমর্থন ছিল, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টের যে কংগ্রেস দলের কিছু সদস্যের কাছে সঞ্জীব রেড্ডী ছিলেন অযোগ্য, হঠাৎ সেই দলই তাঁকে যোগ্যতম প্রার্থী বলে স্থির করলেন।
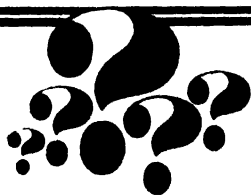
মুকুটমণিপুরে পৌঁছে কংসবতী বাঁধের কাজ শেষ হতে প্রায় সাড়ে বারটা বেজে গেল। কংসাবতী, কুমারী এবং শিলাবতী—তিনটে নদী বেঁধে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীতে সেচের জল দেওয়া হবে। যত দূর মনে হচ্ছে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর বেশী জল পাবে এবং হুগলী অতি সামান্য। বাঁকুড়ার খাতড়া থানায় মুকুটমণিপুরে এই বাঁধ। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে, এই দিকটা ছোটনাগপুরেরই একটা অংশ। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর শাল-পলাশের বন। মহাবিস্তৃত জংগল অঞ্চল ছিল। ক্রমাগত গাছ কাটার ফলে জমির অবক্ষয় ঘটেছে। তবু এখনও যে শোভা তা অতুলনীয়। ফাল্গুনে পলাশ যখন তার রক্তরাঙা বিজয়-কেতন ওড়ায় তখন অতি জড়বাদীও চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। এখনও কিছু কিছু হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া গাছ আছে। তা ছাড়া পিয়াল, অর্জুনেরও সমারোহ কম নয়। আগে এই অঞ্চলে বহু ভেষজ গাছ ছিল। এখন অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে কংসাবতী খুব চওড়া। আর বর্ষাকালে খুব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। বাঁকুড়া থেকে খাতড়া যাবার পথে শিলাবতীর ক্ষীণ রেখা

দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে। বর্ষাকালে এর তাণ্ডবলীলায় ঘাটাল মহকুমায় বিপর্যয় হয়। কংসাবতীর উৎপত্তি-স্থান দেখলে বোঝাই যাবে না যে, কংসাবতী এরকম বিস্তৃত রূপ নিতে পারে। পুরুলিয়া থেকে রাঁচী যাবার পথে জয়পুর এবং ঝালদার মাঝে রাস্তার উপর একটা বারো ফুট চওড়া কালভার্ট আছে। সেইখান দিয়েই কংসাবতী বয়ে আসছে। একটু দূরেই একটি ছোট্ট বিধ্বস্ত পাহাড়। মনে হয় যেন কেউ গদাঘাতে পাহাড়টাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। একটিও গাছ নেই। ক্রমাগত গাছ কেটে ফেলার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি।

মুকুটমণিপুরের কাজ সেরে আমরা খাতড়ার বাংলোয় ছিলুম। সেইখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন। সেখানে একরকম মিষ্টান্ন দিল—নাম চিত্তরঞ্জন। অপূর্ব খেতে। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে বলা হল যে, মিষ্টিটা খুব ভাল। যেন সবাইকে দেওয়া হয়। খাওয়ার পর আমরা বিশ্রাম করছি এমন সময় কর্তৃপক্ষের একজন চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'আজ্ঞে, সব ব্যবস্থাই তো ঠিক, কেবল মিষ্টান্নটি নেই।' আমি হাসি চাপতে পারলুম না। ফলে সব কথাই ফাঁস হয়ে গেল। পরামর্শটি দিয়েছিলেন ডাঃ রায়। ও'রই সন্দেশটি ভাল লেগেছিল। উনি হেসে হেসে বললেন, 'ওহে, তোমরা তো সেইরকম করলে'—বলেই গল্প শুরু করলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর অজস্র গল্প বলতে পারতেন এবং নিজে না হেসে। খাতড়ায় যে গল্পটি বললেন তার সারাংশটি হল—ছোট ভাই বড় ভাইকে চিঠি লিখেছে—দীর্ঘ চিঠিঃ 'দাদা, তোমার বাড়িতে অসুখ। তার উপর আয় সামান্য। ছেলেপুলেও অনেকগুলি। আমার কাছ থেকে অর্থসাহায্য গেলে তবু খানিকটা সুবিধা হয়। তোমার এ অবস্থা জানা সত্ত্বেও গত বছর কিছু পাঠাতে পারি নাই। এবছর তাহাও পারিলাম না।' এই ছিলেন ডাঃ রায়। এক দিকে যেমন কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত, আবার যাতায়াতের পথে অবসর পেলে তাস খেলতেন। আর তাঁর ঝুলিতে অজস্র ছোট গল্প ভরা ছিল। তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা অনেকেই জানেন। প্রশাসক হিসেবেও খুব নাম হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে সময় সময় খুব আড্ডা দিতে পারতেন—এ খবর অনেকেরই অজানা।

আমরা মুকুটমণিপুর থেকে বাঁকুড়া শহরের কাছে গৌরীপুর কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র ও কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতালে গেলুম। যাবার পথে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চবার্ষিকী যোজনা নিয়ে আলোচনা করলেন। একটা গোলমাল ডাঃ রায়ের মধ্যে ছিল। তাঁর চিন্তাধারা ছিল বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক ও নগরমুখী। কুটিরশিল্প বা গ্রামের চাষবাস সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কিন্তু মন ছিল না। এটা জওহরলালের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। অবশ্য জওহরলালের ঔদাসীন্য বোঝা যায়, কিন্তু ডাঃ রায়ের অবহেলা আমার বুদ্ধির অগম্য। কারণ, জওহরলাল যাকে 'প্ল্যানার' বলে তা ছিলেন না। খানিকটা তিনি ভাবরাজ্যে বাস করতেন। সেজন্য বাস্তবের রূঢ় সংস্পর্শে বহু সংঘাতের সৃষ্টি হত। এবং ভারতবর্ষের স্বনির্ভরতার জন্য জওহরলাল বরাবরই শিল্পসৃষ্টির দিকে জোর দিয়েছেন। ডাঃ রায় ছিলেন সত্যিকারের একজন 'প্ল্যানার'। বাস্তবের রূঢ় সংঘাত তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। তবুও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর কোনও সময়ই কেন যে জোর দেননি তা ব্যাখ্যা করা শক্ত।

গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রমটি একটি শালবনের মধ্যে। আবহাওয়া ভাল। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম এবং চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত আছে। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার কুষ্ঠ রোগীর শতকরা হার স্বাধীনতার পর অনেক কমে গেছে। কিন্তু সমস্যা খুবই

জটিল। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে কুষ্ঠ রোগীদের সমাজে স্থান নেই। এখন অধিকাংশ কুষ্ঠ রোগী রোগমুক্ত হচ্ছেন কিন্তু তাঁদেরও সমাজে স্থান হচ্ছে না। তারপর তাঁদের স্থান কোথায়? কুষ্ঠাশ্রমে থাকা চলবে না; কারণ, তাঁরা রোগমুক্ত। সমাজে স্থান নেই; কারণ, তাঁদের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। এবং সাধারণভাবে সমাজে এখনও কেউ বিশ্বাস করেন না যে, কুষ্ঠরোগী সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হতে পারে। একদা যিনি কুষ্ঠরোগী ছিলেন, চিকিৎসার গুণে স্পৃশ্য হয়েছেন—এ বোধও অধিকাংশ লোকের মধ্যে নেই। অধিকাংশ বললে ভুল বলা হয়, একেবারেই নেই বললেই চলে। সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবীরা যতটা আগ্রহশীল হলে সমাজ থেকে এই অহেতুক ও অমূলক কুসংস্কার দূর হতে পারে তার চেষ্টাও বিশেষ নেই। এর ফলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একদা কুষ্ঠরোগী বর্তমানে রোগমুক্ত—এঁদের তা হলে স্থান কোথায়? রোগমুক্তকে পরিবারের লোক বর্জন করতে পারে না, অতএব সেখানে রোগমুক্তদের স্থান হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—সমাজে একঘরে হয়ে থাকা। মুখে কেউ বলে না; কিন্তু পারতপক্ষে সকলেই ঐ পরিবারকে এড়িয়ে চলে। তা হলে উপায় কি? যাঁরা রোগমুক্ত তাঁরাও তো মানুষ! তাঁরাও তো স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনযাপন করতে চান! কিন্তু তাঁদের কাছে সব পথ বন্ধ। এ যেন টিকে থাকার জন্য বেঁচে থাকা। আইন করে এই সামগ্রিক সামাজিক কুসংস্কার বন্ধ করা যাবে না। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি চিকিৎসকগণ এবং সমাজপতিগণ কুষ্ঠরোগীর রোগ নিরাময়ের পরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হন। 'আফটার কেয়ার কলোনি'র দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না। কিছু লোককে এগিয়ে এসে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্ত মানুষ যে পরিবারে বাস করেন, যদি সেই পরিবারের সংগে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন তবেই হয়তো একটা পথ খুলে যেতে পারে। আমি হয়তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে দেখেছি যে, তাঁদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। যেন মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার তাঁরা হারিয়েছেন। আমি অনেক দিন একটি কুষ্ঠাশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলুম। আমার বুদ্ধিতে কোন পথ বার করতে পারিনি।

গৌরীপুর থেকে আমরা গেলুম দুর্গাপুর। সেখানে অনেক রাত অবধি ডাঃ রায় দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর 'কোক ওভেন প্ল্যান্ট'টা ঘুরে আসার জন্য বেরুলেন। তখন রাত নটা বেজে গেছে। অফিসাররা সসংকোচে একান্ত নিভৃতে আমাকে বললেন যে, তাঁদের শারীরিক ক্ষমতায় আর কুলচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে ছিল সাংবাদিক শিবদাস ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও অনিল ভট্টাচার্য (যুগান্তর পত্রিকা)। এরা দুজনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে ডাঃ রায়কে বোঝাতে গেল যে, তাঁর ঐ বয়সে—সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এতটা পথ অতিক্রম করেছেন—পরিশ্রম বেশ হয়েছে। আজ রাত্তিরে তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এ দুজনের সাহস অসামান্য। সেজন্য যে কথা কেউ সাহস করে বলতে যায়নি, এরা বলে ফেলেছিল। ডাঃ রায় শুনেই বললেন, 'ও! তোমাদের বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে!' একজন অফিসারকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এদের খাবার ব্যবস্থা করে দাও'। ব্যস, তারপরেই বেরিয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য সঙ্গে ছিলুম। ওই দুজন সাংবাদিকের অবস্থা সংকটাপন্ন। অপর সব সাংবাদিকরা ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল। এবং বেচারীরাও একটু মুষড়ে গেল। আমরা সাড়ে দশটার পর ফিরে এসে দেখি অফিসাররা শিবদাস ও অনিলকে অনেক সাধাসাধনা করছেন খাবার জন্য। তারা না খেয়ে চুপ করে বসে আছে। সে একটা

উপভোগ্য দৃশ্য। আর ডাঃ রায়ের হাসি। তিনি দুজনকে বললেন, 'তোমরা খাওনি কেন? ভেবেছ, বুঝি আমাদের জন্য ভালমন্দ আলাদা করা আছে।' আবার হাসি। আবার একটা খাওয়ার গল্প। ডাঃ রায় যখন দিল্লী যেতেন ওঁর সঙ্গে যেত জওহর-লালের জন্য ভাল ভাল বড় বড় মিষ্টান্ন। উনি সে সময় দিল্লী গেলে জওহরলালের বাড়িতে (প্রধানমন্ত্রী ভবনে) থাকতেন। সেবারে প্লেনের হয়েছে অনেক দেরি। ডাঃ রায় গিয়ে যখন পেঁছলেন তখন সকালের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গেছে। সে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হল না। ডাঃ রায় নিজের ঘরেই সকালের খাবার খেতে বসলেন, এমন সময় জওহরলালের আবির্ভাব। সকলেই মনে করেছে যে, কুশল প্রশ্ন করবার জন্য জওহরলাল গেছেন। ডাঃ রায় ঠিক বুঝেছেন। উনি বিমলাকে (জওহরলালের বাড়ির অতিথিদের পরিচর্যার ভার শ্রীমতী বিমলার উপর ছিল) ডেকে বললেন—'এবারে নতুন ধরনের মিষ্টি এনেছি—নিয়ে এসো না আমার জন্যে! আর, জওহর-লালকে প্লেটে করে দাও।' অবশ্য তারপরে দুজনেই মিষ্টান্ন আস্বাদ করেন। জওহরলাল খেলেন অসময়ে—আর ডাঃ রায় খেলেন চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও। ওঁর ডায়াবিটিস ছিল। ইনসুলিন ইনজেকশন নিতেন, কিন্তু মিষ্টান্ন-প্রীতি কম ছিল না। সবচেয়ে ভাল বাসতেন বাড়ির তৈরী পায়েস—আর সেটা যদি খেজুরের গুড়ের হত তা হলে তো কথাই নেই!

খানিকটা দূরে দেখা গেল কয়েকজন লোক একটা ইলেকট্রিকের পোস্ট মাটিতে বসাচ্ছে। একটু কথাবার্তার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল খুঁটিটা বসানো হয়েছে এবং সেই দল থেকে একজন আমাদের কাছে আসছে। কাছে আসতে দেখি বক্সী সাহেব। শ্রীনগরের আদরের ডাক বক্সী সাহেব। পহলগাঁও-এর যে বাড়িতে উনি থাকতেন সেই বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ। মুখ্যমন্ত্রী এতক্ষণ অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ইলেকট্রিকের খুঁটি বসাচ্ছিলেন। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। এর আগে শ্রীনগরের বাড়িতে গানবাজনা হয়েছে। গাইয়ে-বাজিয়েদের সঙ্গে নিজেও সোৎসাহে যোগদান করতেন। একসময় জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। স্বাধীনতার পর জম্মু-কাশ্মীরে আইন পরিষদে যখন জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন বক্সী সাহেব পায়ের আঘাতে শয্যাগত ছিলেন। শেখ সাহেব তখন জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধান-মন্ত্রী বলা হত)। আইন পরিষদের গর্ভগৃহে একটি ইজিচেয়ার পাতা এবং সব বক্তাই একবার করে বক্সী গোলাম মহম্মদের নাম করছেন। বাইরেও প্রবল উত্তেজনা। সবাই বক্সী সাহেব বক্সী সাহেব বলে ধ্বনি দিচ্ছে। খানিক বাদে লোকজন ধরাধরি করে ওঁকে নিয়ে এল এবং উনি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় রইলেন। কক্ষে তখন প্রবল উত্তেজনা। সকলে টেবিল চাপড়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন।

এই পহলগাঁও-এ 'কামরাজ প্ল্যান' রচিত হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা ছিলেন জওহর-

লাল, বিজু (পট্টনায়ক) এবং বক্সী গোলাম মহম্মদ। কামরাজের সঙ্গে সাত-আট মাস বাদে হায়দ্রাবাদে রাষ্ট্রপতি নিলয়ে জওহরলালের আলোচনা হয় এবং তখন নামকরণ হয় কামরাজ প্ল্যান। এই পহলগাঁও ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। এইখান থেকেই চন্দনবাড়ি হয়ে অমরনাথ যেতে হয়। পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। কয়েক বছর আগে অকস্মাৎ বরফের ঝড় ওঠায় বহু সহস্র তীর্থযাত্রীর প্রাণ দিতে হয়। অমরনাথ এক অদ্ভুত তীর্থ। অমরনাথের গুহা ষোল হাজার ফুটের উপর। এই দেবস্থানটি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উঁচুতে।

এই তীর্থের পথই সব থেকে বিপদসংকুল; কিন্তু যাত্রীর বিরাম নেই। রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়েছিল দেখেছিলুম; কতটা যাওয়া যায় তা আমার জানা নেই। বছরে একটা নির্দিষ্ট তিথিতে কাশ্মীররাজের রাজছত্র নিয়ে পাণ্ডারা এগিয়ে যান—সঙ্গে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। সেদিন অমরনাথ যাবার রাস্তা খোলা হয়। সেই অনুষ্ঠান এখনও আছে।

কাশ্মীর নিয়ে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এখন তা নেই বললেই চলে। হানাদাররা আসার পরেই আমার শ্রীনগর যাবার সুযোগ হয়। শ্রীনগরের পাওয়ার হাউস পুড়ে গিয়েছিল। এবং শ্রীনগরের মধ্যের খানিকটা অংশেও হানাদাররা ঢুকে পড়েছিল। বল্লভভাইয়ের বিচক্ষণতায় যে অংশ এখন জম্মু-কাশ্মীর বলে পরিচিত তা রক্ষা পায়। কাশ্মীরের খানিকটা অংশ এখনও হানাদারদের কবলে। হানাদাররা যে নির্যাতন চালায় তা থেকে হিন্দু-মুসলমান কেউই বাদ যায়নি। হিন্দু বা মুসলমান—এঁরা সমভাবেই নির্যাতিত হয়েছিলেন।

হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ আছে হজরতবল মসজিদে। হঠাৎ কেশ অন্তর্ধান হয়। তাই নিয়ে বিশৃংখলা দেখা দেয়। লালবাহাদুর সে সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন। কেশের অন্তর্ধান নিয়ে কাশ্মীরে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। অবশ্য কিছু দিন বাদেই এই পবিত্র কেশের উদ্ধার হয় এবং তা হজরতবল মসজিদেই আছে। হজরতবল মসজিদটি ডাল লেকের ধারে। শ্রীনগর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়েরই এই জায়গাটি পবিত্র স্থান। সম্রাট শাজাহান মসজিদটি তৈরি করিয়েছিলেন। যখন এই মসজিদের আঙিনায় বসেছিলুম তখন কত দিনের কথা মনে হচ্ছিল। এই পবিত্র কেশ ছিল মদিনার সৈয়দ আবদুল্লার কাছে। কেশ হস্তান্তর হবার উপক্রম হওয়ায় সৈয়দ আবদুল্লা ভারতবর্ষের বীজাপুরে চলে আসেন। আওরংগজেব যখন বীজাপুর দখল করেন তখন আবদুল্লার বংশধর বীজাপুর থেকে জাহানাবাদে পালিয়ে যান। পরে কেশটির অধিকারী হন নুরুদ্দিন আশোয়ারী নামে একজন ব্যবসায়ী। এই নুরুদ্দিন আশোয়ারী যাচ্ছিলেন কাশ্মীরে। পথে আওরংগজেবের লোকেরা তার কাছ থেকে কেশটি নিয়ে আজমীঢ়ে রাখেন। হঠাৎ একদিন আওরংগজেব নুরুদ্দিনের ছেলে মদানীশকে ডেকে পাঠান। তিনি মদানীশকে বলেন যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কেশটি মদানীশকে ফেরত দিয়ে দেন। তখন মৃত নুরুদ্দিনের শেষ ইচ্ছামত কেশটি নিয়ে আসা হয় কাশ্মীরে এবং রক্ষিত হয় একটি ছোট জায়গায়। পরে সেখানে ভিড় এত বাড়তে থাকে যে, সেটিকে এনে শাজাহানের তৈরি বিরাট মসজিদ হজরতবলে রাখা হয়। কাশ্মীরের মুসমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের অনেক তফাত। এবং বহু তীর্থ আছে যেখানে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে আরাধনা করে। অমরনাথ আবিষ্কার করেছিল গুজর মুসলমানেরা। তারা এখনও অমর-

নাথের পুজো করে এবং অমরনাথের থেকে যা আয় হয় তার একটা বিশেষ অংশ এই গুজর সম্প্রদায় পায়। গুজরদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তারা সাধারণতঃ বাস করে দশ হাজার বার হাজার ফুট উপরে এবং বৃত্তি প্রধানতঃ মেষপালন। কাশ্মীরের জনসাধারণের দারিদ্র্য অপরিসীম। এবং ভিক্ষাবৃত্তি একটা পেশার মত। বহু বছর আগে দেখেছিলাম উলার হ্রদের আশেপাশের গ্রামবাসীদের প্রধান আহার্য ছিল পানিফল। যারা এক বেলা খেত তাদের পানিফলের রুটি, যারা দুবেলা খেত তাদেরও তাই। উলার হ্রদটি তের মাইল লম্বা। চওড়া সাত মাইল। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে প্রায় আটাত্তর বর্গমাইল জলে ঢাকা। এটি ভারতের বৃহত্তম হ্রদ। আবার শুনেছি পৃথিবীর কোথাও পানীয় জলের এত বড় হ্রদ নেই। চারদিকে অসংখ্য পুরাকীর্তি আছে। সবই ভগ্নস্তূপ এবং ধ্বংসাবশেষ। আর আছে আনার গাছ। কত হাজার যে আনার গাছ আছে তা বলা শক্ত। বাজারে যেসব ডালিম আসে তার দ্বিগুণ আয়তনের লাল টকটকে আনার অনেকেরই লোভের সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের কাহিনী অনেকেরই জানা—বেশ মজার মজার অনেক গল্প আছে। বিশেষ করে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানকে ঘিরে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য তৈরি হয়েছিল শালিমার উদ্যান। সেইখানে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে সব রাজকার্য থেকে সরিয়ে রেখে আনন্দসাগরে ডুবিয়ে রাখতেন আর নিজে ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। নূরজাহানের নিজের বাগান ছিল মানসবল হ্রদের ধারে। সেই বাগানটি এখন পরিত্যক্ত। আর নিষাদবাগানটি তৈরি করেছিলেন মমতাজের পিতা শাজাহানের শ্বশুর। কথিত আছে যে, শাজাহানের শ্বশুর এই বাগানটি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করায় শাজাহান বাগানে জল আসার পথ বন্ধ করে দেন। পরে বাধ্য হয়ে শ্বশুরমশাই বাগানটিকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করেন। এর কাছেই একটি বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্যামাপ্রসাদ যখন কাশ্মীর যাওয়া স্থির করেন সেই সময় হরেনদার (ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী) দিল্লীর বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে হরেনদার দেখা হয় এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। হরেনদা শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর আপত্তির কারণ ছিল শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্য। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর হরেনদা গভীর শোকগ্রস্ত হন। এবং বারবার বলতেন, 'আমি শ্যামাপ্রসাদকে আটকে দিইনি কেন।' আমার যত দূর মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ বোধ হয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন যখন উনি ১৯৪৫-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। এবং ঘটনাটি ঘটে ব্যারাকপুর মহকুমার কোনও নির্বাচনী সভার কাছে।

উলার থেকে বারামুলার পথ। কাশ্মীরে গেলেই একবার বারামুলায় যেতেই হয়। এইখানে শহীদদের স্মৃতি উপলক্ষে ফলক আছে। ১৯৪৭-এর ২৭শে অক্টোবর হানাদারদের রুখতে বহু শিখ বীর প্রাণ দেন। তাঁদের নেতা ছিলেন রণজিৎ রায় নামক একজন শিখ কর্নেল। তাঁরা অসাধারণ সাহস দেখিয়ে হানাদারদের প্রতিহত করেন এবং নিজেদের প্রাণ দেন। এটা উল্লেখযোগ্য, এই অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয় একজন বাঙালী বিগ্রেডিয়ার এল পি সেনের নেতৃত্বে। এই বারামুলায় কি নিদারুণ অত্যাচার যে হয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। এইখানেই ছিলেন মকবুল শেরওয়ানী। এই মকবুল শেরওয়ানী কায়েদে আজম জিন্নাকে বলেছিলেন, 'কাশ্মীরে আছে শুধু কাশ্মীরী। হিন্দু বা খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমান—এরা সবাই কাশ্মীরী।' হানাদাররা মকবুল সাহেবকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে এনে সদর

রাস্তায় তাঁর গায়ে বেত্রাঘাত করে এবং অসীম নির্যাতন করে। তাঁর রক্তে বারামুলা পূত পবিত্র হয়ে আছে। এই বারামুলার কাছেই সম্রাট কনিষ্ক প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন করেন। হিউ এন সাঙের বর্ণনা থেকে তা পাওয়া যায়। কাশ্মীরে আর একটি ভাল গল্প প্রচলিত আছে। সম্রাট হর্ষবর্ধন যখন কাশ্মীর আক্রমণ করতে আসেন কাশ্মীর রাজ্যে তখন গোঁড়া সনাতনী ধর্ম। কাশ্মীরের তৎকালীন রানী যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় এবং যুদ্ধজনিত রক্তক্ষয় ও মৃত্যু বন্ধ করার জন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনকে কাশ্মীরে রক্ষিত বুদ্ধদেবের দণ্ড উপহার দেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন কাশ্মীর জয় না করেই ফিরে যান।
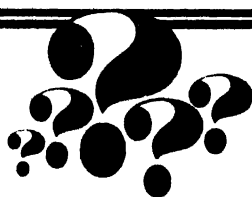
সালটা মনে হচ্ছে ১৯২৮। রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলার রাজনৈতিক সম্মেলন। সুভাষচন্দ্র সভাপতি। পরিবেশ অতি চমৎকার। তখনকার বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ায় ভরতি ছিল। কিন্তু এই মানভূম জেলায় অনেকে ম্যালেরিয়ার সময় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যেত। মানভূম জেলার তখন বিহার কংগ্রেসের মধ্যে খুব নামডাক। শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় মানভূম জেলার সভাপতি ও বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। অপূর্ব নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী চাকরি ছেড়ে কংগ্রেসের কাজ গ্রহণ করেন। মানভূম জেলা বিহারে হলেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা যাঁদের নিষ্ঠাবান, সৎ ও গান্ধীবাদী বলে জানতাম, নিবারণবাবু তাঁদের প্রথম সারির মধ্যে একজন। সঙ্গে সহকারী ছিলেন শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র ঘোষ। সহধর্মিণী লাবণ্য দেবী। সত্যিই সহধর্মিণী এবং কংগ্রেস কর্মী ও আশ্রমবাসীদের স্নেহপরায়ণা মাতা। রামচন্দ্রপুর কনফারেন্সে অতিথিরূপে আমরা বেশ একটু গোলযোগ করতে পেরেছিলুম। অভ্যর্থনা সমিতির কড়া অনুশাসন—'চা চলবে না'। অথচ প্রফুল্লদার চা চাই। তিনিও খাদি কর্মী ও গান্ধীবাদী। আমরা বয়ঃকনিষ্ঠরা বেশ মজা অনুভব করলুম। অনেক আলোচনার পর অতিথিবৎসলতার নীতি গৃহীত হল—অর্থাৎ চা পাওয়া গেল। তখনকার কনফারেন্সে বাহ্যিক জাঁকজমক বিশেষ থাকত না। কিন্ত যে-কোনও জেলাতেই হোক, অন্য জেলার কর্মীরা কোনও দিন নিজেদের অপরিচিত জায়গায় এসেছি মনে করবার সুযোগ পেত না। মনে হত যেন একই পরিবারভুক্ত। তারপর নিবারণবাবুকে দেখবার এবং জানবার সুযোগ বহুবার হয়েছে। এঁদের কথা মনে হলেই মনের মধ্যে কতকগুলো গোলমালের সৃষ্টি হয়। সে গোলমেলে ভাবগুলো এখনও মনের মধ্যে আছে।

পুরুলিয়ার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, বাঁকুড়ার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, সিলেটের ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বর্ধমানের যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, কাঁথির প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলীর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—এঁরা সব যে যার বৃত্তি ছেড়ে অসহযোগী হয়েছিলেন এবং তারপর কোনও দিনই কোনও উপার্জন করেননি। একান্ত

কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে এঁদের সংসার চলত। সামাজিক বহু কুপ্রথার বিরুদ্ধেও এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের কোনও দিন বিপ্লবী বলা হয়নি। বিপ্লবী বলে অভিহিত কয়েকজনকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আমার সুযোগ হয়েছে, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার। মাস্টার মশাইয়ের কথা এর আগেও অনেকবার বলেছি। আজও ভেবে পাই না যে যাঁদের বিপ্লবী বলে জেনেছি ও যাঁদের কংগ্রেস নেতা বলে জেনেছি—বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁদের দু' দলের পার্থক্য কি? তখনকার ১৯২০-২১ সালের ভারতবর্ষে যাঁরা আরামের 'শয্যাতল' ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম তাঁদেরই বা বিপ্লবী বলে অভিহিত করা হয় না কেন? বিপ্লবের সংজ্ঞা হিংসা বা অহিংসার উপর নির্ভর করে না। এটা তো একটা মনোভাব ও আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। স্বাধীনতা আনা একটি বড় কথা ঠিকই; কিন্তু সেই কাজ যাঁরা বন্দুকের মুখে করতে চেয়েছেন এবং যাঁরা নিরস্ত্রভাবে করতে চেয়েছেন—এই দু' দলের মনোভাব তো একই। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ আশুতোষ দাস, সতীশচন্দ্র সামন্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, আরও অনেকের নামই করতে পারি—কয়েকটা নামমাত্র দিলুম। এঁরা তো ১৯২১ থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। এঁদের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন কারও চেয়ে কম নয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই সুখের সংসার এবং বড় বড় চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন। এঁদেরই বা বিপ্লবী বলা হবে না কেন? ১৯২০-২১ সালে আট শ' টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে ডঃ ঘোষ এসেছিলেন। আমার মতে এটা তো কম বিপ্লবাত্মক কাজ নয়! ডাঃ আশুতোষ দাস পার্মানেন্ট কমিশন ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসেন ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যান। এঁরা কি বলে অভিহিত হবেন? এঁদের মধ্যে অনেকেই বহু সামাজিক কুসংস্কার ভেঙেছেন। দেশের জন্য যে কোনও ত্যাগই যথেষ্ট নয় তা নিজেদের জীবনে সপ্রমাণ করেছেন। তা হলে এঁদেরই বা বিপ্লবী বলা হবে না কেন? স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেউ কেউ একটা পথ নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অন্য পথ নিয়েছেন। দুটো পথই দুর্গম এবং কষ্টসাধ্য। দুটোতেই আসতে হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধন ও নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে। তা হলে পার্থক্য করা হয় কেন? যারা ইংরাজকে গুলি করে মেরেছে তারা যেমন নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করেছে, তেমনি যারা সাক্ষাৎ মৃত্যু জেনেও নিরস্ত্রভাবে আইন অমান্য করেছে, তারাও। এই দু' দলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? নিশ্চিত মৃত্যু এবং নিশ্চিত অঙ্গহানি—এর মধ্যে কোনটা বেশী আদৃত হবে আমি জানি না। আমি চোখের সামনে দেখেছি একজন কর্মী অহিংসভাবে দাঁড়িয়ে ইংরাজের সমস্ত নির্যাতন নস্যাৎ করে দিয়েছে। পিঠ, মাথা ফেটে গেছে, রক্তপাত হয়েছে। চিরদিনের জন্য শারীরিক দুর্বলতা গ্রহণ করতে হয়েছে, তবুও মুখ দিয়ে 'বাবা রে মলুম' বা চোখ দিয়ে জল বেরোয় নি। এরাও কি বিপ্লবী নয়? আর ঐ বড়ডোঙ্গলের অনুকূল চক্রবর্তী! যার বড় ডিসপেনসারী গেল, জমিজমা চলে গেল, স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে চরম দারিদ্র্যকে বরণ করতে হল—অথচ মুখের হাসি কোনও দিন বন্ধ হল না। তাঁকে কি বলা হবে? গ্রামে গ্রামে কত মা বেরিয়েছেন। যারা নিরাশ্রয়, বুভুক্ষু কংগ্রেস কর্মীদের দিন এবং রাতে যে-কোনও সময়ে মমতা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ক্ষুধার অন্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের কি বলা হবে? এসব

তো তাঁরা উচ্ছ্বাসে মেতে গিয়ে দু-এক দিনের জন্য করেননি—বছরের পর বছর করেছেন। আমি হাবুর মা বলে একজনকে জানতুম। বছরের পর বছর তাঁকে দেখেছি, নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তিনি মাতৃস্নেহে কর্মীদের সাহস যুগিয়েছেন, শক্তি যুগিয়েছেন। এ মহিলারা কি? এঁরা কি বিপ্লবী? মেদিনীপুরের ঝড়েশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন যে, তাঁর ধানের গোলা পুড়িয়ে দেওয়া হল। তবুও পেছু হটেননি। এঁকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা হবে? পুরুলিয়ার নিবারণ দাশগুপ্ত মশাই তাঁর আচরণে, কর্মে ও জীবনযাত্রায় পুরুলিয়ার আদি-বাসীদের সঙ্গে দাশগুপ্ত, ঘোষ, বোস, মিত্তির, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চাটুজ্যের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে জেল খাটা, নির্যাতন ভোগের সঙ্গে পার্থক্যের এই কুসংস্কার ভাঙ্গার পথে সব শক্তি নিয়ে এগিয়েছিলেন। তাঁকে কি বলে অভিহিত করা হবে? বিজয়কুমার ভট্টাচার্য মশাই প্রধান শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করেন এবং জেল খাটেন। তারপর তিনি সুন্দরবনের মধ্যে গিয়ে নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের জন্য সেইখানেই বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমানে বর্ধমানের এক গ্রামে আদর্শ স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। এঁকে কি বিপ্লবী বলা চলবে? আর সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়! বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম স্রষ্টা। আচরণে ছিল পুরো সাহেবিয়ানা। সব ছেড়ে খাদি প্রতিষ্ঠান করলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে কুটিরশিল্প প্রসারের চেষ্টা করে এসেছেন। চুরানব্বই বছর বয়সেও বাঁকুড়ার এক অখ্যাত গ্রামে চাষের মাটির সৃজনীশক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এঁকে কোন স্তরে ফেলা হবে? অসহযোগ আন্দোলন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে একজন বাঙালী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অহিংস পথে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সুবৃহৎ মহকুমায় ইংরাজ শাসন অচল করে দিয়েছিলেন। সরকার যখন ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তন করেন, সমগ্র কাঁথি মহকুমায় বীরেন শাসমল মশাই ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তন করতে দেননি এবং তিনি জয়ী হয়েছিলেন। সরকারকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এঁকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা হবে? নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী চাকরি ছেড়ে গোটা পরিবার নিয়ে দুঃখ এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের আদর্শ রক্ষা করে গেছেন। কোনও দিন মাথা নিচু করেননি। আমি মাত্র কতকগুলি নাম এখানে উল্লেখ করলুম। সব নাম এবং ঘটনা উল্লেখ করলে একটি মহাভারত হয়ে যাবে। নাম-গুলি দিয়েছি কেবলমাত্র কয়েকটি নজির দেবার জন্য। আরও বহু নাম ও ঘটনা দেওয়া যায়। কিন্তু যুক্তির সারবত্তা তাতে বাড়বে না। একটাই প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে গেছে। শ্রদ্ধেয় কানাইলাল দত্ত মশাই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আমার অসুবিধা বিপ্লবী কথাটা নিয়ে। কানাইলাল দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য ভাগিনেয় ডাঃ আশুতোষ দাস সরকারী চাকরি ছাড়লেন, স্বাধীনতা-আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। রোজগার করতেন প্রায় গড়পড়তা চোদ্দ শ' টাকা মাসে। তের শ' সত্তর টাকা কর্মী-দের আস্তানা 'কল্যাণ সংঘ' চালাবার জন্য এবং আরো অনেক কর্মীর খরচের জন্য দিতেন, আর মায়ের হাতে দিতেন ত্রিশ টাকা সংসার চালানোর জন্য। এঁকে কি বলে অভিহিত করব? যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজাকে দেখেছি। এম এ, বি এল। দর্শন-শাস্ত্র ও রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ পারঙ্গম। শুধু পায়ে থাকতেন। ছোট জামা গায়ে দিতেন। ওকালতি ছাড়ার পর কোনও দিন ওকালতি করেননি। এঁদের কার্যক্রম কি দেশে বিপ্লব সৃষ্টির মনোভাব প্রসারের সাহায্য করেনি! হুগলী জেলার

ধনেখালি থানায় মামুদপুর গ্রামে ডাঃ ভবতোষ দাসের বাড়ি। বিত্তবান ঘরের ছেলে। এম বি পাস। শহরে প্র্যাকটিস করার সব ব্যবস্থা পাকা। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল। মনোস্থির করে ফেললেন যে, গাঁয়ের বাইরে আর যাবেন না। জেল-খাটা আর গ্রামে বসে চিকিৎসা করা—দুটোই আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়িটা হয়ে উঠল কংগ্রেস কর্মীদের বড় আস্তানা। গ্রামের দু' মাইল আড়াই মাইলের মধ্যে কোনও দিনই জামা পরে রোগীর বাড়ি যেতে দেখিনি। শীতকালের কথা স্বতন্ত্র। আদুড়গায়ে হাতে স্টেথোস্কোপ, পরনে খদ্দরের ধুতি—এই ছিল তাঁর রোগী দেখতে যাওয়ার সাজসজ্জা। কংগ্রেস স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যে পথে চালিত করেছে বরাবরই সেই পথে চলেছেন। কোনও দিন ক্লান্তি, অবসাদ বা অনুশোচনা দেখিনি। ইতিহাসে এইসব লোকের স্থান কোথায়? আর বাংলাদেশে যে শত শত মানুষ ছড়িয়ে ছিলেন, যাঁরা সমস্ত পরিবার পরিজন নিয়ে হাসিমুখে সব আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইংরাজের নির্যাতনকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম ইতিহাসে উঠবে না জানি, কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের জেনেছি, চিনেছি—কি বলে তাঁদের অভিহিত করব? এঁদের মধ্যে অনেকে আবার সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও লড়েছেন। যে নেতা বাইশ বছর জেল খেটেছিল কিন্তু ছেলের বিয়েতে পণ নিতে আগ্রহ কম দেখাননি, তিনি বোমা তৈরি করে নেতা হন বা অহিংস পথেই নেতা হন, তাঁকে বিপ্লবী বলে অভিহিত করার কোনও সুযুক্তি নেই। অনেক সহিংস ও অহিংস কর্মীকে আমরা দেখেছি যাঁদের নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগবরণ অসীম, কিন্তু বিধবাবিবাহে তাঁদের প্রচন্ড আপত্তি। এঁদের কি বলা হবে?

মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমাদের চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধি কতকগুলো ধোঁয়াটে কথার মধ্যে হারিয়ে গেছে।
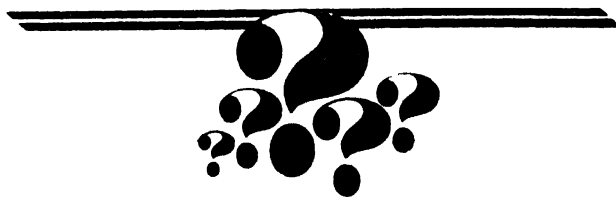
১৯৪৬-এর ১৫ই আগস্ট। কিছু দিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছি। রোগ-জীর্ণ শরীর। কলকাতা থেকে শ্যামাদাস (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিয়ে গেল। ওঁদের বাড়িতেই আস্তানা। মাঝে মাঝে কংগ্রেস অফিসে যাই। এক-একটা সভায় উপস্থিত হতে পারি। সেবার ১৫ই আগস্ট দিবসের সঙ্গে অনেক উত্তেজনা জড়িয়ে ছিল। সাধারণতঃ জনসভায় যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তা তো ছিলই, তার সঙ্গে একটা থম-থমে ভাবও ছিল, তখন বাংলা দেশে মুসলিম লীগ সরকার। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ১৬ই আগস্ট 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' বলে ঘোষিত হয়েছিল। আমাদের উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের জন্য। বল্লভপুরের ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে মিটিং শেষ করে শ্রীরামপুরের টাউন হলে মিটিং আরম্ভ করেছি এমন সময় খবর এলো যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস ডি পি ও দেখা করতে চান। আমি তখন বক্তৃতার মাঝখানে, সেইজন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হল। সভার শেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে, কাছোপিঠে কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে গন্ড-

গোলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস ডি পি ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সহযোগিতা চান যাতে হুগলী জেলায় কোনরকম সাম্প্রদায়িক অশান্তি না হয়। আমার শরীরের কথা ভেবে বন্ধুবান্ধবদের মনে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু অধিকাংশই জেল থেকে সদ্য প্রত্যাগত। সেইজন্য বিশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে উঠে পড়লুম। সঙ্গে নিলুম বিষ্টু (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও শৈলেশ্বরকে (মিত্র)। তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

তেলিনিপাড়া ভদ্রেশ্বর এলাকায় যখন পৌঁছলুম তখন সেখানে খুব উত্তেজনা। 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' যাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁরা চাইছেন, স্ট্রাইক করা হোক, মিলে যেন কেউ না যায়। বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কোনরকমে স্ট্রাইক হতে দেবেন না। ধীরে ধীরে অশান্তি চরমে উঠল। ইঁট-পাটকেল, বোতল ছোঁড়া—এসব আনুষঙ্গিক কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। এস ডি পি ও-র কাঁধ থেকে বর্ষাতি একজন ছিনিয়ে নিয়ে গেল—দু-একটা চড়-থাপ্পড়ও খেলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও অব্যাহতি পেলেন না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন এ বি চ্যাটার্জি, আর এস ডি পি ও রঞ্জিত গুপ্ত। দুজনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, লাঠি বা গুলি চালাবেন না। মিলগুলির মালিক সব সাহেব। রাত সাড়ে বারটার সময় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফোন এল যে, তাঁরা লাঠি চালিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে ভিড় হটিয়ে দিন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য জানালেন যে, তিনি মনে করছেন ওসব না করেই শান্তিরক্ষা করা যাবে। আমরা ইতিমধ্যে দুপক্ষেরই কিছু লোক সংগ্রহ করেছি—যাঁরা শান্তিরক্ষায় আগ্রহী। গোলমাল কিন্তু তখন আর এক পর্যায় এগিয়ে গেছে। রাত দুটোর সময় আবার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফোন এল। টেলি-ফোনের ওপার থেকে কি বলেছিল আজও জানি না। এপার থেকে অবনীবাবু বললেন—'লাঠি বা গুলি চালাবার দরকার মনে করি না। যদি আপনারা মনে করেন অপর কাউকে ভার দিন। আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি।' ইতিমধ্যে আমাদের দলে আরও লোক বেশী হয়েছে। ভোর চারটের সময় অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হল। শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মিলগুলো চালু আছে দেখে আমরা হুগলীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে চলে গেলুম। তখন স্বাভাবিকভাবেই শরীর অচল হয়ে গেছে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর শান্তি ও আনন্দ। তারপর পনের দিন আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে ছিলুম এবং আমাদের একান্ত সৌভাগ্যবশত বাংলা দেশে কলকাতা সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে যখন আগুন জ্বলে উঠেছিল, হুগলী জেলার শিল্পাঞ্চলে একটি প্রাণহানিও ঘটেনি। এ বিষয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের দায়িত্ব কম ছিল না, কিন্তু সাফল্যের একশো ভাগের মধ্যে আশি ভাগের কৃতিত্ব অবনীবাবু এবং রঞ্জিতবাবুর অসাধারণ ধৈর্যের জন্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯২৬ থেকেই দেখেছি। ১৯২৬-এ বাঙালী এবং অবাঙালীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। অনেকে বিনা দ্বিধায় মানুষ হত্যা করেছেন বলে হিরো হয়েছেন। শ্রীরামপুরের যেসব বাড়ির মেয়েরা তৎকালীন অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন তাঁরাও এইসব হিরোকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে খাওয়াতেন। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। যারা গুন্ডা তাদের দাঙ্গা করা স্বভাবিক। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিত মানুষও এ বিষয়ে পেছিয়ে থাকেননি। আত্মরক্ষার জন্য যে-কোনও উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। যাতে সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা না হয়, তার জন্য সবরকম পথই গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এই অজুহাত নিয়ে অনেকে ধনী হয়েছেন। কেউ কেউ অপরের বাড়ি দখল করে

নিয়েছেন। এসব দৃষ্টান্ত কম নেই। এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে—যেখানে শচীন মিত্রের মত, সুশীল দাশগুপ্তের মত, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মহৎ প্রাণের আহুতি হয়েছে এইসব দাঙ্গা নিবারণ করবার জন্য। আবার এমনও আছে—যাঁরা অতি সজ্জন ব্যক্তি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বশে কোনও অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করেননি এবং তা নিয়ে গর্বও করা হয়েছে। সংখ্যায় বেশী-কম হতে পারে, কিন্তু দাঙ্গার অস্ত্রশস্ত্র লাঠি-সোটা রাখার ব্যাপারে মসজিদ এবং মন্দিরকে সমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হুগলী জেলারই শিল্পাঞ্চলে যেমন মসজিদে অস্ত্রশস্ত্র দেখেছি, আবার সেরকম মন্দিরকে অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডার করা হয়েছে—এও প্রত্যক্ষ করেছি।

ভারত-বিভাগ নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। সময় এবং সুবিধা পেলেই অনেকে বরাবরই কংগ্রেসকে দায়ী করে এসেছেন এবং গান্ধীজীও বাদ যাননি। কংগ্রেসের দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু অন্যান্য দল ও নেতা এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না।

কংগ্রেস দেশবিভাগের কথা যখন চিন্তাও করেনি, তারস্বরে কমিউনিস্ট পার্টি বারবার দেশবিভাগের কথা ঘোষণা করেছে এবং তাদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এর পক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছিল। এমন কি, মানচিত্রে কিভাবে দেশবিভাগ হওয়া উচিত তাও এঁকে দেখানো হয়। শ্যামাপ্রসাদও আমাদের সঙ্গে সভা করেছিলেন।

আজ অনাবশ্যকভাবে মহাত্মা গান্ধীর নাম টেনে আনা হয়। তিনি যেসব কথা বলেছিলেন –কি কংগ্রেসী, কি অকংগ্রেসী কেউ তাতে কর্ণপাত করেননি। এই শীর্ণকায় খর্বাকৃতি মানুষটি সব ভয় নস্যাৎ করে এক দারুণ দুঃসময়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন। তাঁর উপরও অত্যাচার আমরা কম করিনি। বেলেঘাটায় যে বাড়িতে তিনি ছিলেন সে বাড়ি বারবার আক্রান্ত হয়েছে, এবং সে আক্রমণ অন্য ধর্মাবলম্বীরা করেননি। নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন, শারীরিক কষ্ট, বয়সের বাধা, নালা-খন্দ, কর্দমাক্ত গ্রাম্য রাস্তা—কোনটাই তাঁর কাছে দুর্গম হয়ে ওঠেন। তিনি সকাতরে বলেছিলেন যে, বাংলা দেশে এমন জেলা আছে যেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা তের ভাগের হাতে আছে আশি ভাগ জমি আর আশি ভাগের হাতে আছে তের ভাগ জমি। নিজেরা বসে জমির আদানপ্রদান করে এই অসম্ভব ও অসঙ্গত পার্থক্য দূর করা উচিত। সে কথা তখন আমরা প্রলাপবাক্য বলে ধরে নিয়েছিলুম।

পৃথিবীতে একই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। ফ্রান্সের একটা অঞ্চলে এক শ্রেণীর খ্রীষ্টানদের দ্বারা অন্য এক শ্রেণীর ত্রিশ হাজার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী নিহত হয়েছিল। সেন্ট বার্থোলোমিউ ডে-তে ফ্রান্সে যে ঘটনা ঘটেছিল তার কলঙ্ক এখনও মুছে যায়নি। আয়ারল্যান্ডের প্রোটেস্টান্ট অধ্যুষিত আলস্টার অঞ্চল সমুদ্র পেরিয়ে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে সদস্য পাঠায়। আয়ারল্যান্ডে বাকী অংশে রোমান ক্যাথলিক-এর সংখ্যা বেশী। সেইজন্য আলস্টার অঞ্চলের লোক এখনও স্বাধীন আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমেরিকাতে সাদা চামড়ার খ্রীষ্টান কালো চামড়ার খ্রীষ্টানকে বহু অধিকার দিতে চান না। মার্টিন লুথার কিং-এর মত লোককে হত্যা করা হয়েছে। সেইজন্য প্রশ্ন জাগে যে, সবই কি সাম্প্রদায়িকতা? না, এর পেছনে সমাজনীতি ও অর্থনীতিও আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-লড়াইয়ে পাকিস্তানের যেসব সৈন্য নির্বিচারে হত্যা করেছিল তাদের ধর্ম এবং যারা নিহত হয়েছিল তাদের ধর্ম একই। সেখানকার মেয়েরাও রক্ষা পায়নি। ভারত-বিভাগ হবার জন্য যা দোষত্রুটি হয়েছে বা যা অনর্থ হয়েছে,

তার জন্য মহাত্মা গান্ধীর উপর অনেক নিন্দাবাদ বর্ষিত হয়েছে। তা হোক। প্রশ্ন এই যে, তার পর কি? নতুন করে বিচার-বিবেচনা করবার অনেক মালমসলা সামনে আছে। সব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করলে সাময়িক তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান কোনও কালেই হবে না। সংঘাতসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীতে যখন প্রায় সকলেই দিশাহারা তখন কিছু লোক অন্তত যদি আনুষঙ্গিক সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে বিচার-বিবেচনা আরম্ভ করেন, তা হলে হয়তো এইসব কলঙ্কজনক সমস্যার সমাধান হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে কি কেবলমাত্র মানুষ ধর্মগত কারণেই দানবে পরিণত হয়, না আরও কারণ আছে? আমরা এখন চাঁদে যাচ্ছি—বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন কেবলমাত্র ধর্মান্ধতার অজুহাত দিয়ে সমস্যাটাকে কি চাপা দেব? বিপ্লবের কথা আমরা শুনি—সেটা এখনও রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ব্যভিচার-দুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু সমাজ সংশোধন করা কি সম্ভব? আমি মনে করি, ভাল উন্নতি করবার চেষ্টা না করে যদি ভেঙে ফেলা যায় তবেই কোনও কোনও সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। গোঁজামিল আমরা অনেক দিয়েছি। তাতে সাময়িক শান্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ হয় তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যতই আমরা সমৃদ্ধিলাভ করি, তার দ্বারা মনের পরিবর্তন সম্ভব বলে বর্তমান পৃথিবীতে মনে হয় না।
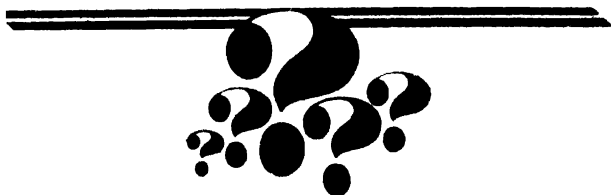
সেবার ইন্দোরে কংগ্রেসের অধিবেশন। নতুন মধ্যপ্রদেশ তখনও গঠিত হয়নি। ইন্দোর তখন মধ্যভারত প্রদেশের রাজধানী। যাওয়ার খুবই অসুবিধা। কলকাতা থেকে অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। এমন সময় হরেকৃষ্ণবাবু (মহতাব) খবর পাঠালেন যে, তিনি বিশেষ প্লেনে কলকাতা হয়ে ইন্দোরে যাবেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলে ভাল হয়। সুবিধা হয়ে গেল। ইন্দোরে মোটামুটি ভাল ব্যবস্থাই হয়েছিল। একদিন সকালে জওহরলালের কাছ থেকে ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি অন্যান্য কয়েকজন নেতা বসে আছেন আর জওহরলাল ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ভর্ৎসনা করছেন। ভর্ৎসনার পাত্র মধ্যভারতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। মনে হচ্ছে তখন বোধ হয় গাঙওয়ালজী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। খুব ভাল গান করতে পারতেন। কোনও কিছু গোলমাল হলেই আমরা তাঁকে গান গাইতে বলতুম। গান গাইতে বলব কি, সব শুনে আমারও রক্ত ফুটে ওঠবার উপক্রম হল। ঘটনাটি যেমন গর্হিত তেমনি অচিন্তনীয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবুকে বিশেষ প্লেনে মধ্যভারতে এনে ইন্দোরে তাঁকে গান্ধী স্মারকনিধির জন্য দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকাটি দেওয়া হয়েছে সরকারী কোষাগার থেকে এবং তার জন্য অ্যাসেম্বলির কোনও প্রস্তাব নেই। এই অভিনব ঘটনায় সকলেই উত্তেজিত ও চঞ্চল। ব্যাপারটা বেশি

দূরে গড়াতে না দিয়ে এ আই সি সি-র তহবিল থেকে আমরা সেই দিনই ঐ দুই লক্ষ টাকা এবং রাষ্ট্রপতির যাতায়াতের স্পেশাল প্লেনের ভাড়া দিয়ে দিলুম। অনেক সময় সংখ্যাধিক্যের জন্য বেপরোয়া হয়ে এমন কাজ করা হয় যা অশোভন এবং অসংগত।

ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী গেলুম। সত্তর-আশি মাইলের মধ্যে। যে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে কালিদাসের যক্ষ মেঘদূতকে বলেছিল যে, 'তুমি যখন আমার বিরহব্যথার বার্তা নিয়ে যাবে, একটু ঘুরে উজ্জয়িনী হয়ে যেও। সেই সময় তোমার মেঘের এমন আওয়াজ করবে যেন লোকের মনে হয় যে, মহাকালেশ্বর মন্দিরে ঢক্কানিনাদ হচ্ছে।' এই সেই উজ্জয়িনী যা একসময় সমৃদ্ধির শিখরে ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। দেশ-বিদেশের সার্থবাহরা নানা দ্রব্য নিয়ে এসে এখানকার বিপাণতে সাজিয়ে রাখত। আরব দেশ ও চীন দেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কালিদাসের সময়। পৃথিবীতে আর কোনও কবি তাঁর বিরহিনীর জন্য মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। এক অপূর্ব কল্পনা। এতে মেঘ-দূতের যা বর্ণনা তা যে-কোনও বিরহীর মনকে খানিকক্ষণের জন্য সেই যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

'প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থং
জীমূতেন সকুশলময়োং হারয়িষ্যণ্ প্রবৃত্তিম।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহারে॥'

কল্পনা কোন শক্তি অবলম্বন করলে এইভাবে বর্ণনা দেওয়া যায় তা ভাবাও মুশকিল। শুধু মেঘদূতকে যেতে বলছেন না, তাকে বলছেন, 'তুমি যদি আমার সংবাদ ও আমার বার্তা আমার প্রেয়সীকে দাও তা হলে তোমাকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমার সঙ্গে বিদ্যুতের যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। তোমাকে যেন বিরহব্যথায় জর্জরিত হতে না হয়।' সত্যেন দত্তের ভাষায়—

'পুষ্পের তৃষ্ণার কর হে অবসান,
হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায় হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ—
হায় গো নাই নাই সুখের লেশ,
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি
তার প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যোৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক" বন্ধু।
বন্ধুর আশিস লও।'

উজ্জয়িনীতে এখনও বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকরা বিক্রমা-দিত্যকে উড়িয়ে দিলেও কালিদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো মনে এখনও সন্দেহ জাগাতে পারেননি। কালিদাস মেঘদূতের মধ্য দিয়ে, কুমারসম্ভবের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞানশকুন্তলার মধ্য দিয়ে ও অন্যান্য অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। সংস্কৃত সাহিত্য আমরা পড়ি না। যেটুকু সামান্য চর্চা হয় তাও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পন্ডিতদের মধ্যে সীমা-বদ্ধ। যাঁদের বাড়িতে শেক্সপিয়র থেকে আরম্ভ করে সিলভিয়া প্ল্যাথ অবধি পাওয়া যাবে, তাঁদের বইয়ের আলমারি খুঁজলে কালিদাসের বই যে পাওয়া যাবে

না—এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা গ্যেটে পড়ি, মিলটন-ও আমাদের মুখস্থ। এজরা পাউন্ড-এর চীনে কবিতার সংকলন যত্ন করে কিনে আনি। এলিয়ট-এর 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' আমাদের আধা-মুখস্থ। হোমার-এর গল্প মুখে মুখে বলতে পারি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য এখনও আমাদের কাছে অনাদৃত। অথচ পাশ্চাত্যে মহাপাণ্ডিত গ্যেটে-র অভিমতঃ

"From the continent of India it was only Kalidasa who had anything to say to him......Sakuntala, Nala, Megh-Doota are his 'spiritual kin' and he cries I should like to live in India, if only there had been no stone-masons there." (Goethe by Richard Friedenthal).

শকুন্তলার উপর গ্যেটে একটি কবিতাও লিখেছেন—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted and fed,
Wouldst thou the Earth and Heaven
itself in one soul name combine.
I name thee oh Sakuntala
and all at once is said.'

হিমালয় ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি ঘটনা আমরা গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে আলোচনা করি। তেনজিং নোরগে কি এডমন্ড হিলারি আগে উঠলেন তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। আর কত বর্ণনাই পাওয়া যায়! কিন্তু কালিদাসের মত বর্ণনা কি কোথাও পাওয়া যাবেঃ

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বিগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥'

বহু কবি হিমালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু 'কুমারসম্ভব'-এর এই যে বর্ণনা, এর কি তুলনা হয়! দুঃখ শুধু এ নয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা আমাদের দেশে প্রায় নেই বললেই চলে; দুঃখ এও যে, আমাদের মনও আমাদের যেসব অমূল্য সাহিত্যসম্পদ আছে তার সম্বন্ধে অবহিত নয়। অবশ্য শিক্ষা সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কি শেখাব সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাও খুব কম লোকেরই আছে। আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ—এতে যেমন অনেক জায়গাতেই ভারতীয় ভাবধারা খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি শিক্ষা-জগতেও একটা এমন ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছে যেখানে প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ভারতীয় ভাব না থাকে। নেহাত যারা নিরুপায়—হয় বিদ্যালয়ের অভাব, নয়তো অর্থের অভাব—তারা ছাড়া সকলেই ইংরাজী মিডিয়মের মারফত ছেলেমেয়ে যাতে শিক্ষালাভ করে তার জন্য আগ্রহী। ভারতীয় কোনও ভাষার মিডিয়মে শিক্ষালাভে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কম। অনেক অভিভাবকের ধারণা, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বা দেশীয় ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর হিন্দী

পড়া তো হিন্দী ভাষাভাষীদের অত্যাচার সহ্য করা। বাপ-মা বাঙালী, ছেলে-মেয়েরাও বাঙালী; কিন্তু বাংলায় চিঠি লিখতে বা বাংলায় বই পড়তে পারে না। গল্পের বই পড়া মানে 'টিন-টিন' বা 'এনিড ব্লাইটন।' এই অস্বাভাবিক পরিণতিতে কিন্তু কারও মনে খেদ বা গ্লানি নেই। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র বা কেরলের ছেলেমেয়েরা—যারা ইংরাজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে তারা সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমরা গর্ব করি যে, বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ভাষা। অথচ এই সমৃদ্ধ ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা একটু বেশী শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন তাদের কাছে বাংলা ভাষার কোনও সমাদর নেই।

ইন্দোর এক সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্যের এক দিক্‌পালের আস্তানা ছিল। এখন এটি একটি শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে। রাজ্য পুনর্গঠনের পর যখন নতুন মধ্যপ্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন ভূপালে রাজধানী হলেও ইন্দোরের মর্যাদা এখনও কম নয়। অনেক দিক দিয়েই মধ্যপ্রদেশ ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। নতুন ভারতে শিল্পসৃষ্টিতে মধ্যপ্রদেশের অবদানও প্রচুর। ইতিহাসের মালমসলাও মধ্যপ্রদেশে অনেক। আবার দ্রষ্টব্য স্থান—তার বিশদ বিবরণ দেওয়াও শক্ত। রেওয়ার সাদা বাঘ, পান্নায় হীরকের খনি। খাজুরাহর মন্দির, সাঁচীর স্তূপ। জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়, ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝাঁসি নগরী (আগে মধ্যপ্রদেশে ছিল, এখন উত্তর-প্রদেশে)। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বরের মন্দির, আবার মাইহারে আচার্য আলা-উদ্দিনের বাস। এইসব মিশে মধ্যপ্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আমাদের দেশের ট্যুরিজম এখনও সুসংগঠিত হয়নি, হলে চম্বলের দস্যু-দের আস্তানা দেখালেও অনেক ট্যুরিস্ট সমাগম হত। আমি সিউপুরি হয়ে সন্ধ্যের পর গোয়ালিয়র যাচ্ছিলুম। পথে আটক। তবে চম্বলের দস্যু কিনা জানি না, বেশ খোলা তলোয়ার নিয়ে সদর্পে দুটি খাটিয়ায় দুটি মানুষকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। কাছেই থানা। সে সম্বন্ধে কারো দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। আমাদের গাড়ি আটকাল। আমাদের ড্রাইভার এবং আমাদের সঙ্গী স্থানীয় নেতা গাড়ি থেকে নেমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। কি কথাবার্তা হল জানি না, তবে দেড় ঘন্টার বেশী আটকে থাকতে হয়নি। পরে শুনলুম, ক্ষুদ্র লোক-দের চম্বলের বীরেরা স্পর্শ করে না। আমাদের সব পরিচয় পেয়ে তারা ঘৃণায় আমাদের ছোঁয়নি। জয়প্রকাশ নারায়ণ গিয়েছিলেন। অনেকে ধরা দিয়েছে। অনেকে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের কল্যাণ করবার যে প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন তা এখনও প্রতিপালিত হয়নি। চম্বলের যেসব জায়গা দস্যুদের অধি-কৃত ছিল সেসব জায়গায় কোনও চাষ হয় না, ঊষর ও অনুর্বর। সেসব জায়গায় অধিবাসীদের চাষবাসও নেই, অন্য কোনও বৃত্তিও নেই। প্রশ্ন জাগে—তা হলে তাঁদের বাঁচবার উপায় কি? দস্যুজীবন আমি সমর্থন করছি না, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা কি, যদি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার কোনও পথ খোলা না থাকে।

বাইবেল ইংরাজী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছে। ধর্মগ্রন্থরূপে বাইবেলের সমাদর আছে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবেও তা কম আদৃত নয়। গীতা আমাদের একটা অপূর্ব বই। কিন্তু ওটাকে আমরা ফেলে রেখে দিয়েছি ধার্মিকদের জন্য। অরবিন্দের গীতাভাষ্য বা তিলকের গীতাভাষ্যের মত বই যে-কোনও দেশের পক্ষে দুর্লভ রচনা। তিলকের গীতাভাষ্যের অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আমরা অনেকেই পড়েছি কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের দিকে আমরা

বেশী কেউ যাইনি। ধর্ম ছাড়াও যে গীতার মত বইয়ের মূল্য আছে—এ বোধ আমাদের অনেকের মধ্যে নেই। এবং বিস্ময়ের কথা যে, কৌতূহলও জাগে না। দক্ষিণের মন্দিরসমূহে পূজাপাঠে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয় সংস্কৃতে। কিন্তু সেই মন্ত্রগুলি যে কি এবং স্থানীয় ভাষায় তার যে কি মানে হয়—এ আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজে বিয়ের সময় বাটনা-বাটা শিলের উপর দাঁড়াতে হয় এবং পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণও করেন। কিন্তু অধিকাংশ পুরোহিত এবং যাঁরা বিবাহ করেন তাঁরা যত বড় পণ্ডিতই হন, তাঁদের কাছে এই আচারের কোনও অর্থ জানবার চেষ্টাও দেখা যায় না। অপূর্ব শ্লোক আছে—যার অর্থঃ 'তোমার-আমার বন্ধন পাথরের মত শক্ত হোক।' সাম্প্রতিককালে একটি বিয়ের ব্যাপারে 'সুতহিবুক যোগ' কথাটি শুনি। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ এবং দু' পক্ষেরই পুরোহিত এর মানে বলতে পারেনি। মানে অতি সোজা। এই যোগ সমস্ত অমঙ্গলজনক লগ্ন-প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—তা হলে মামুলীভাবে এইসব প্রথা মানবার প্রয়োজন কি? আমাদের হিন্দু সমাজে শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ হয়। অর্থাৎ অতি পবিত্র কাজ। কিন্তু সেই বিবাহ উপলক্ষে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হয় তার অর্থ অনুধাবন করা যে প্রয়োজন—এ বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

১৯৬৪ সাল। ভুবনেশ্বর কংগ্রেস। কামরাজ সভাপতি। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অনেক আলোচনা করা হয়েছিল, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। অন্য কারণেও মনে থাকবার কথা। জওহরলাল ঐখানেই কংগ্রেস অধিবেশনের ডায়াসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমস্ত অধিবেশনই এই কারণে খুব উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটে। ঐ অসুস্থতার ধাক্কা জওহরলাল সামলাতে পারেননি—মে মাসে আমাদের ছেড়ে চলে যান। চাইনিজ অ্যাগ্রেসন-এর পরই শরীরটা ভাঙতে আরম্ভ করে। ওয়ার্কিং কমিটি-র নির্বাচন ও গঠন নিয়ে খানিকটা অসুবিধা হয়। নির্বাচনে পরাজিত হন শ্রী সি বি গুপ্ত ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব। আমি ঐ ভুবনেশ্বর কংগ্রেসেই এ আই সি সি কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলুম। পূর্ণ ওয়ার্কিং কমিটি তালিকা প্রকাশ হতে দেরি হয় এবং খবরটা আমি পাই ভুবনেশ্বর ছাড়ার পর।

এর বহু বছর আগে উড়িষ্যায় পুরীতে কংগ্রেস হবার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে হতে পারেনি। যত দূর মনে আছে সেই পুরী কংগ্রেসের আয়োজন করতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এবং শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা শোধ করেন। গোপবন্ধুবাবু ছিলেন সরকারী হাকিম। অসহযোগ আন্দোলনে চাকরি ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে তিনি ভূদান আন্দোলনে সমস্ত সময় দিয়েছিলেন। শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, গোপবন্ধুবাবুর ছোট ভাই। আর গোপবন্ধুবাবুর স্ত্রী রমা দেবী—তিনি একজন অসামান্যা মহিলা।

সত্যবাদীতে আশ্রম আছে, সে আশ্রম দেখবার মত। এই গ্রামের সত্যবাদী নামকরণ নিয়ে অনেক গল্প আছে। পাশেই সাক্ষীগোপাল। সাক্ষীগোপালের মূর্তি অপরূপ। নিকষকালো পাথরের মূর্তি, আর মুখের শ্রী বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। কথিত আছে যে, বৃন্দাবনে গোপাল বিগ্রহের সামনে এক বৃদ্ধ এক যুবককে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রাহ্মণ গ্রামে ফিরে এসে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। যুবক পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ করায় পঞ্চায়েত বলে যে, অন্তত একজন সাক্ষী তো থাকা চাই। কোনও সাক্ষীর সামনে কথা হয়নি, কথা হয়েছিল একমাত্র 'গোপালের' সামনে। যুবক তখন নিরুপায় হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালের আরাধনা করেন। যুবকের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে গোপাল সাক্ষাৎ সাক্ষী দিতে আসেন। সেই থেকেই সাক্ষীগোপাল নামের উৎপত্তি।

ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অতি সুচারুভাবে সংগঠিত হয়েছিল। আয়োজন যাতে নিখুঁত হয় তার জন্য বীরেন (মিত্র), বিজয় (পাণি) প্রমুখ কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃতিত্বের পঁচাত্তর ভাগ প্রাপ্য বিজুর (পট্টনায়ক)। অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল। বিজুর তাড়াতাড়ি কাজ করা বা অস্থিরতা প্রকাশ করা—এর পরিচয় অনেকেই জানতেন। কিন্তু সে যে একজন ভাল সংগঠক, তার পরিচয় কারুর জানা ছিল না। উড়িষ্যায় শিল্প সৃষ্টিতে বিজুর প্রচেষ্টা সর্বজনস্বীকৃত। খনিজ ও অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ উড়িষ্যায় যে শিল্পাঞ্চল সৃষ্ট হয়েছে তা বিজুর কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়। বিজু এবং বীরেন ছিল হরেকৃষ্ণবাবুর (মহতাব) ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আর নীলমণির (রাউতরায়) সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পুত্রাধিক। উড়িষ্যার রাজনীতি ছিল একটু স্বতন্ত্র। ১৯৫২ এবং ১৯৫৭—কোনও সাধারণ নির্বাচনেই কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়নি। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করায় হরেকৃষ্ণবাবুর প্রধান সহায়ক ছিল বিজু, বীরেন ও নীলমণি। তারপর নানা কারণে হরেকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে মতভেদ হয় এবং পরে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে হরেকৃষ্ণবাবু কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি এবং সেই প্রথম সংখ্যাধিক্য পেয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সমস্ত নির্বাচনের সময়টা আমার উড়িষ্যায় থাকবার সুযোগ হয়েছিল। বিজুর নেতৃত্বে কর্মীদের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলেই কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনের পর বিজয়ী কংগ্রেস এম এল এ-দের একটি সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই সংবর্ধনা সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব উড়িষ্যার সহকর্মীরা আমার উপর অর্পণ করেন। সেই সভায় বিজু শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথবাবুর (দাস) নাম মুখ্যমন্ত্রীরূপে প্রস্তাব করে। বিশ্বনাথবাবু সস্নেহে সকলকে জানান তাঁর চেয়ে যাঁরা বয়োকনিষ্ঠ, তাঁদেরই কারোর এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত; এবং তিনি সব সময় তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। বিশ্বনাথ দাস মহাশয় আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯৩৭-এ উড়িষ্যায় যখন প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হয়, তখন বিশ্বনাথবাবু হন প্রধান মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন মন্ত্রী ছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো এবং বোধ হয় শ্রীবোধরাম দুবে। এঁরা ভারতবর্ষের রাজনীতি-ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। সেইজন্য প্রাদেশিক গভর্নর ক্যাবিনেট মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতেন। একজন ওখানে গভর্নর হয়ে আসেন, যিনি ওখানকার কমিশনার ছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর মন্ত্রিসভা প্রতিবাদ জানাল যে, তাঁর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেট মিটিং হতে পারে না। রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হল। তখন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য তিনজন—সর্দার বল্লভভাই

প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাজেন্দ্রবাবু উড়িষ্যায় ছুটে এলেন। অনেক চেষ্টা করলেন। সবই ব্যর্থ হল। বিশ্বনাথবাবু মন্ত্রিসভা পদত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষে ইংরাজ সরকার নতি স্বীকার করল—অন্য একজন গভর্নর এলেন। খর্বাকৃতি শীর্ণকায় এই মানুষটির মনোবল অসাধারণ।

উড়িষ্যা বা কলিঙ্গ এক সময় সমৃদ্ধির মহাশিখরে উঠেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে যাকে এখন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বলা হয় তারও শীর্ষ স্থানে। মন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায়, মানুষ বিজ্ঞানের কোন স্তরে পৌঁছলে তা নির্মাণ করা সম্ভব। কোনারকের ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে একটা লোহার বীম পড়ে আছে (এখনও আছে কি না জানি না)। যে বীম পড়ে আছে, তা কোথায় হয়েছিল, কে করেছিল এখনও অজ্ঞাত। কিন্তু বর্তমান যুগের যে-কোনও লোহার বীমের চেয়ে সে বীম সবরকমে উৎকৃষ্ট। বড় বড় পাথর কোথা থেকে এনে যে মন্দির তৈরী হয়েছিল, তা বোঝা শক্ত। কোনারক বা কোণার্ক মন্দির তৈরি করতে সময় লেগেছিল বারো বছর, আর শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। এই মন্দির সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। স্থপতিদের নেতা ছিলেন বিষ্ণু মহারানা। ইনি মন্দির শেষ হবার পর কিছুতেই মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণকলস স্থাপন করতে পারছিলেন না। সারা দিন, সারা রাত চেষ্টা করেও যখন বসানো গেল না, তখন বিষ্ণু মহারানা একদম ভেঙ্গে পড়লেন। অক্ষমতার ব্যথা-বেদনায় চোখ দিয়ে তখন দরদর করে জল পড়ছে। এমন সময় এক কিশোরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপনি চিন্তিত হবেন না। কি করে কলস বসাতে হয়, তা আপনি বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু আমার স্মরণ আছে।' বিষ্ণু মহারানা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, এক কিশোর বালক। তিনি সানন্দে অনুমতি দেওয়ায় বালক উঠে কলসটি স্থাপন করে এল। অন্যান্য শ্রমিকরা তখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ। তাদের অনুমান যে, কোনও কৌশলে কিশোর বালক বিষ্ণু মহারানার অমর্যাদা করেছে। তাতে তাদের সকলকেই অসম্মান করা হয়েছে। কোলাহল চরমে উঠল। বিষ্ণু মহারানার শত চেষ্টাতেও অশান্তির অবসান না ঘটায় সেই কিশোর বালক তখন আবার দৃঢ় পদে মাথা সোজা করে সেই মন্দির শীর্ষে আরোহণ করে। সেখানে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রণাম জানিয়ে সেই শীর্ষ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয়।

উড়িষ্যার জনসাধারণ অতি ভদ্র এবং তাদের দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর অগাধ শ্রদ্ধা। পরাধীন ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন প্রদেশে নিরক্ষর ছিল শতকরা বিরাশি-তিরাশি জন, তখন উড়িষ্যার গ্রামে ওড়িয়া ভাষায় লিখতে সক্ষম লোক ছিল শতকরা চল্লিশ ভাগেরও উপর। স্থপতিবিদ্যার বহু গ্রন্থ ওড়িয়া ভাষায় ছিল, যা অল্প মূল্যে বিদেশে চালান হয়ে গেছে দেশের ধনী ও পণ্ডিত লোকদের অবহেলার জন্য। আমি একবার খুব বিপদে পড়েছিলুম। কেন্দ্রাপাড়ায় এক বিরাট সম্মেলন। কংগ্রেস সভাপতি ডেবরভাই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন, আমি সভাপতি। ডেবরভাই তো হিন্দীতে বললেন—সামান্য গুঞ্জন শোনা গেল। আমি ইংরাজীতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল একটু বাড়ল। তখন ডেবরভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে কি অতুল্যবাবু হিন্দীতে বলবেন?' তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'বাংলায়।' এবং একান্ত ধৈর্য ধরে আমার বক্তৃতা শুনলেন। ইউনেসকো থেকে প্রতি দু' বছর অন্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য দু' হাজার পাউন্ড করে বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তির নাম হল 'কলিঙ্গ বৃত্তি' এবং এর টাকার সবটা'ই বিজু পট্টনায়ক-এর দেওয়া। কলিঙ্গ নাম

হলেই আমার অশোকের কলিঙ্গজয়ের কথা মনে পড়ে। চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন, বিন্দুসার তার আয়তন বাড়ালেন, আর অশোক কলিঙ্গতে যুদ্ধ করতে এসে বহু হাজার মানুষের রক্তক্ষয় দেখে ভবিষ্যতে আর কোনও যুদ্ধবিগ্রহ করেননি। কালসীতে (উত্তরপ্রদেশ) অশোকের শিলানুশাসনে (১৩) পাওয়া যায়—'অষ্টবর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক কলিঙ্গগণ বিজিত হইয়াছিল।

যাহারা সেখান হইতে অপবাহিত হইয়াছিল, (তাহারা) দ্বি-অর্ধসংখ্যক প্রাণ শতসহস্র; শতসহস্র সংখ্যক সেখানে হত হইয়াছিল, (এবং) ঠিক ততই মরিয়াছিল।

তাহার পর কলিঙ্গদেশ সদ্য লব্ধ হইলে দেবগণের প্রিয়ের তীব্র ধর্মবাত ধর্ম-কামতা ও ধর্মানুশাস্তি (হইল)।

কলিঙ্গগণকে বিজয় করিয়া দেবগণের প্রিয়ের অনুশয় হইল। অবিজিত (দেশ) বিজয় করায় সেখানে লোকের যে বধ বা মরণ বা অপবাহন (হয়), তাহা দেবগণের প্রিয়ের অত্যন্ত বেদনীয় মনে হয় ও গুরু মনে হয়।'......

'অতএব, কলিঙ্গ-দেশ লব্ধ হইলে তখন যত লোক হত, মৃত ও অপবাহিত হইয়াছিল, তাহার শত ভাগ বা সহস্র ভাগ এখন দেবগণের প্রিয়ের গুরু মনে হয়।'

পৃথিবীর আর কোনও সম্রাট যুদ্ধ জয় করবার পর এরকম মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, তার সংবাদ আমার জানা নেই। কলিঙ্গে এসে অশোক তাঁর সমস্ত আচার, ব্যবহার এবং জীবন ধারণের রীতিনীতি পরিবর্তন করলেন। এ ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ ঘটনা।

উড়িষ্যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু সংঘাতের মধ্য দিয়ে এসেছে। উড়িষ্যা দেশ যেমন বহুবার আক্রান্ত হয়েছে, উড়িষ্যার রাজারাও তেমনি বহু দেশ জয় করেছেন। শিল্প, শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যে উড়িষ্যার দান উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উড়িষ্যাতেই দেহ রাখেন। প্রথমে যখন উড়িষ্যা যান, পাঁচ বছর থাকবার পর স্বদেশে ফেরত আসেন। সেখান থেকে আবার উড়িষ্যায় যান। সেখান থেকে বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ—এই সব ঘুরে আবার উড়িষ্যায় আসেন। তাঁর দেহাবসান সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে। কেউ বলেন, সমুদ্র তাঁকে নিয়ে নেয়। কেউ বলেন, তিনি জগন্নাথ দেবের শরীরে লীন হয়ে যান। আবার কেউ বলেন যে, ভাবোন্মাদে নৃত্য করতে করতে তিনি বারবার পড়ে যেতেন। একবার এই পতনের ফলে গুরুতর আহত হন। আহত স্থানে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। এ কথাও প্রচলিত আছে যে, গুণ্ডিচাবাড়ির কোনও এক স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারের যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তার মধ্যে উড়িষ্যার খানিকটা আছে—নাম হল এ, এম পি, ও। অর্থাৎ অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা নিয়ে এই প্রজেক্ট। কোরাপুটে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। মানা এবং বাস্তারে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে যে কাণ্ড হয়েছে, তার কথা আগেই বলেছি। কোরাপুট ও নিকটস্থ অঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনুরূপ। একটি পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা যায়, আবার তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অথচ এই পরিকল্পনা প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল।
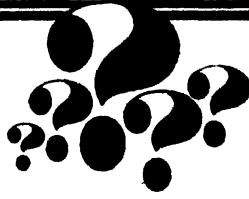
১৯৫৪ সাল। কল্যাণী কংগ্রেস। সভাপতি জওহরলাল। আমরা দশ লক্ষ লোকের আয়োজন করেছিলুম। দেশ স্বাধীন হবার আগে হরিপুরায় দেখেছিলুম সর্ববৃহৎ কংগ্রেস। সুভাষচন্দ্র সভাপতি। স্টেশন থেকে একুশ মাইল দূরে জঙ্গল কেটে খরস্রোতা নদীর উপর পুল বানিয়ে দশ লক্ষ লোকের বাস করবার মত নগর তৈরী হয়েছিল। যেমন আয়োজন, তেমনি ব্যবস্থাপনা। ওয়াটার ওয়ার্কস, ইলেকট্রিক সাপ্লাই—সবই সাময়িক, কিন্তু কোনও ত্রুটি ছিল না। কয়েক শ' গরু কেনা হয়েছিল। সেই গরুর দুধের ঘি দিয়ে প্রতিনিধিদের খাবার তৈরী হত। খাবার জায়গা বাঁধানো চত্বর। ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের জন্য বহু পর্ণকুটির তৈরী হয়েছিল। সভাপতির জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। দশ লক্ষ লোক বাস করত, আর আসত আরও প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ লোক। কিন্তু একটিও মাছি ছিল না। সাফাইয়ের স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল সব কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। সমারোহের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি ছিল। প্রহরায় সবই সেবাদলের কর্মী। খাবার জায়গা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বাঁধানো। যদিও নিরামিষ খাওয়া, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসীর কথা ভেবে আহার্য তৈরি হত। সর্দারের নিজের তত্ত্বাবধানে সবটা গড়ে উঠেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অন্য একজন নেতা। আজ অবধি যত কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছে, হরিপুরা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ছিল তার মধ্যে সংক্ষিপ্ততম। প্রতিনিধিদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও অপূর্ব। যে প্রদেশ গুজরাট থেকে যত দূরে, তাদের বাসস্থান হয়েছিল অধিবেশন মণ্ডপের সবচেয়ে কাছে। সবটাই হয়েছিল নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ম্যাজিক মেশালে যা হয়। যে-কোনও প্রদেশ থেকে দিনে-রাতে যে-কোনও সময়েই প্রতিনিধি এসেছে, বাসস্থান খুঁজে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। কংগ্রেস নগরের আশেপাশে যত খাবারের দোকান হয়েছিল, অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষজ্ঞদের সেইসব খাদ্যদ্রব্যের উপর কড়া নজর ছিল। কোনও খুঁত থাকলেই সে খাবার বিক্রয় বন্ধ। এরকম অপূর্ব সংগঠন আর কোনও কংগ্রেস অধিবেশনে দেখিনি। সেবা ও শৃঙ্খলা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিকশিত হয়।

আমরা কল্যাণীতে আধা-তৈরী, পুরো-তৈরী অনেক বাড়ির সন্ধান পেয়ে সেখানেই আয়োজন করলুম। দশ লক্ষ লোক ধরবার মত কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা দিনরাত চেষ্টা করে অধিবেশন-মঞ্চকে চিত্রাঙ্কনে সুসজ্জিত করেন। প্রদর্শনী হয়েছিল বিরাট। তিন মাস আগে থাকতে জমি নিয়ে আমরা একটি আদর্শ গ্রাম তৈরী করেছিলুম। নানাবিধ সবজিও ফলানো হয়েছিল। কুটিরে ঢেঁকির কাজ হচ্ছে তা যেমন ছিল, আবার গৃহস্থবধূ চরকা কাটছে, সে দৃশ্যও কম ছিল না। মধ্যখানে পুকুর। তাতে হাঁস এবং মাছ। জলে কিছু কলমী শাক, সুষনি শাক। আর জলের ধারে কলাগাছ।

তাঁত ছিল, কামারশাল ছিল। আবার ছুতোর কাজ করছে, তাও দেখানো হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রামে যতরকম সম্পদ উৎপাদন ও সৃষ্টি করা সম্ভব, তাই দেখাবার প্রচেষ্টা। অন্য অন্য বিভাগও ছিল। একদিন তিন লক্ষের উপর লোক চার আনার টিকিট কেটে ঢোকে—সেদিন সব প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদের আহার্যের মণ্ডপ ছিল বিরাট, যাতে একসঙ্গে পাঁচ হাজার লোক খেতে পারে। রন্ধনশালা ও আহার্যমণ্ডপের দায়িত্বে ছিলেন অজয়দা (মুখোপাধ্যায়), সতীশদা (সামন্ত) ও শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নেতৃস্থানীয় আরও অনেকে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জওহরলাল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রন্ধনশালা ও আহার্যস্থানের কর্মীরা কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে পাননি। জওহরলাল দু' দিন গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসেন। ভাঁড়ারঘর ছিল বিশাল। অন্য প্রদেশের নেতারা বলেছিলেন যে, ভাঁড়ারঘরেই অল ইন্ডিয়া কমিটির একটি অধিবেশন হতে পারে। সেই প্রথম আমরা কংগ্রেস দ্রব্যদাতার প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। গরুর গাড়িতে কংগ্রেস পতাকা লাগিয়ে কেউ হাঁড়ি আনছে, কেউ কলসী আনছে, কেউ বেগুন আনছে, কেউ কুমড়ো আনছে, কেউ কপি আনছে। বালুরঘাট থেকে স্পেশাল প্লেনে করে চাল এল। ক'টা গরুর গাড়ি ভরতি করে খালি এল মাটির পাত্র। সবজি এবং অন্যান্য জিনিস দেবার জন্য আশেপাশের গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের দিন কলকাতা থেকে গিয়েছিল একশো ছাপ্পান্নখানি স্পেশাল ট্রেন। যেসব মোটরারোহী রাত আটটার সময় কল্যাণী থেকে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের কলকাতা ফিরতে ভোর তিনটে-চারটে হয়ে গিয়েছিল—রাস্তায় এত ভিড়।

জওহরলাল আর বিজয়লক্ষ্মী পাশাপাশি দুটি বাড়িতে ছিলেন। আর মৃদুলা সরাভাই রোজ দুটি করে গোলাপ ফুল জওহরলালের জন্য দিয়ে আসতেন। অনেকে জওহরলালের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু জওহরলাল তো শোনবার মানুষ নন! উনি সময় পেলেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে হয় রান্নাঘর, নয় রাস্তার ধারে গরুর গাড়িতে শোভাযাত্রা, নয়তো প্রদর্শনীর গ্রাম দেখতে যেতেন। প্রতিনিধিদের আবাসস্থানেব ব্যবস্থা আমরা সাধ্যমত করেছিলাম। সকল প্রদেশই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় দাঙ্গা হয়ে গেল ইউ পি আর বিহারের প্রতিনিধিদের মধ্যে। বিহার থেকে যত প্রতিনিধি আসার কথা, তার উপর আরও ছয় হাজার লোক এসে হাজির। যারা প্রতিনিধি নয়, তাদেরও বিহার কংগ্রেস কমিটি প্রতিনিধিশিবিরে তুলে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিশিবিরে। আমাদের নেতৃস্থানীয় অনেকে চেষ্টা করে পারলেন না। ডাঃ রায় নিজেও ঘুরে গেলেন, কিন্তু কিছুই হল না। তখন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হচ্ছে। অধিবেশনে গিয়ে আমি জওহরলালকে বললুম, 'কংগ্রেস যদি পণ্ড হয়, তা হলে আপনি কংগ্রেস সভাপতি, আপনিই দায়ী হবেন। আমি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, আমার দায়িত্ব আয়োজন করার। নিন্দে আমাদের যতই হোক, দায়ী হবেন আপনি। কারণ, প্রতিনিধিদের সামলাবার দায়িত্ব আমাদের নেই।' পাশেই শ্রীবাবু বসে ছিলেন (বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী)। আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললুম, 'দু'খানা স্পেশালে আরও কয়েক হাজার লোক বিহার থেকে আসছে কংগ্রেস পতাকা নিয়ে। বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে বলেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।' ডাঃ রায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'ট্রেনগুলো তা হলে তো আটকে দেওয়াই

ভাল।' এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি তখনই ট্রেন বন্ধ করবার জন্য ছুটলেন। জওহরলাল তাঁকে নিরস্ত করে শ্রীবাবুকে অনুরোধ জানালেন, বিহার পি সি সি-র প্রেসিডেন্ট এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গিয়ে ট্রেনগুলি যেন পশ্চিমবঙ্গে আসা বন্ধ করেন। এক দফা বিপদ তো রক্ষা হল। বিপর্যয় এল অন্য পথে।

কংগ্রেস অধিবেশনের আগের দিন ছ' ঘন্টা ধরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। একে শীত-কাল, তায় বৃষ্টি, তায় মুষলধারে। আমরা আবার মন্ডপের শোভা বাড়ানোর জন্য জমিটাকে চাষ করে সেখানে ঘাস বসিয়ে দিয়েছিলুম। অর্থাৎ যেমন বৃষ্টি পড়ল, গদগদে কাদা। যেখানেই পা দেওয়া যায়, হাঁটু অবধি পা ডুবে যায়। বৃষ্টি থামবার পর জওহরলাল এসে হাজির। তখন আমরা সেখানে প্রায় দু' হাজার লোক কাজ করছি। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা দিনরাত কাজ করে যে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন, তা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। রাত আড়াইটের পর থেকেই তাঁরা কাজ আরম্ভ করেছেন। জওহরলাল এসেই বললেন, 'বলে দাও, আজ অধিবেশন হবে না, কাল হবে।' আমরা তো একে শীতকাল, তায় ভিজে আছি; ওঁর কথাতে আরও ঠান্ডা হয়ে গেলাম। আমি একটু সকরুণভাবে ডাঃ রায়ের দিকে চাইতেই ডাঃ রায় জওহরলালকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা তখন ক্রমাগত খড় আর চট মন্ডপের অনাবৃত জায়গায় পাতছি যাতে বসবার যোগ্য হয়। যত দূর মনে পড়ে ঐ এক রাত্রেই খড় এবং চট কিনতে আমাদের দু'লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়েছিল। ডাঃ রায়ও সারা রাত আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এদিকে রান্নাঘরেও বিপর্যয় কম নয়। আটটার মধ্যে সব কর্মীদের প্রাতঃকালীন খাবার দিতে হবে, কিন্তু জলে সব ভেসে গেছে। অন্যান্য জায়গায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি খাবারের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু এখানে আমরা নিজেরাই সব করেছিলুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির কয়েকজন পান্ডাকে ধরে পড়লুম। তখন রাত প্রায় এগারোটা। তাঁরা সকলেই কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং নেতৃস্থানীয়। যতগুলি গাড়ি প্রয়োজন, ব্যবস্থা করে দেওয়া হল এবং অবাক কান্ড, ঠিক সকাল আটটায় তাঁরা প্রাতঃকালীন খাবার সবাইকে দিতে সক্ষম হলেন। অপূর্ব এঁদের সংগঠন। সেদিন যেভাবে তাঁরা আমাদের রক্ষা করেছিলেন, তা ভোলবার নয়।

ঠিক আড়াইটের সময় জওহরলালের কাছে গেলুম। যেতেই বললেন, 'কাল সকালে ক'টায় অধিবেশন ডাকা ঠিক হয়েছে?' আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললুম, 'আজ্ঞে, যে সময় অধিবেশন আরম্ভ হবার কথা; ঠিক তিনটের সময়ই সভাপতির শোভাযাত্রা আরম্ভ হবে।' তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হাসি। জওহরলাল যখন প্রাণ খুলে হাসতেন, মনে হত যেন অন্য মানুষ। কংগ্রেস অধিবেশনের নিয়ম হচ্ছে মূল প্রবেশদ্বার থেকে সভাপতিকে নিয়ে ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতিরা এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা শোভাযাত্রা করে মঞ্চে যান। দিল্লী থেকে যেসব ঝানু-ঝানু নিরাপত্তা রক্ষার পদস্থ কর্মচারীরা এসেছিলেন, তাঁরা কায়দা করে জওহরলাল ও আমাদের অন্য পথ দিয়ে মঞ্চে নিয়ে গেলেন। কারণ, মন্ডপ তো অগণিত জনতায় ভরতি, কোনও পথই নেই মঞ্চে যাবার। আমি দেখলুম, ঝানু অফিসার হলে কি হবে, তাঁরা জওহরলালকে চেনেন না। জওহরলালের মঞ্চ থেকেই লাফাবার উপক্রম। ডাঃ রায় এসে হাত ধরে বললেন, 'করছ কি? অতুল্যর তো দু পা-ই ভাঙ্গা। ওকে তো তোমার সঙ্গে যেতে হবে।' লাফ দেওয়া বন্ধ হল, কিন্তু নীচে নামা বন্ধ হল না। আমাকে নিয়ে যতটা ক্ষিপ্র

গতিতে নামা যায় নেমে মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় মাটিতে এসে দাঁড়ালেন। তারপর দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সরো। পথ করে দাও।' সেই অগণিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত মঞ্চ থেকে যেখানে প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল, সেখান অবধি পথ করে দিল। সেখানে আমরা সবাই গেলুম। জনতা স্থিরধীর-ভাবে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে সভাপতির শোভাযাত্রা আরম্ভ হল। যতক্ষণ না আমরা সবাই মঞ্চে উঠলুম, জনতা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। জীবনে ভোলবার নয়। এই আসা-যাওয়ার পথে জওহরলালের বুক থেকে সভাপতির বিশিষ্ট স্মারকচিহ্ন ভিড়ের মধ্যে খসে পড়ে গিয়েছিল। আমি মাইকে ঘোষণা করলাম, 'সভাপতি জওহরলালের স্মারকচিহ্ন ভিড়ের মধ্যে খসে পড়ে গেছে। যদি কেউ খুঁজে এনে দেন, তা হলে কৃতজ্ঞ থাকব।' মনে মনে যদিও জানতুম যে, সে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জওহরলাল কিন্তু স্মারকচিহ্ন ছাড়া দাঁড়াবেন না। প্রায় ছেলেমানুষী আবদার। আমার পকেটে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির স্মারকচিহ্নটি ছিল, সেটি পরিয়ে দিলুম। খুব খুশী। আশ্চর্যের বিষয়, খানিক বাদে ব্যাজটি পাওয়া গেল। একজন কৃষক ব্যাজটি এনে দিলেন। তখন জওহরলালের উল্লাস দেখে কে! তিনি ওটি হাতে করে মঞ্চের এক দিক থেকে আর এক দিক অবধি দাপাদাপি করে সকলকে দেখাতে লাগলেন। আমরা ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি-র সদস্যদের জন্য এক বিশেষ পেন্সিল তৈরি করিয়েছিলুম। যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। ওঁকে একটা দিতেই বললেন, 'তোমার আক্কেলটা কি? আমার রাজীব আর সঞ্জয় বলে দুজন নাতি আছে।' অগত্যা তিনটে দিতে হল। ওঁর সঙ্গে দরকারী কাগজপত্র রাখার একটা পোর্টফলিও থাকত। তার মধ্যে পেন্সিল তিনটিকে সযত্নে রেখে দিলেন। শিশুরা খেলনা পেয়ে যেরকম আনন্দ করে, ঠিক সেইরকম খুশী। সভা আরম্ভ হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ সাধারণতঃ পড়া হয়। আমি পড়তে উঠলুম। উঠে দাঁড়ালুম। উনি মাইক থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'অতুল্যবাবু বাঙলায় বলবেন এবং লিখিত ভাষণ নয়।' সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঘোষণা করলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পরে যখন ভাষণ দেবেন, বাঙলায় বলবেন। পরামর্শ খুবই সমীচীন। কারণ, ঐ লক্ষ লক্ষ লোক ভিজে মাটিতে বসে বইয়ের নীরস পড়া আরম্ভ করলেই অস্থির হয়ে উঠত।

সেই সময় ডাঃ রায়কে যে পরিশ্রম করতে দেখেছি, তা যে ঐ বয়সের কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব, তা ধারণাতীত। রোজই বেলা দশটা-এগারোটায় যেতেন। ফিরতেন রাত দশটায়। অধিবেশনের আগের দিন সারা রাত জেগে—অস্নাত এবং অভুক্ত। আর একজনের নাম মনে পড়ছে—তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)। কত নাম করব! প্রফুল্লদা (সেন) থেকে আরম্ভ করে অখ্যাত অজ্ঞাত সামান্যতম কর্মী পর্যন্ত ক'দিন প্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করেছিল।
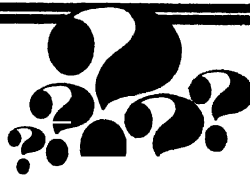
বরাবরই অবাক হয়ে ভাবতুম যে, হঠাৎ মহর্ষি ছাতিমতলাতেই বা পাল্কি নামালেন কেন? জায়গাটা অদ্ভুত। এক দিকে অজয়ের ধারে, জয়দেবের কেন্দুবিল্ব, অন্য দিকে প্রায় সমদূরত্বে চন্ডীদাসের নান্নুর। বাংলার এই দুই বিখ্যাত কবির মাঝখানে এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বর্তমান যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবির পিতা। শান্তিনিকেতন অনেকবারই গিয়েছি—ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় অবধি, কিন্তু এর কোনও সদুত্তর পাইনি। বীরভূমের অবশ্য একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। রাজা-রাজড়ার কথা বাদই দিচ্ছি, কত রকমের সাধু, কত রকমের তান্ত্রিক আর কত কীর্তনের দল যে বীরভূমে আছে তার পুরো ইতিহাস এখনও জানা যায়নি। হরেকৃষ্ণবাবু এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন—তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তারাশংকরের মুখে অনেক গল্প শোনা গেছে। সজনীকান্তও বর্ণনাবিশারদ ছিলেন।

একদা ছাতিমতলাকে আশ্রয় করে যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম গড়ে উঠেছিল, আজ তা বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়ে মহামহীরূহ হয়ে উঠেছে। এখনও পৌষের মেলা, পয়লা বোশেখে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, দোলের বসন্ত-উৎসব সারা দেশের লোকের কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু আমরা পুরনো যারা, আমাদের মনে হয়, কোথায় যেন একটা যোগসূত্র হারিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ওখানে মহাপন্ডিত এবং পরম গুণীদের সমাবেশ হয়েছিল ; তাঁরা সব দিক্‌পাল। আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরাও স্মরণীয়। সাক্ষাৎভাবে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে। বিধুশেখর শাস্ত্রী। তাঁর মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের গোলপাতার ঘরে গিয়ে প্রণাম করেছিলুম। বিরাট আমবাগানের মধ্যে সৌম্য, শান্ত শাস্ত্রীমশাই বসে ছিলেন; তাঁর সে মূর্তি ভোলবার নয়। স্নেহের অত্যাচারও তাঁর উপর করেছিলুম। একবার শ্রীরামপুরে এনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনায় তিনি সাধারণত যেতেন না। সেজন্য এখনও মনে হয়, এই অভাজনের প্রতি তিনি কেন এত সদয় হয়েছিলেন যে, শ্রীরামপুরে এসে সংবর্ধনা গ্রহণে সম্মতি দেন। আচার্য নন্দলাল বসুর কথা ভোলা যায় না। 'দেশ'-এ প্রকাশিত একটি ছবি তাঁর চেহারাটা যেন স্পষ্ট করে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। তাতে অবনীন্দ্রনাথ আছেন, গগনেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমারস্বামীও আছেন। নন্দলালবাবু পটুয়া। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিত্রকলা সম্পর্কে বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। ব্যক্তিগত ব্যবহারে যা স্নেহ পেয়েছি তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যখনই গিয়েছি, আদর-সম্ভাষণে ত্রুটি হয়নি। এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন পরিবারেরই একজন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে গুণীজন সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস থেকেই বোধ হয় প্রথম ব্যাপকভাবে গুণীজন সংবর্ধনা শুরু করা হয়। একবার স্থির হয় যে, আচার্য নন্দলালকে সংবর্ধনা জানানো হবে।

তিনি তো স্পষ্ট বলে দিলেন, 'সংবর্ধনা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর, কলকাতা যাওয়ার তো কোনও কথাই ওঠে না।' একদিন দুপুরবেলা গিয়ে হাজির হলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর হাত কচলাতে কচলাতে আমার আরজির কথা তুললুম। খুব হেসে উঠলেন। বললেন, 'যা সম্ভব নয়, তা বলতে এসেছ কেন?' আমি মুখ চুন করে হস্তকণ্ডূয়ন করতে লাগলুম। অবশ্য আমার পক্ষে ছিলেন আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ শ্রদ্ধেয় সুরেন কর মশাই। নানারকম কথাবার্তা হল। তখন আমি সবিনয়ে জানালুম যে, আমরা শান্তিনিকেতনেই মণ্ডপ তৈরি করে ওঁর ছবি সামনে রেখে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব। খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর তারপরই হেসে উঠলেন। সে হাসি ভোলবার নয়। তার মানেই সম্মতি। আমরা পরম আড়ম্বরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে এলুম।

রথীবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। এক-একসময় তাঁর স্নেহের আতিশয্যে খুব অপ্রতিভ হতে হয়েছে। বেশ মনে আছে, একবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় পেঁাছবার কথা, পেঁাছলুম গিয়ে রাত এগারোটায়। সেই অবস্থায় ঘুমন্ত কণিকা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং নীলিমাকে (সেন) উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে গান শোনালেন। বহু বছর পাবলিক লাইফে থাকার ফলে লজ্জা-ঘেন্না প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, আমিও সেদিন লজ্জিত হয়েছিলুম। কয়েক মাস আগে মোহরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিনও তাকে একদা কত কষ্ট দিয়েছিলুম স্মরণ করিয়ে দিই। রথীবাবুর সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। একদিন কোনও এক শিক্ষক ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথের ছবি বোঝাচ্ছিলেন। সেই সময় বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে রথীবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। মিনিট কয়েক দাঁড়াবার পর তিনি ঘরে ঢুকে ছবিখানি উল্টে দিয়ে যান। আমার পক্ষে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হবে। রথীবাবু যেমন সুরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন, তেমনি হাতের কাজেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। সুরেনবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। সুরেনবাবু শান্তিনিকেতনের বহু পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আমার কাছে সেটা তাঁর বড় পরিচয় নয়। ছোটখাট কাজেও তাঁর যা আগ্রহ দেখেছি তার তুলনা হয় না। বাঁকড়োয় আমি একটা বাড়ি আর বাগান করি। উনি সেই বাগান সম্বন্ধে যে কত পরামর্শ দিয়েছেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করে বাঁকড়োর সেই বাড়িতে গিয়েছেনও বহুবার। দু'বার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ভীমবাঁধ গিয়েছিলেন। মুঙ্গের জেলার জামুই মহকুমার এক অরণ্যসঙ্কুল জায়গা। চারদিকে বড় বড় পাহাড় আর অনেক গরম জলের ঝরনা। এবারে সুরেনবাবুর সঙ্গে মৃগাঙ্কমোহন সুর, ডাঃ সন্মথনাথ দত্ত ও আমি গিয়েছিলুম। আর একবার সুরেনবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিহারে যে এরকম অপূর্ব কত জায়গা আছে তা বলা যায় না। এই ভীমবাঁধে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে ক্যাম্প করতে যেত। কেন্দুবিল্ব গিয়েছিলুম বন্ধুবর অনিল চন্দের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথেরই একান্ত সচিব এবং শিক্ষাভবনের এককালীন অধ্যক্ষ অনিল চন্দের কথা লিখে শেষ করা যায় না। এরকম সুরসিক, সুপণ্ডিত, সুজন ও সৎ মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। কতবার ওঁর বাড়িতে থেকেছি শান্তিনিকেতনে। ভারি আড্ডাবাজ ও সমঝদার লোক। একদিন এমন একটা গল্প বললেন যে, আমরা ঘরে যে ক'জন ছিলুম সকলেরই হাসিতে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এক অধ্যাপকের নাম 'তোমার'। বোধ হয় মারাঠী। তাঁর সঙ্গে আর এক অধ্যাপকের আলাপ হয়। সেই

অধ্যাপক, অধ্যাপক 'তোমার'কে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানান। যথারীতি সন্ধ্যাবেলা 'তোমার' গিয়ে হাজির অধ্যাপকের বাড়িতে। অধ্যাপক তখন নেই। কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে রমণীকণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কে?' উত্তরে অধ্যাপক বললেন, 'আমি তোমার।' আবার একটু জোরাল গলায় প্রশ্ন এল, 'কে, কে?' তারপর অতি বিনয়নম্র গলায় উত্তর এল, 'আমি তোমার।' ব্যস, ভিতর থেকে করুণ আর্তনাদ। পাড়াপড়শী ছুটে এল।

অনিলবাবুর বিয়ে হয় রাণীর সঙ্গে। পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রাণী একটি অসাধারণ মেয়ে। বিয়ের পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাগুরু আচার্য নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা আর দাদা যশস্বী শিল্পী। প্রতিভা যেমন লেখায় তেমন শিল্পসৃষ্টিতে। অথচ গৃহকর্মে নিপুণা। শান্তিনিকেতনে ওদের বাড়িতে তো অনেক দিন থেকেছি। দিল্লীতে একবার আঠারো দিন ছিলাম। রান্নাটা নিজের হাতেই করে। সে এক অবাক কান্ড। কখন লেখে, কখন ছবি আঁকে, কখন রান্না করে, আবার আমাদের সঙ্গে আড্ডাতেও যোগ দেয়। যেমন নিজের মর্যাদাবোধ তেমনি একান্ত কমনীয়তা।

কেন্দুবিল্বে আমরা প্রায় সারা রাত ছিলুম। বসে বসে ভাবছিলুম—এই জয়দেব লোকটি কেমন ছিল। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি বোঝা যায়। কবিশ্রেষ্ঠ—তাও বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে গান—আর সে গান এমন যে, গাছে নতুন পাতা গজিয়ে উঠল। কথিত আছে যে বাংলার বাইরের এক সঙ্গীতজ্ঞ এমন গান করেছিলেন যে, গাছের সব পাতা ঝরে যায়। তিনি মহারাজা লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। জয়দেবের ভার্যা পদ্মাবতী মহারাজাকে বলেন, 'আমার স্বামীর গানের পর যেন পুরস্কার দেওয়া হয়।' জয়দেব গানে বসেন। চতুর্দিক নীরব, নিথর। নিষ্পত্র গাছ নতুন পাতায় সুসজ্জিত হয়ে উঠল। গান যখন শেষ হলো তখন কারুর মুখে কথা নেই। বাইরের যে গায়ক পুরস্কার লাভ করেছিলেন তিনি পরাজয় স্বীকার করেন।

আরো কত গল্প আছে। ওখানে গেলে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এইখানে বসে 'গীতগোবিন্দ কাব্যম্' লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে আছে 'দশাবতার স্তব'। এই দশাবতার স্তবের মধ্যে পৃথিবীর বিবর্তনবাদের পরিষ্কার একটা ছবি ফুটে উঠেছে। জীবজগতের বিবর্তন প্রসঙ্গে ১৮৫৯ সালের ডারউনের 'Origin of species' বের হয়। তার প্রধান প্রবক্তা হলেন Ernest Haeckel (১৮৬৬)। তার আগেও অবশ্য কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন।

দশাবতার স্তবে আছে—যেগুলিকে আমরা শ্লোক বলেই জানি, কিন্তু এগুলি রচিত হয়েছিল সঙ্গীতরূপেঃ

মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ ৫ ॥ ধ্রুবম্।

অর্থাৎ, তখন শুধু জল। মাটি নেই। তাতে একরকম জীব বাস করে, যাদের হাড় নেই, মাংস নেই, খালি চোখ আছে। মাছ।

পরে—'কেশব ধৃত কূর্ম শরীর'। অর্থাৎ এখনও জল। একটু একটু মাটি হয়েছে, আর এক তাল মাংস। কচ্ছপের পিঠটা কিন্তু শক্ত। সে মাঝে মাঝে মাটিতে

উঠবার চেষ্টা করে। সে বাস করে জলে।

তৃতীয় অবতার হলেন—'কেশব ধৃত বরাহরূপ'। অর্থাৎ, মাটি হয়েছে। কিন্তু এমন প্রাণী হয়েছে, যারা কাদায় বাস করতে চায়। চোখ আছে, কান আছে, কিন্তু হাড় নেই বললেই চলে। একটা মাংসপিন্ড। এবং মাটির পৃথিবী সৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্থ অবতার—'কেশব ধৃত নরহরিরূপ'। অর্থাৎ, আমরা যাকে নৃসিংহ অবতার বলি। খানিকটা মানুষ, খানিকটা জন্তু। বনে-জঙ্গলে থাকে। বড় বড় নখ। নখ দিয়ে আহার্য সংগ্রহ করে। তখনও কোনও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু গাছপালা হতে শুরু করেছে।

পঞ্চম অবতার—'কেশব ধৃত বামনরূপ'। এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক জগৎ 'এপ্‌ম্যান'-এর কথা জানে। সবাই খর্বাকৃতি মানুষের মত, কিন্তু মানুষ নয়।

ষষ্ঠ অবতার—'কেশব ধৃত ভৃগপতিরূপ'। অর্থাৎ, পরশুরাম। প্রতীক হলো কুঠার। অর্থাৎ পাথর ঘষে কুঠার তৈরী হচ্ছে। বনে-জঙ্গলে বাস এবং শিকার করে খাওয়া।

সপ্তম অবতার—'কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ'। প্রতীক হলো ধনুর্বাণ। প্রযুক্তি-বিদ্যা আয়ত্তে এসেছে। ধনুক তৈরী হচ্ছে। শিকার হলো প্রধানতম জীবিকা।

অষ্টম অবতার হলেন—'কেশব ধৃত হলধররূপ'। প্রতীক হলো—হল লাঙ্গল। নদীর ধারে মানুষের বসতি স্থাপন এবং জমি চাষ করে আহার্যের ব্যবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে মানুষ সামাজিক জীবে পরিণত হয়েছে।

নবম অবতার হলেন—'কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর'। উপনিষদ, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, জনসেবা, জনকল্যাণ। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে আদর্শ প্রয়োজন তার উপলব্ধি।

দশম অবতার হলেন—'কেশব ধৃত কল্কিশরীর'। আধুনিক জগৎ। এক দিকে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা জনসাধারণের আয়ত্তে, অ্যাটমের আবিষ্কার হয়েছে। এবং তার সৃষ্টিকার্য না দেখে তার ধ্বংস কার্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। নাগাসাকি ও হিরোশিমা।

জয়দেবের সময় হল ১১শ থেকে ১২শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ, এখন থেকে প্রায় আটশ' বছর আগে। অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলুম, তখনকার দিনে এইসব মহা-পুরুষদের মনে এমন সুস্পষ্ট ধারণা কেমন করে জন্মেছিল। এ এক অপূর্ব বিস্ময়।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। দেখি, সামনে একটা ছোট ছাউনির মধ্যে পূর্ণ আর মঞ্জু (দাস) বাউল গান ধরেছে। হাজার হাজার বাউল। জয়দেবও তো বাউল ছিলেন।
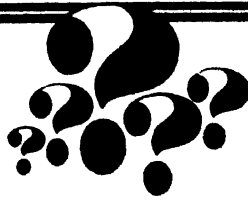
তখন পুরুলিয়া ছিল মানভূম জেলার মধ্যে, অর্থাৎ বিহারে। বিনোবাজী ভোর সাড়ে চারটেতে বিহার থেকে পশ্চিম বাংলায় ঢুকবেন। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার কাছে। আমাকে তো যেতেই হবে! তা ছাড়া সেদিন ক্যাবিনেট মিটিং—মন্ত্রীরা কেউ যেতে পারবেন না। আর একটা বিপদ—সেইদিনই সকাল দশটা সাড়ে-দশটায় জওহরলাল আসছেন দমদমে। জওহরলালের আসা-যাওয়া আমার পক্ষে খুবই উদ্বেগজনক ছিল। যদি গিয়ে দেখা করি হয়তো কথাও বলতেন না; আর দেখা না করলে লম্বা চিঠি আসত, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল। তুমি বোধ হয় বড্ডই ব্যস্ত ছিলে।' ডাঃ রায় বলেছিলেন, 'যেখানেই থাক দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে এসে হাজির হ'য়ো।'

সাড়ে-চারটের সময় বিনোবাজীকে প্রণাম করলুম। তাঁর সঙ্গে একটুখানি হেঁটে বিদায় নিলুম। বলে এলুম, তার পরদিন তাঁর প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হব। সেখান থেকে মরি-বাঁচি করে দমদম। সেখানে প্রণাম করলুম। তার পরদিন সকালে বেশ একটু খুশী মেজাজে জওহরলাল বললেন, 'তুমি তো এক দিনে দু' জায়গায় ছিলে দেখছি। বিনোবাজী কি বললেন?' ডাঃ রায় তো ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নন! বললেন, 'কথা কইবে কি করে? তাকে প্রণাম করেই ছুটে আবার তোমার কাছে আসতে হয়েছে।' তারপর দুজনেই হাসতে লাগলেন। জওহরলালের কাছে বিদায় নিয়ে বিকালে বিনোবাজীর প্রার্থনা-সভায় যোগদান করলাম ; রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল যে, বিনোবাজী যে রাজ্যে ঘুরতেন, সেখানে তাঁর ঘোরার আনুষঙ্গিক সব ব্যয় রাজ্য কংগ্রেস কমিটি, বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটি, অথবা স্থানীয় লোকেরা বহন করতেন। বিনোবাজীর জন্য ব্যয় হত সামান্য ; কিন্তু সঙ্গে তো আমরা অনেকেই থাকতুম, এবং তা ছাড়া তাঁর সঙ্গীরা থাকতেন—সেটা একটা মোটা খরচ।

বিনোবাজীর স্নেহ আমার প্রতি অসীম। আমার পায়ের অবস্থা জেনে আমাকে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে জীপে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর নামটা মনে নেই। লোকে তাঁকে পাগলা হাকিম বলত। তিনি সব সময়ই পায়ে হেঁটে হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। এবং দারুণ শীতেও একটা সুতী জামা ছাড়া গায়ে অন্য কিছু দেখিনি। ওন্দা গ্রামে প্রফুল্লদা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। আরও অনেক মন্ত্রীও ছিলেন। আমরা দুজনে বিনোবাজীর সঙ্গে সময় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে লেগে গেলুম। আমাদের প্রশ্নটি ছিল সাধারণ। চরকার উপর বিনোবাজী জোর দিচ্ছেন না কেন? অথচ অহিংসা নীতির সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণ জড়িয়ে আছে। আবার বিকেন্দ্রীকরণে চরকা একটা বড় প্রতীক। অনেকক্ষণ ধরেই আলোচনা হল। আমার নিজস্ব একটা প্রশ্ন ছিল। এখনও সে প্রশ্নের মীমাংসা আমি করতে পারিনি। বিনোবাজী নিজেই বলেছিলেন যে, অনেক জমি পাওয়া গেছে—যা 'টাঁড়' জমি। অর্থাৎ কঙ্করময় জমি—যেখানে সেচের

সুবিধা নেই এবং অদূরে ভবিষ্যতেও ফসল ফলবার সম্ভাবনাও কম। আমার প্রশ্ন—এসব জমি নিয়ে কি হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, লোককে দশ কাঠা, এক বিঘা জমি দিয়ে লাভ কি? তাতে তো এদের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনও সমাধান হবে না! আমি তেলেঙ্গানার পয়মপল্লী অথবা পছমপল্লী গ্রামে (ঠিক নামটা মনে নেই) গিয়েছিলাম—যেখান থেকে বিনোবাজীর যাত্রা শুরু হয়। অনুর্বর কাঁকুরে জমি। চাষবাসের কোনও চিহ্ন নেই। কতকগুলি ব্যবসায়ী—ছোট ছোট দোকান আছে মাত্র। জমি যাদের দেওয়া হচ্ছে যদি তাতে পাঁচজনের একটি পরিবার প্রতিপালিত না হয় তা হলে জমিদানের পুণ্যোর্জন হবে বটে, কিন্তু কৃষকের সমস্যার সমাধান হবে না। ঠিক আমাদের সরকারী সিলিং-এর মত। ওপরের মাপের সীমা এ'রা ঠিক করে দিয়েছেন, কিন্তু নিচের কোনও মাপ নেই। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কেউই আগ্রহী নন। ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া মানে তো এ নয় যে, তাকে চিরদিনের জন্য গরীব করে রাখা। ভূমির মালিকানা এমন করতে হবে যে, এত বিঘের নিচে কোনও কৃষকের জমি থাকবে না। আপত্তি উঠতে পারে এই বলে যে, কথা বলা সহজ, করা শক্ত। এই যুক্তি দিয়ে যদি অর্থনৈতিক প্রশ্নকে নস্যাৎ করা হয় তা হলে অন্য সব সমস্যাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায়। যেমন মার্কসের 'withering of the State.' ষাট বছরেও কম্যুনিস্ট রাশিয়া এ কাজ করতে পারেনি। অতএব এ পথ কম্যুনিস্টদের ত্যাগ করাই উচিত। গান্ধীজী বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি ও অহিংসার আদর্শকে স্থাপন করে গেছেন। পরম গান্ধী-বাদী যাঁরা তাঁরা প্রশাসনে গিয়েও এখনও গান্ধীজীর আদর্শের দিকে একটুও এগিয়ে যেতে পারেননি। যেমন, মাদকতা নিবারণ। এটা গান্ধীজীর বড় কর্মপন্থা। কিন্তু তিনি তো বারবার বলে গেছেন, কেবলমাত্র প্রশাসনের ভিতর দিয়ে এটা হতে পারে না। কংগ্রেস প্রশাসনের ভিতর দিয়ে এ কাজ করবার চেষ্টা করে এসেছেন। জনতা দল আরম্ভ করেছেন। জনতা দলের মন্ত্রী ও নেতারা বহু জনসভা করেন; সেখানে কোথাও মাদকতা বর্জনের কথা শোনা যায় না। তা হলে কি গান্ধীজীর মাদকতা বর্জন নীতি পরিত্যাগ করতে হবে? আমার বক্তব্য বিনোবাজীর কাছে অতি স্পষ্ট ছিল। কৃষক পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করবার জন্যই তাদের জমি দেওয়া প্রয়োজন। ছিটেফোঁটা দিয়ে সে সমস্যার সমাধান হবে না। অর্থাৎ জমির নিম্নতম সিলিং বেঁধে দিতে হবে। যাকে জমি দিতে হবে তাকে ততটা পরিমাণ জমিই দিতে হবে যাতে তার সংসারে সাচ্ছল্য আসে। সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর যারা নির্ভরশীল নয় তাদের জমিও নিয়ে নিতে হবে। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মিল এবং কারখানার শ্রমিক—এদের জমি থাকবে কেন? বর্তমান ব্যবস্থায় এদের জমি তো আছেই। তারই ঊর্ধ্বতন সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটা হল গোঁজামিল দেওয়া। এতে কোনও দিন সমস্যার সমাধান হবে না। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভারতবর্ষের যত কোটি লোক জমির উপর নির্ভরশীল, তাতে অর্থ-নীতির ভিত্তিতে জমি দিলে সবাইকে দেওয়া যাবে না। ভাল কথা, যাদের দেওয়া যায় তাদের তো দেওয়া আরম্ভ হোক! ছিটেফোঁটা করুণাবৃদ্ধি না করে কয়েকটি পরিবারের সমস্যার সমাধান হোক। যারা জমি পাবে না তাদের দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা, টাটানগর—এসব জায়গায় না টেনে তারা যাতে গ্রামে বসে রোজগার করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। ভারতবর্ষ নাকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। যদি সত্যিই হয়ে থাকে তা হলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, জল, কুটিরশিল্পের যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে গ্রামের লোককে গ্রামেই রাখা যায়। বৃহৎ

বৃহৎ শিল্পনগরী সৃষ্টি করে গ্রামগুলোকে জনশূন্য করে যে সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে তা থেকে দেশ রেহাই পায়। আমরা বলি ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক। শতকরা সত্তর-জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ ভারতবর্ষে কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ধার্য হলেও এখনও চালু হয়নি। কিন্তু কলকারখানার শ্রমিকদের—যারা ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় অতি মুষ্টিমেয়, তাদের বেলায় শুধু যে নিম্নতম মজুরি ধার্য হয়েছে তা নয়, চালুও হয়েছে অনেক দিন। কারণ অতি সুস্পষ্ট। এখনও অবধি রাজনৈতিক দলেরা কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে হইচই করেন; কৃষি-শ্রমিকদের দিকে নজর দেবার সময় বিশেষ কারো নেই। কলকারখানা এবং সেখানে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ইন্সিওর করা যায়; কিন্তু আমাদের দেশে ক্রপ ইন্সিওরের কথা এখনও বিশেষ শোনা যায়নি। লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বোম্বের এ আই সি সি-তে আমরা ক্রপ ইন্সিওরের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। তখন সুব্রহ্মণ্যম কৃষিমন্ত্রী। কিন্তু সে তো চাপা পড়ে গেছে। অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের জন্য যে ফসল নষ্ট হচ্ছে তার জন্য কৃষকেরা কেন ক্ষতিপূরণ পাবে না—এটা বোঝা খুব শক্ত। এইসব অব্যবস্থার মধ্যে ভূদান যজ্ঞের দ্বারা যে এক বিঘা দু' বিঘা ভূমিদান, তাতে লোকসেবার কাজ হবে বটে, কিন্তু জনকল্যাণ হবে না।

কেন জানি না, বিনোবাজীর মনে হয়েছিল যে, আমাকে দিয়ে ভূদান আন্দোলন সুসংগঠিত করা সম্ভব। নদীয়া জেলা পরিভ্রমণের সময় বিনোবাজীর নির্দেশে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতনেও আমায় কিছু বলতে হয় এবং বিনোবাজী আমায় কিছু দায়িত্ব নেওয়া সম্বন্ধে অনুরোধ জানান। বিনোবাজীর ওপর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে যেভাবে ভূদান-আন্দোলন হয়েছে সে সম্পর্কে আমার মনে তখনও দ্বিধা ছিল এবং এখনও আছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে যখন যেখানে ঘুরেছেন আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি। যেবারে পুরুলিয়া থেকে শালতোড়া হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এলেন, সেবারে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন হয়ে উড়িষ্যার লক্ষ্মণনাথে প্রবেশ করলেন। সেখানে হরেকৃষ্ণবাবু (মহাতব) এসেছিলেন। তিনি বোম্বাই-এর গভর্নর হচ্ছেন—এ সংবাদ দিতে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এ খবর কেউ জানে না।

একবার আমায় খুব বিব্রত হতে হয়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মানভূমের কতকটা অংশ এসে পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টি হয়েছে। বিনোবাজী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে চান্ডিলের কাছে একটি গ্রামে ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু দেখা করতে এলেন। ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমি আর বদু কলকাতা থেকে জামসেদপুর হয়ে সেই গ্রামে গেলুম। জামসেদপুর থেকে ডাঃ রায়ের স্পেশাল প্লেন কলকাতায় ফিরে গেল। আমরা রাষ্ট্রপতির প্লেনে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাব—এটাই ঠিক ছিল। যাঁরা ব্যবস্থা করছিলেন তাঁরা ডাঃ রায় ও আমার রাষ্ট্রপতির প্লেনে আসন ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু বদুর জন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমি বদুর ট্রেনে কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করছিলাম। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবুর কোনও খুঁটিনাটি জিনিসেরও চোখ এড়াত না। তিনি শশব্যস্ত হয়ে আমাকে বারণ করলেন এবং বদুকে সঙ্গে নিয়ে প্লেনে উঠে গেলেন। ফলে, একজন হোমরাচোমরা অফিসারকে অন্যভাবে কলকাতা ফিরতে হল। সমস্ত ব্যাপারটা ডাঃ রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করছিলেন। অনেক ছোটবেলা থেকেই রাজেন্দ্রবাবুকে জানতুম। সরল, নিরহংকার, অথচ চরিত্রে একটা দৃঢ়তা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তখনকার দিনে চতুর্থ এম এল। অথচ কোনও শিক্ষাভিমান কথাবার্তায় প্রকাশ পায়নি। জীবনযাপন করতেন সাধারণ কৃষকদের মতন। কর্মীদের উপর ছিল অগাধ স্নেহ,

প্রীতি ও বিশ্বাস। রাষ্ট্রপতি হবার পর বহুবার গিয়েছি। কোনও ভাবান্তর দেখিনি। কলকাতায় যখনই এসেছেন, সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়েছেন। শেষ জীবনে হাঁপানিতে খুব কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হয়নি। কংগ্রেসকে যাঁরা সুসংগঠিত করেছিলেন, গান্ধীজীর পরে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির এই নেতা কোনও দিন কাউকে জোরে কথা বলেছেন বলে শুনিনি। মৃত্যুদিন অবধি সদা-বিনম্রভাব বজায় রেখে গেছেন।

১৯৫৯ সাল। নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন। অধিবেশনের পর ডেবরভাই (ইউ এন ডেবর) কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করবেন এবং নিয়মানুযায়ী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবে। কোনো কোনো কংগ্রেস স্মারকগ্রন্থে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে লেখা আছে যে, তিনি নাগপুরে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন—এটা ভুল। তিনি নাগপুর কংগ্রেসের পর সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং এই সভাপতি নির্বাচন নিয়ে পর্দার আড়ালে যা ঘটেছিল তাও সহজে ভোলবার নয়। যাঁরা সেই ঘটনার নায়ক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জওহরলাল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডেবরভাই, কামরাজ, লালবাহাদুর আর আমাদের মধ্যে নেই।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের আগে থাকতেই আমি, কামরাজ, লালবাহাদুর ও আরও কয়েকজন নিজলিঙ্গাপ্পাকে কংগ্রেস সভাপতি করার বিষয়ে আলোচনা করেছিলুম। পূর্বেও একবার নিজলিঙ্গাপ্পার নাম হয়েছিল। সে সময়ে জওহরলালের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের অসম্মতি থাকায় তা ঘটে ওঠেনি। আমরা কয়েকজন ঠিকই করেছিলুম নাগপুর ত্যাগ করার পূর্বে নিজলিঙ্গাপ্পার নাম প্রস্তাব করে যাব। নাম প্রস্তাব করার আগে পন্থজীর পরামর্শ নেওয়া সমীচীন বলে মনে হয়। আমি পন্থজীর কাছে যাই। তিনি সামান্য আলোচনার পর সম্মতি দেন। তবে আমাকে বলেন, 'তুমি একবার জওহরলালের সংগে আলোচনা কর।' শুনে তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা। কিন্তু পন্থজীর কথা অমান্য করবার উপায় নেই। আমি একটু সন্ত্রস্তভাবে জওহরলালের কাছে বসলুম। কংগ্রেসের ডায়াসে। মেজাজ ভালই ছিল। এ-কথা সে-কথার পর আমি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের কথা তুললাম। সংগে সংগে মেজাজ বদলে গেল। একটু ক্রুদ্ধ স্বরেই বললেন, 'দেখ না, আমি রাজভবনে আছি, সুব্রহ্মণ্যম সেখানে আছে। কাগজে লিখে দিয়েছে আমি সুব্রহ্মণ্যমকে সভাপতি করতে চাইছি। অথচ আমি এ সম্বন্ধে কারোর সংগে আলোচনাও করিনি।' আমি অনেকক্ষণ কাছে বসে রইলুম। তারপর সুযোগ-সুবিধা বুঝে নিজলিঙ্গাপ্পার নাম পেশ করলুম। মনে হল বেশ প্রসন্নভাবেই বললেন, 'নাম ভাল এবং উপযুক্ত। তবে আমার কথা কাউকে ব'লো না।' সম্মতি পেয়ে গেলুম। পন্থজী, লালবাহাদুর, কামরাজ—সকলকেই জানালুম। তখন নিয়ম ছিল দশজন প্রতিনিধিকে কংগ্রেস সভাপতির নাম প্রস্তাব করে অল ইণ্ডিয়া

কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে পাঠাতে হত। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে দশজন করে কুড়িজন নিজলিঙ্গাপ্পার নাম প্রস্তাব করে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে জমা দিয়ে দিলুম। তারপরই ভিলাই প্রভৃতি দু-একটি জায়গা ঘোরবার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়ি। তিন দিন বাদে কলকাতা ফেরার পর সকালে ডাঃ রায়ের ফোন পেলুম, 'তুমি আমায় নাগপুর থেকে টেলিফোনে বললে, নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন। কাগজে বেরিয়েছে যে, পশ্চিম বাংলা ছাড়া অন্য সব জায়গা থেকে ইন্দিরার নাম প্রস্তাবিত হয়েছে এবং নিজলিঙ্গাপ্পা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।' আমি তো হতভম্ব। ক'দিনের কাগজ পড়া হয়নি। কাগজে সব পড়ে কামরাজকে ফোন করলুম। তার পরের ঘটনাও খুব চিত্তাকর্ষক।

কামরাজ বললেন, 'তুমি চলে যাবার পর ওয়ার্কিং কমিটির যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আরও কয়েকজন আমরা মিলিত হই।' নাগপুর কংগ্রেসে মোরারজীভাই উপস্থিত ছিলেন না, বোম্বাইয়ে তাঁর তখন অপারেশন হয়েছে। কামরাজের কাছে ও পরে লালবাহাদুর ও জগজীবন রামের মুখে সব ঘটনাই জানতে পারলুম। কামরাজ যে মিটিং-এর কথা বললেন, সেই মিটিং-এ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রথমে জগজীবন রাম নিজলিঙ্গাপ্পার নাম করেন। পরে কামরাজ এবং লালবাহাদুরও নিজলিঙ্গাপ্পার নাম করেন। লালবাহাদুরের পাশে বসেছিলেন কংগ্রেসের তৎকালীন সম্পাদক সত্যনারায়ণ রাজু। রাজু বলেন যে, কংগ্রেসের অল্পবয়স্ক কয়েকজন প্রতিনিধি ইন্দিরাজীর নাম করছিলেন। রাজুর পাশেই বসেছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে জানান, 'না, না, ইন্দিরার এখন হওয়া সম্ভব নয়। ওর শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। এই গুরুদায়িত্ব বহন করা এখন ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল বলে ওঠেন, 'শরীর খারাপ তো বুঝলাম। কিন্তু কংগ্রেস তো রোজ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। তার উপায় কি?' আর দু-একজন অস্ফুট স্বরে নিজলিঙ্গাপ্পার নাম করেন। অনেকক্ষণ আলোচনার পর মোটামুটি সকলেই ধরে নেয় যে, ইন্দিরাই হবেন। সেই রাত্রে এবং তার পরদিন অনেকে নাগপুর ছেড়ে চলে যান। তার এক দিন বাদে একটি prepared statement নিয়ে রাজু কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডী এবং নিজলিঙ্গাপ্পার কাছে গিয়ে হাজির হন। বিবৃতিতে লেখা ছিল যে, ওঁরা তিনজনেই ইন্দিরার নাম প্রস্তাব করছেন এবং আর একটি আলাদা বিবৃতি নিজলিঙ্গাপ্পার নামে ছিল যে, উনি সভাপতির পদপ্রার্থী হবেন না। তিনজনই সই করে দেন এবং কাগজে তা প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে তিনি পুরো 'টার্ম' ছিলেন না। শরীরের জন্যই ছেড়ে দিতে হয়। অন্য কোনো কারণ থাকলে তা আমার অজানা। তারপর সঞ্জীব রেড্ডী সভাপতি হন। পরে অবশ্য নিজলিঙ্গাপ্পা অবিভক্ত কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। সে অনেক পরে। বোধ হয় ১৯৬৮ সালে। তার পিছনেও ইতিহাস আছে। জব্বলপুর অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এর পর কামরাজ পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয় যে, কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সর্বসম্মত নাম স্থির করবেন। তিন-চার দিন বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে আলোচনা হয়। এস কে পাতিলের সঙ্গে আলোচনার সময় পাতিল বলেন যে, নিজলিঙ্গাপ্পা একটি সর্বসম্মত নাম। ব্যস, দুজনেই গভীরভাবে এস কে পাতিলের

প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে নিজলিঙ্গাপ্পা সে সময়ে দিল্লীতে ছিলেন। ওঁকে ডেকে আনা হয় এবং দুজনে অনুরোধ করেন কংগ্রেস সভাপতি হবার জন্য। নিজলিঙ্গাপ্পা চব্বিশ ঘন্টা সময় চেয়ে নেন। রাত্রে আমার কাছে নিজলিঙ্গাপ্পার ফোন এল। নিজলিঙ্গাপ্পা দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি আমাকে পরদিন সকালেই দিল্লী যেতে অনুরোধ জানালেন। আমি সকালে দিল্লী যাবার পথে সংবাদপত্রে পড়লুম যে, কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস সভাপতির পদপ্রার্থী হতে রাজী হয়েছেন। ব্যস্, দিল্লীতে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করলুম। মনে হল, নিজলিঙ্গাপ্পার আর প্রতিবাদ করা উচিত হবে না। নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস সভাপতি হলেন। তার পরের ইতিহাস আধুনিক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডীকে হারাবার জন্য প্রস্তাবক শ্রীমতী ইন্দিরার ষড়যন্ত্র এবং কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়, মোরারজীভাইয়ের কাছ থেকে অশোভনভাবে তাঁর দপ্তর কেড়ে নেওয়া। ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ এবং কংগ্রেসের split। সে সময়ে যাঁরা split করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁরা সেদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে, কংগ্রেস প্রশাসন ভারতবর্ষের কেন্দ্র থেকে অপসারিত হবে এবং অধিকাংশ রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটবে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—কংগ্রেস পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত।

বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস এসেছে ১৮৮৫-তে যাঁরা কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা সেদিন স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখেননি। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময় কংগ্রেস থেকে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। তারপর সুরাটে কংগ্রেস প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়। অ্যানি বেসান্ট হোম রুল-এর প্রস্তাব আনেন। ধীরে ধীরে কিছু কিছু অধিকার পাবার কথাই উঠছিল। ১৯১৭-য় কলকাতায় অ্যানি বেসান্টের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন হয়। আর ১৯২০-তে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে এই কলকাতাতেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তারপরই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। পরে নো-চেঞ্জার, প্রো-চেঞ্জার এবং স্বরাজ্য পার্টি নিয়ে অনেক বিরোধ দেখা দেয়। এবং পরে কোকোনাডায় মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে সব মিটমাট হয়ে যায় এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা স্থির হয়। আবার ১৯২৬-এ গৌহাটিতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে ও ১৯২৭-এ মাদ্রাজে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে ভারতবর্ষের লক্ষ্য স্বাধীনতা বলে স্থির হয়। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে স্থির হয় যে, এক বছরের মধ্যে যদি কয়েকটি বিষয় ছাড়া সব অধিকার ভারতবাসীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সংগে আপস-রফায় প্রস্তুত। ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টার সময় লাহোর কংগ্রেসে জওহরলালের সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপরই ১৯৩০-এ আন্দোলন। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট হয় এবং করাচী কংগ্রেসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেস প্রথম ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের প্রথমেই থাকে:

১। (ক) প্রত্যেক ভারতবাসী স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং যে-কোনো ধর্মাচরণ করতে পারবে।

(খ) বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের এবং সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষিত হবে।

(গ) আইনের চোখে জাতি-ধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান

অধিকার পাবে।

(ঘ) রাস্তা, পুকুর, ইঁদারা, স্কুল এবং সাধারণের জায়গা সকলের ব্যবহার করবার অধিকার থাকবে।

(ঙ) সব ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে।

(চ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সকলে পাবে।

শ্রমনীতি সম্পর্কে, অর্থনীতি সম্পর্কেও এই প্রস্তাবে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। পরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ হয়। এবং ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় (প্রস্তাবক ও সমর্থক জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেল)। স্বাধীনতার পর যখন ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়, তখন করাচী কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবের সারাংশ তাতে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে ১৯৪৮-এ জয়পুরে এ আই সি সি-র অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে 'সোস্যালিজম' শব্দটি স্থান পায়। মধ্যে মধ্যে আরও নানাভাবে 'সোস্যালিজম'-এর কথা ব্যবহৃত হয়েছে। ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম, সোস্যালিস্ট কো-অপারেটিভ—এইসব লক্ষ্য হলেও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পৃথিবীতে এখনও সোস্যালিজম সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। সুইডেনে রাজতন্ত্র আছে, কিন্তু সোস্যালিস্টরা যে শ্রেণীর অর্থনীতির কথা বলে, সুইডেনে সেই শ্রেণীর অর্থনীতি প্রচলিত। কংগ্রেস বরাবর এই মত প্রকাশ করেছে যে, ডেমোক্রেসি এবং সোস্যালিজম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অথচ কত দেশই তো ডেমোক্রেটিক বলে পরিচিত যেখানে এখনও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। সুকর্ণ এক ডেমোক্রেসির কথা বলেছিলেন, আয়ুব খাঁও এক ডেমোক্রেসির কথা বলেন। রুশ দেশের নাম হল ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক; কিন্তু সেখানেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ফিজিসিস্ট সুখারভ, তিনিও অকুণ্ঠভাবে কথা বলতে পারেন না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার জে সি ব্রাউন এ সম্বন্ধে ভাল বলেছেন। তিনি ১৯২০-তে লেখেন—

'One thing at least is obvious. The word has come to mean nothing, or rather it means so much that it means nothing at all. Exactly the same trouble has arisen with other political terms. We all believe in liberty, but very few of us agree as to what liberty is. The word socialist is applied to thousands of people who detest each other's policies and economics, as heartily as they detest capitalism.'

বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আজ কংগ্রেস যেখানে উপস্থিত হয়েছে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—এর ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ যাই হোক, অতীতে কংগ্রেসের সোস্যালিজম সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার ছিল না। সেজন্য যখনই সোস্যালিজম-এর কথা বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতিকে একসঙ্গে ভাবা হয়নি। ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চয়ই অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কেন এই স্বাধীনতা—এই প্রশ্ন যদি সাবলীলভাবে মীমাংসিত না হয় তা হলে সে পলিটিক্যাল পার্টির অস্তিত্ব যদি লোপ পায়, তা হলে পার্টি মেম্বারদের ক্ষতি হতে পারে বটে, কিন্তু দেশের কোনো ক্ষতি হয় না। আমরা মিশ্র অর্থনীতির ওপর এতদিন চলে এসেছি। অথচ অনেক সময় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরাও

মিশ্র অর্থনীতির নিন্দা করে এসেছেন। ভূমি সংক্রান্ত নীতি এখনও অস্পষ্ট। এ ব্যাধি থেকে ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দলই মুক্ত নয়। কম্যুনিস্ট পার্টি, অথবা জনতা দল, অথবা কংগ্রেস—এর মধ্যে কোনো দলই পরিষ্কার করে কাঠা-মোটা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে পারেনি। কাজে-কাজেই, কেবলমাত্র কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ভেবেই ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান হবে না। একটা ভালো কথা অক্সফোর্ড-এর Chichele Professor Sir Isiah Berlin লিখেছেন যে (Two concepts of liberty,1958)—

'The extent of a man's or a people's liberty to choose to live as they desire must be weighted against the claims of many other values, of which equality, or justice, or happiness, or security, or public order are perhaps the most obvious examples. For this reason, it cannot be unlimited. We are rightly reminded by Mr. Tawney that the liberty of the strong, whether their strength is physical or economic, must be restrained. This maxim claims respect, not as a consequence of some a priori rule, whereby the respect for the liberty of one man logically entails respect for the liberty of others like him; but simply because respect for the principles of justice, or shame at gross inequality of treatment, is as basic in men as the desire for liberty. That we cannot have everything is a necessary, not a contingent, truth. Burke's plea for the constant need to compensate, to reconcile, to balance; Mill's plea for novel 'experiments in living with their permanent possibility of error, the knowledge that it is not merely in practice, but in principle, impossible to reach clearcut and certain answers even in an ideal world of wholly good men and wholly clear ideas, may madden those who seek for final solution and single, all-embracing systems, guaranteed to be eternal. Nevertheless, it is a conclusion that cannot be escaped by those who, with Kant, have learnt the truth that out of the crooked timber of humanity no straight thing was ever made.'

কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিজম-এর সর্ব প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জওহরলাল। জওহরলাল ১৯৬৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর লিখেছেনঃ

'What does socialism mean? It means many things. But it must be remembered that this word came to be widely used in Western Europe after the Industrial Revolution. It was in essence a child of that Revolution. It was only when the productive apparatus of society had increased the wealth of a country that the question of distribution became important.

'Socialism means equality. It means equal opportunities for everyone. It means that the methods of production should be owned by the State. But in order to take steps towards introducing a socialist structure of society, it is inevitable that the major

methods of production should be owned or controlled by the State. Otherwise, the old order which we wish to change will continue and all the vested interests of that order will flourish.'

জওহরলাল ডেকে পাঠালেন। যাবার পর বললেন, 'অনেকেই চাইছেন যে, সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। উনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত। তোমার সঙ্গে তো খুব ঘনিষ্ঠতা—তুমি একটু বলে দেখ।' আমি অবশ্য আগেই জানতুম। এবং সুধীদার দ্বিধার কারণও জানতুম। তবু আমরা অনেক অনুরোধ করায় সুধীদা রাজী হলেন। সে সময়ে শান্তিনিকেতনে আমার যাতায়াত একটু বেশী ছিল। আর সুধীদা আমাকে একটু বেশী স্নেহ করতেন।

শান্তিনিকেতনে যাতায়াত আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। যখন ছাত্রছাত্রীরা শুধু-পায়ে থাকতেন এবং নিরামিষ খেয়ে থাকতেন সে অবস্থা দেখেছি, আবার বিশ্বভারতীতে যখন রূপান্তরিত হল তাও দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর মহাত্মা গান্ধী আচার্যপদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডুর কথা বলেন। দুজনেই আচার্য হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রথীবাবু উপাচার্য হন। তারপর সাময়িকভাবে ইন্দিরা দেবী। তারপরে সত্যেন বসু মহাশয়। এই দুজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। এবং ও'রা ডাকলেই যেতুম। রথীবাবু হাতের কাজে অসাধারণ পটু ছিলেন। শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতনে অনেক গাছপালা এবং বাগান করেন। শ্রদ্ধেয় সুরেনবাবুর কথা ও গাছগাছড়া সম্বন্ধে লিখেছি বটে, কিন্তু তাঁর স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার রাষ্ট্রপতিভবনের একটি ঘর সাজালেন মুলী বাঁশ ও কৃষ্ণনগরের পুতুল দিয়ে—অপূর্ব। শান্তিনিকেতনের এই কঙ্করময় ভূমিতে শ্যামলিমা এনে দেওয়ার প্রধান কৃতিত্ব ছিল সন্তোষকুমার মজুমদার, জগদানন্দ রায়, তেজেশচন্দ্র সেন ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। উত্তরায়ণের বাগানটি রথীবাবুরই সৃষ্টি। যেমন সদালাপী তেমনি সুরসিক। মানুষকে আকৃষ্ট করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। সত্যেন্দ্রনাথের কথা তো সবাই জানে। একটা বিষয়ে উনি থাপ খাওয়াতে পারেননি। আম্রকুঞ্জে কনভোকেশন অনুষ্ঠান। একবার উপাচার্যের ভাষণে বলেই ফেলেছিলেন যে, আম্রকুঞ্জে কনভোকেশনের ব্যবস্থা ও'র মনঃপূত নয়। সত্যেন্দ্রনাথের পর সাময়িকভাবে উপাচার্য হন শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর পরই সুধীদা। সুধীদার পর শ্রীমান কালিদাস (ভট্টাচার্য) উপাচার্য হন। কালিদাসের বাবা ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর পরম দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করতেন। ইজন্যে কালিদাস এবং তাঁর দাদা গোপীনাথ দুজনকেই ছেলেবেলা থেকে জানতুম। এই দুই ভাই মনে-প্রাণে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনের সময় গোপীনাথ তাঁর সমগ্র বেতন কংগ্রেসের আন্দো-

লনের জন্য দিয়ে দিতেন। এবং যত দূর মনে পড়ে, বৎসরাধিককাল দিয়েছিলেন। কালিদাস অতি নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও সাদাসিধে মানুষ। কথাবার্তায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ কখনও দেখিনি। বাল্যকাল থেকে এখনও অবধি সমান ভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন। যখন ডঃ বাগচী উপাচার্য হয়েছিলেন, যদিও তাঁকে চিনতুম কিন্তু যাতায়াত বিশেষ ছিল না। অবশ্য প্রতি বছর জওহরলাল আসতেন—সে সময় যেতে হত।

সুধীদা উপাচার্য হবার পর একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমার সঙ্গে সে সময়ে আমার এক নাতনী শান্তিনিকেতনে যেত। তার বয়স তখন দশ-বারো বছর। সে বহুবার গিয়েছে। জওহরলাল যখন ফিরে যেতেন আমরা তখন পানাগড় অবধি তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যেতুম। একবার শান্তিনিকেতন থেকে জওহরলালকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যাবার পথে ভোলা যাবে না এমন একটি ঘটনা ঘটে। গাড়ির পিছনের আসনে ছিলুম আমি, মনু (নাতনী) আর করণ সিং। আর সামনের আসনে ড্রাইভার, তারপর একজন আর খাদিলকর। খাদিলকর তখন বোধ হয় কেন্দ্রের মন্ত্রী। খাদিলকর দু'দিন ধরে মনুকে দেখেছেন। মনু জওহরলালের সঙ্গে গল্প করছে, সকাল-দুপুরে খাবার খাচ্ছে। খাদিলকরের মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু ভরসা করে জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। পানাগড়ের পথে বোলপুর পেরোবার পর খাদিলকর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কে?' আমি সাধারণভাবে উত্তর দিলুম, "আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী।" খাদিলকর আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। তারপর পানাগড় অবধি একেবারেই নির্বাক। করণ সিং আর মনু এটা বুঝতে পারেনি। তারা তখন গানে মশগুল। করণ সিং শোনাচ্ছে তার স্বরচিত গান, আর মনু শোনাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। জওহরলাল প্লেনে উঠবার সময় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এর পরে যখন আসবে তোমার নাতনীকে সঙ্গে করে এনো।' বলে মনুকে আদর করলেন। খাদিলকরের কানে গ্র্যান্ডডটার কথাটা ঢুকেছে। খাদিলকর সুধীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মেয়েটি কে?' সুধীদা বললেন, 'তোমরা একই গাড়ি করে এলে—জান না! অতুল্যর নাতনী।' খাদিলকর আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রাগতস্বরে সুধীদাকে বললেন, 'তবে অতুল্যবাবু যে বললেন—ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী।' সুধীদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তোমরা অবাঙ্গালী, তাই জান না। আমাদের বাঙালীসমাজে নাতনীদের এইরকমই ঠাট্টা-তামাশা করা হয়।' আমার যত দূর মনে হচ্ছে—খাদিলকর বোধ হয় তারপর আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি।

সুধীদার উপর মাঝে মাঝে অনেক অত্যাচার করেছি। একবার বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরিতে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সুধীদার খুবই কষ্ট হয়েছিল। বিশেষ করে ফেরবার সময়। শীতকালে জীপে করে আমরা যখন ওখান থেকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলুম তখন সুধীদাকে কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জীপে বউদিও ছিলেন। আমার মুখ-চোখ দেখে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। সুধীদা বললেন, 'ওহে, মাঝে মাঝে এইরকম যাতায়াত করি বলে এখনও যে বেঁচে আমি বুঝতে পারি।' নানাভাবে সুধীদাকে দেখেছি। ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতিরূপে, প্রতাপ সিং কায়রোঁ সম্পর্কে যে কমিশন বসে তার সভাপতিরূপে, বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে, আবার কালিম্পং-এও তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটিয়েছি। লোককে আপন করে নেবার অদ্ভুত শক্তি ছিল। ওঁর ছেলেদের চিনতুম না। মেয়েকে আর

জামাইকে চিনি। জামাইয়ের পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। অশোক (সেন) ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান ব্যবহারজীবীদের মধ্যে অন্যতম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিরূপে পার্লামেন্টে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়েছে তার প্রত্যেকটি সারগর্ভ ও শ্রুতিমধুর। মেয়ে কাজল শিক্ষিতা, বিনয়নম্র এবং সপ্রতিভ। নিজে পড়াশুনা কম করেনি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং থাকে অতি সাধারণভাবে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংশিলষ্ট অথবা এককালীন ছাত্র এমন কয়েকজনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ হয়েছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও পণ্ডিত আমার পরম বন্ধু প্রমথনাথ বিশী এবং তাঁর পাঠদ্দশার বন্ধু উড়িষ্যার শ্রীমতী মালতী চৌধুরী। দুজনের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয় ওঁরা মাসীবিশী বলে অভিহিত হতেন। প্রমথবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। সর্ব ব্যাপারে সাহায্য করে এসেছেন। আমি যখন কংগ্রেসে ছিলুম, যেভাবে সাহায্য করে এসেছেন, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর একজন হলেন শ্রীকানাইলাল সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি স্তম্ভ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা প্রচণ্ড তার দ্বেষ'—এটা বোধ হয় পুরোপুরি কানাইলালের সম্পর্কেই খাটে। অহেতুক ক্রোধ এবং উত্তেজনা এবং পর মুহূর্তেই যার উপরে ক্রোধ তার কল্যাণসাধনে যে-কোনও কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত—এমন লোক জীবনে খুবই কম দেখেছি।

সুরেন কর মশাইয়ের সঙ্গে নান্নুরে গিয়েছিলুম। সেখানকার সকলের ধারণা যে, চণ্ডীদাস নান্নুরের। এ নিয়ে অনেক পণ্ডিত গবেষণা করে গিয়েছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করে গিয়েছেন। এ ভার আমি পণ্ডিতদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের আনন্দ—চণ্ডীদাস বলে কবি ছিলেন। এবং ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ তাঁকে উড়িয়ে দেননি। বিলাতে মহাসমারোহে এখনও গবেষণা চলছে যে, শেক্সপীয়র বলে কেউ ছিলেন কি না। চণ্ডীদাস সম্পর্কে সে বিতর্কে আমাদের পড়তে হয়নি। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নান্নুরেও রামীর কাপড় কাচার পাথর, বাশুলীর মন্দির এবং চণ্ডীদাসের ভিটে দেখেছি। ছাতনাতেও বাশুলীর মন্দির, রামীর কাপড় কাচার পাথর এবং চণ্ডীদাসের ভিটে দেখেছি। ওঁরা কে কোথায় ছিলেন, কে কোথায় জন্মেছিলেন, তা জানি না। কিন্তু বাঙালী এখনও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে চণ্ডীদাসের নামে রচিত গান—মান, মাথুর, নৌকাখণ্ড শুনে আনন্দ উপভোগ করে।

কানুর পিরিতি বড়ই বিষম
ছাড়িলে না যায় ছাড়া।
আমি সে ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ দুখ হয়েছে বাড়া॥

এই গান যখন কীর্তনের সঙ্গে হয় তখন তা বাঙালীর ভোলা শক্ত। আবার মানভঞ্জনের কতরকম পদ। দেয়াসিনী, নাপিতানী, যোগিনী—যতদিন বাংলা দেশে বাংলা ভাষা ও কীর্তন থাকবে ততদিন এইসব পদাবলী বাঙালী ভুলবে বলে মনে হয় না।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—বীরভূমের এক প্রান্তে বসে জয়দেব মানভঞ্জনের পুঁথি রচনা করলেন, আর এক দিকে নান্নুরে চণ্ডীদাস। সেখানেও সেই মানভঞ্জন পালা। মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। ঘটল কি করে এই ঘটনা! বীরভূমে নানা মত ও সাধনা হয়েছে। কিন্তু সে-সবই প্রায় স্থানীয়। চণ্ডীদাস বাংলাদেশে

মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও জয়দেব সারা ভারতবর্ষে। আর মাঝে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। এ একটা অপূর্ব সংঘটন। অনেকে অনেক বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু বীরভূমে যে ঘটনা ঘটেছে তাঁর বিশ্লেষণ এখনও বেশী শোনা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি কেউ বলেন তিনি বীরভূমের নয়, তবে তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বলা চলবে—তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের স্থায়ী ঠিকানা ছিল বীরভূম।

১৯৬৭-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভার সব আসনের ফলাফল বার হবার আগেই বোঝা যায় যে, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে না। সেই দিনই আরামবাগের ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে প্রফুল্লদা জানিয়ে দেন যে, তিনি পরাজিত হবার জন্য পদত্যাগ করছেন। রাত্রে কংগ্রেস ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রফুল্লদা ফোনে কথা বলেন। সেই রাত্রেই কংগ্রেস ভবনে আমি, প্রফুল্লদা, বিজয়ানন্দ, অশোক (সেন), সিদ্ধার্থশংকর (রায়), শৈল মুখার্জী, রবীন্দ্রলাল সিংহ ও বদু মিলিত হই। দীর্ঘকাল আলোচনার পর স্থির হয়—যেহেতু কংগ্রেসের বিধানসভায় সংখ্যাধিক্য হয়নি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করবার চেষ্টা করব না। একটি বিবৃতিরও খসড়া করা হয়। বিবৃতিটি প্রফুল্লদা সমেত সকলে অনুমোদন করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বদুর নামে পরদিন সকালে সংবাদপত্রে বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। 'প্রদেশ কংগ্রেস জনতার রায় মেনে নিচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত রীতি অনুসারে বৃহত্তম দল হিসাবে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পায়নি; তাই কংগ্রেস সদস্যরা বিরোধী দলের ভূমিকাই গ্রহণ করতে চান।'

পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী খবর পেলুম যে, প্রফুল্লদার বাড়িতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, অজয়দাকে (মুখোপাধ্যায়) অনুরোধ করা হবে যে, কংগ্রেস দলের সহযোগিতায় তিনি যেন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অজয়দাকে জানানোর ভার দেওয়া হয় ব্যোমকেশকে (মজুমদার)। পরে জানতে পারি যে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সংবাদটি শুনেই অনেকে বিস্মিত হন। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট থেকে ক্ষমতায় থাকার ফলে কংগ্রেসের বেশিরভাগ লোক এখন সরকারের বাইরে থাকতে চাইছেন না। গণতন্ত্রে জয়-পরাজয় আছে। মুখে আমরা গণতন্ত্রের কথা বললেও পরাজয়কে স্বীকার করতে মন কুণ্ঠিত হচ্ছিল। এই সময় আমার সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়। আমি অনেকের সমর্থন পেয়েছিলুম যে, কংগ্রেসের বাইরে অন্যান্য দল যাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। গণতন্ত্রে বিরোধীর ভূমিকাও যথেষ্ট সম্মানজনক। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারলুম, আমার

মতের সমর্থক মুষ্টিমেয়। ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠন হবার পরও যখন সেটা ভাঙবার চেষ্টা জোরদার হয়ে ওঠে তখন আমি কাগজে বিবৃতি দিয়ে এই চেষ্টা বন্ধ করতে চেয়েছিলুম। আমার ধারণা ছিল, কংগ্রেস যখন ২৮০-র মধ্যে ১২৭টি আসন পেয়েছে, অন্য কোনও দলই ৫০টি আসনও পায়নি, তখন মন্ত্রিসভা টিকতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস যখন গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও গণতন্ত্র বিশ্বাস করে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইউনাইটেড ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙার চেষ্টা করা অনুচিত। এখানে ১৯৬৭-র নির্বাচনের ফল দিচ্ছি।

মোট আসন—২৮০

কংগ্রেস	১২৭
সি পি আই (এম)	৪৪
সি পি আই	১৬
ফরওয়ার্ড ব্লক	১৩
বাংলা কংগ্রেস	৩৪
পি এস পি	৭
এস এস পি	৭
আর এস পি	৬
এস ইউ সি	৪
লোকসেবক সংঘ	৫
গোরখা লিগ্	২
ওয়ার্কার্স পার্টি	২
জনসংঘ	১
স্বতন্ত্র	১
মাঃ ফঃ ব্লক	১
নির্দল	১০
	২৮০

ফলাফল অনুসরণ করলে বোঝা যাবে যে, আর মাত্র ১৪টি আসন পেলেই কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হত। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেসের ৩৪টি আসনের সব ক'টিই যদি কংগ্রেস মতাবলম্বী বলে ধরে না নেওয়া হয়, তা হলেও বাংলা কংগ্রেস না দাঁড়ালে ৩৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ২০-২২টি আসন হত, স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা যায়। এই অবস্থায় কংগ্রেস যদি ফ্রন্ট ভাঙবার চেষ্টা না করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট মন্ত্রিত্বের সময় ঠিকভাবে বিরোধী দলরূপে কাজ করত, তা হলে আমার মনে হয়, কংগ্রেসের শক্তি আরও অনেক বাড়ত।

কম্যুনিস্টদের যে শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগেকার নির্বাচনের ফলাফল দেখলেই বোঝা যাবে যে, ১৯৬৭ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেক শক্তি বেড়েছে।

১৯৫২ : মোট আসন	২৩৮
কংগ্রেস	১৫১
কম্যুনিস্ট	২৮
১৯৫৭ : মোট আসন	২৫২
কংগ্রেস	১৫২

কম্যুনিস্ট	৪৬
১৯৬২ ঃ মোট আসন	২৫২
কংগ্রেস	১৫৭
কম্যুনিস্ট	৫০
১৯৬৭ ঃ মোট আসন	২৮০
কংগ্রেস	১২৭
সি পি আই (এম)	৪৪
সি পি আই	১৬

সব দিক দিয়েই বোঝা যায় যে, যারা বিরোধী পক্ষ বলে পরিচিত ছিল তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আমবা বহুদিন ক্ষমতায় থেকে গণতন্ত্রের মূল আদর্শবোধ হারিয়ে ফেলেছিলুম। এজন্য টাকার খেলা এবং আনুষংগিক কুকর্ম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরম্ভ করা হয়—যাতে ইউনাইটেড ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেংগে যায়। আপাতদৃষ্টিতে কার্যসিদ্ধি হয়েছিল। ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন এম এল এ বেরিয়ে আসেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতায় ডঃ ঘোষের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। আমি কংগ্রেস ভবনে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যেদিন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তার আগের দিন সিদ্ধার্থ আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমাকে জানাল যে, প্রফুল্লদা, বিজয়বাবু, খগেনবাবু, প্রতাপ, ফজলুর রহমান, শৈলবাবু, রবিবাবু, আরও অনেকে কংগ্রেস ভবনে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। একবার আমাকে যেতেই হবে। এতগুলি সহকর্মী ও বয়স্ক লোকের ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। অন্যায় করছি জেনেও আমি যাই। সেখানে সকলের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়—ডঃ ঘোষ যখন মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে এসেছেন তখন তাঁর সংগে সহযোগিতা না করলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এবং তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কে কে মন্ত্রী হবেন তা ঠিক করার ভার আমায় দেন। আমি তখন মনের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাঁদের কথা মেনে নিয়ে আমি কংগ্রেস পক্ষ থেকে ৬ জনের নাম করি। এবং সংগে সংগেই বলি যে, ডঃ ঘোষ যতজন নেবেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও মতামত দেওয়া উচিত নয়। খগেনবাবু কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা—তাঁর নাম করলুম। দু'জন ডেপুটি লিডার—শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ও শ্রীবিজয়সিং নাহার। কংগ্রেস পরিষদ দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তপসিলভুক্তদের মধ্য থেকে ডঃ বিনোদবিহারী মাঝি ও মুসলমানদের মধ্যে আবদুস সাত্তার। সেদিন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই এমন ভাব দেখালেন যে, আমার কথা সকলেরই মনঃপূত হয়েছে।

কংগ্রেস থেকে ৬টি নাম ডঃ ঘোষের কাছে চলে গেল। পুরো মন্ত্রিসভা গঠিত হল। তারপরই আবার খেলা আরম্ভ হল। আমার অনুপস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভায় আলোচনা হয়—যেহেতু কংগ্রেস দল এখন নিজেরাই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে, অতএব কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক। আমি দিল্লীতে সংবাদপত্রে এই খবর পড়ে কলকাতায় এসে এক বিবৃতি দিই—যদি কোনও কংগ্রেস এম এল এ ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা সমর্থন না করেন তবে তাঁর কংগ্রেসে জায়গা নেই। সাময়িকভাবে আলোচনা বন্ধ হল বটে, কিন্তু তখন বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। কংগ্রেস পক্ষের এম এল এ এবং এম এল সি-দের মধ্যে যাঁরা মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখতে

লাগলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এইসব মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদারদের বেশ ভালো করেই উৎসাহ দিতে থাকেন। একবার কলকাতা থেকে সতেরজন না কুড়িজন, ঠিক মনে নেই, দিল্লী গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। আর এ ব্যাপারে টাকার তো অভাব হয় না। কোনও কোনও শিল্পপতি টাকার থলি খুলে দিয়েছিলেন। যে ক'জন এম এল এ এবং এম এল সি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা তো ভালই ছিল, আর তাছাড়া প্রত্যেকের জন্য একখানা করে গাড়ি। সে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। দু-একটি সংবাদপত্র এই ষড়যন্ত্রে বেশ শক্তি দিচ্ছিলেন। এবং অনেকেই তখন তৎপর হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস দলের এম এল এ এবং এম এল সি-দের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। ব্যাপারটা যখন ঘোরালো হয়ে উঠলো এবং নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারলেন যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা কংগ্রেস সদস্যদের অপচেষ্টার ফলে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, তখন দিল্লীতে সরাসরি জানানো হয় যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক। প্রধান-মন্ত্রীও স্থির করে রেখেছিলেন যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মন্ত্রিসভাকে না জানিয়েই রাষ্ট্রপতি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেবেন। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বাতিল করার আগেই আমরা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিই। যেদিন প্রধানমন্ত্রীকে এই সংবাদ দেওয়া হয় তার পরদিন রাষ্ট্রপতির কলকাতায় আসবার কথা। আসবার আগে তিনি দিল্লীতে মন্ত্রিসভা বাতিল করে আসবেন। আমরা ঘোরতর আপত্তি করি এবং প্রধানমন্ত্রীকে জানাই যে, যদি এ কাজ করা হয় তা হলে তাঁর পরামর্শে এবং উৎসাহে ডঃ ঘোষ ইউনাইটেড ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন—এর বিশদ বিবরণ আমরা সংবাদপত্রে দিয়ে দেব। ডঃ ঘোষ তখন দিল্লীতে। অনেক বাদানুবাদের পর রাত একটায় স্থির হয় যে, ডঃ ঘোষ সকালে দিল্লী থেকে কলকাতায় আসবেন এবং ক্যাবিনেট মিটিং করে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘোষণা করবেন। এবং তারপর রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘোষণা প্রকাশ করবেন। সেই রাত্রেই ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে ফোন করে তার পরদিন সকালে ক্যাবিনেট মিটিং ডাকার নির্দেশ ডঃ ঘোষ দেন।

সকালে যথারীতি ডঃ ঘোষ দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ক্যাবিনেট মিটিং-এ যান। সেখানে মন্ত্রীদের বিশদভাবে সব জানান এবং তারপর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘোষিত হয়। পরে অবশ্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণা জারি হয়।

পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার চক্রান্ত করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়া সমর্থন করেননি। এই ভাঙ্গার ব্যাপারে প্রফুল্লদার সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার যোগাযোগ ও সমর্থন ছিল। এর বিশদ বিবরণ অনেক সাংবাদিকের লেখায় বেরিয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণ ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কংগ্রেস পায় মোট পঞ্চান্নটি আসন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় ১৯৫২ সালে কংগ্রেস সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ছিল না বললেই হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্য ডঃ ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির প্রথম সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে কংগ্রেস ছেড়ে দেন। অনেক প্রবীণ নেতা ও কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনের কাজে কোনও সহায়তা করেননি। প্রফুল্ল-চন্দ্র সেন প্রমুখ সাতজন মন্ত্রী হেরে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ২৩৮-এর

মধ্যে ১৫১টি আসন পেয়েছিল। সেইজন্যই ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের ফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস ভাগের পর ১৯৭১ সালে কংগ্রেস পায় ১০৫ ও ১৯৭২ সালে ২১৬। কিন্তু ২১৬টি আসন নিয়েও কংগ্রেস দল নিজেদের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারেনি। কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য হলেই প্রতিষ্ঠানের শক্তি বাড়ে না। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তা প্রমাণ হয়েছে।
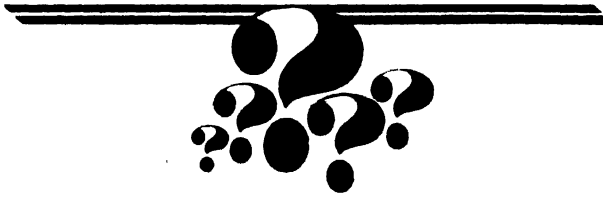
'একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভালো হয়।'

'কখন এবং কোথায়?'

'চারটের সময় আমার বাড়িতে।'

আমি সভয়ে বললুম, 'চারটের সময় তো আপনি পার্লামেন্টে থাকেন, বাড়িতে গিয়ে কি করবো?'

একটু হেসে উত্তর হলঃ 'ভোর চারটেয় তো পার্লামেন্ট হয় না!'

আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলুম। দিল্লীতে শীতকালে রাত চারটের সময় কারুর বাড়ি যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমরা পূর্বাঞ্চলের লোক—দিল্লীর এই শুকনো ঠান্ডা আমাদের পক্ষে অসহ্য। ভোর চারটেয় যাওয়া অসম্ভব।'

একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

আমি নিশ্চিন্ত হলুম যে, পরে একসময় দিন ঠিক করে দেখা করলেই হবে।

পরের দিন ভোর চারটের সময় একটা গাড়ির হর্ন ক্রমাগত শুনতে পেলাম আমার বাড়ির দরজায়। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। আশেপাশের বাড়িরও সেই অবস্থা। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির দরজা না খুলে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি একটা প্রকান্ড গাড়ি আর তার ড্রাইভার আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার একটু হেসে বললে, 'আপনার জন্য সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

আমি তো হতবাক্। একটু সামলে নিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, যাচ্ছি। দাঁড়াও।' তারপর যতগুলো পারি শীতবস্ত্র চাপিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। তাতে কি দিল্লীর শীত মানে? মনে বিরক্তি আর রাগ দুই-ই।

ড্রাইভার বাড়িতে নিয়ে সঙ্গে করে একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। গিয়ে দেখি, মাথায় একটা টুপি: আর একটা ইলেকট্রিক স্টোভে কফি তৈরি করছেন। একটু হেসে বললেন, 'খুব রাগ হয়েছে তো? একটু কফি খেলেই শরীর গরম হয়ে যাবে।' মানুষটি এমন যে, রাগ করে থাকা যায় না। ইনি শ্রীরফি আহমেদ কিদোয়াই। লোকে ওঁকে আদর করে বলত রফি সাহেব। ওঁর সঙ্গে যারা ঘুরতো তাদের বলতো Rafian। অদ্ভুত মানুষ। কখন কি করবেন, বোঝা যেত না। অথচ মনটা একান্ত স্নেহে ভরা। অসাম্প্রদায়িক যতজন আমি দেখেছি

তাঁদের প্রথম সারির একজন। মতিলাল নেহরুর সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সময়ে লোকসমাজে পরিচয়। জওহরলাল নেহরুর বোধ হয় সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। আচার্য কৃপালনী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কংগ্রেস ছেড়ে যখন 'কে এম পি পি' দল গড়েন, উনিও কংগ্রেস ও মন্ত্রিসভা ছেড়ে ঐ দলে যোগদান করেন। তারপর জওহরলাল অনেক চেষ্টা করে ফিরিয়ে আনেন এবং উনি পুনরায় মন্ত্রী হন। কলকাতায় যখনই আসতেন, আমার সঙ্গে দেখা হতো। বেশ হেসে হেসে বলতেন, 'তোমার বিরুদ্ধে অনেক লোককে তৈরি করছি।' তারপর একে একে নামগুলি বলে যেতেন। আমার বিরুদ্ধে যারা বলতো তাদের প্রচুর উৎসাহ দিতেন এবং সব সময়ই তারা আশ্বাস পেতো দিল্লীতে তারা যাতে সমর্থন পায় তার ব্যবস্থা করবেন। আমাকে বলতেন, 'সব জায়গায়ই গোলমাল, এখানেই থাকবে না কেন?' আবার যদি কোনও সময় কোনও অসুবিধার জন্য ওঁর কাছে হাজির হতুম তা হলে একান্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতেন, আর অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করতেন। প্রায়ই লোকের কাছ থেকে ঘড়ি, কলম নিতেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেগুলি অপরের কাছে চলে যেতো। জীবনযাত্রা ছিল যেমন অনাড়ম্বর, তেমনি সরল। সময়ে সময়ে বহু সমস্যারও সৃষ্টি করতেন। আমরা সমস্যা নিয়ে জর্জরিত হতুম আর উনি মজা উপভোগ করতেন।

একবার খুব বিপদে ফেলেছিলেন। সে সময়ে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলন হত। উনি বারাসতে যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়, তার সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের প্রাথমিক কাজের পর ডাঃ রায় তাঁর ভাষণ দিতে উঠতেই উনি আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'এবারে আমি ঘন্টা বাজিয়ে দেবো। পাঁচ মিনিটের বেশী বক্তৃতা দিতে দেবো না।' আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললাম, 'এ কাজ করবেন না। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার লোক এসেছে এখানে—দর্শক। সকলেই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হবে।' উনি বললেন, 'ডাক্তার রায়ের ওপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ জীবনে পাইনি। আমি সভাপতি। একবার কর্তৃত্বটা দেখিয়ে দিই।' আমি বিপদ এড়াবার জন্য ডাঃ রায় যেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেখানে গিয়ে বললুম, 'একটা ঘোষণা আছে। খুব জরুরী।' আমি মাইকে ঘোষণা করলুম, 'আমাদের সম্মেলনের সভাপতি রফি সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি সম্মেলনের স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন। ওঁর নির্দেশ-মতো উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী সভাপতিত্ব করবেন।' এ ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। ডাঃ রায়ের বক্তৃতা বন্ধ করে দিলে সম্মেলন ভেঙ্গে যেতো। অবশ্য পরে যখন প্রকাশ পায় তখন ডাঃ রায়ের কাছে যা ধমক খেয়েছি তা আমার জীবদ্দশায় ভুলতে পারবো না। তিনি কিদোয়াইকে ঐভাবে সরিয়ে দেওয়াটাই দেখেছিলেন, আমরা যে কি বিপদে পড়েছিলাম তা বুঝতে পারেননি।

সে সময় প্রায় প্রতি বছরই প্রাদেশিক সম্মেলন হত। হাওড়ায় সম্মেলন হয়েছিল বোধ হয় ১৯৫১-তে। সঙ্গের প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কখনও যুক্ত হননি, কিন্তু আমার মনে হয় যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব যদি একটু কম অসহিষ্ণু হতেন তা হলে তাঁকে হয়তো পুরোপুরি কংগ্রেসে পাওয়া যেত। সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগজীবন রাম। সিমলায় যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে (স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু পূর্বে) আলোচনা হয় তখন তফসিলী জাতিদের মধ্য থেকে মন্ত্রী বাছাই নিয়ে বিহার থেকে নাম যায় জগজীবন রামের, পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাধানাথ দাসের, আর মাদ্রাজ থেকে নাম

এসেছিল বোধ হয় মুন্নিস্বামীর। অবশ্য জগজীবন রামই মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হন। কেন্দ্রের মন্ত্রীদের মধ্যে সুদক্ষ প্রশাসকরূপে যাঁদের নাম হয়েছে জগজীবন রাম তাঁদের মধ্যে প্রধানতম।

বর্ধমান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব। এঁর জীবনে অনেক উত্থানপতন হয়েছে। স্বাধীনতার আগে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব। তারপরই আবার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী প্যার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। আগে নাম ছিল জেনারেল সেক্রেটারী। উনি হবার পরই ঐ পদ অভিহিত হল সেক্রেটারী জেনারেল নামে। ১৯৫২-র নির্বাচনে উড়িষ্যায় কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য হয়নি। '৫৭-তেও তাই। কিন্তু ওঁর নিপুণতা ও কার্যকুশলতায় কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ওখানে যখন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হয়, তখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। আবার এই পরিণত বয়সেও ১৯৭৫-এ ২৬শে জুন এমারজেন্সী ঘোষিত হবার পর গ্রেপ্তার হন ও কয়েক মাস জেলে কাটাতে হয়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভাপতিত্ব করেন এস কে পাতিল। উদ্বোধন করেছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। যখন সিণ্ডিকেট গঠন করা এবং সে ব্যাপারে অপপ্রচার শুরু হয় তখন পাতিলের নাম, কামরাজের নাম ও আমার নাম একত্রে যুক্ত করা হয়। পাতিল ছিলেন একজন অপূর্ব সংগঠক। একসময় ছিল যখন কোনও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মধ্যে গণ্ডগোল হলে অথবা কোথাও নির্বাচনী প্রচার দুরূহ হলে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পাতিলকে পাঠানো হত। এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করতেন। বহু বছর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সে সময়ে পন্থজী ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সম্মেলনের পর সন্ধ্যায় উনি সারভিস প্লেনে দিল্লী ফিরে যাবেন। প্লেন ছাড়বার আধ ঘন্টা আগে আমরা দমদমে এসে উপস্থিত হলুম। ওঁর একান্ত সচিব জানকী খোঁজখবর নিয়ে এসে বললে, একটু যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে, প্লেন ছাড়তে মিনিট পনরো দেরি হবে। যখন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল তখনও সেই একই কথা—আর পনরো মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমরা একটু উদ্বিগ্ন হলুম। জানকী একজন অফিসারের খোঁজে গেল। দেখা গেল খবরাখবর দিতে পারে এমন ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মধ্যে একজনও দমদম বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত নেই। পন্থজীকে অনেক অনুরোধ করে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল। পরের দিন স্পেশাল প্লেনে গেলেন। এখন যখন সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনি, তখন সেইসব দিনের কথা মনে হয়। গোবিন্দবল্লভের মতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দমদম এয়ারপোর্টে উপস্থিত। বিমান চলাচলমন্ত্রী এস কে পাতিল কলকাতায় হাজির। তা সত্ত্বেও দমদম এয়ারপোর্টে দায়িত্বশীল অফিসারেরা সকলেই অনুপস্থিত।

বিডন স্কোয়ারে (বর্তমান নাম রবীন্দ্র কানন) সভাপতি ছিলেন সুচেতা কৃপালনী; আর উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধী। সেই সম্মেলন পণ্ড করবার জন্য প্রায় দক্ষযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল। আদালতের কাঠগড়ায় কয়েকজন কংগ্রেসসেবীকে দাঁড়াতেও হয়। পরে প্রকাশ পায়, দুষ্কৃতিকারীরা উৎসাহ পেয়েছিল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে।

মালদার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লালবাহাদুর। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডেবরভাই। বিশালত্বে সে সম্মেলন মনে রাখার মত।

সেই সম্মেলনে উপস্থিত হবার পর বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটে। লালবাহাদুর, ডেবরভাই, আমি ও আরো অনেকে বিশেষ প্লেনে দমদম থেকে বালুরঘাট নেমে বাহাত্তর মাইল দূরে মালদায় যাই। যাবার পথে অগণিত তোরণ আর অজস্র সংবর্ধনা। মধ্যে এক জায়গায় থেমে আমরা আহারাদি শেষ করলাম। ডেবরভাই সেখানে স্নানাদি সম্পন্ন করেন। মালদায় উপস্থিত হয়ে স্নান-টান করবার পর লালবাহাদুর, আমি, ডেবরভাই সব এক জায়গায় বসে আলোচনা হচ্ছিল। লালবাহাদুর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'অতুল্যবাবু, তুমি কি করেছ? আমি তো আমার কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছি।' আমি তো একটু বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে চাইলাম; তারপরই মনে পড়লো মাস কয়েক আগে ডেবরভাই কংগ্রেস সভাপতি-রূপে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস-কর্মীদের দুখানা কাপড় আর দুটি জামা হলেই চলে। আমি আর লালবাহাদুর মালদায় এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলাম। ডেবরভাই তো পথিমধ্যে একবার করেছেন, তাঁর তো আর কাপড় থাকার কথা নয়। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ডেবরভাই একটু বিব্রত বোধ করলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি তো ট্যুরের সময়ের কথা বলিনি।' আমি সবিনয়ে বললুম, 'প্রেসিডেন্ট মশাই, আমরা তো প্লেনে আর মোটরে এলুম, অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীরা তো পায়ে হেঁটে ঘোরে। আমাদের যদি দু'খানার বেশী লাগে তা হলে তো যারা পায়ে হেঁটে ঘোরে তাদের তো আরো বেশী লাগা উচিত।' ঘরে একটা নিস্তব্ধতার আবহাওয়া নেমে এল। তারপরই তিনজনে হেসে উঠলুম। এই মালদা সম্মেলনে কংগ্রেস সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনীত হয়। কংগ্রেস সংস্কৃতি পরিষদ যখন গঠিত হয়, তখন প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে একটা ঝড় উঠেছিল। কংগ্রেস ভবনের মধ্যে নাচ, গান, থিয়েটারের রিহার্সাল—এ তো অসহ্য। অনেকের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। কয়েকজন গিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে অভিযোগ করে। ডাঃ রায় খুব হেসে বলে উঠলেন, 'ভালোই তো হল। বিনা পয়সায় আমরা নাচ, গান, থিয়েটার শুনতে পাবো।' অদম্য সাহসী যাঁরা তারা দিল্লী অবধি গিয়েছিল। জওহরলাল সব জেনে-শুনে বলেন, 'এবারে যখন কলকাতা যাবো তখন গুরুদেবের একটা নাটক দেখা যাবে।' যাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন তাঁরা এই সব 'অধার্মিক' কথা নেতাদের মুখে শুনে খুবই ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েন। আমরা অবশ্য অন্য অসুবিধার জন্য পরে অন্যত্র রিহার্সালের ব্যবস্থা করেছিলাম।

দীঘা সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লালবাহাদুর, উদ্বোধন করেন জওহরলাল। সেখানেও একটা ঘটনা ঘটে। সম্মেলনের বিরতির মাঝে আমরা কয়েকজন তাস খেলতাম। সব সম্মেলনেই আমরা খেলেছি। প্রফুল্লদা, আমি, বিজয় নাহার, রবি শিকদার, রবি সিংহি ও আরো অনেকে। সময় পেলেই আমরা তাসে বসে যেতাম। আমাদের ম্লেচ্ছাচার কর্মীদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। দীঘায় আমি, প্রফুল্লদা, বিজু (পট্টনায়ক), বিজয় নাহার—আমরা তাস খেলছিলাম। একজন আদর্শবাদী গিয়ে সম্মেলনের সভাপতি লালবাহাদুরের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাস খেলে সম্মেলনের আবহাওয়াকে আমরা অপবিত্র করছি। লালবাহাদুর কাঁচুমাচু মুখ করে জানান যে, তিনি তো তাস খেলতে জানেন না, কিন্তু গিয়ে দেখতে পারেন। পরে লালবাহাদুরের কাছে শুনেছি তাঁর উত্তর শুনে অভিযোগকারীর প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হয়েছিল।

রাত প্রায় বারোটা বাজে। আমার দিল্লীর বাড়ির বাইরের ঘরে আমরা দু'জন বসে আছি। এমন সময় ডাঃ রায় এলেন। মুখটা গম্ভীর। পরে বুঝলাম ওটা কপট গাম্ভীর্য। গম্ভীরভাবে কামরাজকে বললেন, 'ওহে হল না। জওহরলাল বললেন, ক্ষমতা আর দায়িত্ব একসঙ্গে থাকা উচিত। আমরাও তাই মনে করি।' আমরা একটু হতাশ হলাম। আমরা মানে আমি আর কামরাজ। কামরাজ মাদ্রাজ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেত নির্বাচিত হয়েছেন। ও'র মুখ্যমন্ত্রী হবার একটুও ইচ্ছা নেই। আমরা সেইজন্য ডাঃ রায়কে উকিল ধরেছিলাম—যাতে নেতা একজন থাকবে, আর একজন মুখ্যমন্ত্রী হবে। পূর্বের নজিরও ছিল। অন্ধ্রে একবার হয়েছিল। দেখা গেল, যাঁদের উকিল ধরা হয়েছিল তাঁদেরও মত ছিল না। কামরাজ সাত বছরের কিছু বেশী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তারপর 'কামরাজ প্ল্যান' অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়েন।

কৃষ্ণস্বামী কামরাজ নাদারের মত লোক সাধারণত দেখা যায় না। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান কম ছিল। অপরে বললে বুঝতে পারতেন, কিন্তু নিজে বলতেন না। গরীবের ঘরের ছেলে। ও'দের সম্প্রদায়ের পেশা ছিল তাড়ি (Toddy) তৈরি করা। দীর্ঘাকৃতি মানুষ। গা কুচকুচে কালো। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সংগঠনশক্তি। বাল্যকালে সত্যমূর্তির অনুগামী ছিলেন, শিষ্য বললেও চলে। সত্যমূর্তির তখন খুব নাম। পেশায় সিনিয়র অ্যাডভোকেট। কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। অসাধারণ বাগ্মী। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির সেক্রেটারী ও পরে ডেপুটি লীডার হয়েছিলেন। ও'র বক্তৃতার সময় সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীর হল দর্শকে ভরতি হয়ে যেতো। তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। স্বরাজ্য পার্টি হবার পর সে সম্বন্ধে প্রচারের জন্য বিলাত যান। তখন 'মোশন পিকচার' এত জনপ্রিয় ছিল না। সেই অবস্থাতেও দাক্ষিণে দুটি মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ও'র মৃত্যু হয়েছিল শোচনীয়ভাবে। বোম্বাইতে এ আই সি সি মিটিং-এ 'আগস্ট প্রস্তাব' পাস হবার পর উনি সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গ্রেপ্তার হন। ও'র স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। নাগপুর থেকে ও'কে একটি ঝরঝরে বাসে ছিয়ানব্বই মাইল দূরে অমরাবতী জেলে পাঠানো হয়। অন্য খাদ্য দূরে থাক, এই ছিয়ানব্বই মাইল পথের মধ্যে এক গেলাস পানীয় জলও পাননি। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য জেল থেকে মুক্তি পান এবং কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়। এই অসাধারণ মানুষটির কাছেই কামরাজ রাজনীতির তালিম নেন। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে কামরাজ তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস ভাগ হবার আগে পর্যন্ত অবিভক্ত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক কালে আর একজনও কামরাজের মতো নেতা নেই। অতি

গরীবের ঘরে জন্মে ইংরাজী না জানা সত্ত্বেও কামরাজ অত বড়ো নেতা হতে পেরেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছে কামরাজের নিজের গুণে। মাদ্রাজে রাজাজীর তখন খুব প্রতিপত্তি। কামরাজের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হতো না। সেইজন্য জওহরলালেরও তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন না।

'কামরাজ প্ল্যান' উপলক্ষ করে কামরাজের নাম ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু এই 'প্ল্যান' কার্যকরী হবার ফলে ধীরে ধীরে কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। একান্ত খামখেয়ালীভাবে বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্ল্যানটি সমর্থন করেছিলেন, আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই রকমভাবে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও মন্ত্রিত্ব ছেড়ে আসার কোনও অর্থ হয় না। বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের অভিজ্ঞ নেতারা সংগঠনের কাজ করবেন বলে ছেড়ে যাচ্ছেন। যাঁরা ছেড়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁদের মধ্যে সংগঠনের ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। যেমন পশ্চিম বাংলার শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উড়িষ্যার বিজু পট্টনায়ক, কেন্দ্রের ডাঃ শ্রীমালী। আর বেশী নাম দেবার প্রয়োজন নেই। জনসাধারণ এটা গ্রহণ করেননি। মাদ্রাজের কথাই ধরা যাক্। যাঁর নামে 'কামরাজ প্ল্যান', সেই কামরাজই ছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যের অবিসংবাদী নেতা। মাদ্রাজের মন্ত্রিসভা ছিল স্বল্পায়ত। প্ল্যানিং কমিশনের মতে, মাদ্রাজের প্রশাসন ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল। নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ মাদ্রাজ সরকার অতি কৃতিত্বের সঙ্গে করেছে। অথচ '৬৭-র নির্বাচনের ফল হল অতি শোচনীয়। ১৯৬২-র নির্বাচনে ডি এম কে পেয়েছিল ৪৯, আর কংগ্রেস পেয়েছিল ১৩১। ১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস পেল ৪৯, আর ডি এম কে পেল ১৩১। স্বয়ং কামরাজ এক অজ্ঞাত যুবকের কাছে হেরে গেলেন।

জওহরলালের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে কামরাজের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান। লালবাহাদুরের মতো ছোটখাটো মানুষটির মধ্যে যে ইস্পাতকঠিন মনোভাব ছিল, কামরাজ সেটা বুঝতেন; এবং আরও বুঝতেন যে, জওহরলালের পর একজন অতি সাদাসিধে নিরাড়ম্বর মানুষের প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রয়োজন। লালবাহাদুরের মৃত্যুর পর যখন ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়, তখন কামরাজ অন্য মনোভাব নিয়ে এ কাজ করেন। ও'র মনে একটা আশংকা ছিল যে, হিন্দীর প্রাধান্য হলে হয়তো ভারতবর্ষে গোলমাল বেঁধে যাবে। দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল কখনও হিন্দীর প্রাধান্য মেনে নেবে না। উনি মনে করেছিলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে সে রকম কোনও ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা কেউ কেউ ও'কে প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিলাম। উনি সবিনয়ে দৃঢ়তা সহকারে তাঁর অসম্মতি জানান। আমার বেশ মনে আছে যে, উনি আমাকে সব কথা ভালো করে বোঝাতে পারবেন না ভেবে একজন দোভাষীর সাহায্যে ও'র অসুবিধের কথা জানান। দোভাষী ছিলেন মাদ্রাজের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম। মোদ্দা কথাটা কামরাজ বলেছিলেন যে, মাদ্রাজে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করা ও'র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল খালি তামিল ভাষার উপর নির্ভর করে। তিনি জনসাধারণকে এবং সরকারী কর্মচারীদের ও'র বক্তব্য পরিষ্কার বুঝিয়ে বলতে পারতেন। কিন্তু কেন্দ্রে তাতে অনেক অসুবিধে হবে; বিশেষ করে পার্লামেন্টে। ও'র যা বক্তব্য তা তামিল ভাষায় উনি যেভাবে বলতে পারতেন, তা অনুবাদ করলে তার গুরুত্ব অনেক কমে যাবে। এইটিই ছিল ও'র নিজের বক্তব্য। পরে ও'র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মতান্তর আরম্ভ হয়। ডিভ্যালুয়েশন উপলক্ষ করে সেই

মতান্তর চরম অবস্থায় পেঁছায়। কারণ, ডিভ্যালুয়েশনের মূল ধারক যে দুজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁরা কি জানি কেন এ ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে ব্যাপারটা ঘটবে তা যে গোপন রাখা যায় না, সেই বোধ এই দুই মন্ত্রীর ছিল না। কামরাজ এ সম্বন্ধে যতবার আলোচনা করতে চেয়েছেন, তাঁকে বলা হয়েছিল আশু ভবিষ্যতে 'ডিভ্যালুয়েশন' হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। লোকসভাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যখন বিরোধী পক্ষ বার বার করে 'ডিভ্যালুয়েশন' সম্পর্কে জানতে চান, তখন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শচীনদা (চৌধুরী)-কে কিছু বলতে না দিয়ে অশোক মেটা দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, ভারতবর্ষে 'ডিভ্যালুয়েশন' করবার কোনও ইচ্ছে মন্ত্রিসভার নেই এবং তা হবেও না। অথচ অশোক মেটা ও সুব্রহ্মনিয়ম এ সম্বন্ধে সব পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। আমি অবশ্য জানতুম। অশোকের মুখেই শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম পরেশবাবুর (ভট্টাচার্য) মুখে। পরেশবাবু তখন ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। 'ডিভ্যালুয়েশন' ঘোষণা করার কিছু পূর্বে আমি সিমলায় ছিলাম। সেখানে শচীনদা এ সম্পর্কে আমাকে জানাতে যান এবং প্রধানমন্ত্রীও টেলিফোনে জানিয়েছিলেন। এই যে গোপনীয়তা এবং কংগ্রেস সভাপতিকে পর্যন্ত অন্ধকারে রাখা—এটা কামরাজ সহ্য করতে পারেননি। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কামরাজের মতপার্থক্য আগেই আরম্ভ হয়েছিল। 'ডিভ্যালুয়েশন' নিয়ে সেই মতপার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার পর থেকে কামরাজের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আর কোনও দিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়নি। সম্পর্কের তিক্ততা ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং পারস্পরিক আলোচনাতেও বেশ বোঝা যেত।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কামরাজের যতই মতান্তর ঘটে থাকুক, কিন্তু কংগ্রেসকর্মীদের একটা বড় অংশ কামরাজের প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান ছিল। ঘরোয়া কথাবার্তায় উনি ওঁর প্রতিপাদ্য বিষয় বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন, আর তার মধ্যে কোনও ধোঁয়া থাকতো না। অনেক কম্যুনিস্ট বন্ধু কামরাজকে প্রগতিবাদী বলে কংগ্রেসের অনেকের থেকে তফাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কামরাজ ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। এসব ছেঁদো কথায় বড় কান দিতেন না। 'সোস্যালিজম'-এর এখনও পুরো ব্যাখ্যা হয়নি এবং কংগ্রেসও কোনও দিন স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অসম বন্টনব্যবস্থা এবং সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে যে এত প্রভেদ, কামরাজ এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যখন ভারতবর্ষের কোনও কংগ্রেসই প্রিভি পার্সের বিরুদ্ধে কিছু বলতেন না তখন মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় আমি প্রিভি পার্স উঠে যাওয়ার পক্ষে বক্তৃতা করি। কামরাজ কংগ্রেস সভাপতি হবার পর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রিভি পার্স সম্পর্কে আমার একটি বইও প্রকাশিত হয়। অন্যান্য যে সব মৌলিক বিষয়—যেমন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বা অন্যান্য কলকারখানা জাতীয়করণ—এ সম্বন্ধেও কামরাজের মন খুব পরিষ্কার ছিল। তবে, কামরাজের একটা অসুবিধা ছিল। এইসব বিষয়ে নীতি ঘোষণা করবার আগে উনি মনে করতেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোককে এইসব নীতি সম্পর্কে আস্থাশীল করা সময়সাপেক্ষ। কোনও অভ্যন্তরীণ বিবাদের যাতে সূত্রপাত না হয় সেদিকে কামরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এইসব কারণে মত প্রকাশে কামরাজের বিলম্ব হত। আমরা যাঁরা ওঁর ঘনিষ্ঠ ছিলাম, ঠাট্টা করে বলতাম 'পাবকালম'। তামিল এই কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল wait। এই মনো-

ভাবের জন্য আগে তো অনেক বিপত্তি হয়েছে। পরেও অসুবিধার সৃষ্টি হতো। কংগ্রেস ভাগ হবার পর যখন শ্রীমতী ইন্দিরা মনে করেছিলেন যে, কামরাজকে 'অর্গ্যানাইজেশন কংগ্রেস' থেকে বার করে আনা যাবে তখন কামরাজকে তোয়াজ করা আরম্ভ হয়। কামরাজ আমাদের কাছে বলতেন, আমরা যখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংগে সহযোগিতা করতে পারি তখন কংগ্রেসের সংগেই বা পারবো না কেন? তাঁর এই মনোভাব তামিলনাড়ুর অনেক জায়গায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় 'অর্গ্যানাইজেশন কংগ্রেস'-এর কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত এ কথা তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু তা নিয়ে মনের মধ্যে এত চিন্তা ছিল যে, তা যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অসময়ে মৃত্যু তাঁকে টেনে নেয়। জীবনে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অনেক ব্যক্তির সংগে মেশবার ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমার এসেছে; কিন্তু কামরাজের মতো এমন নিষ্ঠাবান, নিরহংকার ও নির্ভীক নেতা খুব কম দেখেছি। গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন। তখনও যেভাবে জীবন কাটাতেন, ক্ষমতা ও প্রভাবের উত্তুংগ শিখরে উঠেও জীবনধারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ওঁর যারা অনুগত কংগ্রেস-কর্মী, মুখে কোনও দিন তাদের সহানুভূতি বা সমবেদনা জানাননি। কিন্তু তাদের বিপদ-আপদ সবই নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। গন্টুর-র এ আই সি সি-র সময়ে কংগ্রেসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক রাজাগোপালন অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাজাগোপালন ছিল সুদর্শন, প্রিয়ভাষী, কর্মঠ, উচ্চশিক্ষিত যুবক। বহুবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল। রাজাগোপালনের অসুস্থতার সময়ে বোঝা গেল যে, রাজাগোপালন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। সেই সময় কামরাজের যা অবস্থা দেখেছি, বলবার নয়। দুটি বিনিদ্র রজনী রাজাগোপালনের পাশে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অল্পবয়স্কা দুটি মেয়ে ও স্ত্রীর পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সরকারী সাহায্য নয়, নিজে অর্থ তুলে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করেন। বহু কংগ্রেস-কর্মী এখনও কামরাজের জীবনের এই দিকটা সশ্রদ্ধ মনে অশ্রুভরা চোখে স্মরণ করে।
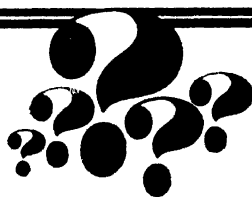
১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবংগে বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়নি। লোকসভার কতকগুলি আসন আমরা হারিয়েছিলাম। আমি পরাজিত হই। অবশ্য আমার পরাজয় সম্পর্কে আমার কতকটা ধারণা ছিল। আমি তিনবার আসানসোল অঞ্চল থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হই। মনোনয়নপত্র পেশ করার দিন থেকে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবার দিন পর্যন্ত আমি এক দিনও নির্বাচন-কেন্দ্রে যাইনি। তা সত্ত্বেও জনসাধারণ কংগ্রেসকে জয়ী করে। '৬৭-র নির্বাচনে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছিল বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে। আমি অবশ্য আপত্তি করেছিলাম এবং হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম কোনও

অনুপস্থিত প্রার্থীর পক্ষে ঐ নির্বাচন-কেন্দ্রে জয়ী হওয়া শক্ত। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা কেন্দ্রগুলি সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে তিনটি বাঁকুড়া জেলার ও চারটি পুরুলিয়া জেলার বিধানসভার আসন ছিল। পুরুলিয়া জেলার এসব অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের যোগাযোগ খুব কম ছিল; কারণ, কয়েক বছর আগেও ঐ অঞ্চলগুলি ছিল বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্তর্গত। আমার আপত্তি অবশ্য টেকেনি। প্রফুল্লদা তখন মুখ্যমন্ত্রী। উনি এবং অন্য দুজন মন্ত্রী একান্তভাবে অনুরোধ জানান। একজন মন্ত্রী তাঁর নিজের নির্বাচন-কেন্দ্র ছেড়ে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের একটি বিধানসভা আসনে দাঁড়ান। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে লোকসভা আসনের জন্য অন্তত পনেরো হাজার বেশী ভোট পাওয়া যাবে। নির্বাচনের ফল বেরুবার পর দেখা গেল সেই মন্ত্রী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, আমি তাঁর চেয়ে তেরো হাজার ভোট কম পেয়েছি। আর এক মন্ত্রী বাঁকুড়ায় জনসভায় বক্তৃতায় বলেন, অতুল্যদার এই কেন্দ্রে দাঁড়ানোর জন্য বাঁকুড়া-বাসী ধন্য হয়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। নির্বাচনের আট দিন আগে পুরুলিয়া জেলার ঐ লোকসভার অন্তর্ভুক্ত চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল বিলি হয়। হ্যাণ্ড-বিলটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসের সীলমোহর এবং ডেপুটি হাই কমিশনারের স্বাক্ষর facsimile করে ছাপা ছিল। হ্যান্ডবিলটি দু' পাতার। তাতে মোদ্দা কথা ছিল যে, পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং নির্বাচনের পূর্বে আরও কয়েক লক্ষ টাকা দেবেন। এই হ্যান্ডবিল যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের আশা ছিল যেহেতু ঐ অঞ্চলে আমি স্বল্পপরিচিত, অতএব ইলেকশনের ঠিক আগে ঐ হ্যান্ডবিল খুব কার্যকরী হবে। কার্যত কার্যকরী হয়েছিল।

নির্বাচনের প্রায় এক বছরের মধ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও চৌহান এক বিবৃতি দেন যে, ঐ হ্যান্ডবিলটি ভারতে অবস্থিত এক দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কোনও লোকের যোগ-সাজসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ছাপাও হয় বিদেশে। এবং পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। ঐ বিদেশী দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী ভারতবর্ষের বাইরে অন্য দেশে গিয়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে। কয়েকজন উৎসাহী আইনবিশারদ নির্বাচনী মামলা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঐ হ্যান্ডবিল উপলক্ষ করে। হয়তো নির্বাচনী মামলায় জয়লাভও করা যেত। কিন্তু তার মূল্য কি? প্রতিষ্ঠানগতভাবে যে রাজ্যে কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেনি, একটি লোকসভা আসনে জয়-পরাজয়ে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে অনেকে বিচার করতে পারেন; কিন্তু যে প্রার্থী তিনবার নির্বাচন-কেন্দ্রে না গিয়ে জয়লাভ করেছে তার পক্ষে এ প্রশ্ন ওঠেই না।

নির্বাচনের ফল বেরুবার পর ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারকে ভাঙবার জন্য কিছু কংগ্রেসকর্মী খুব সক্রিয় হয়ে ওঠেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দেবার জন্য তৎপর হন। এই উদ্যোগীদের মধ্যে কয়েকজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে পরাজিত মন্ত্রীর সংখ্যাও কম নয়। এঁরা মনে করেছিলেন যে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার কাজে তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস

কমিটি বাধাস্বরূপ। একটা সুযোগও মিলে যায়। সে সময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধি পাঠানো হত। তাঁদের কাজ ছিল কংগ্রেসের পরিষদীয় দল ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যাতে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় তার চেষ্টা করা। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ যখন বিভিন্ন রাজ্যের পরিদর্শকদের নাম হচ্ছিল তখন শ্রীগুলজারিলাল নন্দের নাম হয় বিহারের জন্য। গুলজারিলাল নন্দ আমাকে বলেন যে, তিনি পশ্চিম বাংলায় আসতে ইচ্ছুক। পশ্চিম বাংলায় কোনও সমস্যা ছিল না। আমি সানন্দে মত দিই। শ্রীগুলজারিলাল নন্দ পশ্চিম বাংলায় এসে তাঁর নির্দিষ্ট কাজের কথা ভুলে যান। যারা ইউনাইটেড ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙ্গতে তৎপর, তারা তাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থাকলে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা সম্ভব হবে না। এ কাজে প্রফুল্লদাও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমার মত জিজ্ঞেস করায় আমি বলেছিলুম, এ কাজ কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী বেআইনী হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। তখনকার দিনে কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী কংগ্রেসের কার্য সাধারণত পরিচালিত হত। আমাকে ওরা আশ্বাস দেয় যে, তাড়াতাড়ি কিছু করা হবে না। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা প্রেসের লোকেরা ফোন করে আমাকে জানায় যে, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে অ্যাড হক কমিটির সুপারিশ করেছেন এবং তার এই সুপারিশে প্রফুল্লদা প্রমুখ কয়েকজন নেতা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি কাগজে একটি ছোট্ট বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিই যে, এ কাজ করা অনুচিত হয়েছে। কয়েকটি কারণে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির, বিশেষ করে আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন।

প্রফুল্লদার মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কয়েক বছর শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ভারতবর্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিম বাংলায় আসার সময় একবার বিভ্রাট ঘটে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী বিজয়সিং নাহার দমদম এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। বিজয়বাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য গাড়িও নিয়ে গিয়েছিলেন। প্লেন থেকে নামবার পর শ্রীগুলজারিলাল নন্দ কুশলভাষণাদির পর বিজয়বাবুকে জানান, যেহেতু বিড়লার বাড়ি থেকে গাড়ি এসেছে এবং বিড়লা মহাশয় স্বশরীরে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, তিনি বিড়লাদের গাড়িতেই যাচ্ছেন। বিজয়বাবু শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। সেখানে কোনও প্রতিবাদে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেননি। আমার রাইটার্স বিলডিং-এ যাতায়াত খুবই কম ছিল। এদিন ঘটনাক্রমে আমি রাইটার্স বিলডিং-এ উপস্থিত ছিলাম। বিজয়বাবুর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি কোথাও কিছু অনর্থ হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করায় উনি আনুপূর্বিক আমাকে সব ঘটনা বলেন। তখন আমরা দুজনে মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে সব ব্যাপারটি আনি। স্বাভাবিকভাবে তিনি একটু বিব্রত, বিস্মিত ও নিজেকে বিপর্যস্ত মনে করেন। কারণ, বিজয়বাবু তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবেই গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সেদিন একটি চেম্বার অব কমার্সের সভা ছিল, যেখানে গুলজারিলাল নন্দের ভাষণ দেবার কথা। অনেক মন্ত্রীর যাবার কথা ছিল। এই ঘটনায় তাঁরা সকলে সে সভায় যাওয়া বন্ধ করেন এবং সেটা জানিয়ে দেন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কথা স্বতন্ত্র। আমি যদিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম কিন্তু আমি ঐ সভায় উপস্থিত হবার সুযোগ গ্রহণ করিনি। শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে তারপরে আমি সব জানাই। মন্ত্রীরা তাঁর সভায় না যাওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ একটু ক্ষুব্ধ

হয়েছিলেন। আমার কাছে কারণ শুনে একটু বিচলিত হন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি বিজয়বাবুর কাছে তাঁর ত্রুটি স্বীকার করেন।

অন্য একটি ঘটনা ঘটে আরও উঁচু স্তরের। শ্রীগুলজারিলাল নন্দ স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী থাকাকালে একদল আন্দোলনকারী দিল্লী ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে বেরিয়ে কনট সার্কাসে অনেক ভাঙচুর করে আকাশবাণী ভবনে আগুন লাগায়। পার্লামেন্ট ভবনের সামনে হুলস্থুল হয় এবং তৎকালীন মন্ত্রী রঘুরামাইয়ার বাড়ির সংগে কয়েকটি বাড়িও আক্রান্ত হয়। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে এইসব ঘটনা ঘটে। মনে হয়েছিল কেন্দ্রে কোনও সরকার নেই। তখন লোকসভার অধিবেশন চলছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যকরী সমিতির জরুরী সভা ডাকা হয়। আমি সেখানে আমন্ত্রিত হই। তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। আমি পরিষ্কারভাবে বলেছিলুম যে, দিল্লীতে কয়েক ঘন্টার জন্য কেন্দ্রে যে কোনও সরকার আছে তা বোঝা যায়নি এবং তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দায়ী। সেই উপলক্ষ করে গুলজারিলাল নন্দকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পদত্যাগের জন্য তিনি আমাকেই অপরাধী ধরে নিয়েছিলেন। শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ভারতীয় সদাচার সমিতি গঠন করেন। সে কাজেও, তিনি মনে করতেন, আমি যথোচিত সহযোগিতা করছি না। আমার এইসব নানা গুরুতর অপরাধের জন্য শ্রীগুলজারিলাল নন্দ তাঁর দায়িত্বের বাইরে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে 'অ্যাড হক কমিটি' করবার সুপারিশ করেন। ফল যা হবার তাই হলো। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ কর্মী এবং বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটিও নিরুৎসাহ ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েন। কংগ্রেস ভবনে সংগঠনের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সমস্তক্ষণ ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ভাঙার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। এবং তখন থেকেই কংগ্রেস ভবনের সংগে বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসকর্মীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। আমি অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটিতে অথবা কামরাজের কাছে অ্যাড হক কমিটি ভেঙে দেবার ব্যাপারে কিছু বলিনি, যদিও এটা সম্পূর্ণ বেআইনী ছিল। কারণ, আমি জানতুম, অ্যাড হক কমিটির স্বাভাবিকভাবেই অপমৃত্যু ঘটবে।

জব্বলপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা। আমরা সকলেই গেছি। যাবার পথে আমরা তীর্থস্থান হয়ে যাই। আমি ওসব অঞ্চলে গেলেই মাইহারে আচার্য আলাউদ্দিনকে প্রণাম করে যেতুম। জব্বলপুর তো পুরনো শহর—তার উপর দর্শনীয় অনেক আছে। ওখানেই আমার পরম বন্ধু রাজনীতির ধুরন্ধর দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্রের বাড়ি। দ্বারিকাপ্রসাদ রাত্রে আমায় বললেন, 'ওহে, পঃ বঙ্গের ব্যাপার বোধ হয় মিটে যাবে।' আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'পঃ বঙ্গের ব্যাপার কিছু আছে নাকি?' অতি অভিজ্ঞ দ্বারিকাপ্রসাদ মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাদের ওই অ্যাড হক কমিটি!' আমি সংগে সংগে উত্তরে বললুম, 'আমি তো তোমাদের কিছু বলিনি, ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নালিশও করিনি। তা তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?' বললেন, 'যাদের মাথাব্যথা, তারাই সব আলোচনা করছে।' এ আই সি সি-র মণ্ডপে দেখি বিজু (পট্টনায়ক) প্রফুল্লদার সংগে খুব গভীর আলোচনায় রত। বিজুর উৎসাহ যেমন অপরিসীম, তেমনি যে কাজ ধরে তার পেছনে সময় দেয় অপরিমিত। খানিকবাদে এ আই সি সি-র অধিবেশন শেষ হবার পর বিজু এসে আমায় বললে, 'দাদা, চলো প্রফুল্লদার ওখানে যাই।' কংগ্রেস সভাপতি যেখানে ছিলেন, তার ঠিক উলটো দিকের বাড়িতে প্রফুল্লদা ছিলেন।

বিজুর সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখি ব্যোমকেশ (মজুমদার) ও প্রতাপ (চন্দ্র) রয়েছে। আমাকে দেখেই প্রফুল্লদা বললেন, 'ওহে, এই দেখ সবাই সই করে দিয়েছে। আমরা অ্যাড হক কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছি (অর্থাৎ পদত্যাগ)। এইবার তুমিও একটা সই কর।' আমি একটু হেসে বললুম, 'আমি তো অ্যাড হক কমিটির সদস্য নই। পদত্যাগ করি কি করে? যে পদ নেই তা ত্যাগ করা যায় না।' কিন্তু বিজুকে তো কোনও জিনিস বোঝানো শক্ত, যদি তার ইচ্ছে না থাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ফরমুলা বার করল, 'প্রফুল্লদা পদত্যাগের চিঠি কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের কাছে পাঠিয়ে দিন। তার সঙ্গে প্রফুল্লদা যে চিঠিটা লিখবেন সেটা তুমি সই কর।' প্রফুল্লদা খসখস করে লিখলেন। আমিও সই করলুম। বিজু চিঠিটা নিয়ে গিয়ে কামরাজকে দিল। সেই রাত্রেই সংবাদপত্রে বেরোল যে, অ্যাড হক কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই কিন্তু শেষ নয়, আরো আছে। একজন প্রবীণ কংগ্রেসসেবী লোকসভার প্রাক্তন সদস্য কলকাতার এক ইংরেজী দৈনিকে দিয়ে দেন যে, আমি নাকি প্রফুল্লদার সই না নিয়েই অ্যাড হক কমিটি ভাঙ্গার চিঠি কামরাজকে দিয়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি জব্বলপুরেও ছিলেন না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও নন। তবু আদর্শের খাতিরে (?) তিনি এই সংবাদটি পরিবেশন করেন। অবশ্য ওই কাগজেই আমার একটা ছোট্ট বিবৃতি বেরোয়—যাতে আমি বিজু, প্রতাপ এবং ব্যোমকেশের নাম উল্লেখ করে জানাই যে, তারা প্রফুল্লদার স্বাক্ষরের সাক্ষী আছে। তারপরে সরকারীভাবে কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকেও ঐ প্রাক্তন এম পি-র লেখার প্রতিবাদ বেরোয়।
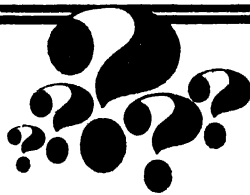
বাঁশোয়ারা যখন পেঁাছলুম তখন সূর্যদেব উঁকিঝুঁকি মারছেন। নামটা মনে হচ্ছে বাঁশোয়ারা, রাজস্থানের একটি নির্বাচন কেন্দ্র। গুজরাট এবং রাজস্থানের সীমান্তে। সভার সব আয়োজন প্রস্তুত। মায় শ্রোতা। কয়েকজন দেশী-বিদেশী সাংবাদিকও রয়েছেন। এই সাংবাদিকরা অদ্ভুত। যত রাত্রে বা যত সকালেই সভা হোক, সে দুর্গম পথ হলেও ও'রা ঠিক হাজির থাকবেন। সেদিন আমার পাঁচটি জনসভা। বাঁশোয়ারার পর উদয়পুর, তারপর নাথোদ্দার, তারপর আজমীর ও জয়পুর। মনে একটু উদ্বেগও আছে। এর আগে জগজীবন রাম ও চৌহানের দুটি জনসভা পন্ড হয়েছে। এই নির্বাচনী সভাগুলি অদ্ভুত। শ্রোতাদের উৎসাহ অপরিসীম। মনে হয় যেন একটা মেলায় অগণিত লোক এসেছে। আবার কোনও গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা হলে এই শ্রোতারাই বিশৃঙ্খল-ভাবে এমন দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে যে, সভা আয়ত্তে আনা কঠিন হয়। বাঁশোয়ারা এবং উদয়পুরের সভা নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। নাথোদ্দারে থমথমে ভাব। আমি তো হলদিঘাট, চৈতক, চিতোর, রাণা প্রতাপ, পদ্মিনী, সবই আউড়ে গেলাম। হলদিঘাটের মাটি আর চিতোরের জহরকুন্ডের মাটি যে বাঙালীরা পবিত্র বলে

নিয়ে যায়, তাও জানালুম। গান গাইতে পারি না, দ্বিজেন্দ্রলালের দু' লাইন আবৃত্তি করলুমঃ

'মেবার পাহাড় হইতে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির,
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।'

সবই বললুম কিন্তু বিশেষ কোনও কাজ হলো বলে মনে হলো না। তখন আচারিয়া উঠলেন। ইনি উদয়পুরের মেয়র, রাজস্থান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী এবং আইন পরিষদের স্পীকার—সবই হয়েছেন। উনি মুখে মুখে এত কবিতা বাঁধলেন ও শোনালেন যে, যারা গোলমাল করতে এসেছিল তারা গোলমালের কথা ভুলেই গেল।

সন্ধ্যার একটু পরে আজমীরের সভা। বড় শহর, বন্ধুবর বালকৃষ্ণ কাউল উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থানের অর্থমন্ত্রী। 'কামরাজ প্ল্যান'-এর পর ওঁর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হবার কথা ছিল। উনি সোজা গিয়ে জওহরলালকে জানান যে, তাঁর তো ইচ্ছে নেই-ই, তা ছাড়া উনি মুখ্যমন্ত্রী হলে বিধানসভার কংগ্রেসী দলের অনেক সদস্য অখুশী হবে। আজমীরের অনেক কথা বললুম। পুষ্করের কথা উল্লেখ করলুম। সভা নির্বিঘ্নেই হলো। তারপর জয়পুর। রাতও হয়েছে। জয়পুরের হরদেও যোশী, কিছু দিন আগেও যিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আরও অনেক নেতা ও মন্ত্রীর উপস্থিতি মনে একটু সাহস এনে দিল। এখানে আবার রাণা প্রতাপ, চিতোর এসব চলবে না, কারণ, অম্বর ও মেবারের ঝগড়া ইতিহাসের একটি সুপরিচিত অধ্যায়। আমি জয়পুরের কথা আরম্ভ করলুম। জয়পুরের সঙ্গে বাঙালীর যে কিরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাও অনেকক্ষণ ধরে সকলকে শোনালুম। অম্বরে প্রতাপাদিত্যের যে কালী আছে তার পুরোহিত বরাবরই বাঙালী। জয়পুরের দেওয়ান বাঙালী, আর সর্বোপরি জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী বাংলার মেয়ে। জয়পুর শহরের স্থপতি বাঙালী। কাজে-কাজেই জয়পুরের সঙ্গে বাঙালীর তো নাড়ীর যোগ। তারপরই বিশ্ববিশ্রুত মানমন্দিরের কথা—জয়পুর, দিল্লী, বেনারস, উজ্জয়িনী। যেখানে পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্যরা এসে প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষের এত বড় গৌরব এই জয়পুরেরই অবদান। তারপর সবিনয়ে বললুম, আমি কলকাতা থেকে তিনটি লরী এনেছি। এই জয়পুরের মাটি, ইট, পাথর আমাদের কাছে পরম পবিত্র। এখানকার কিছু লোক এর আগে কংগ্রেসী নির্বাচনী সভা মাটির ঢেলা ও ইট ছুঁড়ে পণ্ড করেছেন। এই সভায় যদি আপনারা মাটির ঢেলা, ইট ছোঁড়েন তা হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি সেগুলি লরী করে কলকাতায় নিয়ে যাবো। কারণ, সেগুলি পরম পবিত্র। অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম। পরে সভাস্থলে তুমুল হর্ষধ্বনি ও হাস্যরোল। নির্বিঘ্নে সভা শেষ হলো। আমার মনে হলো যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

কেরল ছাড়া আর সর্বত্রই এই মিটিং ভাঙ্গার অপচেষ্টা চলেছে। এই অপকার্য ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দলই কমবেশী করে থাকেন। মনে স্বতঃই প্রশ্ন বরাবরই জেগেছে যে, কেন এই অপচেষ্টা? সব দলই যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী দেন, তাঁরা গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নেন। তাহলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয় কেন? তা ছাড়া,

নির্বাচনী সভা পণ্ড বা সাফল্যের উপরে নির্বাচনী ফলাফল নির্ভর করে না। এ কাজে কংগ্রেসও পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময় লাগে, এই অপকার্য করতে কোনও রাজনৈতিক দলই যেকোনও পথ নিতে দ্বিধা করেন না। পশ্চিমবঙ্গের কথা স্বতন্ত্র। এখানে রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহূত যে-কোনও জনসভা পণ্ড করা বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলের একটা বড় কৌশল। যদি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা যায় তা হলে অনায়াসে প্রমাণ করা সম্ভব —যাঁরা সভা আহ্বান করেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা সভা পণ্ড করেন তাঁদের ক্ষতি হয় বেশী। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার রাজন্যবর্গ সভা ভাঙ্গার কাজে প্রচুর উৎসাহ দিতেন এবং খরচও কম করতেন না। একবার মধ্যপ্রদেশে বেশ মজা হয়েছিল। একদল গো-রক্ষা সম্পর্কে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে সভা পণ্ড করতে এগিয়ে এল। আমি তখন প্রিভি পার্সের অসঙ্গতি এবং তা তুলে দেবার ব্যাপারে বলছি। প্রিভি পার্সের বিরুদ্ধে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একদল মারমুখী হয়ে উঠল। তখন ঐ গো-রক্ষার জন্য যারা সভা পণ্ড করতে এসেছিল তারা প্রিভি পার্স বজায় রাখার দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পনরো মিনিট আগেও যারা সভা পণ্ড করতে তৎপর, তারাই তখন সভায় শান্তি রক্ষা করার জন্য উদ্‌গ্রীব। রাজন্যবর্গের দিকে কাজ করার লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তবু তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অথচ, এই রাজন্যবর্গেরই একদল নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যখন কোনও রাজা accession-এর কথা ভাবেননি, তখন বারোটি রাজ্য এক হয়ে মেবার রাজ্যের নেতৃত্বে প্রথম accession-এর কথা মেনে নেন। এ কাজ সম্ভব হয়েছিল মানিকলাল বর্মার সাহস ও কুশলতার জন্য। উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় তা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে কয়েক দিন থাকবার আমার সুযোগ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর মমত্ববোধ এবং দেশীয় রাজ্য থাকবার যে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, সেকালেই তিনি সে সম্বন্ধে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীমোহনলাল সুখাডিয়া, যিনি রাজস্থানের প্রায় ষোল বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি মানিকলাল বর্মার প্রধান অনুগামী। এইসব দেশীয় রাজ্যে আমরা অনেক অসুবিধায় পড়তুম। আমরা ব্রিটিশ ভারতে কাজ করতে অভ্যস্ত। সব জায়গাতেই কেজো হোক অকেজো হোক, কংগ্রেসের শাখা-প্রশাখা ছিল। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণকে সংগঠিত করবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয়নি বললে ভুল হবে না। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব আসে এবং জওহরলালের চেষ্টায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতে অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনে এই 'স্টেট পিপলস্ কনফারেন্স'-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু সর্দার বল্লভভাই না থাকলে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিনা রক্তপাতে এবং প্রকৃতপক্ষে বিনা আয়াসে এ কাজ অত সুশৃঙ্খলভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না।

সর্দার বল্লভভাই-এর পরিষ্কার চিন্তা, মানসিক দৃঢ়তা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই সমস্ত দেশীয় রাজ্য, ৬০০-রও বেশী, ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেকে বিসমার্কের সঙ্গে সর্দারের তুলনা করেন। এ তুলনা করা উচিত নয়। বিসমার্কের পিছনে ছিল তৎকালীন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। আর, সর্দার ছিলেন নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কম্যুনিস্টরা বলতো, 'এ আজাদি ঝুটা

হ্যায়'। ইংরাজের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো। তার উপর ছিল রিফিউজি সমস্যা। তা ছাড়া, ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেসের মত শক্তিশালী সংস্থা ছিল—যা রাজ্যগুলিতে হওয়া সম্ভব হয়নি। আমাদের অনেক বিদেশী বন্ধু, বিশেষ করে অ্যাংলো-আমেরিকানরা, প্রায়ই বলতেন যে, ভারত সরকারের দু'মুখো নীতি। কাশ্মীরের বেলায় রাজা হরি সিং সই করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতের অন্তর্ভুক্তি হল। আর, জুনাগড়ের নবাব জুনাগড়কে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সংকল্প করায় ভারত সরকার গ্রাহ্য করলেন না। এই দু'মুখো নীতির পিছনে কোনও আদর্শ নেই। আমাদের এইসব সমালোচক বন্ধুরা প্রশ্নটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেননি। কাশ্মীরের রাজা সই করবার আগে থাকতেই ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর লোকেরা ভারতের অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন করেছিলেন এবং ন্যাশন্যাল কনফারেন্স-এর সত্যিই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার মতো জনপ্রিয়তা ছিল। জুনাগড়ের নবাব যে ঘোষণা করেছিলেন সে ঘোষণার সঙ্গে জুনাগড়ের জনসাধারণের কোনও যোগ ছিল না। জুনাগড়ের জনসাধারণ ভারতের অন্তর্ভুক্তির জন্য এমন তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন যে, নবাবকে রক্ষা করবার পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারকে গ্রহণ করতে হয়। কাশ্মীরের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে জনসাধারণের চাপে পড়ে কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি মহারাজাকে মেনে নিতে হয়। ইউনাইটেড নেশনস-এ যে সাওয়াল গেছে তা হানাদার কর্তৃক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রশ্ন। সুতরাং জুনাগড় সম্পর্কে যে ভারত সরকার দু'মুখো নীতি গ্রহণ করেছিলেন—এ কথা আসে না।

প্রিভি পার্স ও প্রিভিলেজেস লোপ করা সম্পর্কেও অনেক সমালোচনা হয়েছে। আবার এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, সর্দার বল্লভভাই রাজাদের তোয়াজ করার জন্য প্রিভি পার্স ও প্রিভিলেজের মারফত রাজাদের সুবিধা করে দেন। আমি এখানে সর্দার বল্লভভাই-এর পক্ষে ওকালতি করছি না। দেশীয় রাজ্যের ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সর্দার বল্লভভাই যে কাজ করে গেছেন তার অসাধারণত্ব ইতিহাসের ছাত্ররা এখন বুঝতে আরম্ভ করেছে। মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজ যখন চলে যায়, তখন এই দেশীয় রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এক-একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ইংরেজের আমলে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশাসন রাজাদের হাতেই ছিল। তাঁরা নামে মাত্র ভারত সাম্রাজ্যের অংগীভূত ছিলেন, কিন্তু ভারত সরকারের সাধারণ প্রশাসন ঐসব রাজ্যে কোনও দিন চালু হয়নি। সর্দার বল্লভভাই-এর দূরদর্শিতার ফলে ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হবার আগেই এইসব দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়। স্বেচ্ছায় যদি এইসব রাজ্য অন্তর্ভুক্ত না হত, তা হলে বিনা রক্তপাতে এই ঘটনা ঘটা সম্ভব হত না। রক্তপাত এবং জুলুম করে অন্তর্ভুক্তি করতে হলে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হত, তা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে। ফলে ভারতবর্ষকে যে পথ গ্রহণ করতে হত তাতে ভারতের সমস্যা আরও ঢের বেড়ে যেত এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হত নানাবিধ অশান্তি। আবার কিছু কিছু লোক এমনও বলেছিলেন যে, প্রিভি পার্স ও প্রিভিলেজেস রদ করা অন্যায় হয়েছে। তৎকালীন ভারত সরকারের সঙ্গে ঐসব দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের যেসব চুক্তি হয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সরকারের পক্ষে সেই চুক্তি লঙ্ঘন করা যে শুধুই অন্যায় হয়েছে তা নয়, চুক্তিভঙ্গজনিত নৈতিক অপরাধও হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, চুক্তি হয়েছিল স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার পূর্বে।

সংবিধান রচনার পর প্রিভি পার্স ও প্রিভিলেজেসকে লোপ করে ভারত সরকার চুক্তিভংগ করেননি। আর নৈতিক আদর্শের কথা যদি আনা হয়, তা হলে তার সোজা এবং সরল উত্তর হল যে, চুক্তিটা হয়েছিল সাময়িকভাবে। সংবিধান রচনার পূর্বে যেসব চুক্তি হয়, সংবিধানের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকারের সংবিধানের সে অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সব সময়েই পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ আবার লিখে গেছেন যে, সর্দার বল্লভভাই ভয় দেখিয়ে রাজন্যবর্গকে প্রভাবিত করেন। এ কথা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। এর পিছনে কোনও যুক্তি নেই। সর্দার বল্লভভাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। এবং সব সময়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করার অধিকার থাকে। সেইজন্য এইসব অযৌক্তিক বা উদ্ভট সমালোচনার অবসান হওয়া প্রয়োজন। যে নীতি ও আদর্শের ফলে রাজন্যবর্গের accession-কে স্বাগত জানানো হয়েছে, প্রিভি পার্স ও প্রিভিলেজেস রদ করার পেছনে সেই নীতি কাজ করেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে দেশ-বিভাগ হওয়ায় ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তিতে ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যা বেড়েছে। এবং সংগে সংগে ইংরাজ যে ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করে প্রশাসন চালাতো, সেই অদ্ভুত পরিস্থিতির অবসান হয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে যে, বিভিন্ন প্রদেশে সেই প্রদেশেরই কোনও কোনও অঞ্চলের উপর প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল না। যেমন বাংলার কোচবিহার রাজ্য। কোচবিহার বাংলার মধ্যেই, কিন্তু সেখানকার সংগে বাংলার প্রশাসনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই উদ্ভট অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্দার বল্লভভাই সকলকার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

১৯৬৪-৬৫ সালে হুগলী জেলার মায়াপুরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন। তৎকালীন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অজয়দা (মুখোপাধ্যায়) সম্মেলনের সভাপতি। কংগ্রেস সভাপতি কামরাজও উপস্থিত ছিলেন। মায়াপুর সম্মেলনে প্রধানত একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

ভূমি সংক্রান্ত নীতি নিয়ে প্রস্তাবঃ

(১) ভূমির মালিকানা স্বত্ব।

(২) কারা মালিক হবার অধিকারী।

(৩) Law of inheritance বদলানো।

(৪) Crop insurance এবং ক্ষতিপূরণ।

১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সিলিং প্রথা চালু আছে তা' ঊর্ধ্বতম। ঐ সংগে নিম্নতম সিলিং প্রথা চালু করতে হবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞরা

পাঁচজনের একটি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যত বিঘা জমির প্রয়োজন বলে ঠিক করবেন, তার চেয়ে কম জমি কাউকে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ যদি পনরো বিঘা জমি ঠিক হয়, তা' হলে পনরো বিঘার কম জমি কাউকে দেওয়া অন্যায় হবে। বর্তমান সিলিং-এর ফলে যেসব উদ্বৃত্ত হচ্ছে বর্তমানে তা থেকে এক বিঘে, দু' বিঘে, দশ কাঠা করে জমি ভূমিহীনদের দেওয়া হয়। এতে কাঙালীবিদায়ের পুণ্য অর্জন করা সম্ভব; কিন্তু ভূমিহীনকে ভূমি দান করা হচ্ছে বলে যে ব্যাখ্যা করা হয় তা অর্থহীন।

ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে পাঁচজনের একটি পরিবারে সেই ভূমিই উপজীবিকা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই যে বছরে বছরে ভূমি বিলির ব্যবস্থা তা রদ করতে হবে। এই ভূমিবণ্টন ব্যবস্থায় ভূমিহীনদের কোনও সমস্যার সমাধান হয় না, বরঞ্চ তাদের অমর্যাদাই করা হয়। যাদের কখনও এক কাঠা জমিও ছিল না, তারা দশ কাঠা, এক বিঘে জমি পেলে সাময়িক উল্লাস আসা সম্ভব, কিন্তু তার ফলে তাদের পাকাপাকিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এটা রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে, কিন্তু এটা গভীর কলঙ্কজনক। এবং যাদের জমি দেওয়া হবে, তাদের যেন সেই জমির অধিকারী থাকবার জন্য প্রতি বছর বি ডি ও অফিসে গিয়ে হয়রান না হতে হয়। পুরোপুরি স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব দিতে হবে, এর মধ্যে কোনও গোঁজামিল রাখা চলবে না।

যাঁরা জমি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল একমাত্র তাদেরই চাষের জমি থাকবে। যাঁরা অন্য বৃত্তিতে আছেন—যেমন উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বৃত্তিভোগী—অর্থাৎ যাঁদের অন্য উপায়ে জীবিকানির্বাহের সংস্থান আছে, তাঁদের চাষের জমি দেওয়া অসংগত ও অন্যায় হবে। মনে রাখতে হবে যে, চাষও একটা পেশা। যাঁদের এই পেশা, কেবলমাত্র তাঁরাই জমির অধিকারী। যেমন নির্দিষ্ট গুণ না থাকলে ডাক্তারি করা যায় না, শিক্ষক হওয়া যায় না, ওকালতি করা যায় না, সেইরকম কৃষিকার্যও একটা নির্দিষ্ট গুণ। এই গুণের অধিকারীরাই চাষের জমি পাবার যোগ্য। বর্তমানে যা প্রচলিত রীতি, তাতে যে-কোনও বৃত্তিধারী চাষের জমির মালিক হতে পারেন। এই অবস্থার অবসান ঘটা উচিত। এই সঙ্গে হোমস্টেড এবং অর্চার্ডের কথাও আসে। সিলিং-এর বাইরে কোনও ব্যক্তির হোমস্টেড বা অর্চার্ড সংলগ্ন জমির মালিকানা থাকতে পারে না। যদি একজনের দশ কাঠা জমির ওপর বাড়ি থাকতে পারে, তা হলে অন্য জনের ষাট বিঘা জমির উপর প্রাসাদ থাকা উচিত নয়। নিয়মকানুনের স্বাতন্ত্র্য হয়তো করতে হবে। অর্চার্ড কাউকে লিজ দিলে যদি সুফল পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তা করতে হবে; কিন্তু মালিকানা স্বত্ব থাকতে পারে না।

Law of inheritance না বদলালে স্থিতিশীল ব্যবস্থা হবে না। যাদের উপ-জীবিকার জন্য পনরো বিঘা জমি ধার্য হল, তাদের আবার যদি উত্তরাধিকারী বেশী থাকার জন্য জমি ভাগ হয়, তা হলে পূর্বতন অবস্থাই ফিরে আসবে। সেই-জন্য, একটি ছেলে বা মেয়েকেই উত্তরাধিকার দিতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, বাকী ছেলেমেয়েদের কি হবে? এ প্রশ্ন ন্যায্য ও সংগত। বর্তমানে গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর কেন্দ্রীয় সরকার খুব জোর দিয়েছেন। এই নীতি কেবল-মাত্র যদি আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, যদি কার্যকরী হয়, তা হলে এ সমস্যা সমাধান করা শক্ত হবে না। ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবর্তন করতে হবে। উত্তরাধিকার থেকে যারা বঞ্চিত হবে, তারা

স্বাভাবিকভাবেই এইসব শিল্পে নিযুক্ত হবে। গ্রামগুলোকে উজাড় করে দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পনগরী সৃষ্টি করার কোনও মানে হয় না। বৃহৎ শিল্প নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু সেই বৃহৎ শিল্পকে অবলম্বন করে আশেপাশে যে ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা হয়েছে, সেগুলি অনায়াসে গ্রামাঞ্চলে হতে পারে। এখন দেখতেও কিরকম কিম্ভূত লাগে। চতুর্দিকে জনহীন, দারিদ্র্যে জর্জরিত সব গ্রাম আর মাঝে মাঝে এক-একটা মহাসমৃদ্ধ ঝলমল আর আলোকমালায় সুসজ্জিত বড় বড় শিল্পনগরী। এই পার্থক্য বজায় রেখে কোনও দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। সেইজন্যেই গ্রামগুলোকে শুকিয়ে বড় বড় শিল্পনগরী না করে গ্রামগুলোকে সজীব রেখে অনায়াসে দেশকে সমৃদ্ধ করা যায়। স্বাধীন হয়ে অবধি আমরা যে কাজ করেছি, যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছে, তাতে সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যায়—

'পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

এর জন্য কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা প্ল্যানিং কমিশনকে দোষ দিলে হবে না। ছোট বড় সব নেতাই এর জন্য দায়ী। স্বাধীনতার পর প্রথম উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল উচ্ছ্বাস বোঝা যায়। তখন মনোভাব ছিল যে, আমরা তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হব। সেই মনোভাব থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, বৃহৎ শিল্প সৃষ্টির বাইরে আর চিন্তা করবার অবকাশ হয়নি। ফলে, তিরিশ বছর ধরে দেশে সর্বসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত করবার প্রকৃত চেষ্টা হয়নি। ইঞ্জিন তৈরি, ইস্পাত তৈরি, জাহাজ তৈরি—এসবের কারখানা নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু এইসব করবার জন্য যে সব ছোটখাট যন্ত্রপাতির দরকার হয়, সেগুলো আশেপাশের গ্রামে করা সম্ভব ছিল। তা করতে পারলে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পনগরী সৃষ্টি না হয়ে গ্রামগুলো নিয়ে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি হত এবং তাতে গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থানের কোনও অসুবিধা হত না। মনে রাখতে হবে যে প্রতি উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে গ্রামের বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়ছে। আমাদের নজর শিক্ষিত বেকারদের উপর। কিন্তু গ্রামে গ্রামে পিচের রাস্তা হওয়ার জন্য যে কত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ চিন্তা করবার আমাদের অবকাশ নেই। পিচের রাস্তায় লরী চলে; একটা লরী পঞ্চাশটা গরুর গাড়ির মাল বহন করতে পারে। ফলে, গরুর গাড়ি যারা তৈরি করে এবং যারা চালায় তারা বেকার হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, পিচের রাস্তা হবে না। পিচের রাস্তা করতে হবে, লরীও চালাতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে এমন প্ল্যানিংও করতে হবে—যারা গরুর গাড়ি চালায়, তারা যাতে বেকার না হয়। ব্রিজ একটা হলে আর নৌকার প্রয়োজন হয় না এবং নৌকায় যারা মাল তুলতো, নামাতো, তারাও বেকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা তৈরি করবার কাজও বন্ধ। ব্রিজ নিশ্চয়ই করতে হবে; কিন্তু যারা বেকার হবে, তাদের কি ব্যবস্থা! যে প্ল্যানিং-এ এই সব বেকারত্ব ঘোচাবার ব্যবস্থা হয় তাকেই তো সামগ্রিক প্ল্যানিং বলে। তিরিশ বছর ধরে কি বামপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী—সকলেই আমরা এ বিষয়টিকে অবহেলা করে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে, বামপন্থী কথাটার মানে এখনও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। যদি বামপন্থীর মানে হয় প্রোগ্রেসিভ, তা হলে অনেক বামপন্থী আছেন যাঁরা বিয়েতে পণ নেন, যাঁরা অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করেন না, যাঁরা বিধবাবিবাহ মেনে নেন না, যাঁরা এখনও বহু সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার মেনে চলেন, তাঁদের কী কট্টর প্রোগ্রেসিভ বলা যাবে? 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'

বললেও বামপন্থী হওয়া যায় না; আবার 'লাঙগল যার, জমি তার' বলেও নিজেদের জমি ভাগে চাষ করিয়ে বামপন্থী হওয়া যায় না। সমাজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, ব্যক্তিগত আচরণেরও কোনও পরিবর্তন হবে না—তবুও বামপন্থী। 'বামপন্থী' কথাটা যদি নামবাচক বিশেষ্য হয় তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এ যদি গুণবাচক হয়, তা হলে ভারতবর্ষে যাঁরা বামপন্থী বলে অভিহিত, তাঁরা 'বামপন্থা'র সংজ্ঞাও জানেন না। কেবলমাত্র পার্টি কনফারেন্সে প্রস্তাব নিলেই যদি বামপন্থী হওয়া যায়, তা হলে কংগ্রেসই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে জাতপাত তোড়ক সম্মেলন হয়েছিল। লোকে বলতো যে, ভটচায্যি মশাইয়ের পাতের দই আমার পাতে গড়িয়ে এসেছে, আর আমার পাতের দই ভটচায্যি মশাইয়ের পাতে গড়িয়ে গেছে। ব্যস, সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা উঠে গেল। এতে আত্মতুষ্টি হয় বটে, কিন্তু সমাজের কোনও পরিবর্তন হয় না। কর্মের দিক থেকে আজ অবধি লেফ্‌ট-রাইটের কোনও পরিচয় ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করে সি পি আই 'লেফ্‌ট'; রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন না রেখে সি পি আই (এম) 'লেফ্‌ট'। নির্বাচনে জেতবার জন্য বামপন্থীরা যখন ধনী লোকেদের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন সেটা হয় লেফ্‌টিজম; আর কংগ্রেস যখন সে কাজ করতো, সেটা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাজ। (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। তাঁরা কেবলমাত্র কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ধুয়া না তুলে ভূমি সংস্কার আইনের মারফত নতুন ধারার প্রবর্তন করতে পারেন।

মায়াপুর সম্মেলনের চতুর্থ অনুচ্ছেদে ছিল Crop insurance ও ক্ষতিপূরণের কথা। কলকারখানা ইনসিওর করা যায়; প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক কারণে বিপর্যয় হলে সেখানে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। অথচ ভূমিকম্প অথবা অনাবৃষ্টি, অথবা প্লাবন—এতে যদি ফসল নষ্ট হয়, তাতে ক্ষতিপূরণ পাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা অল্প, তাই তারা সংঘবদ্ধ। তাদের নিম্নতম মজুরি স্থির হয়েছে, চালু হয়েছে ও কার্যকরী হয়েছে। কৃষিকার্যে যেসব শ্রমিক আছে, তাদের নিম্নতম মজুরির কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু তা কার্যকরী হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। বিস্ময় লাগে যে, একটা প্রগতিশীল দেশ কি করে ভূমিকম্প, প্লাবন ও অনাবৃষ্টির জন্য শস্য নষ্টের ক্ষতিপূরণের এখনও ব্যবস্থা করেনি। যেহেতু কৃষির উপর নির্ভরশীলরা সংঘবদ্ধ নয়, সেইজন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কংগ্রেস সংগঠন লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বোম্বে এ আই সি সি-তে Crop insurance-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। লালবাহাদুরের মৃত্যু হলে, পরবর্তী কংগ্রেস সরকার ১৯২৮-এর মধ্যে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। বিনা বিলম্বে এটা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। যে শস্য কৃষক নিজে খরচ করে উৎপাদন করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি তা নষ্ট হয়, তার জন্য কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবে না কোন নীতিতে? এর কি এখনও বিচার-বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে?

এই লেখাটি সম্পর্কে আমার গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা, যাঁরা ছাপবার আগে লেখাটি পড়েন, তাঁরা একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই মায়াপুর প্রস্তাব আমি রচনা করেছিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও অধিকাংশ কংগ্রেস-কর্মী তাঁদের মন থেকে এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিতে পারেননি। এই মায়াপুর সম্মেলনের পর থেকেই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের

অধিকাংশ কর্মীর যে মনোভাব তার সঙ্গে আমি চলতে সক্ষম হব কিনা। কারণ, ভারতবর্ষে মুখে আমরা লেফ্‌ট রাইট সবই বলতে পারি, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সব রাজনৈতিক দলেরই অধিকাংশ কর্মী হলো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে অনেকেই জমির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কালে সি পি আই (এম)-এর কর্মীদের যে সমাবেশ হয়েছিল তাতে সি পি আই (এম)-এর দপ্তর হিসেব নিয়ে দেখেছেন শতকরা মাত্র পাঁচজন নিম্ন মধ্যবিত্ত বা ভূমিহীন।

মায়াপুর সম্মেলনের প্রস্তাবে কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন; কারণ, তাঁরা অনেকেই ছিলেন জমির উপর নির্ভরশীল। মায়াপুর সম্মেলনে প্রস্তাব রচনা আমার জীবনের একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা। সেইজন্যে, 'কণ্ট-কল্পিত'র অন্যান্য লেখার সঙ্গে মিল না থাকলেও এটা লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
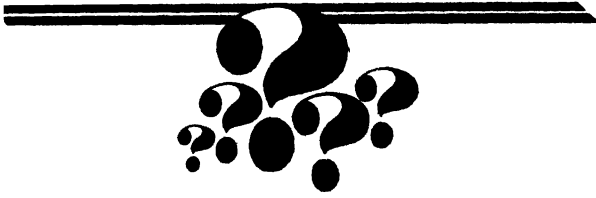
কয়েকজন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোক বাড়িতে এলেন। নাম মনে নেই, তবে হোমরা-চোমরা লোক। দিল্লী এম্‌ব্যাসি থেকে দেখা করার দিন, স্থান এবং সময় ঠিক করা হয়েছিল। বাইরে থেকে শ্বেতকায়রা যখন আসেন তার মধ্যে অনেকে কথা বলেন অভিভাবকের সুরে। যেন আমরা ভারতীয়রা একান্ত করুণার পাত্র। তাঁরা আমাদের উপর কৃপাপরবশ হয়ে উপদেশ দিয়ে বাধিত করছেন। আবার এটাও লক্ষ্য করেছি—শ্বেতকায় হলেই আমাদের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভাবতবর্ষের নিন্দায় বেশ মুখর হয়ে ওঠেন। আমরা ছোট এবং কৃপাপ্রার্থী—তাঁদের আচরণে এটা বেশ প্রকাশ পায়। কিন্তু অশ্বেতকায় অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক সময়ে আমরাই মুরুব্বীয়ানা করি। আমাদের মধ্যে এই বর্ণবৈষম্য খুব প্রকট। যদিও এটা মুখে স্বীকার করতে অনেকেই দ্বিধা করেন।

আমেরিকান বন্ধুরা সাময়িক কথাবার্তার পর দুম্‌ করে নকশাল আন্দোলনের কথা পাড়লেন। তাঁরা আমাকে ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এটা আমাদের দেশের পক্ষে গভীর কলঙ্কময়। আমি খুব ধৈর্য ধরে শুনলাম এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে তাঁদের কথাও যে শুনছি তাও জানালুম। তাঁদের উপদেশাদি দেবার পর আমি সবিনয়ে নিবেদন করলুম যে, আপনারা সভ্য, সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত। আপনাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! আমরা এখনও লাঠি, ছোরা, পাইপগানের মধ্যে আমাদের কর্মতৎপরতা দেখাচ্ছি। আপনাদের বোস্টন, শিকাগোয় স্টেনগান, ব্রেন-গান ছাড়া চলে না। নিউইয়র্কের মতো শহরেও নাকি হোটেলে ডবল লক করে বেরুতে হয়। ইউরোপের বড় বড় শহরগুলির অধিকাংশেই যেসব খুনখারাপি হয়, সবই স্টেন-গান-ব্রেনগানের দ্বারা। আপনাদের যত খুনখারাপি হয়, সে তুলনায় আমাদের এত বড় দেশে হাজারেও একটা হয় না। অথচ, আমাদের ঘনবসতি আপনাদের চাইতেও বেশী। আমাদের একটু সময় দিন। আমরাও কালে ঠিক সভ্য হয়ে উঠবো। আমেরিকান

বন্ধুরা খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন; কিন্তু অপ্রতিভ হলেন বলে মনে হলো না।

আমি ঠিক এই তথাকথিত নকশাল আন্দোলন এখনও বুঝতে পারিনি। অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু কোনটাই আমার মনে লাগেনি। শুনেছি, এরা সব 'অ্যাংরি ইয়ংমেন'। যদি সত্যিই এরা অ্যাংরি হয়, তা হলে আজকের দিনে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, অথবা পণ্ডিত, অথবা সমাজপতি, তাঁদের তো বিচার করা উচিত যে, কিসের জন্য এরা অ্যাংরি। আর যদি কেবলমাত্র বয়স কমের জন্য এরা অ্যাংরি হয়, তা হলে সে কথা স্বতন্ত্র। অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মুণ্ডু কাটা হয়েছে। আমার যতদূর মনে হয় প্রথম মুণ্ডুপাত হয় ডাঃ রায়ের, তাঁরই সৃষ্ট দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে। বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুপাত নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন কোনও সময়েই সঙ্গত নয়। এবং কঠোরতম ভাষায় সে কাজের নিন্দা করা উচিত। কিন্তু তা হলে কি দায়িত্ব শেষ হয়? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগরের মূর্তি। ঠিক জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে। যিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বিদ্যাদানের প্রবর্তক, তাঁর মূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থাকা সব দিক দিয়েই শোভন ও সঙ্গত। যারা বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুপাত করেছে, তাদের নিন্দা করবার ভাষা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যারা ঐ মূর্তির সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হর্ম্যে বসে প্রত্যহ বিদ্যাশিক্ষার নামে ও ক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করছেন, তাঁরা কি মুণ্ডুপাত করার চেয়ে বেশী অপরাধ করছেন না? তাঁরা তো 'অ্যাংরি ইয়ংমেন' নন, তা হলে শিক্ষার্থীরা কেন সময়ে পরীক্ষা দিতে পারে না? ডাক্তারি যারা পড়ে, বছরের পর বছর যখন তাদের পরীক্ষা না দিয়ে থাকতে হয়, তাদের ক্ষতির পরিমাণ কি খতিয়ে দেখা হচ্ছে? বিনা অপরাধে অভিভাবকদের অর্থদণ্ড দিতে হয় আর শিক্ষার্থীর সরকারী চাকরির বয়স পেরিয়ে যায়। এম কম এগজামিনে তাই, ল পরীক্ষায় তাই। এ তো হলো সর্বোচ্চ পরীক্ষার ব্যাপারে। নিম্নতম ও মধ্যের পরীক্ষাগুলো সম্বন্ধে অধিকতর অরাজকতা। মাঝে মাঝে শোনা যায় গণ-টোকাটুকির জন্য পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর জন্য কি কেবল শিক্ষার্থীরাই দায়ী? যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল স্বয়ং এবং যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেট মহাপরাক্রান্ত সরকার বিনা নোটিসে ভেঙে দিতে পারে, সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজকতা সম্বন্ধে কি কেবলমাত্র ছাত্রদেরই দায়ী করা হবে? ১৯৭০ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা ডিপ্লোমা-পত্র পাননি। এর জন্য দায়ী কে? প্রশ্নপত্র যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। পরীক্ষার খাতা উধাও হয়। এর জন্য দায়ী কারা? 'অ্যাংরি ইয়ংমেন', অথবা যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছেন তাঁরা? বিচারকের আসনে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের যদি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তাঁদের কি অব্যাহতি পাবার কোনও যুক্তি আছে? সম্প্রতিকালে কাগজে বেরিয়েছে যে, বি এ, বি এস-সি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা যে সময়ে হবার কথা, সে সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। যদি এ সংবাদটি মিথ্যা হয় তা হলে যাঁরা এটি প্রচার করেছেন, তাঁদের কঠোরতম সাজা দেওয়া উচিত; আর যদি সংবাদটি সত্য হয়—তা হলে? এই ছোট্ট খবরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে বিহ্বলতা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। যাঁরা খবরটি প্রকাশ করলেন, তাঁরা হয়তো সামাজিক কর্তব্যবোধে করেছেন। কিন্তু যাঁরা এই সংবাদের সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি একবারও ভেবেছেন যে, এই সংবাদে পরীক্ষার্থীদের মানসিক বিপর্যয় হতে পারে! তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

হলো পরীক্ষার্থীদের মনোবল ভেঙেগ যাওয়া। এর জন্য দায়ী কে? পরীক্ষা যদি কোনরকমেও হয়, তা হলে পরীক্ষার ফল বেরুনো সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কবে বেরুবে যেমন স্থিরতা নেই, আবার পরীক্ষার খাতা ঠিক জায়গায় পৌঁছনো সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা। বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যাশিক্ষার মাপকাঠি হলো পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা ব্যবস্থাই যদি অনিশ্চিত হয়, তা হলে শিক্ষার্থীদের অধিকতর শিক্ষা-লাভের উৎসাহ কি থাকতে পারে? শিক্ষাদানের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ফলে যদি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাবিমুখ হয়, তা হলে কি তাদের অপরাধী করা যায়? সেই জন্য যদি কিছু শিক্ষার্থী মনে করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ফলে বিদ্যাসাগর রোজ মর্মাহত হচ্ছেন, অতএব এই অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। এ কথা হয়তো অনেকের মনঃপুত হবে না, কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই মনোভাবই কাজ করছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও পদক দেবার জন্য অনেকে অনেক সম্পদ ও সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। শোনা যাচ্ছে, তারও সদ্ব্যবহার হয় না। একটা সম্পত্তির কথা আমি জানি, যা আগে 'কষ্টকল্পিত' লেখায় উল্লেখ করেছি। শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর মধুপুরের সুরম্য নাতিবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন বলে শুনেছি। এককালীন অতি সুন্দর এই বাড়ি ভগ্নস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। এর সদ্ব্যবহারের কেন কোনও সুব্যবস্থা হচ্ছে না, তা আমার জানা নেই। যদি সত্যিই এইসব এনডাওমেন্ট যথোচিতভাবে ব্যবহৃত না হয়, তা হলে তা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাদায়ক।

ভারতবর্ষ পূর্বে এক বিদেশী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। উপনিবেশবাদের আদর্শের উপর শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখান থেকে আমরা অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের দেশের সংবিধান কোনও বিশেষ ধর্ম, শ্রেণী বা জাতিকে স্বীকার করে না। ভারতীয় নাগরিক, সে যে ধর্মেরই হোক আর যে শ্রেণীরই হোক, স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সব সুযোগের সে অধিকারী। এদিক দিয়ে কোনও নাগরিকের ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। কিন্তু এই সংবিধান পড়াবার যাঁরা ব্যবস্থা করবেন, তাঁরা যদি রোজ প্রমাণ করেন যে, শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কোনও সম্মান ও মর্যাদা নেই, তা হলে ওইসব পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়া অসম্ভব। নিজেদের মনের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকে বিদ্যার্থীরা শিক্ষালাভ করতে যায়। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় যদি তারা নিত্য উপলব্ধি করে যে, তাদের ভবিষ্যৎ গভীর তমিস্রায় ঢেকে গেছে, অন্ধকার ভেদ করে কোনও আশার আলো দেখা যাচ্ছে না, তা হলে তারা যদি সুষ্ঠু নাগরিক না হয়, তা হলে কেবলমাত্র কি তাদেরই দোষ? আর, অভিভাবকরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নৈরাশ্য ও হতাশার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমার এক বন্ধুর ভাগ্নে দু' বছর ডাক্তারি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পায়নি; তার বিধবা মাকে জীবিকানির্বাহের জন্য জমি বিক্রি করে পড়ার ব্যবস্থা করতে হয়। দু' বছর আগে যে বিধবা মা ছেলের পড়া সম্পূর্ণ হয়েছে জেনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন, তাঁর মানসিক ও শারীরিক কষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার গুণে দীর্ঘতর হয়। এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রথমত শিক্ষা এখন ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। নিম্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরও একথলি ভরতি বই প্রয়োজন হয়; তাও সব পাওয়া যায় না। যদি কোনক্রমে বই যোগাড় হয়, দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট করা পাঠক্রম এক বছরের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদি কোনরকমে তাও

সম্ভব হয়, তা হলে প্রশ্নপত্রে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। যেমন এবারে হোম সায়েন্সে প্রশ্ন হয়েছিল—'যে সুতো দিয়ে তুমি কাপড় সেলাই করেছ সেটি কোন মিলের?' এ প্রশ্ন যাঁরা করেছেন তাঁরা কি কলকাতার বাজার থেকে আট, দশ, বারো হাত গুলিসুতো কিনে বলতে পারবেন কোন মিলের সুতো? এইসব প্রশ্ন যাঁরা করেন, তাঁরা কি মানবজগতের? যে পরীক্ষার্থীকে এই প্রশ্ন করা হয়, তার অবস্থা কি হয়—সেটা কি শিক্ষা অধিকর্তারা ভেবে দেখেছেন? প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে তার সাজা আছে; কিন্তু অসংগত প্রশ্ন করে যাঁরা বিদ্যার্থীদের বিভ্রান্ত করেন, তাঁদের কোনও সাজা নেই এবং তাঁরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক অগ্রসর হয়েছে বলে শোনা যায়। শিল্প-সৃষ্টিতে সমৃদ্ধিও তার উল্লেখযোগ্য। এ কাজে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এখন ভারতবর্ষ পেছু হাঁটার পথ গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার পীঠ-স্থানগুলি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রণক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কেবলমাত্র ছাত্রদের উপর দোষ চাপিয়ে আমাদের মতো যারা বর্ষীয়ান, তারা দায় সারতে পারে; কিন্তু সত্যিই কি তাই? রাঁচীর কাছে 'বিড়লা ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি' চার মাস বন্ধ থাকার পর খুলেছিল; চার দিন বাদে আবার বন্ধ হয়ে যায়। যেসব তরুণ কিশোর ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই যে নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে তাদের পড়তে হচ্ছে তাতে ধীরে ধীরে তাদের মন এক বিরাট 'ফ্রাসট্রেশনের' মধ্যে ডুবছে। এই 'ফ্রাসট্রেশন' যাঁরা ঘটাচ্ছেন তাঁরা সমাজদ্রোহী, না যারা ফ্রাসট্রেশন-এর শিকার হচ্ছে তারা সমাজদ্রোহী? আর এইসব কিশোর, তরুণ ও যুবকযুবতী—এরা কার কাছে বিচারের জন্য যাবে? এরা কি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে

*　　　　*　　　　*

শুধু দুটি অন্ন খুঁটি
কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া?'

এই অবস্থা কি চলবে?
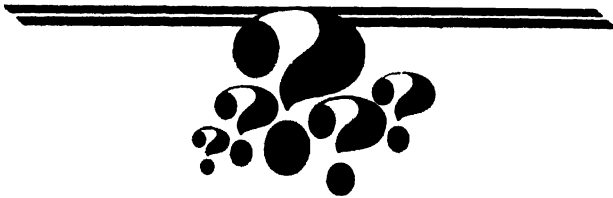
ব্যোমকেশ (মজুমদার) খুব পীড়াপীড়ি করছিল। বক্তব্যটা অতি সোজা। তার শ্বশুরমশাইকে অনেক দিন ধরে কথা দিয়েছি। এবার না গেলে অন্যায় হবে। আমারও যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, হয়ে ওঠেনি। যেতে হবে বর্ধমানের একটি গ্রামে। এই বর্ধমান জেলাটি পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এক দিকে আসানসোল-রানী-গঞ্জের কয়লা, তার সঙ্গে সদর মহকুমার ধান। আর কাটোয়া-কালনায় শুধু ধান নয়, তার সঙ্গে সব সময়েই সবজি এবং তার উপর পাট। যে সময়ের কথা বলছি তখন দুর্গাপুরের শিল্পনগরীও হয়নি আর দামোদর পরিকল্পনার দুর্গা-

পুর ব্যারেজও হয়নি। কিন্তু সদর মহকুমার সেচের ব্যবস্থা ভালই ছিল। রণ্ডিয়ায় অ্যান্ডারসন ওয়্যার করে দামোদর থেকে জল এনে সদর মহকুমার অনেক গ্রামেই সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের গোলসি গ্রামের পাশ দিয়ে যে খালটি এসে বর্ধমান শহরের কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে গেছে, সেইটি আসল খাল। যেসব জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে সেইসব জমিতে অন্যান্য জমির তুলনায় চার গুণ ফসল হয়। ওই সেচের এলাকায় যার পনর-কুড়ি বিঘা জমি ছিল সেই সম্পদশালী। ওয়্যার, ব্যারাজ, ড্যাম—এসব কথার তখন মানে বুঝতুম না। কিন্তু এটা বুঝতুম অ্যান্ডারসন ওয়্যার দামোদরের খানিকটা জল বেঁধে সদর মহকুমার চাষীদের প্রভূত কল্যাণ করেছে। বোধ হয় আসছিলুম আরামবাগ থেকে। নানাবিধ যানবাহনের আশ্রয় নিয়ে যখন নদীর ধারে গিয়ে পেঁছিলুম তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। খানিকটা নৌকায়, খানিকটা হেঁটে নদী পেরোতে হল। বেশ গাছপালায় ঢাকা একটি ছোট্ট বাড়ি। আশেপাশে কয়েকটি কুটিরও রয়েছে। একটু দূরেই আর একটি নদী এসে এই নদীতে পড়েছে। বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শান্ত সৌম্য-দর্শন মানুষটি, গলায় তুলসীকাঠের মালা। শুধু-গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা সংবাদ না দিয়ে গিয়েছিলুম। কি খুশী যে হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা যায় না। আর উনি খুশী হলে ওঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটা প্রকাশ পেত। আমি তো মহা অপ্রস্তুত। বয়সে বড়, পরম শ্রদ্ধেয়, তাঁর অভ্যর্থনার ঘটা দেখে আমি প্রমাদ গুনলাম। আমি অবশ্য তখনও ভবিষ্যতে যে বিপদ আছে তা আঁচ করতে পারিনি। ব্যোমকেশকে একটু সস্নেহে তিরস্কার করলেন—'তুমি ওঁকে নিয়ে এলে, একটাও খবর দাওনি। তা বেশ, বেশ। ভাল হয়েছে। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি।' আমি একটু সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে, আপনার জামাই এসেছে—আমার জন্য আবার আলাদা করে কি করবেন!' উনি একটু হেসে বললেন, 'আমি কি আলাদা করে করবার কথা বলেছি! হাত মুখ ধোন, চা খান, তারপর একটু জলযোগ করবেন।' আর কথাগুলো এমন-ভাবে বলছেন যে, কারোর মনে করবার সাধ্য নেই যে, এগুলো সাজানো কথা। ওঁর বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত গেলেই এমন আন্তরিক ও ভালবাসা-ভরা সংবর্ধনা পায় যে, লোকে অভিভূত না হয়ে পারে না। আর এটা ওঁর একান্ত স্বাভাবিক। আমি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কথা বলছি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সস্নেহ প্রাণ এবং স্বাভাবিকভাবে আনন্দোচ্ছল সম্ভাষণ বিদ্যমান, ক'জন এর খবর রাখে তা জানি না।

হাত-মুখ ধোয়ার পরই চা-পর্ব হল। চা-এর সঙ্গে ঘরে তৈরী চিড়ের নাড়ু, তিলের নাড়ু এসব তো ছিলই। আমি তো মনে মনে শিউরে উঠছি যে, এর পর আবার জলখাবার। অনেক কাকুতি-মিনতি করে জানালুম যে, এর পর আর কিছু খেলে আর রাত্রিতে খেতে পারব না। যাই হোক, পরের দিন সকালেই ব্যোমকেশ চলে গেল। তখন আমি বুঝলুম যে কি বিপদে পড়েছি। সকাল থেকে ভাত খাওয়ার মধ্যে বোধ হয় আমায় আটবার খেতে হয়েছিল—একবার ক্ষীরের নাড়ু, একবার তিলের নাড়ু, একবার খানিকটা ছানা। ঘুরছেন-ফিরছেন আর আধ ঘন্টা বাদে বাদে এসে বলছেন, 'এটা একটু খেয়ে দেখুন তো।' আমার তখন সব্বোনাশ। যাদের চিনি তারা কেউ তখন গ্রামে নেই। ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোৎস্নানাথ আমার বিশেষ বন্ধু। আর জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী। তার কাছে অনেক দিন কাটিয়েছি। এখনও কলকাতা থেকে ছুটি নেবার দরকার হলেই তার কাছে গিয়ে কাটিয়ে আসি। অবশ্য এরা বাড়িতে থাকলেও যে আমাকে বিশেষ রক্ষা করতে পারত তা নয়।

কবিবর সব বিষয়েই আত্মভোলা। কিন্তু বাড়িতে যদি অতিথি-অভ্যাগত আসে তাদের সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ও সচেতন। আমাদের সেই বৈষ্ণবদের গুণবর্ণনায় আছে যে, তৃণের ন্যায় সুনীচ আর গাছের মত সহিষ্ণু, সদা সর্বদা অমানীকে মান দেয়, আর যাকে দেখলেই মনে হরিনামের উদয় হয়। এইসব গুণ যাদের আছে, তারাই প্রকৃত বৈষ্ণব। এ'কে দেখে মনে হয় যে, প্রকৃত বৈষ্ণব এবং বাঙালী। উচ্চশিক্ষিত, অনেক সুযোগ পেয়েও শহরে চাকরি করতে যাননি। গ্রামে হেড-মাস্টারি করে জীবন কাটিয়ে দিলেন। কুনুর নদী এবং অজয় নদের সঙ্গমস্থলে বাড়ি। অজয়ের বানে প্রায়ই গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। ছেলেরা সব কৃতী। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও গ্রাম ছেড়ে আসেননি। একবার বন্যায় বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। তবু গ্রাম ছাড়েননি। তাঁবুতে বাস করেছেন, যতদিন না নতুন বাড়ি হয়। আর গ্রামের মানুষদেরও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, সব সময়েই তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সাথী হতেন। এ'কে লোক পল্লীকবি বলে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। গ্রামের কথা যখন কইতেন তখন কার সাধ্য বোঝে যে, একজন অসাধারণ পণ্ডিত কথা বলছেন। নিজের জন্মস্থান সম্বন্ধে লিখেছেন—

'এই পথেতে আবার আমায়
আসতে যদি হয়
যেখানেতে ছিলাম দিয়ো
সেইখানে আশ্রয়।
সেথায় জেনেছিলাম আমি
তুমিই কর্তা গৃহস্বামী,
তুমি ভিন্ন করতে হয় না
অন্য কারো ভয়।'

আবার স্বগ্রাম সম্বন্ধে লিখেছেন—

'তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে
নহে কো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া
অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুঃখভাগী
নয় তো নেহাত অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি
বুকের রক্তে বহে।

আমি নর্মদা মর্মরতটে
বাঁধিতে চাহি না ঘর
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি
ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জে—মাধবীর শাখে
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
নয় কাশ্মীর কমলকানন
তার চেয়ে মনোহর।'

এত বড় কবি, এত স্বীকৃতি, কিন্তু একেবারে শিশুর সারল্য। সে সময়ে দু'

দিন দু' রাত ও'র সঙ্গে কাটিয়েছিলুম। সে ক'টি দিনের কথা ভোলবার নয়। বাল্যকালে মাতামহের দৌলতে অনেক কবি ও সাহিত্যিককে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তী যুগে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ছিলেন সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র অথচ ব্যবহার অতি সাধারণ। আমার মত অর্বাচীনের সঙ্গে কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন দিন কোনও কবি বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে অশোভন মন্তব্য করতে শুনিনি। সব সময়েই একটা শিক্ষার্থীর মনোভাব ছিল।

ও'র একটি গান 'মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। উনি লিখেছিলেন কবিতা। এই কবিতাটি সুর দিয়ে তখন অনেকেই গাইতে আরম্ভ করে। এবং গ্রামোফোনেও রেকর্ড হয়। এ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জন 'সাহিত্যতীর্থে' রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় লেখেন, "রবীন্দ্রনাথ আমায় বললেন, 'ওহে, তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছে!' আমি তো অবাক! ভাবিলাম, কি বলিতেছেন তিনি! বলিলেন, 'লোকে এখানে এসে বলছে, আমি "ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে" গানটি বেশ লিখেছি। তাঁরা ভাবছেন কবিতাটি আমার রচনা।' আমি শুনিয়া বলিলাম, 'ভালই তো, নদী যদি সাগরে মিলবার সৌভাগ্য লাভ করে, তাতে আপনার বাধা দেওয়া কেন?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি সকলকেই বলেছি যে, আমার নয়, ওটি তোমার লেখা।' তখন তিনি পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন।"

সেবারে দু' দিন ও'র বাড়িতে ছিলুম। সকালে উঠে অজয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। এই অজয়ের ধারেই কেন্দুবিল্ব। সেখানে জয়দেব, তারপর রবীন্দ্রনাথ, তারপর চণ্ডিদাস। এই রাঢ় অঞ্চলে যে কত কবি জন্মেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের এটি একটি পীঠস্থান। কুমুদরঞ্জনের মধ্যেও ছিল সমস্ত বৈষ্ণবোচিত গুণ। ও'র বাড়িটি দেখে তপোবনের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে যায়। আমি বাড়ির কাছে এসে দেখি—বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী এসেছেন, আরও অনেকে আসছেন। সেই নদীর ওপার থেকেও আসছেন। আমি ভেবেছিলুম বুঝি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে এ'দের কোনও কাজ আছে। তারপরই বুঝতে পারলুম, আমার মত অভাজনকে দেখবার জন্য তাঁরা এসেছেন এবং খবর পাঠিয়েছেন কবি নিজে। অবাক হয়ে দেখলুম, যত লোক এসেছেন, তাঁদের সবাইকেই উনি জানেন; সবাইকে উনি চেনেন, শুধু তাঁদের নয়, তাঁদের ছেলেমেয়ে, ভাই সকলেরই নাম জানেন। প্রত্যেককেই কুশল প্রশ্ন করছেন। আর আমার সম্বন্ধেও দু-একটা কথা বলছেন। 'সোমনাথ' সম্বন্ধে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। অনেকের কাছে সে কথা বললেন। আমার তো লজ্জায় মাটিতে মেশবার উপক্রম। কুমুদ-রঞ্জন নিজেই 'সোমনাথ'-এর উপর বহু কবিতা লিখেছিলেন। 'সোমনাথ'-এর উপর লেখা একটি কবিতা আমাকেও পাঠান। গ্রামবাসী যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও দেখলুম কোনও আড়ষ্টতা নেই। কুমুদরঞ্জন একান্ত আপন। কবি কুমুদরঞ্জনকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু মানুষ কুমুদরঞ্জন তাঁদের পরিবারভুক্ত। আমার গ্রামে গ্রামে ঘোরবার বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামের মধ্যে সাধারণত যাঁরা বড় হন, সে অর্থেই হোক বা লেখক হিসেবেই হোক, তাঁদের সঙ্গে গ্রামের লোকেদের একটা স্বাতন্ত্র্য আপনা আপনি জন্মে যায়। এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি ওখানে বাস না করলে, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। বর্ণনা করা অসম্ভব। কুমুদ-রঞ্জনের কবিতা ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। তখনকার বহু মাসিক

ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত ও'র কবিতা বেরিয়েছে। সব একত্রে প্রকাশিত হয়নি। যা বেরিয়েছে তাতে দেখা যাবে, উনি বহু বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছেন। আবাস পল্লীগ্রামে। মায়া পল্লীর উপর, স্বাভাবিকভাবেই পল্লী-কবিতাগুলি বেশী প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়েই উনি যেসব কবিতা রচনা করে গিয়েছেন, তাও অনবদ্য। আমার মনে হয় সাহিত্যিক-সমাজ ও সাহিত্য-পিপাসুরা ঠিকভাবে কুমুদরঞ্জনকে গ্রহণ করেননি। সেইজন্যই কবি ও সাহিত্যিক-দের মধ্যে ও'র স্থান যে কত উপরে সে বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞান কম। তারাশঙ্কর কবির ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সংবর্ধনায় অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখেন—'একদিন আমরা কুমুদরঞ্জনকে স্বীকার করিনি। বুদ্ধকেও আমরা একদিন স্বীকার করিনি। আজ নূতনভাবে তাঁকে পেয়েছি। সারা পৃথিবীও পেয়েছে। আজ আড়াই হাজার বছরের আগেকার মানুষকে আমরা নূতনভাবে স্মরণ করছি। কুমুদরঞ্জনকে তেমনি করে আজ নূতনভাবে স্মরণ করছি।

'কুমুদরঞ্জন অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি। তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব; প্রার্থনা করব এইজন্য যে, আমরা একদিন যে সংবিৎ হারিয়েছিলাম, তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলা কাব্যপুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ সুন্দর সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর কবিতায় নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যেই।'

বহুবার কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারই তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে অভিভূত হয়েছি। 'কো গ্রামে' তাঁর কাছে যে দু' দিন দু' রাত ছিলুম, জীবনে তা ভোলবার নয়। স্নিগ্ধ, শান্ত, শান্তিময় পরিবেশ।

বিশের দশকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে খুব মতান্তর হয়েছিল। যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের অভিহিত করা হত 'নো-চেঞ্জার' বলে, আর যাঁরা প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে ছিলেন তাঁদের বলা হত 'প্রো-চেঞ্জার'। দেশবন্ধু এবং মতিলালের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়। পরে অবশ্য কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। ১৯৩০-এর আন্দোলনের প্রাক্কালে কংগ্রেস পক্ষীয় সমস্ত আইনসভার সদস্য পদত্যাগ করেন। তারপর ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ থেকে আবার প্রার্থী দাঁড় করানো হয়। ১৯৩৬-এ ফৈজপুরে কংগ্রেস হয়। সেখানে মোটামুটি বোঝা যায় যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোয় কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠনে দ্বিধা আছে। সেইজন্য ফৈজপুর কংগ্রেসে স্থির হয় যে কংগ্রেস পক্ষে নির্বাচিত সব সদস্যদের নিয়ে একটি কনভেনশন হবে। দিল্লীতে ১৯৩৭-এ ১৯ এবং ২০ মার্চ কনভেনশন হয় এবং সেই কনভেনশনে

প্রথমেই উপস্থিত সব সদস্যরা নিম্নলিখিত শপথবাক্য পাঠ করেন:

'I, a member of this All-India Convention, pledge myself to the service of India and to work in the legislature and outside for the independence of India and for ending the exploitation and poverty of her people. I pledge myself to work under the discipline of the Congress for the furtherance of Congress ideals and objective to the end that India may be free and independent and her millions freed from the heavy burdens that they suffer from.'

১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়-জয়কার। পাঁচটি প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বোম্বেতে প্রায় অর্ধেক, আর বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলেও একক দল হিসেবে সর্ববৃহৎ।

প্রদেশের নাম	আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যা	নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যসংখ্যা
মাদ্রাজ	২১৫	১৫৯
বিহার	১৫২	৯৮
বাংলা	২৫০	৫৪
সি পি	১১২	৭০
বোম্বে	১৭৫	৮৬
ইউ পি	২২৮	১৩৪
পাঞ্জাব	১৭৫	১৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	১৯
সিন্ধু	৬০	৭
আসাম	১০৮	৩৩
উড়িষ্যা	৬০	৩৬

আর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ৯৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সমর্থিতগণ ৫৫টি আসন লাভ করেন। নির্বাচনের ফলাফল দেখে সারা ভারতবর্ষে এক উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়। এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন:

'The Committee has therefore come to the conclusion and resolves that Congressmen be permitted to accept office where they may be invited thereto. But it desires to make it clear that office is to be accepted and utilised for the purpose of working, in accordance with the lines laid down in the Congress election manifesto and to further in every possible way, the Congress policy of combating the new Act on the one hand and of prosecuting the constructive programme on the other.

'The Working Committee is confident that it has the support and backing of the A.I.C.C. in this decision and that this reso-

lution is in furtherance of the general policy laid down by the Congress and the A.I.C.C. The Committee would have welcomed the opportunity of taking the direction of the A.I.C.C. in this matter but it is of opinion that delay in taking a decision at this stage would be injurious to the country's interest and would create confusion in the public mind at a time when prompt and decisive action is necessary.'

এই প্রস্তাব নেওয়ার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে লখনৌতে এ আই সি সি-র অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্য নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে কোনও মতামত গ্রহণ না করাই বিধেয়। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটির মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সম্বন্ধে জুলাই মাসের প্রস্তাব এ আই সি সি-র ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবরে '৩৭-এর অধিবেশনে সমর্থিত ও গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

প্রদেশের নাম	মন্ত্রী	পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী
বোম্বে	৭	৬
মাদ্রাজ	১০	১০
ইউ পি	৬	১৩
বিহার	৪	৮
সি পি	৭	—
উড়িষ্যা	৩	৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪	—

পরে আসামেও কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না; বলা হত প্রধানমন্ত্রী। প্রদেশগুলিতে প্রধানমন্ত্রী হন যথাক্রমেঃ

প্রদেশের নাম	প্রধানমন্ত্রী
বোম্বে	বি জি খের
মাদ্রাজ	চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী
ইউ পি	গোবিন্দবল্লভ পন্থ
বিহার	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
উড়িষ্যা	বিশ্বনাথ দাস
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	ডঃ খান সাহেব
আসাম	গোপীনাথ বড়দলৈ
সি পি	ডঃ এন বি খারে

(ডঃ খারে ১৯৩৮-৩৯-এ অপসারিত হন। তাঁর জায়গায় আসেন রবিশঙ্কর শুক্লা)।

এঁদের সকলকেই জানতুম। কয়েকজনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শ্রীবিশ্বনাথ দাসের কথা আগেই লিখেছি। শ্রীবিশ্বনাথ দাস, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ বড়দলৈকে আমরা হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উত্তর-

পাড়ায় সংবর্ধনা জানাই। সেই সময় সরোজিনী নাইডুও এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ মনে পড়ছে। বাংলার মহিলাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের মহিলারা সাদা শাড়ি কেন পরেন? রঙিন শাড়ি পরা উচিত। তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে তিনি আরও বলেন যে, তিনি নিজে রঙিন শাড়ি পরেন বলে অনেক পুরুষমানুষ তাঁর কথা শোনেন।

শ্রীবাবু অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর খাওয়ার সময়েই তাঁকে ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়া হত। একটা ভাল অভ্যেস ছিল তাঁর, যা অনেকের মধ্যেই নেই। নিয়মিতভাবে বই কিনতেন এবং পড়তেন। দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি—এইসব বিষয়েই আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। স্বল্পভাষী লোক ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও নিরহঙ্কার। কি কারণে জানি না, বিহারে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রবল দল ছিল। এক দিকে শ্রীবাবু, অন্য দিকে শ্রদ্ধেয় অনুগ্রহবাবু। শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ। কারণ জানি না, কিন্তু কেন্দ্র থেকে এঁদের দু'জনের পার্থক্য বরাবর জীইয়ে রাখা হয়েছিল। দুজনেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবদান প্রচুর। প্রশাসক হিসেবে দু'জনেরই নাম ছিল। অথচ তাঁদের মধ্যে যে ভেদ আছে সেটা সব সময়েই প্রকট হয়ে উঠত। আমি শ্রীবাবুর কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি। দিল্লীতে যখনই গিয়েছেন, আমায় খবর দিয়েছেন এবং আমার বাড়িতেও অনেকবার এসেছেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপার নিয়ে হয়তো মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু ব্যবহারে কোনও দিন তা প্রকাশ পায়নি। ফজল আলি কমিশন যখন বিহারে ঘুরছিলেন, আমিও তখন বিহারের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। মুখ্যমন্ত্রীরূপে শ্রীবাবু আমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। যদিও সেই সময়ে আমার বিহারে যাওয়াটা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবলবন্ত গোবিন্দ খের আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতেন। বোম্বের প্রধানমন্ত্রী হবার ফলে তাঁকে আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এরকম ভদ্র, শান্ত, সংযত মানুষ খুব কম দেখা যায়। প্রশাসক হিসেবেও অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন।

শ্রীরবিশঙ্কর শুক্লারও রায়পুরের বাড়িতে গিয়েছি, নাগপুরেও গিয়েছি। আরও অনেক জায়গায় অনেকভাবে তাঁকে দেখেছি। ৮০ বছর বয়স অবধি মুখ্য-মন্ত্রিত্ব করেন। যেমন সোজা চেহারা তেমনি কথাবার্তাও ছিল সহজ ও সরল। উনিও বেশ ভাল খেতে পারতেন। আর বৈঠকী গল্প করতে ও'র জুড়ি খুব কমই ছিল। কথাবার্তায় এত মিষ্ট ও ভদ্র যে, প্রথম আলাপেই মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ত।

রাজাজীর বিষয় সকলেরই জানা। আমি একবার ও'র ব্যাপারে কি বিপদে পড়েছিলুম তা আগেই 'কষ্টকল্পিত'তে লিখেছি। উনি যখন পশ্চিম বাংলার প্রথম গভর্নর হয়ে আসেন সেই সময়ে সুরেশদা (মজুমদার) ও প্রফুল্লদা (সেন) দু'জনে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একটি চিঠি দেন। চিঠি বহন করে নিয়ে যান অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। চিঠিতে লেখা ছিল যে রাজাজীকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশেষ পছন্দ করে না। তাঁর তীক্ষ্ম শ্লেষবাক্য এবং ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে-সমস্ত উক্তি তিনি করেছিলেন তার কোনটাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য চিঠিতে কোনও কাজ হয়নি। জওহরলাল একান্তভাবেই রাজাজীকে পশ্চিম বাংলায় পাঠাতে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ সম্বন্ধে পূর্বেই অনেক কথা লিখেছি। আমাকে পুত্রাধিক

স্নেহ করতেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে যে বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। পার্লামেন্টে তাঁর বক্তৃতাগুলি যেমন সংযত তেমনি তীক্ষ্ম অথচ রসকষবিহীন ছিল না। বিরুদ্ধপক্ষের তর্কজাল ছিন্ন করার সময় তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অনেক সময়ে বিরোধী পক্ষও উপভোগ করত। একটা ভুল ধারণা অনেকের মনে আছে যে, ও'র সব সময়েই মাথা নড়ত। সেটা 'সাইমন কমিশন' বর্জন আন্দোলনে আহত হওয়ার ফল। আহত হয়েছিলেন এটা ঠিকই, কিন্তু সেজন্য মাথা নড়ত না। ওটা ছিল একটা স্নায়বিক ব্যাধি।

ডঃ খান সাহেবের চেয়ে নাম বেশী ছিল আবদুল গফুর খানের। দুই ভাই-ই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনেক নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ডঃ খান সাহেবের ক্যাবিনেটে ডঃ চারুচন্দ্র ঘোষ বলে একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাড়ি হুগলী জেলার পান্ডুয়া থানার ইলছোবা-মন্ডলাই গ্রামে। তাঁকে আমরা একবার সংবর্ধনা জানিয়েছিলুম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করার ফলে পাঠান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালীর রসবোধটুকু যায়নি।

শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈ মহাশয় অতি শান্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। যেমন মধুর ব্যবহার, সেইরকম সাদর অভ্যর্থনা। তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল, নেতা, উপনেতা, সহ-নেতা ও কর্মীর মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করতেন না।

সবচেয়ে বিস্ময় লাগত যে, প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও এ'দের কারও মাথা খারাপ হয়নি। সকলেই কংগ্রেসের সেবক হিসেবেই জীবনযাপন করতেন এবং প্রতিদিনকার ব্যবহারেও সেটা প্রকাশ পেত। আমাদের মত ছোট কর্মীরাও অসংকোচে সব সময়ে এ'দের কাছে যেতে পারত। মন্ত্রিত্ব যে কোনও কোনও মানুষকে ভয়াবহ করে তুলতে পারে, এ'দের ব্যবহারে কোনও দিন তা লক্ষ করিনি। এ'রা যে শুধু প্রশাসনের কাজ করতেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামও করে যেতে হত। উড়িষ্যার গভর্নর নিয়ে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়, শীর্ণকায় বিশ্বনাথ দাস মহাশয় তাতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সে ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন সরকারকে অচল করে দেবার একটা সংকল্পও ছিল। আমার মনে হয়, সেই সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে ভারতবর্ষ অনেকগুলি দক্ষ প্রশাসক পেয়েছে।

১৯৫৯ সাল। শ্রীমতী ইন্দিরা কংগ্রেস সভাপতি। কেরলে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে জওহরলাল গিয়েছিলেন। জওহরলাল খুবই ক্ষুব্ধ। 'ওখানে যাঁদের হাতে সরকার আছে, তাঁরা পার্টি ছাড়া কিছু বোঝেন না এবং তার অনিবার্য ফল ফলবেই।'' জওহরলাল পরে লোকসভায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'কেরলের কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধ দলগুলিকে হুমকি দিয়ে যে ভাষণ দেন, তাতে বলেন

যে বিরুদ্ধ দলগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে চান তবে জনগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।' অবশ্য ১৯৫৭য় নাম্বুদ্রিপাদ সরকার গঠন হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়নি। তাঁরা হাতে ক্ষমতা পেয়ে 'Dictatorship of the proletariat' করতে গিয়েছিলেন। কেরলে যারা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নয়, তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার সর্বপ্রকার চেষ্টা সরকার আরম্ভ করেছিলেন। পুলিসকে পার্টির কাজে লাগানো হয়েছিল। যেসব জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট পার্টির কথা অনুযায়ী চলতেন না, তাঁদের বদলি করা বা উন্নতি বন্ধ করা হত। সংবিধানের বাইরে গিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বাসুপিল্লাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। বাসুপিল্লাই হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই আদেশ বহাল রাখে। কেরলে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা হবার পরই বাসুপিল্লাই-এর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার জন্য যে আবেদন করা হয়, সেই আবেদন অগ্রাহ্য হবার পর কম্যুনিস্ট সরকার এ কাজ করেন। আরও দশজন বন্দীরও মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করা হয়।

এইসব গুরুতর সংবিধানবিরোধী কাজ করার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সরকার নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বাতিল করে প্রেসিডেন্ট রুল জারি করেন তখন এক শ্রেণীর সংবাদপত্রসেবী তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খুব মুখর হয়ে ওঠেন। এঁদের যুক্তি ছিল অদ্ভুত। যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার, সেহেতু কম্যুনিস্ট সরকারকে বাতিল করা ভুল বা অন্যায় হয়েছে। যদি অকারণে রাজ্য সরকারকে বাতিল করা হয়, তবে সে কাজ সব সময়ে গর্হিত। আর যদি সত্যই বিধিসঙ্গত কোনও কারণ থেকে থাকে, তা হলে যে দলেরই সরকার হোক, তা বাতিল করার বিরুদ্ধে কোনও নিরপেক্ষ সাংবাদিকের মন্তব্য করা উচিত নয়। ১৯৫৯-এর আগে বহু রাজ্যের সরকার বাতিল করা হয়েছিল। সেগুলি সবই কংগ্রেসী সরকার। সেজন্য নিরপেক্ষ (?) সাংবাদিকরা হইচই করেননি। কেরালার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকরকমে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদ সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবিধান লঙ্ঘন করায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য হতে হয় সরকার বাতিল করবার জন্য।

রাজ্যপালের রিপোর্ট লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ যা পড়েন, তার মধ্যে আছে—

'কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা (১) অপর দশজন বন্দীর মৃত্যুদন্ড হ্রাস করিয়া, (২) রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভায় একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য নিয়োগের প্রশ্নে বিতর্ক তুলিয়া ও (৩) রাজ্যপাল কর্তৃক পূর্ব-ঘোষিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়মাবলী সংশোধন করিয়া সংবিধানিক রীতিনীতির প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন করেন।'

'পুলিসী ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া এবং কম্যুনিস্টদের নানারূপ জুলুমে উৎসাহ দিবার জন্য নূতন পুলিসী নীতি গ্রহণ করিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করা হয়।'

'পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রী মতবাদ প্রচারের জন্য কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করেন। আইনের সাহায্যে তাঁহারা সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দলের লোকদের ব্যাপক হারে শিক্ষাকার্যে

চাকুরি দেন। নবনির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট-চীনের ইতিহাস এবং তাহাদের অগ্রগতির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অপর পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস, তাহার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয় এবং স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে তাহার প্রগতির কথা হয় উপেক্ষা করা হয়, না-হয় বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়।'

'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মামলাদির অনুসন্ধান, শুনানি এবং আসামীদিগকে জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রায়ই সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ করিত।'

'ইহা প্রমাণ করার মত পর্যাপ্ত তথ্য আছে যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থকদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী অর্থের অপপ্রয়োগ করা হয়। অন্ধ্রের সহিত চাউলচুক্তি, সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি তাহাদের দুর্নীতি, অসাধুতা ও স্বজনপোষণের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।'

'ইহা প্রমাণ করার মত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে, কেরলে কম্যুনিস্টরা কেবল কম্যুনিস্টদের জন্যই শাসন চালায় এবং ২৮ মাস ব্যাপী লাল শাসনে কম্যুনিস্টদের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়।'

'এইসকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণের মনে নিরাপত্তার অভাব এবং আতংক দেখা দেয়। ইহাই পরে গণ-অভ্যুত্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সুপারিশ করিতে বাধ্য হন। কারণ, রাজ্যপাল মনে করেন যে, সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে দলের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে জনগণের ক্ষতি করিয়াছেন। গণতন্ত্রের আবরণে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করেন।'

একটু গোড়ার কথায় যাওয়া যাক। ১৯৫৭-এর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়নি। এজন্য প্রথম থেকেই ওদের নানারকম উপায়ে সরকার চালাতে হয়। নিম্নে নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হল—

কম্যুনিস্ট	৬০	[ভোটের শতকরা ৩৫ ভাগ]
কংগ্রেস	৪৩	[” ” ৩৭ ”]
পি এস পি	৯	
মুসলিম লীগ	৮	
নির্দল	৫	

১২৫

কম্যুনিস্ট পার্টির সংখ্যাধিক্য না হওয়ায় সরকার গঠনের জন্য নির্দল পাঁচজনের সহযোগিতা ও'রা গ্রহণ করেন এবং ফলে তাঁদের মধ্যে দু'জনকে মন্ত্রী করতে হয়। প্রদত্ত ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ভোটদাতাই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এটা সম্ভব হয়। মজার ব্যাপার হল—অ-কম্যুনিস্ট দল যদি কোনও জায়গায় শতকরা ৫১ ভাগের কম ভোট পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে, অমনি কম্যুনিস্টরা তারস্বরে চীৎকার করেন যে, এটা অগণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এ কাজ করছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, কম্যুনিস্টরাও ক্ষমতা লাভের সুযোগ পেলে ছাড়েন না। এই দু'জনের মেজরিটি রক্ষা করবার

জন্য নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে অনেক কাজ করতে হয়েছিল, যা তাঁরাও জানতেন সংবিধানবিরোধী বলে। আর ২৮ মাস শাসনের মধ্যেই সরকারের কার্যকলাপে গোটা কেরল উত্তাল হয়ে ওঠে। কেরলের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজারের কারাদণ্ড হয়, আরও ১০ হাজারের জরিমানা প্রভৃতি অন্য নানারকম সাজা হয়। যেসব জেলখানা ছিল তাতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেক কলকারখানা রিকুইজিশন করে তা জেলখানায় পরিণত করা হয়। কেরলে ২৭টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ২২টি, জেলার সবগুলি বার অ্যাসোসিয়েশন, কম্যুনিস্ট পার্টির ৪টি সংবাদপত্র ছাড়া কেরলের সব ক'টি সংবাদপত্র এবং শতকরা ৮০টি নির্বাচিত পঞ্চায়েত কম্যুনিস্ট সরকারের পদত্যাগের দাবিতে প্রস্তাব পাস করেন। আমি কেরলের প্রায় সব অঞ্চলেই ঘুরেছি। একবার নয়, বহুবার। নাম্বুদ্রিপাদ সরকার কিছু কিছু কল্যাণকর কাজ করেছেন—এটাও সত্য। কিন্তু সেসবই পার্টির মেম্বারদের কল্যাণের জন্য। গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধানকে উপেক্ষা করে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন। কেউ রেহাই পায়নি। আই এন টি ইউ সি-র কত শ্রমিক কর্মী যে লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির যারা সদস্য নয়, তাদের জন্য নাম্বুদ্রিপাদ সরকার কোনও শ্রেণীভাগ করেননি—এটা সত্য। বিত্তবান ও বিত্তহীন অ-কম্যুনিস্টরা সমানভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, মনে হত যে, সরকার নেই; কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই আছে এবং তাদের হাতেই সব ক্ষমতা। পরে হয়তো এ নিয়ে আরও বিচার বিশ্লেষণ হবে। কিন্তু আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে মনে হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, নাম্বুদ্রিপাদ সরকার তা ভুলে গেছেন এবং অ-কম্যুনিস্ট সমস্ত শক্তি তাদের কাজের ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ওখানে মিছিলকে বলে 'জাঠা'। সব ধর্মের, সব শ্রেণীর, সব বয়সের লোক এমন হাজার হাজার 'জাঠা' বার করে সরকারের বিরুদ্ধে। অবস্থা এমন হয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা, পার্টির সেক্রেটারী শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন যে, অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং কেরালায় ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আর মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ নিজে বলেন যে, অবস্থা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং রোজই অবস্থা আরও ভয়াবহ হচ্ছে। সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় আছে—

[It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution.]

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ ১৯৫৯-এর আগস্টে লোকসভায় কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের বক্তৃতায় বলেন—

'That the fact that the situation was serious and it was such that it could not be managed without the aid of the central government was accepted. But it was said that the central government did not give any help. What could the centre do in this circumstances? ***No request came from Kerala and no suggestion was made for any aid or assistance. How can the centre help a state unless its assistance is sought? The affairs of a state are normally

under the control of the state government. We cannot impose any police force which will only lead to confusion. We cannot impose any military and we cannot do anything unless we are asked to help the state. The state government will be helped whenever any such assistance is sought, and that has been made very clear. But when deliberately no assistance is sought how is the situation to be brought under control and the needful to be done.? Article 355 only state the condition under which the action can be taken. The operative part is found in article 356 and that is when under 355 situation has arisen, action has to be taken under 356. That a situation under article 355 had arisen is admitted by the Kerala Ministry and also by the leadership of the Communist party. They did not ask for any sort of assistance either by way of police or the army or any apparatus which is under the control of the central government.'

কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং নাম্বুদ্রিপাদ সরকার—দু'পক্ষেই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে বিবৃতি দেন। কিন্তু কেন্দ্র যখন জানতে চায় যে, কি সাহায্য তারা করতে পারে, কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় আরও বলেন—

'When they did not ask for assistance, and they admit that the situation is such that the action has to be taken by the centre in order to set matters right, how can we be blamed for doing what they thought was necessary but which they did not choose to ask us to do. They did not accept our advice that mid-term election may be held. They did not ask for any help.'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতায় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নাম্বুদ্রিপাদ সরকার মধ্যবর্তী নির্বাচন চাননি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনরকম সাহায্যের পরামর্শ দেননি, যদিও তাঁরা ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ উল্লেখ করেছিলেন। এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাই, অথচ তাঁদের কি সাহায্য চাই তাও জানাব না, আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরামর্শও গ্রহণ করা হবে না। এই অবস্থায় যে-কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন—এ অভিযোগ টেকে না। আর যদি বিশেষ বিশেষ অভিযোগের কথা উল্লেখ করা যায়, তার তো ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসুপিল্লাই-এর মামলা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন, তা খুবই বিস্ময়কর। 'বাসুপিল্লাই-এর মামলার বিষয় অত্যন্ত চমকপ্রদ। বাসুপিল্লাই কংগ্রেস-কর্মী হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমার জন্য আবেদন করা হয় কিন্তু সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কেরলে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার শাসনভার গ্রহণের বহু পূর্বেই এইসকল ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাসুপিল্লাই-এর ফাঁসি হয় নাই। শাসনভার গ্রহণের পরই কম্যুনিস্ট সরকার আইনবিরুদ্ধভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ জারি

করেন। কেরল সরকার বাসুপিল্লাই সম্পর্কেও অনুরূপ আদেশ জারি করেন। কিন্তু এই ব্যাপার সম্পর্কে সকল বিধিই অবলম্বিত হইয়াছিল এবং বাসুপিল্লাই-এর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিবার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারের ছিল না। ভারতের অ্যাটর্নী জেনারেল তাঁহার অভিমতে বলেন, "রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমার আবেদন অগ্রাহ্য হইবার পর রাষ্ট্রপতির নির্দেশের বিরোধী হইতে পারে এইরূপ কোনও নির্দেশ জারি করা রাজ্য সরকারের উচিত হয় নাই।"

'কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি বাসুপিল্লাইকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যদিও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কথা দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা এইরূপ কার্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা আরও আগাইয়া যান এবং বাসুপিল্লাইকে কেরলের স্পীকারের গ্যালারিতে বসিয়া বিধানসভার অধিবেশন দেখিতে দেওয়া হয়। সৌভাগ্যবান বাসুপিল্লাইকে মন্ত্রীর গাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায়।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তৎকালীন কেরল সরকার দেশে যে সংবিধান আছে, অথবা রাষ্ট্রপতি আছেন অথবা আইনকানুন আছে, সে সম্পর্কে গভীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। প্রায় ১৯।২০ বছর আগেকার ঘটনা। তৎকালীন নথিপত্র দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, তখনকার কেরল সরকার মনে করেছিলেন যে, তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ—সুপ্রীম কোর্টও নেই, রাষ্ট্রপতিও নেই, সংবিধানও নেই। রাজ্যপালের যে চুম্বক রিপোর্ট লোকসভায় পঠিত হয়, তাতে অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল—

'The commutation of sentences of death of ten prisoners even after the President's rejection of mercy petitions earlier, the question of the nomination of an anglo-Indian member by the governor to the assembly and ammendment of the public service commission rules,'— এই তিনটিতেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, রাজ্যপালকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১০ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর প্রার্থনা না মঞ্জুর করা সত্ত্বেও কেরল সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব করেন।

এখন সে কংগ্রেস সরকারও নেই, সে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারও নেই। কম্যুনিস্ট দল দ্বিধা-ত্রিধাবিভক্ত। কংগ্রেস দলও তাই। এখন যদি বেশ নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, কেরালা সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যা করেছিলেন, তা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, কেরল রাজ্য দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে ১৯৫৮-এর পর থেকে কোনও সরকারী যন্ত্র জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন সাধারণত অনেকেই পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার বহুবার বহু কংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে বাতিল করেছেন। সেইসব বাতিলের কারণ এবং কেরল সরকার বাতিলের কারণ নিয়ে যদি তুলনামূলক সমালোচনা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসী রাজ্যগুলির বাতিলের কারণ তৎকালীন কেরল সরকারের বাতিলের কারণের চেয়ে অনেক লঘু ছিল।

খুব ছেলেবেলায় একবার বিপাকে পড়েছিলুম। রানী বিড়ি খাচ্ছে দেখে যাত্রা দেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হতে পারে যাত্রা দলের রানী—কিন্তু রানী তো! আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ছিল—

'জয় জয় পঞ্চম জর্জ নৃপোত্তম
জয়তি চ মহিষী মেরী।'

এ তো ছিলই, তা ছাড়া যেসব গল্পের বই আমাদের কাছে আসত, তাতে রাজা, রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর—এসব থাকত। পাড়ায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে কয়েকজন রাজাও ছিলেন। সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁকে আমরা 'বড়রাজা' বলতুম। আর ছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—'ছোটরাজা'। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ির সামনে ছিল 'টেগোর ক্যাসেল', যেন ইউরোপের কোনও ক্যাসেল এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা 'টেগোর ক্যাসেলে' মাঝে মাঝে যেতুম। খুব বড় বড় ঘোড়া ছিল, বলত 'Waler' ঘোড়া। দাম নাকি দশ হাজার, পনর হাজার—এরকম সব। আর ছবি-টবি যা দেখতুম রাজা-মহারাজাদের, মাথায় একটা মুকুটের মত, আর কোমরে তরোয়াল তো থাকতই। প্রথম যখন একজন রাজবংশীয়কে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলুম, পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের মতই সাধারণ। শুনলুম, নলডাঙার রাজপরিবারের লোক। প্রায় সেই সত্তর বছর আগেকার কথা—তখনই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাবা ও মায়ের গুরুদেব। তবে এ গুরু অন্যরকম। কত জিনিস যে আমাদের দিতেন—আর পুজোর সময় গরদের পাঞ্জাবি বাঁধা ছিল। ওঁর সঙ্গে হবে, কি বাবার সঙ্গে হবে, মনে নেই—একবার একটি বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, রাজবাড়ি। বেশ বড় বাগান। আমরা সব বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। দেখা গেল, বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়ে রয়েছে। মালীরা কাজ করছিল। তারা গ্রাহ্য করল না। আমাদের পা আর পেয়ারাগাছের কাছ থেকে নড়ল না। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়ারা দেখতে লাগলুম। এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কি বাবু, পেয়ারা খেয়েছ?' মনে হল বাড়ির বেশ পদস্থ কর্মচারী। মালীরা উঠে দাঁড়াল। উনি তখন একটা গাছের ডাল ধরে নামিয়ে দিলেন। আমাদের আর হাত সরে না। যা হোক, একটা দুটো করে তো পেয়ারা পাড়া হল। উনি তখন আমাদের বললেন, 'চল বাড়ির মধ্যে।' তখন আমার একটু সাহস হয়েছে। বললুম, 'শুনলুম এটা রাজবাড়ি। পেয়ারা নিলুম, রাজামশাই রাগ করবেন না তো?' উনি একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, রাজামশাই একটু বদরাগী আছেন। তা চল না, সব ঠিক করে দেওয়া যাবে।' বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে যেতেই সবাই দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম করল। উনি একজনকে আমার বাবার নাম করে বললেন যে, ওনার ছেলে; ওকে আমি পেয়ারা খাওয়াচ্ছিলুম। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বললেন, 'মহারাজ কি ওদের সঙ্গে খেলা করছিলেন?' শুনেই তো আমি কিরকম হয়ে গেলুম। মহারাজ মানে? নদীয়ার মহা-

রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর ক্ষৌণীশচন্দ্র। কি সর্বনাশ! আমরা তো বিক্রমাদিত্য আর কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব চিনতুম। একজনকে চিনতুম বেতালের জন্য, আর একজনকে গোপাল ভাঁড়ের জন্য। তারপর বর্ধমানের মহারাজকে দেখেছি। ও'র অনেক বইও ছিল—আর্ট পেপারে ছাপা, প্রতি পাতায় সুন্দর করে ছবি আঁকা। বর্ধমানে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন সাহিত্যিকরা বলেছিলেন যে, এক দিকে সীতাভোগ-মিহিদানার পাহাড় আর তার নীচে দই-ক্ষীরের নদী। আর একজন মহারাজের কথা জীবনে ভুলব না। নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ রায়। 'মানসী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর 'মানসী'র সঙ্গে 'মর্মবাণী' যুক্ত হয়। এই 'মানসী'তে বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বেরিয়েছিল। 'শ্রুতি স্মৃতি' বলে উনি এক Memoirs লেখেন। ভাষা পড়ে লোকে বলত 'মণিমুক্তাখচিত ভাষা'। জগদিন্দ্রনাথের এমন একটা মর্যাদাবোধ ছিল, যা খুব কম লোকেরই থাকে। গরিমা এবং অহংকারবর্জিত যে মহিমা এবং মর্যাদা, তার ষোল আনা ছিল জগদিন্দ্রনাথের মধ্যে। আরও অনেককে কাছ থেকে দেখেছিলুম। গোড়ায় রাজা-মহারাজা সম্বন্ধে মনে যে সম্ভ্রম ছিল, ধীরে ধীরে তা অনেক কমে গিয়েছিল। বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, তরোয়ালগুলো ভুয়ো। এ'রা সকলেই ছিলেন জমিদার।

'The word Zamindar was, in the official nomenclature of Bengal, merely a convenient general term which included land-holders and tenure-holders of several separate kinds, who were entitled to hold directly under the state, and to pay the land-tax directly to it. The first class of Bengal Zamindars represented the old Hindu and Muhammadan Rajas of the country, previous to the Moghul conquest by Emperor Akbar in 1576, or persons who claimed that status. The second class were rajas or great land-holders, most of whom dated from the 17th and 18th centuries, and some of whom were, like the first class, "de facto" rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land-tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Feudatory chiefs of the British Indian Empire, but the position was enjoyed by them on the basis of custom not of treaties. The third and most numerous class were persons whose families had held the office of collecting the revenue during one, or two, or more generations, and who had thus established a prescriptive right. A fourth and also numerous class was made up of the revenue-farmers, who, since the Dewani grant in 1765, had collected the land-tax for the East India Company under the system first, of yearly leases, then of five years leases, and again of yearly leases. Many of these revenue-farmers had by 1787 acquired the "de facto" status of Zamindars. It is these fundamental differences in origin which have led to such contradictory statements, alike in Indian history and in the Indian law courts, as to the title of the Bengal Zamindars. The result of the

Permanent Settlement in 1793 was to place all classes of Zamindars on a uniform legal basis, and so in a short time to obliterate the previous differences in the customary status of several classes which had grown out of differences in origin.'

[Hunter's Bengal MSS records PP. 31-32]

এঁদের গভর্নমেন্টের সঙ্গে আরও চুক্তি ছিল যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অশান্তি হলে সেই অশান্তি দমন করবার জন্য এঁরা সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। পরবর্তী কালে সত্যিকারের যাঁরা রাজা-মহারাজা, অর্থাৎ যাঁদের দেশীয় রাজ্যের অধিপতি বলা হত, তাঁদের অনেককেই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। এ ইংরাজের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এইসব রাজারা এবং তাঁদের রাজত্বগুলি ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত যে ভারতবর্ষ, তার সঙ্গে এসব রাজা বা রাজ্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এঁদের রাজ্যে এঁরাই প্রধান। কারো কারো নিজের সৈন্যসামন্ত ছিল, কারো কারো ছিল রেল। আচার-ব্যবহার, বিচারপদ্ধতি—সবই আলাদা। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কয়েক শত টুকরো করে ইংরাজ ভারতবর্ষ শাসন করত। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকার শাসন করতেন, তাকে বলা হত 'British India', আর বাকীটা ছিল দেশীয় রাজ্য। তারা ছিল ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীর অধীন। আর বাকী ভারতবর্ষ ছিল ভারত সরকারের অধীন। ভারতবর্ষে এর পূর্বে আরও কয়েকটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে—মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য। কিন্তু দেশকে টুকরো টুকরো করে কেউ দেশ শাসন করেনি। আর এইসব দেশীয় রাজারা কতরকম সুবিধা উপভোগ করতেন! প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বাধীনই ছিলেন। ভারতবর্ষের ভাইসরয়কে তাঁরা সম্মান দেখাতেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজরা তো ঘোষণা করলেন যে, এইসব দেশীয় রাজারা মুক্ত।

Cabinet Mission's Plan

On 22nd May, the Cabinet Mission issued the memorandum dated May 12, 1946 in regard to state treaties and paramountcy (Appendix-II); it affirmed that the rights of the states which flowed from their relationship with the crown would no longer exist and that the rights surrendered by the states to the paramount power would revert to the states. The void caused by the lapse of paramountcy was to the filled either by the states entering into a federal relationship with the successor government or governments in British India, or by entering into particular political arrangements with it or them. The memorandum also referred to the desirability of the states in suitable cases, forming or joining administrative units large enough to enable them to be fitted into the constitutional structure, as also of conducting negotiations with British India in regard to the future regulation of matters of common concern, specially in the economic and financial field.

ভারত সরকার ১৯৪৭-এর ৩রা জুনের এক বিজ্ঞপ্তিতে Cabinet mission-এর উপর্যুক্ত memorandum গ্রহণ করলেনঃ

'His Majesty's government wish to make it clear that the

decisions announced above relate only to British India and that their policy towards Indian states contained in the cabinet mission memorandum of 12th May 1946, remains unchanged.'

অর্থাৎ ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার—দু'পক্ষ থেকেই ঘোষণা করা হল যে, দেশীয় রাজ্য মুক্ত। তাদের কোনও সরকারের সঙ্গেই কোনও চুক্তি রইল না; যেসব চুক্তি হয়েছিল, সব বাতিল। এর মানে একটাই। ব্রিটিশ ভারত স্বাধীন হল। আর প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য—তারাও স্বাধীন। এইসব দেশীয় রাজ্যের বাধ্য-বাধকতা ছিল ইংরাজ-রাজের সঙ্গে। ইংরাজ-রাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তাঁদের কতকগুলো বিধিনিষেধ মানতে হত। ব্যস্! এক ভারতবর্ষ ৬০১টিতে পরিণত হল। ইংরাজ যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল, এক দিকে ভারতবর্ষ তখন বিভক্ত; আর এক দিকে ছয় শতটি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করে গেল যে, তারা মুক্ত। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে দেশভাগজনিত সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার উপর হল দেশীয় রাজ্যের সমস্যা।

১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সামনে দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দেয়। এক দিকে ভারতবর্ষ ভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, তার উপরে আবার কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ। আরও পরে নিজাম হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে স্বাধীন করার হুমকি দিয়েছিলেন। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে নেহরু সরকার দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হন। ছায়া ক্যাবিনেট গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটি দপ্তর হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা খুব জটিল। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের প্রায় ৬০০টি অঞ্চল প্রশাসনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত নয়। দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার নেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি ১৯৪৭-এর ৩রা জুলাই এক বিবৃতি দেন:

'It is the lesson of history that it was owing to her political fragmented condition and our inability to make a united stand that India succumbed to successive waves of invaders. Our mutual conflicts, and internecine quarrels and jealousies have in the past been the cause of our downfall and our falling victims to foreign domination a number of times. We cannot afford to fall into those errors or traps again. We are on the threshold of independence. It is true that we have not been able to preserve the unity of the country entirely unimpaired in the final stage. To the bitter disappointment and sorrow of many of us some parts have chosen to go out of India and to set up their own government.

But there can be no question that despite this separation a fundamental homogeneity of culture and sentiment reinforced by the compulsive logic of mutual interests would continue to govern us. Much more would this be the case with that vast majority of states which owing to their geographical contiguity and indissoluble ties, economic, cultural and political, must continue to maintain relations of mutual friendship and co-operation with the rest of India. The safety and preservation of these states as well as of India demand unity and mutual co-operation between its different parts

'When the British established their rule in India they evolved the doctrine of paramountcy which established the supremacy of British interests. That doctrine has remained undefined to this day, but in its exercise there has undoubtedly been more subordination than co-operation. Outside the field of paramountcy there has been a very wide scope in which relations between British India and the states have been regulated by enlightened mutual interests. Now that British rule is ending, the demand has been made that the states should regain their independence. In so far as paramountcy embodied the submission of states to foreign will, I have every sympathy with this demand, but I do not think it can be their desire to utilise this freedom from domination in a manner which is injurious to the common interests of India or which initiates against the ultimate paramountcy of popular interests and welfare or which might result in the abandonment of that mutually useful relationship that has developed between British India and Indian states during the last century. This has been amply demonstrated by the fact that a great majority of Indian states have already come into the constituent Assembly. To those who have not done so, I appeal that they should join now.'

[White papers on Indian states.—1950, pages —157, 158].

সর্দারের পরিস্কার, প্রাঞ্জল বিবৃতি: কোনও গোঁজামিল নেই। ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে ভারতবর্ষ টুকরো-টুকরোভাবে ছিল বলে বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত ও পদানত হয়েছে। আমাদের নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা আমাদের পতন ঘটিয়েছে এবং বিদেশীর অধীন করেছে। সেই ভুল আর আমরা করতে পারি না। দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও সান্নিধ্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তাদের বহু শত বৎসরের যে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে, তা আমাদের বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এইসব দেশীয় রাজ্যের নিরাপত্তা ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সর্দারের বক্তৃতা কেবলমাত্র একজন মন্ত্রীর বক্তৃতা নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক সীমানা আবার যাতে টুকরো টুকরো না

হয়, সেই দিকে দেশীয় রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বক্তৃতা। সর্দারের এ বক্তৃতায় কাজ হয়। সুখের বিষয় যে, রাজন্যবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা হয়তো মনোভাব ভাল করে প্রকাশ করতে পারতেন না, যদি সে সময়ে সর্দারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সাহায্য না পেতেন।

সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কময় স্বীকৃতিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ হল। সেখানে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা অসহায়ের মতন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার আর দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ। দু' ভাবে বাধা দেওয়া যায়; এক বুঝিয়ে, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে; আর এক সামরিক শক্তিতে। বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। সর্দার সেদিক দিয়ে যাননি। জোর করে রাজন্যবর্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় সাফল্য হয়তো হত; কিন্তু যে রক্তক্ষয় ও অশান্তি হত, তার মূল্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন ধরে দিতে হত। যদিও কোনও কোনও বৃহৎ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেরই মত পাওয়া যায়। ১৯৪৭-এর ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সর্দার একটি বিবৃতি দেন। তার মধ্যে আছেঃ

'In the world of today where distances are fast shrinking and masses are being gradually brought into touch with latest administrative amenities, it is impossible to postpone for a day longer than necessary the introduction of measures which would make the people realise that their progress is also proceeding at least on the lines of their neighbouring areas. Delays inevitably lead to discontent, which in its turn results in lawlessness; the use of force may for a time check the popular urge for reform, but it can never succeed in eradicating it altogether. Indeed, in many of states with which I had to hold discussions during the last two days, large-scale unrest had already gripped the people; in others the rumblings of the storm were being heard. In such circumstances, after careful and anxious thought, I came to the conclusion that for smaller states of this type placed in circumstances which I have described above, there was no alternative to integration and democratisation.'

[White papers on Indian states, 1950. page—175].

সর্দারের এ বক্তৃতার ফলে কাজ অনেক দূর এগুলো। এখন যাকে রাজস্থান বলা হয়, আগে তাকে বলা হত 'রাজপুতানা'। দক্ষিণ-পূর্ব রাজপুতানার বাঁশোয়ারা, বুন্দি, ডোঙ্গরপুর, ঝালাওয়ার, কিষেণগড়, কোটা, প্রতাপগড়, শাহাপুরা এবং টঙ্ক নিয়ে প্রথম রাজস্থান Union গঠিত হয় ১৯৪৮-এর ২৫শে মার্চ। তারপর এর সঙ্গে মেবারও যুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৮-এ বর্ধিত রাজস্থান Union-এর উদ্বোধন করেন। তারপরে গোটা রাজস্থান নিয়ে ৩০শে মার্চ, ১৯৪৯ সালে বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যও ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আরম্ভ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে

রাজন্যভাতা ও দেশীয় রাজাদের বিভিন্ন সুবিধাদানের ব্যবস্থাও হয়। যখন রাজন্যভাতা এবং সুবিধার (Privileges) জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে রাজন্যবর্গের চুক্তি হয়, তখন এই চুক্তির নৈতিক দিক সম্বন্ধে ভারত সরকার সচেতন ছিলেন। এই বিষয় সম্বন্ধে 'moral aspects of treaties' শিরোনামায় White papers on Indian states, 1950 —১৩৪ পৃষ্ঠার ২৪৯ পরিচ্ছেদে আছে ঃ

'It is a recognised principle of International law that the treaties for the duration of whose obligations no special period is fixed, are not to be understood as binding the contracting powers in the event of some material change in the conditions with reference to which they were concluded. An essential change of conditions—the term includes not only material but also moral facts—necessarily involves the obsolescence of treaty obligations.'

Coupland has admirably summed up the position as follows:

'The law can only take account of usage and sufferance, but there is also a moral proviso which is insusceptible of legal definition. No undertaking can be rightly interpreted without weighing the effect of lapse of time and change of circumstance. It is not only a question of material factors; it is also a question of morals No compact can endure when, owing to the evolution of ideas, it has ceased to square with general conceptions of right and wrong. In this sense "rebus sic stantibus" is the implicit condition of every treaty. And certainly things no longer stand in India as they stood when most of the treaties were made.'

Coupland has further emphasised that 'no compact can endure when, owing to the evolution of ideas, it has ceased to square with general conceptions right and wrong'.

সবসুদ্ধ মোট ২৮১টি রাজ্য privy purse ও privileges-এর অধিকারী হয়। মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৫,৫৪,৯৩,১৯৯। সবচেয়ে বেশী পেতেন হায়দ্রাবাদের নিজাম—৫০ লক্ষ টাকা; আর সবচেয়ে কম গুজরাটের Katodia নামক রাজ্য—বছরে ১৯২ টাকা। নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি ১০ লক্ষ অথবা তার বেশী ভাতা পেতেন।

১। হায়দ্রাবাদ—৫০ লক্ষ
২। বরোদা—২৬ লক্ষ ৫০ হাজার
৩। মহীশুর—২৬ লক্ষ
৪। গোয়ালিয়র—২৫ লক্ষ
৫। জয়পুর—১৮ লক্ষ
৬। ত্রিবাঙ্কুর—১৮ লক্ষ
৭। যোধপুর—১৭ লক্ষ ৫০ হাজার
৮। বিকানীর—১৭ লক্ষ
৯। পাতিয়ালা—১৭ লক্ষ
১০। ইন্দোর—১৫ লক্ষ

১১। ভূপাল—১১ লক্ষ
১২। মেবার—১০ লক্ষ
১৩। নবনগর—১০ লক্ষ
১৪। ভবনগর—১০ লক্ষ
১৫। রেওয়া—১০ লক্ষ
১৬। কোলাপুর—১০ লক্ষ

আর ৫ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ পেতেন ৮৬ জন। ১ লাখের নিচে ১৭৯ জন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার পেতেন সাড়ে আট লক্ষ টাকা। আর যেসব privileges ছিল তার উল্লেখ না করাই ভাল; মায় Electric Tax, Water Tax এসবও ছিল।

বর্তমানে রাজন্যভাতা ও privileges অতীত ইতিহাসের একটা অধ্যায়। কিন্তু যে অবস্থায় এইসব প্রবর্তিত হয়েছিল, সে অবস্থার কথা বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে সর্দারের মানসিক দৃঢ়তা ও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভারতবর্ষ আবার টুকরো টুকরো হয়ে অশান্তিতে ডুবে যায়নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষের প্রশাসনে সর্দারের অবদানের এখনও সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। সর্দার, যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের ৪৭ শতাংশ (দেশীয় রাজ্য) বিনা রক্তপাতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। পৃথিবীর আর কোনও রাষ্ট্রনায়ক আজ অবধি এ কাজ করতে সক্ষম হননি।

এর আগে আমি চীনের হানার কথা লিখেছি। এবং তেজপুর হাসপাতালে ভারতীয় সৈন্যরা কিভাবে কান্নাকাটি করেছিল তাও বলেছি। সব সৈন্যরই হাত-পা ফ্রস্টে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, তারা রাইফেল তুলতে পারেনি। কারণ, ১৪000 ফিট উপরে বরফ ও তুষারপাতের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল কেবল সুতীবস্ত্র পরে। এই মর্মন্তুদ ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও কঠোর সত্য। চীন আক্রমণ করল, বিনা প্রতিরোধে জয় করল, ভারতবর্ষের মুখে চুনকালি মাখিয়ে চলে গেল। এর দ্বারা একটাই সত্য উদ্ঘাটিত হল যে আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী দায়িত্বহীন এবং তাঁর প্রতিরক্ষা দপ্তর অকর্মণ্য। সিভিল ইনটেলিজেন্স পনরো-বিশ হাজার ফিট ওপরে কিরকম থাকে জানি না, কিন্তু মিলিটারী ইনটেলিজেন্সকে এইসব সীমান্তে প্রহরীর কাজ করতে হয় এবং খবর পাঠাতে হয়। এ ব্যাপারে আমি সরকারীভাবে কিছু দিন জড়িত ছিলুম। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সীমান্ত, তা সে যত ফিট উঁচুতেই হোক, সেখানে যেমন সীমান্তরক্ষী থাকে, তেমনি মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের ব্যবস্থাও থাকে। সে সময়ে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স চীন সীমান্ত সম্বন্ধে সতর্ক থাকলেও, তারা অসহায় ছিল। চীন সীমান্ত থেকে যে রিপোর্টই যেত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেনন তা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। কোনও অফিসার যদি চীন আক্রমণের সম্বন্ধে কিছু

বলতে যেতেন, তিনি মন্ত্রীর বিরাগভাজন হতেন। কৃষ্ণমেনন সদাসর্বদা বলতেন যে, চীন এবং ভারত-সীমান্ত শুধু দুর্ভেদ্য বরফ-সমাকীর্ণ হিমালয় দ্বারা সুরক্ষিত তা নয়, আমাদের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব হিমালয়ের মতো সুদৃঢ়। ১৯৫৭ সালে যখন প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক মন্ত্রক টের পান যে, চীন আকসাই চীনের মধ্য দিয়ে লাদাক অঞ্চল অবধি সৈন্য যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করেছে, তখন তা পার্লামেন্টে প্রকাশ করা হয়নি আর জনসাধারণকেও জানতে দেওয়া হয়নি। অথচ, এটা ছিল সম্পূর্ণ সমর-আয়োজন। সেই সময়ে লাদাক সীমান্তে দশজন ভারতীয় সৈনিক চীনা সৈনিকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে। তা নিয়ে একটু হইচই হল। আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এই দশজন সীমান্ত-রক্ষীর মধ্যে নয়জন ছিল পশ্চিম বাংলার—তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কালিম্পং-এ একটি স্মৃতিস্তম্ভ করা হয়। এ সবের আগেই অবশ্য ১৯৫৪-তে চার দিনের জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষে এসে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছেন। এর কিছু আগেই টিবেটের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এবং চীন তা অধিকার করেছে। ১৯৫৪-তেই, চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষে আসবার দু' মাস আগেই, ভারত সরকার সরকারীভাবে তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই সময়ে ভারত সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের যে চুক্তি হয়, মোটামুটি তারই ওপর ভিত্তি করে চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষে যখন ছিলেন তখন 'পঞ্চশীলের' নীতি নির্ধারিত হয়ঃ

1. Mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity.

2. Non-aggression pact.

3. Non-interference in each other country's internal affairs.

4. Equality of status and mutual benefit.

5. Peaceful co-existence between the countries concerned.

অর্থাৎ,

১। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও এলাকার সীমানা মানিয়া লওয়া।

২। সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পারস্পরিক আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে।

৩। সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পারস্পরিক অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

৪। নিজেদের মধ্যে সমভাব বজায় রাখা ও পারস্পরিক কল্যাণের জন্য কাজ করা।

৫। পারস্পরিক সহাবস্থান।

বিস্ময়ের ব্যাপার, যখন চীন সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তিপত্র সই হয়, তখন আকসাই চীনে ভারত আক্রমণের রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। এবং প্রতি-রক্ষা মন্ত্রক সে খবর রাখতেন। সাধারণের জানবার কোনও উপায় ছিল না। কারণ, যে অঞ্চল দিয়ে রাস্তা আসছিল, সে অঞ্চলের অনেকটা ভারতবর্ষের মধ্যে হলেও সেখানে কোনও জীবিত প্রাণী বাস করত না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানতে পারলেও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্ব দেননি। যখন জানতে পেরে ভারতবর্ষে এবং পার্লামেন্টে এই নিয়ে হইচই হয়, তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলতেন, এ নিয়ে হইচই-এর কি আছে। ওখানে তো কোনও জীবিত প্রাণী নেই। একটা রাস্তা হচ্ছে, ভালোই তো হচ্ছে। আমার ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় এক হাজার

থেকে বারো শো বর্গমাইল ভারত-ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ঐ রাস্তা আসছিল। এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিলেন জওহরলাল। কৃষ্ণমেননের কোনও সমালোচনা হলেই জওহরলাল মনে করতেন, বুঝি তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে; যাঁরা একটু-আধটু সমালোচনা করতেন, জওহরলালের প্রতি আনুগত্য ও জওহরলালের প্রতি ভীতিতে তাঁদের সমালোচনা প্রায়ই অস্ফুট থেকে যেত। আর কংগ্রেসের বাইরে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কম্যুনিস্টরা ছিলেন কৃষ্ণমেননের পূর্ণ সমর্থক। এবং অন্য যাঁরা, তাঁদের সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনও আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হত। তখন অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়নি। অবশ্য সরকারের মধ্যেও কিছু লোক এমন ছিলেন যাঁরা সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণমেননকে বাধা দেবার চেষ্টা করতেন। ফলে, কৃষ্ণমেনন মন্ত্রী থাকাকালে কখনও রাশিয়া যেতে পারেননি। মন্ত্রিত্ব যাবার পর কৃষ্ণমেনন রাশিয়া গিয়ে ছিলেন peace conference-এ যোগদান করবার জন্য।

কৃষ্ণমেননের ভারতীয় রাজনীতিতে অভ্যুত্থান প্রায় বিনা বাধাতেই হয়েছিল। কারণ, সবটাই ঘটেছিল জওহরলালের সমর্থনে। কৃষ্ণমেনন প্রথমে ছিলেন অ্যানি বেসান্তের Theosophical Society-তে। ১৯২৮-এ অ্যানি বেসান্ত ওঁকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন ওখানকার Theosophical Society-র একটি স্কুলে পড়াবার জন্য। সেই সূত্রে কৃষ্ণমেনন অ্যানি বেসান্তের Commonwealth of India League-এর যুগ্ম সম্পাদক হন। সেই সময়ে ঘটনাচক্রে জওহরলালের সংস্পর্শে আসেন। ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর জওহরলাল কৃষ্ণমেননকে মন্ত্রি-সভায় নিতে চান। গান্ধীজীর আপত্তির জন্য তা সম্ভব হয়নি। পরে কৃষ্ণমেনন ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। এই হাই কমিশনার থাকাকালীন অনেক কেলেঙ্কারির সূত্রপাত করেছিলেন। যে সম্বন্ধে পরে পার্লামেন্টের Public Accounts Committee সমালোচনা করেন এবং তা নিয়ে পার্লামেন্টে ঝড় ওঠে। এই কেলেঙ্কারির মধ্যে প্রধানতম ছিল 'জীপ কেলেঙ্কারি'।

ভারত সরকার কতকগুলি জীপ কেনবার জন্য ইংলণ্ডের হাই কমিশনারকে জানান। হাই কমিশনার কৃষ্ণমেনন মিঃ পটার নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে জীপ কেনার চুক্তি করেন। আশ্চর্যের বিষয়, মিঃ পটারের ব্যবসায়ের মূলধন ছিল ভারতীয় মুদ্রায় মোটে পাঁচ শত টাকা। জীপগুলি ভারতবর্ষে পৌঁছবার পর দেখা যায় এগুলি পুরাতন ও মেরামত-করা জীপ। ভারতবর্ষের সামরিক বিশারদরা সঙ্গে সঙ্গে জীপগুলি বাতিল করে দেন। এতে ভারত সরকারের লোকসান হয় এগারো লক্ষ টাকা। মিঃ পটার আরও খেসারত দাবি করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটে-ছিল বোধ হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে। এ ছাড়াও ছিল ammunition কেনার কেলেঙ্কারি। এই অ্যামুনিশান কেলেঙ্কারিতেও ভারত সরকারের সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিল। এ ছাড়া আরও নানারকম দুর্নীতির কথা তখন ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলবন্ত গোবিন্দ খের ইংলণ্ডের হাই কমিশনার হন এবং কৃষ্ণমেননের কাছ থেকে ইণ্ডিয়া অফিস অব্যাহতি পায়।

জওহরলাল পুনরায় কৃষ্ণমেননকে ১৯৫৪ সালে ক্যাবিনেটে নেবার প্রস্তাব তোলেন। মৌলানা আপত্তি করেন। আপত্তির মূল কারণ ছিল 'জীপ স্ক্যাণ্ডাল'। তারপর যখন ভারত সরকার বহু ক্ষতি করে এসব স্ক্যাণ্ডাল মেটালেন তখন ১৯৫৬। জওহরলাল কৃষ্ণমেননকে Minister without Portfolio করে মন্ত্রি-

সভায় নেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হবার পর অনেক কথাই আমাদের কানে আসত। কিন্তু জওহরলাল কোনও কথারই গুরুত্ব দিতেন না। পার্লামেন্টে আমরা যারা ছিলুম, আমরাও জওহরলালকে বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস করতুম না। ১৯৫৪-য় মৌলানার আপত্তিতে জওহরলাল যখন কৃষ্ণমেননকে ক্যাবিনেটে নিতে পারেননি তখন একদিন পার্টি মিটিং-এ জওহরলাল আমাদের পদত্যাগ করার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। আমরা তো ভয়ে সারা। দেশের মধ্যেও খুব শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২-তে চীন ভারতবর্ষে হানা দেবার পর আর জওহরলালের পক্ষেও কৃষ্ণমেননকে রক্ষা করা সম্ভব হল না। পার্লামেন্টের ভিতরে এবং দেশের মধ্যে কৃষ্ণমেননকে অপসারণের জন্য সকলেই মুখর হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক্জিকিউটিভ কমিটির মিটিং-এ বেশির ভাগ সদস্যই কৃষ্ণমেননের পদত্যাগ দাবি করেন। ঘরে এবং বাইরে এইসব সমালোচনায় জওহরলাল অতিষ্ঠ হয়ে উঠে অক্টোবরের শেষে নিজে দেশরক্ষা মন্ত্রকের ভার নেন এবং কৃষ্ণমেননকে Defence Production মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অবস্থা এমনই জটিল হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ বেসরকারীভাবে জওহরলালকে ক্যাবিনেট থেকে কৃষ্ণমেননের অপসারণের পরামর্শ দেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির অধিকাংশ সদস্য জওহরলালকে জানান যে, কৃষ্ণমেনন যদি মন্ত্রী থাকেন তা হলে তাঁরা পার্টি মিটিং-এ যোগদান করবেন না। লোকসভার এক সদস্যের দিল্লীর বাড়িতে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী সমবেত হন। সেখানে কামরাজ এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। কামরাজ তখন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী। শুধু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, সংগঠনের একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসাবে কামরাজের তখন খুবই প্রতিপত্তি। সেখানে স্থির হয় যে, মুখ্যমন্ত্রীরা একে একে গিয়ে কৃষ্ণমেননের অপসারণের কথা জওহরলালকে জানাবেন। প্রথমে গিয়ে কাম-রাজ বলে আসেন। তারপর অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরা আলাদা আলাদা ভাবে যান। শ্রীমতী ইন্দিরারও এতে যথেষ্ট সায় ছিল। তখন বিজু (পট্টনায়ক) জওহরলালের একজন উপদেষ্টা। বিজুও জওহরলালকে অনুরূপ অনুরোধ জানায়। আমি নিজে দেখিনি; শুনেছি যে, ইন্দিরাকে চোখের জল অবধি ফেলতে হয়েছিল। অবশেষে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে কৃষ্ণমেননকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত হতে হয়।

কৃষ্ণমেননের ব্যাপারটা সবটাই অদ্ভুত। জওহরলাল আরও অনেককে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এইভাবে সমর্থন আর কেউ পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কৃষ্ণমেননের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বন্ধুকে শত্রু করবার এমন অসাধারণ প্রতিভা আর কারো মধ্যে দেখিনি।

১৯২৮-২৯ সালে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় হুগলী জেলার অনেকগুলি গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘোরেন। তাঁর সঙ্গে কিছু স্কুল-কলেজের ছাত্রও ছিল। সব

ব্যবস্থা করে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি। প্রতি গ্রামে পেঁছবার পর সেখানে কংগ্রেস পতাকা তোলা হত। সেই পতাকার কাছে দাঁড়িয়ে ওই ছাত্রদের মধ্যে যারা বক্তা ছিল তারা দু-চার কথা বলত আর সতীশবাবু বসে চরকা কাটতেন। সারা দিন সেই গ্রামের তথ্য সংগ্রহ হত। সন্ধ্যার পর সতীশবাবু কিছু বলতেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানারকম আলোচনা হত এবং সেই গ্রামেই রাত্রিবাস। সতীশবাবু মসলা দেওয়া তরকারি খেতেন না, তাই ওঁর সঙ্গে থাকত একটি ইকমিক কুকার। তাঁর সংগী-সাথীরা গ্রামের একটি বাড়িতে বা কয়েকটি বাড়িতে দুবেলাই খেতেন। মাঝে মাঝে বেশ মজাও হত। যদি কোনও কর্মীর গলায় পইতে থাকত তা হলে গ্রামবাসীরা কিছুতেই রান্না করে খাওয়াত না। তাকে নিজেকে রান্না করে খেতে হত। সে এক বিপদ। যে জীবনে কখনও রান্না করেনি, তার প্রায় হত অগ্নি-পরীক্ষা। সাধারণত এঁরা পাঁচ-ছয় মাইল করে যেতেন। একবার হয়েছে কি, রাত্রে ওঁরা যে গ্রামে ছিলেন, তার পরদিন অন্য গ্রামে যাবার সময়ে পথের মাঝে দুটি ছেলে তাদের পইতে ফেলে দেয়, পাছে রান্না করে খেতে হয়। তারা যখন খেতে বসেছে, তখন যে গ্রামে আগের রাত্রে ছিল সেই গ্রামের একজন লোক গিয়ে উপস্থিত। সেই লোকটি যে দু'জন পইতে ফেলে দিয়েছিল তাদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সে কি! কাল তোমরা ছিলে ব্রাহ্মণ, আর আজ এদের হাতের রান্না খাচ্ছ!' হুলস্থূল ব্যাপার —যাদের বাড়ি খাওয়া হচ্ছিল তারা মর্মাহত। সতীশবাবুর চেষ্টায় অতি কষ্টে সকলে শান্ত হয় এবং ওই দু'জন ছেলেকে সাময়িকভাবে সতীশবাবু বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

সতীশবাবুর এই পায়ে হেঁটে ঘোরাটা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। খুঁটিয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করা হতঃ

(১) গাঁয়ে কতগুলি পুকুর আছে। তার কতগুলি সেচযোগ্য এবং কতগুলিতে কেবলমাত্র মাছ আবাদ হয়।

(২) পুকুরের অধিকারীর অবস্থা কিরকম। মাসে তার আনুমানিক আয় কত।

(৩) গ্রামে কতগুলি পরিবারের

ক) ২০ বিঘের উপর জমি আছে।
খ) ১০ বিঘে বা তার চেয়ে বেশী জমি আছে।
গ) ৫ বিঘে থেকে ১০ বিঘের মধ্যে কতজনের জমি আছে।
ঘ) ৩ বিঘে থেকে ৫ বিঘে কতজনের।
ঙ) ১ বিঘে থেকে ৩ বিঘে কতজনের।
চ) ১ বিঘের নীচে আছে কতজনের।

(৪) গ্রামে নাপিত, কুমোর, কামার, স্যাকরা, গোয়ালা, মালাকার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার কতগুলি পরিবার।

(৫) কত ঘর যজন-যাজন করে এমন পুরোহিত।

(৬) কত গৃহস্থের বাড়িতে চাকুরিজীবী আছে এবং কি ধরনের চাকরি।

(৭) ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি পেশার লোক গ্রামে আছে কিনা, থাকলে কতজন।

(৮) ক'খানি দোকান এবং কিসের দোকান।

(৯) পরিবারের যে জমি আছে তার কতটা ধান-জমি, কতটা আলু ও পাটের জমি এবং কতটা তরিতরকারি ও অন্যান্য ফসলের জমি।

(১০) ক'দিন অন্তর গ্রামে হাট হয়।

(১১) গ্রামে কতজন নিজের জমি চাষ করে।

(১২) কতজন ভাগীদার।

(১৩) কতজন কৃষিমজুর।

(১৪) গ্রামে তাঁতের সংখ্যা এবং তাঁত থাকলে কত ঘর তন্তুবায়।

(১৫) নাপিত, কামার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের তাদের নিজেদের বৃত্তিতে জীবিকা-নির্বাহ হয় কিনা।

(১৬) গ্রামে পাঠশালা এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিনা।

(১৭) গ্রাম থেকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কত দূরে।

(১৮) ম্যাট্রিকুলেশন পাস কতজন, কলেজে শিক্ষিত কতজন, ম্যাট্রিকুলেশন পাস নয় অথচ শিক্ষিত কতজন, নিরক্ষর কতজন।

(১৯) গ্রামের জমিদারের নাম এবং খাজনার হার।

(২০) গ্রাম থেকে হাসপাতাল কত দূরে।

(২১) নিকটস্থ পুলিস থানা কত দূরে।

(২২) যাতায়াতের পথ।

(২৩) নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন কত দূরে।

বিশদভাবে এ-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হত। সতীশবাবু সঠিক তথ্য সংগ্রহের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত ছাত্র গিয়েছিল তারা খুব উৎসাহভরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করত। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হয়েছিল। সঠিক তথ্য পাওয়া খুব শক্ত হত। বেশ কিছু গ্রামে রটে গিয়েছিল যে, বোধ হয় আবার নতুন ট্যাক্স বসবে, সেইজন্য এসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশ্য সতীশবাবু এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় সে সন্দেহ দূর হয়। সতীশবাবু যখন প্রথম যান তখন আমাদের ধারণা হয়নি যে, এত বিশদভাবে সব তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কিছু দিন কাজ করবার পর আমাদের সামনে একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছিল। তারপর ১৯৩০-এর আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০-৩২-এর আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৭, '৩৮, '৩৯ সালে আমরা আরও ব্যাপকভাবে এ কাজ আরম্ভ করি। তখন নাম দেওয়া হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম বছর পাঠানো হয় প্রায় এক শত জন ছাত্র। সেটা ক্রমশ পাঁচ শততে ওঠে। গ্রামে যাবার সময়ে তারা কিছু প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, ধারাপাত, সোজা অঙ্কের বই এবং স্লেট-পেনসিল নিয়ে যেত। ছেলেরা সব বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত এবং কুড়ি দিন গ্রামে বাস করার পর কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে ফিরে আসত এবং সকলের কাছে যে ডায়েরী বই থাকত, সে বইগুলি জমা দিত। এই ডায়েরীগুলিতেই সব তথ্য লেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আর যেসব গ্রামে যেত সেসব গ্রামবাসী সমাদর করে এদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিত। রাজনীতির বিশেষ আলোচনা হত না। তবে সকালে কংগ্রেস পতাকা তুলে তা অভিবাদন করা হত। কোনও কোনও গ্রামে পতাকা তোলবার সময়ে ভাল জন-সমাগম হত। আবার কোনও কোনও গ্রামে দু-চারজন লোক মাত্র উপস্থিত থাকত। প্রতি গ্রামেই সন্ধ্যার পর গ্রামের সাধারণ জায়গায়, হয় আটচালায় নয় কারও বাড়ির উঠোনে একটা বৈঠক হত। সেখানে নানাবিধ আলোচনা হত ও কখনও কখনও গ্রামবাসীরা প্রশ্নও করত। যেসব প্রশ্ন ছেলেরা উত্তর দিতে পারত, দিত। যেসব

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেগুলি লেখা হত নিজ নিজ ডায়েরীতে। অত ছেলে গ্রামে যেত, কিন্তু তাদের বিশেষ অসুবিধা কোনও দিন ভোগ করতে হয়নি। ছেলেরা তো স্ফূর্তিতেই ছিল, গ্রামবাসীরাও আনন্দ পেত। কোনও গ্রামে থাকত পাঁচজন, কোনও গ্রামে তিনজন। কিন্তু কোথাও দু'জনের কম থাকেনি। অসুখ-বিসুখ হলে গ্রামবাসীরা সাধ্যমত সেবা-যত্ন করত। সামান্য অসুখের অবশ্য চিকিৎসা হত, না হলে তারা বাড়ি ফিরে আসত। যেসব ছেলে যেত তারা অধিকাংশই শহরাঞ্চলের ছেলে। সেইজন্য খানিকটা অসুবিধা হতই। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে দু-চারজন ছাড়া কেউ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়ি ফিরে আসেনি। ১৯৪০-এর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ থেকে ১৯৪৫ অবধি এ কাজ বন্ধ ছিল। আবার নতুন করে আরম্ভ হয় ১৯৪৬-এ।

১৯৪৬-এ আবার যখন গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে ছেলেদের গ্রামে পাঠানো আরম্ভ হল তখন তা ছিল আরও সুনিয়ন্ত্রিত। ভার নিয়েছিল অপরেশ (ভট্টাচার্য), অনিল (গাঙ্গুলী), নির্মল (সরকার) এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক। অপরেশ এখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, অনিল ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এর একজন উচ্চমানের গবেষক, আর নির্মল আছে এখন অধ্যাপকরূপে কানাডায়। এরা ব্যবস্থা করে যে, প্রতি গ্রামে দুজন করে কর্মী থাকবে এবং তারা একটি নৈশ বিদ্যালয় আরম্ভ করে দেবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা চলে আসবার পর গ্রামের লোকেরাই সেই নৈশ বিদ্যালয়ের ভার নেয়। এইরকমভাবে প্রতি পাঁচটি কেন্দ্রের উপর পরিদর্শক থাকত। যে অঞ্চলে এইসব গ্রাম সেইসব অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেখানে থাকত আঞ্চলিক কার্যালয়। সমস্ত এলাকাকে কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ভাগ করা হত। এই আঞ্চলিক কার্যালয়ে থাকতেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সাধারণতঃ অধ্যাপক বা শিক্ষক। আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাজ ছিল তার এলাকার সমস্ত গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সম্ভব হলে নৈশ বিদ্যালয়কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া। ওইসব অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল, যার কয়েকটি এখনও টিঁকে আছে। কয়েকটি আরও উন্নত হয়েছে। কর্মকাল শেষ হলে অর্থাৎ কুড়ি দিন বাদে সব কর্মী এসে একটি প্রধান শিবিরে তিন দিন বাস করত। সেই শিবিরে তাদের সংগৃহীত তথ্য এবং তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হত। সতীশবাবু যেসব তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন মোটামুটি সেইসব তথ্যই সংগ্রহ করা হত। আবার তথ্যভুক্ত নয় এমন কোনও কাজ কোনও গ্রামে থাকলে তাও ছেলেরা খাতায় লিখে নিত। এই তিন দিনের শিবিরের শেষ দিনে যাদের ডায়েরী ভাল বলে বিবেচিত হত তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কতকগুলি বই উপহার দেওয়া হত। অবশ্য ১৯৪৮ সালের পর এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এই তথ্য সংগ্রহ করে একটা জিনিস বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, সাধারণতঃ শিক্ষিত বলতে যাদের বোঝায়, গ্রামের সেইসব পরিবার এই কাজে বিশেষ আমল দিতেন না। যাঁরা নিজেরা জমিতে চাষ করতেন বা গ্রামের মধ্যে ছোটখাট দোকান রাখতেন তাঁরাই বরাবর পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের সাহায্য পাওয়া যেত না, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবার—তাঁরাই এগিয়ে আসতেন। আর একটা জিনিসও বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, ভূমিহীন কথার সংজ্ঞা নতুন করে নিরূপণ করা প্রয়োজন। গ্রামের এমন অনেক পরিবারই ছিলেন যাঁদের জমি আছে অথচ তাতে পাঁচজনের একটি ছোট পরিবারও প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব

ছিল না। প্রায় সকলেরই জমি আছে; কিন্তু পরিমাণ পাঁচ কাঠা, দশ কাঠা, কি এক বিঘে, দেড় বিঘে, দু' বিঘে; অর্থাৎ দু-তিন মাসের খোরাকিও তার থেকে হত না। আবার অনেকের বেশী জমি থাকলেও হয় সে জমি বন্যায় ডুবে থাকত, নয় সেচের জলের অভাবে ফসল শুকিয়ে যেত। আর বৃত্তিধারী যারা—কামার, কুমোর, নাপিত, ছুতোর, গয়লা, ময়রা—এদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বললেই চলে। কিছু গ্রামের অধিবাসী বাঁশের ভাল কাজ করত—চুপড়ি, পেতে, ধুচুনি। প্রায় সবই বন্ধ। অনেক গ্রামে গরুর গাড়ির চাকা ও গরুর গাড়ি তৈরী হত। পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে সেও বন্ধ প্রায়। অর্থাৎ সকলেই জমির উপর নির্ভরশীল। যাদের কোনও দিন জমি ছিল না, কেবল বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের অবস্থা দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। জমিদার এবং মহাজনের অত্যাচারে গ্রাম তো জর্জরিত, তারপর আবার ওইসব বৃত্তিধারীদের শিল্পসৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় সব গ্রামেরই অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। যাঁরা গ্রামের বাইরে থেকে ওকালতি বা চাকরি করে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁরাই ছিলেন গ্রামের মাতব্বর। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামে আসতেন ভাগের ফসল আদায়ের জন্য। গ্রামের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। আর এই সম্প্রদায়ের যাঁরা গ্রামে বাস করতেন তাঁদের গ্রাম থেকে আয়ের বিভিন্ন পন্থা ছিল। যেমন ধান ধার দেওয়া। এক মন ধানের দেনা ফসল উঠলে দেড় মন দিলে তবে শোধ হবে। আর দাদন প্রথা, সে তো ভয়াবহ। দুধের দাম ছয় আনা সের। মহাজন দাদন দিয়েছেন বলে তাকে দু' আনা সেরে বেচতে হবে। আলুচাষেও তাই। বড় হাট বা গঞ্জ থেকে খোল ও বীজ চাষের সময় পাওয়া যেত; পরিবর্তে আলু হবার পর বাজার থেকে অর্ধেক দামে আলু পৌঁছে দিতে হত। পাটবীজও তাই। চাষের এমন কোনও জিনিস নেই যাতে কৃষকদের এইরকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত না। এ একটা দুঃসহ অবস্থা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যাদের প্রোলেটারিয়েট বলে তারা বাস্তবিকপক্ষে ভূমিহীন। প্রোলেটারিয়েট কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যাদের সন্তান ছাড়া কোনও সম্পত্তি নেই—বাসস্থানের ভিটের মাটিটুকুও তাদের নিজেদের নয়। যখন যেখানে তারা কাজ করে তখন সেটাই তাদের বাড়ি। আমাদের এদিকে অতি গরীবেরও মাথা গোঁজবার জায়গা আছে আর সামান্য জমিও হয়তো আছে। কিন্তু তাতে দু' বেলা পেট পুরে খাওয়া দূরের কথা, একবারও খাওয়া জুটতো না।

গ্রামে গ্রামে এইসব তথ্য সংগ্রহ করে অন্তত একটা সত্য উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, বইয়ে যেসব কথা লেখা আছে তার সঙ্গে রূঢ় বাস্তব সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু এক বেলাও পুরো আহার যাদের জোটে না, তাদের কাছে কোনও বড় বড় কথা বলা উপহাসেরই নামান্তর। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অনেক বছর কেটে গেছে। গ্রামের চেহারা অনেক বদলেছে। এখন টেলারিং হয়েছে, জুতোর দোকান হয়েছে; বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা—এসবও হয়েছে। মানুষ হয়তো এক বেলা পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে; কিন্তু সংগতিশালী ও সংগতিহীনের মধ্যে যে পার্থক্য তা যেন আরও বেড়ে গেছে।
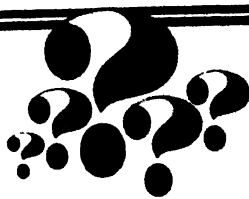
যত দূর মনে হচ্ছে ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মূর্তি ভাঙ্গা অভিযান শুরু হয়। প্রথম শিকার হয় ডাঃ রায়ের মূর্তি—তাঁরই সৃষ্ট দুর্গাপুরে। একদিন সকালে দেখা গেল মূর্তির গলাটি স্কন্ধচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। বিশেষ হইচই যে হল, তা নয়। তবে প্রফুল্লদা এবং আরও কয়েকজন এ কাজের কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। তারপর অবশ্য আরও মূর্তি ভাঙ্গা হয়। চৌরঙ্গীর গান্ধীমূর্তিও ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল, বোধ হয় উচ্চতার জন্য সম্ভব হয়নি। তখনই মনে হয়েছিল, এই নিষ্ফল অভিযান কেন? প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে জীবিত মানুষকে হত্যা করার কথা শোনা গেছে; কিন্তু মূর্তি ভাঙ্গলে কোন বিপ্লব সফল হবে, এ সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। অবশ্য অর্থহীন পাগলামিতে কেউ কেউ এ কাজ করতে পারে। এবারকার মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে প্রফুল্লদা এ কথা বলেছেন। আর একটা দিক আছে, যার মানে খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের, তা তিনি জীবিতই হন বা মৃতই হন, তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে দেশে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া। বিপ্লবের নাকি এটা একটা বড় অঙ্গ।

১৯৬৯-৭০-এ মূর্তি ভাঙ্গার দোষ নকশালদের উপর দেওয়া হয়েছিল। এবারে কারা ভাঙ্গছে, এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়নি। সংবাদপত্রে নানারকম বেরিয়েছে। আমরা যদি কয়েক বছর পেছিয়ে যাই, তা হলে অবশ্য দেশে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়াবার কোন রাজনৈতিক দল প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন, সে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। কেবলমাত্র মূর্তি ভাঙ্গলেই তো শ্রদ্ধাহীনতা হয় না, আরও নানারকমে শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করা যায়। যেমন, পরম শ্রদ্ধেয় বলে পরিগণিত মানুষের প্রতি জুতো ছোঁড়া, জাতীয় পতাকা পোড়ানো, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের গাধা ও কুকুরের রূপ দিয়ে প্রচার, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা—আরও নানাভাবে দেশের লোকের মন স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা।

মূর্তি ভাঙ্গা উপলক্ষ করে লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের দলীয় চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এরকম মন্তব্য এঁরা আগে কখনও করেননি। বাস্তবিকপক্ষে, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের সৃষ্টি থেকে জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যতরকম অপপ্রচার করা যায়, করে এসেছেন। সেইজন্যে যাঁরা বর্তমানে পঃ বঙ্গ সরকার চালাচ্ছেন, সেই দলের নেতার মুখে মূর্তি ভাঙ্গার কঠোরতম প্রতিবাদ দেখে আশ্বস্ত হয়েছি।

কম্যুনিস্ট পার্টি বোধ হয় ১৯২৬ সালে ভারতের মাটিতে প্রকাশ পায়। তারপর থেকে এই রাজনৈতিক দলটি দলবদ্ধভাবে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন এবং ভারতের বাইরে অন্য রাষ্ট্রের ভারতবিরোধী নীতিকেও সায় দিয়ে এসেছেন।

(১) সোভিয়েত রাশিয়া যখন তাঁদের বিশ্বকোষে গান্ধীজীকে সাম্রাজ্যবাদের চর ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে লেখেন, ভারতীয় কম্যুনিস্টরা আপত্তি করেননি।

(২) ১৯৩০-এর দশকে কম্যুনিস্ট পার্টির একজন কর্মী (তিনি মৃত বলে তাঁর নাম প্রকাশ করলুম না) যখন গান্ধীজীর দিকে জুতো ছোঁড়েন, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি তার নিন্দা করেননি।

(৩) যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যদিও ভারতবর্ষ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এবং নাৎসীদের নীতি অত্যন্ত গর্হিত, তা সত্ত্বেও যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করেনি, সেহেতু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ তাকে সাহায্য করবে না—পয়সা দিয়েও নয়, মানুষ দিয়েও নয়। বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন রাশিয়া-জার্মানিতে চুক্তি হয়েছিল। সেইজন্য ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধের নিষ্ক্রিয় সমর্থক ছিলেন। যখন জার্মানি রুশ দেশ আক্রমণ করে, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন এবং যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে থাকেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী দল বা ভারতের মাটির প্রতি কম্যুনিস্ট পার্টি কোনও শ্রদ্ধা দেখাননি। রুশ দেশের সিদ্ধান্তকে তাঁরা কার্যকরী করেন।

(৪) নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনেক দুঃখে 'প্রবাসী'তে মন্তব্য করেছিলেনঃ

'চাঁদি কে চন্দ্ টুকরে পর দেশকে বেচনেওয়ালে'—এই মন্তব্যে তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী শ্রী পি সি যোশীর যে চুক্তি হয়, তা প্রকাশ করেন। চুক্তিতে লেখা ছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের জেল থেকে ছেড়ে দিলে তাঁরা 'Quit India'—'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করবেন। রামানন্দবাবুর পর এ ব্যাপারে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আই এন এ ফৌজ গঠন করেন এবং ভারত অভিযানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন কম্যুনিস্টদের 'People's War' কাগজে ১৯-৭-৪২ তারিখে একটা কার্টুনে নেতাজীকে গাধা-রূপে দেখানো হয়। এবং গাধারূপ নেতাজীর পিঠে জাপানের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী তোজো বসে আছেন। ১৩-৯-৪২ তারিখে ঐ 'People's War' কাগজে একটি কার্টুনে নেতাজীকে কুকুররূপে দেখানো হয়েছে এবং হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্ বাঁ হাতে ঐ কুকুরের ঝুঁটি ধরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ কাগজেরই ২১-১১-৪২ তারিখে আর একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়। একটি প্রকাণ্ড বোমাকে আঁকড়ে ধরে নেতাজী আকাশপথে ভারতের নগ্ন, রুগ্ন, বুভুক্ষু ছেলে-মেয়েদের উপর নেমে আসছেন।

(৬) বোম্বাই এ আই সি সি-তে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে আসেন জওহরলাল—সমর্থন করেন সর্দার। বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে জওহর-লাল বলেন, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের বিপক্ষে বারোজন ভোট দিয়েছেন। তার মধ্যে এগারো জন কম্যুনিস্ট, আর একজনের ছেলে কম্যুনিস্ট।

এখন অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা ৯ই আগস্ট দিবস পালন করেন।

(৭) ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই ইংরাজ সরকার এক প্রেস নোটে প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশদের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করার শর্তে কম্যুনিস্টদের ছাড়া হয়েছে।

(৮) স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্টরা স্লোগান তোলেন, 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। এবং ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ 'ক্ষমতা দখলের জন্য'

প্রবন্ধে লেখেনঃ

(ক) ক্রমাগত কংগ্রেস দলকে দুর্বল করিয়া ফেলা। (খ) ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে বাধা দেওয়া।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কার্যপন্থা উপযুক্তভাবে স্থির হয়। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগানে সারা ভারতের আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সর্বরকমে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

(৯) ভারতবর্ষের সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাতীয় পতাকার বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ করা হয়।

সংবিধানে স্বীকৃত জাতীয় পতাকার বহ্ন্যুৎসবে চরম শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকা আর দীর্ঘ করতে চাই না। সাম্প্রতিক কালের লেফট ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পঃ বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যসচিব পূর্বাপর প্রথানুযায়ী ২০শে অক্টোবর গান্ধীঘাটে গিয়ে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করেন। এ ঘটনা ১৯৭০-এর ২রা অক্টোবর ঘটেছে। আমার যত দূর স্মরণ হচ্ছে, মুখ্যসচিবের এ চিঠি প্রত্যাহৃত হয়; কারণ সি পি আই (এম) দলভুক্ত মন্ত্রীরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গান্ধীঘাটে যাওয়ার ব্যবস্থাটা পছন্দ করেননি।

স্বাধীন হবার পর তেলেঙ্গানা, বড়া, কমলাপুর প্রভৃতি স্থানে বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তা সুবিদিত।

বর্তমানে সি পি আই (এম) দল তাঁদের পথ বদলেছেন। পঃ বঙ্গের নাগরিক হিসেবে এতে আমি আনন্দিত হয়েছি। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। বহু দিন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিরা জাতীয় ভাবধারার মূল উৎস থেকে সরে ছিলেন। বর্তমানে সি পি আই (এম) দল মূল উৎসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় ভাবধারার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। এখনও মাঝে মাঝে অসঙ্গত কথা বলা হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতার একটি বাংলা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে, লেফ্‌ট ফ্রন্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, আদালতের রায় যাই হোক, বর্গাদারদের লড়াই চলবে। যদি এ খবর সত্য হয়, তা হলে এ বিবৃতি অত্যন্ত নিন্দার্হ। যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন, তাঁদের নেতা যদি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যাবার জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করেন, তবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা শুধু যে অপরাধ তাই নয়, দণ্ড পাবার মত অপরাধ। যদি লেফট ফ্রন্ট সরকারের নেতা এ কথা না বলে থাকেন, তবে যে সংবাদপত্রে এ কথা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের দণ্ড পাওয়া উচিত।

আমি শুরু করেছিলুম শ্রদ্ধাহীনতা দিয়ে। জাতীয় ভাবধারা এবং জাতির মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মান ও দেশকে যে আঘাত করে, তার পরিণাম সুদূর-প্রসারী। এ কাজ যে দল বা যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন তাঁদের আজ বিচার, বিশ্লেষণ, বিবেচনা করা উচিত যে, কেন এসব মূর্তি ভাঙ্গা হচ্ছে। কেবলমাত্র কয়েকটি নকশালের উপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্বের অবসান হয় না। মূর্তিগুলির সামনে পুলিস বসিয়েও কর্তব্য সম্পাদিত হয় না। শ্রদ্ধাহীনতার যে বিষাক্ত আবহাওয়া অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের মাটিতে

ছড়িয়েছেন, তার অবসানের জন্য সক্রিয় পন্থা নেওয়া প্রয়োজন। এর সর্বোত্তম পথ হল জনসাধারণের কাছে অকপটে স্বীকার করা যে, জাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে শ্রদ্ধাহীনতা প্রচার করে বিপ্লব আসে না, জনকল্যাণও হয় না।

বিদ্যাসাগর বা যতীন্দ্রনাথ বা দেশবন্ধু—এঁদের মূর্তি ভেঙে এঁরা যে আসনে বসে আছেন, সেখান থেকে তাঁদের টলানো যাবে না। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, স্ত্রীশিক্ষা থাকবে, মেয়েদের প্রতি অযথা অত্যাচার অন্যায় বলে স্বীকৃত হবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের নাম, বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকবে। শত মূর্তি ভেঙেও তাঁকে তাঁর শ্রদ্ধার আসন থেকে কেউ সরাতে পারবে না। এ তো হল ভাবপ্রবণতার কথা। বাস্তব সত্য হল শ্রদ্ধাহীনতার পথ থেকে দেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, তার জন্য প্রচেষ্টা। সমালোচনা ও শ্রদ্ধাহীনতা এক নয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমালোচনা করার অধিকার আছে। কিন্তু সে সমালোচনা যদি শ্রদ্ধাহীনতার প্রসার ঘটায়, তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ। সংবিধানসম্মত উপায়ে যাঁরা সরকারে এসেছেন, আইনসভার মধ্যে তাঁরা সে সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন; কিন্তু জনসভায় সে চেষ্টা শ্রদ্ধাহীনতার নামান্তর। এ পূর্বেও লিখেছি। সেই কথারই পুনরুক্তি করছি যে, নকশাল বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির এবং পরে সি পি আই (এম)-এর সদস্য। কেন দেশের এইসব সুসন্তান—এঁদের অনেককেই সুসন্তান বলে আমি জানতুম—সর্বনাশা ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার আলোচনা ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র নকশালদের কাজ বলে উড়িয়ে দিলে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হবে না।

১৯৬২-তে যখন চীন ভারতবর্ষে হানা দেয়, তখন দার্জিলিং জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্টার পড়ে যে, মাও সে তুং মুক্তি-ফৌজ নিয়ে ভারতবর্ষে আসছেন। মাও সে তুং চীনের লোক, চীনের সেনা নিয়ে আসছিলেন। আর নেতাজী ভারতবর্ষের লোক, ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতবর্ষের সৈন্য নিয়ে গঠিত আই এন এ নিয়ে আসছিলেন। তাঁকে 'কুইসলিং' বলা হয়েছিল। কিন্তু এই মুক্তি-ফৌজ নিয়ে মাও সে তুং আসছেন—এর কোনও প্রতিবাদ কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে করা হয়নি। দার্জিলিং জেলার বহু ইউনিয়নে লাল রসিদ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয় মুক্তি-ফৌজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। কিন্তু কোনও দিন কোনও কম্যুনিস্ট ইউনিয়ন থেকে এর প্রতিবাদ শোনা যায়নি। এসব ঘটনা একটুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না। কম্যুনিস্ট পার্টি এখন বিভক্ত। সেজন্য সি পি আই (এম) নেতাদের কাছে অনুরোধ, যেন নতুন করে তাঁরা জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন করেন।
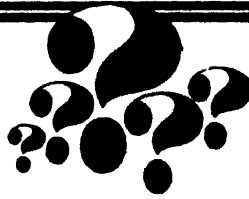
'কণ্টকল্পিত' লিখতে লিখতে একটু থমকে দাঁড়িয়েছি। আমি যদিও লিখেছিলাম যে, আমি কোনও ডায়েরী রাখি না, সবই আমার মন থেকে লেখা, সেজন্য তথ্যগত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আর এটা জীবনীও নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমি দর্শক। কতগুলি জায়গা ও কতগুলি মানুষ সম্পর্কে আমার যা মনে হয়েছে, লিখেছি। এর কোনও ধারাবাহিকতা নেই। বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে অনেক গল্পও দিয়েছি। তার যে সবই বানিয়ে লেখা, তা নয়; তবে লিখতে লিখতে কিছু কিছু বানানো ব্যাপারও এসে গেছে। আমি পরিষ্কার করে বললেও পাঠকদের মধ্যে অনেকের ধারণা, লেখক যখন অনেক দিন রাজনীতি করেছে, তখন কখনই সত্যি কথা বলতে পারে না। আমি নিরুপায়। অনেকে আবার ধরে নিয়েছেন, যেহেতু আমার লেখার মধ্যে গান্ধীজী, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ রায় এসে পড়েছেন, অতএব তাঁদের সব কাজের কৈফিয়ত আমারই দেওয়া উচিত। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এঁদের কাজের দোষগুণের বিচার ইতিহাস করেছে এবং করবে। আমার যা মনে হয়েছে এঁদের সম্পর্কে, তাই লিখেছি। সেটা যদি কোনও কোনও পাঠকের মনঃপূত না হয়, তার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি নাচার। সারা জীবনে অনেক কাজই করেছি, যা অনেকের মনঃপূত হয়নি। সকলের মনঃপূত কাজ ও কথা যদি করতে পারতুম ও লিখতে পারতুম, তা হলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু এই জীবন-সায়াহ্নে এসে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কোনও মতেই সম্ভব হচ্ছে না।

আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁরা সত্যিই অনুগৃহীত করেছেন। তথ্যগত ভুল যা হয়েছে, সংশোধন করেছেন। এই পাঠকদের সহৃদয়তা বুঝতে পারি; কিন্তু গান্ধীজী কেন ভেজালদারদের পক্ষে ছিলেন—এ কথার উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে অসম্ভব। আগে কোনও দিন শুনিনি, এখনও আমার জানা নেই। তবে তথ্যগত প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ এ বিষয়ে লেখেন, তা হলে গান্ধীজীর জীবন নিয়ে যাঁরা বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটা দিক খুলে যাবে। বহু দেশের বহু লোক ও পণ্ডিত গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের কাছে একটা নতুন দিক খুলে যাবে, যদি কেউ তথ্য-প্রমাণ সহযোগে দেখাতে পারেন। আবার আর এক রকমও আছে। আমি হেমন্তদার (বসু) কথা বারবার উল্লেখ করেছি। একজন চিঠিতে লিখেছেন যে, আমি ভুল বলছি, হেমন্ত বসু হবে না, হেমন্ত সরকার হবে। হেমন্ত সরকার নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং একসময়ে তাঁর খুব নামও ছিল। কিন্তু তার দ্বারা তো এটা প্রমাণ করা যাবে না যে, হেমন্ত বসু বলে কেউ ছিলেন না। আরও একটা দিক আছে। ভুল যা, তা সব সময়েই ভুল। সে আমার মত লোকই লিখুক, বা কোনও বড় পণ্ডিতই লিখুন। কিন্তু কেবলমাত্র ভুল বললেই তো ভুল প্রমাণ করা যায় না; কি ভুল, কোথায় ভুল এবং কিভাবে

জানা গেল যে এটা ভুল—এ না জানালে তো ভুল প্রমাণিত হয় না। সহৃদয় পাঠক-বর্গ যাঁরা এই সব ব্যাপারে অনুগ্রহ করে লেখেন, তাঁরা যদি কারণ ও তথ্য দিয়ে ভুল দেখিয়ে দেন, তা হলে আমাকে তো সাহায্য করা হবেই, অন্যান্য পাঠকদেরও অনেক সুবিধা হবে।

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কত বৈচিত্র্য। সামাজিক ব্যবস্থায় কত পার্থক্য। পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের বিবাহপদ্ধতির সঙ্গে অন্ধ্রের হিন্দুদের বিবাহপদ্ধতি ও পাত্রী মনোনয়নে সম্পূর্ণ তফাত। তবুও আমরা এক দেশেরই লোক এবং এক ধর্মাবলম্বী। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুর এবং সূত্র, যা সারা ভারতবর্ষকে বেঁধে রেখেছে, তার খানিকটাও যদি ধরতে পারা যায়, তা হলে জীবন সার্থক হয়। সকলেই তো পথিক—নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার জন্য বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একাত্মবোধ কি করে বিকাশ লাভ করেছে, এটাই তো ভারতবাসীর জীবনের বড় কথা। কত সাধু, তাপস, পরিব্রাজক অজানা-অচেনা ভারতবর্ষের অন্দর-কন্দরে ঘুরে এসেছেন। এ শক্তি তাঁরা পেয়েছিলেন কোথায়? আবার সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন, গ্রীকদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে হটিয়ে দিলেন, আর যেমনি পঞ্চাশ বছর বয়স হল, সঙ্গে সঙ্গে বিহার থেকে হেঁটে কর্ণাটকে গিয়ে পেঁছলেন। তাঁর শৌর্য, বীর্য, সাম্রাজ্য—সব পড়ে রইল; কেউ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে কর্ণাটকের শ্রবণবেলগোলায় গিয়ে বারো বছর সাধনা করে দেহত্যাগ করলেন। এঁরা হলেন ভারত-পথিক। কেন করেছিলেন, কি অনুভূতি তাঁদের মনের মধ্যে তখন ছিল—তার কিছুই আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি যে, এ কাজ তিনি করেছিলেন। এর মধ্যে কোনও বিশ্লেষণ নেই। একটা মহত্তোমহীয়ান আচরণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। এর মানে এই নয় যে, পৃথিবীর অন্য দেশে এরকম সাধক বা পথিক নেই। তাঁদের আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের মহাসৌভাগ্য যে, আমাদের যাঁরা পথিক ও পথদ্রষ্টা তাঁদের আমরা চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি এবং গ্রহণ করেছি। এতে কতটা বিশ্লেষণ আছে এবং কতটা অনুভূতি আছে—এর ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিশ্লেষণই হোক, আর অনুভূতিই হোক, আমার কাছে যে এঁদের কাজ পরিস্ফুট হয়েছে—এটাই আমার কাছে বড় কথা। সত্য তো সবই। কেউ যদি আধ গেলাস জলকে বলেন গেলাসটা অর্ধেক ভরতি, আবার কেউ যদি বলেন যে গেলাসটা অর্ধেক খালি—দুটোই সত্যি। তা হলে কি আমরা দুটো সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে কোনটা সত্য, তা নিয়ে সময় কাটাব, না কোনও একটাকে গ্রহণ করব—নিজের জীবনকে সার্থক করবার পথে এগিয়ে যাব? দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে—সবই ঠিক। বিশ্লেষণও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার আবর্তে জীবনকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে কখনই পথের নিশানা পাওয়া যাবে না।

কেউ কেউ বলেন যে ইতিহাস ভুল করে না; আবার কেউ কেউ বলেন যে, ইতিহাসের সবই ভুল। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে 'গ্রেট' বলা হয় (আমরা বলি সেকেন্দার শাহ)। পণ্ডিতপ্রবর এইচ জি ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসের বইতে বলেছেন যে, আলেকজাণ্ডার যেভাবে দেশ জয় করেছেন তার পিছনে কোনও কারণ ছিল না; নেহাত খামখেয়াল। এইচ জি ওয়েলস আলেকজাণ্ডারের যাত্রাপথ একটি ম্যাপে, দেখিয়ে লিখেছেন 'Wild goose chase'. 'Wild goose chase' যিনি করেছিলেন তাঁকে অনেকে 'গ্রেট' বলেছেন। তবে কোনটা সত্যি? ফরাসী বিপ্লবের এক বড় নেতাকে সাড়ম্বরে কবরস্থ করা হয়। আবার কিছু দিন পরে কবর খুঁড়ে

তাঁকে বার করে এনে ফাঁসিকাঠে লটকানো হয়। রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা বুখারিন-এর 'হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম'-এর বই শ্রদ্ধাসহকারে পড়ত এবং অনেকে সেই বই পড়ে কম্যুনিস্ট হয়েছেন। রুশ বিপ্লব সফল হবার পর বুখারিন-এর সহকর্মীরা তাঁর বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেন--তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। আমাদের দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে যুবকরা টেনে নিয়ে যেত। আবার পরে তাঁর প্রতি সে শ্রদ্ধার প্রকাশ আর দেখতে পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে এমন বহু নজির আছে। কিন্তু জীবন তো খালি ইতিহাস পড়ে গড়ে ওঠে না। সেইজন্য কতগুলি লেখা হয় সুখপাঠ্য, কতগুলি অপাঠ্য, কতগুলি পাঠ্য।

১৯৬৯-৭০ সালে এখানে মূর্তি ভাঙ্গা আরম্ভ হয়। সাম্প্রতিক কালেও কিছু হয়েছে। অনেকেই এর কোনও মানে খুঁজে পান না। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এর কোনও মানেও হয় না। কারণ, বিদ্যাসাগর তো প্রস্তরমূর্তির মধ্যে বেঁচে নেই; তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু চেষ্টা করলে এর মানে বার করা যায়। আধুনিক সমাজ যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে সেই শ্রদ্ধার নিদর্শনকে ভেঙ্গে দেশের মাঝে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া। কিছু লোক মনে করেন যে, অরাজকতা ও শ্রদ্ধাহীনতা যত ছড়াবে বিপ্লব তত ত্বরান্বিত হবে। প্রথম যখন মূর্তি ভাঙ্গা আরম্ভ হয় তখন তাকে বলা হত নকশালপন্থীদের কাজ। আমি জানি না কারা মূর্তি ভাঙ্গেন; তবে নকশালরা যদি ভেঙ্গে থাকেন তা হলে এই মূর্তি ভাঙ্গার পিছনে কম্যুনিজমের কোনও সম্পর্ক নেই—এ কথা বলা যায়। পৃথিবীর যে দুটি বড় দেশে এখন কম্যুনিজম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেই রাশিয়া ও চীন দেশে বিপ্লবের পূর্বে স্থাপিত মূর্তি এখনও সগৌরবে বিরাজ করছে। রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট এবং চীন দেশে চেংগিস খাঁয়ের। পিটার দি গ্রেট সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা কথা পাওয়া যায়; কিন্তু চেংগিস খাঁ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে, তিনি ছিলেন নৃশংস বর্বর। চীন দেশে যেখানে চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর অধিনায়কত্বে কম্যুনিজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে এবং যা এখনও অব্যাহত আছে, সেখানে চেংগিস খাঁয়ের মূর্তি এখনও কি করে সগৌরবে বিরাজ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। ভেবে পাওয়া মুশকিল হলেও এ ঘটনাটি বাস্তব এবং সত্য। সেইজন্যই সব সময়ে সব কাজের মানে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। গান্ধীজীর 'স্বরাজ'কে অনেকে 'ইউটোপিয়া' বলে। মার্কসের বইয়ে যা লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে রুশ দেশ বা চীন দেশ কম্যুনিজম অনুশীলনে তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এর মধ্যে হয়তো অনেকে অসংগতি খুঁজে পাবেন; কিন্তু যাঁরা কম্যুনিজমের প্রচার করছেন তাঁদের কাছে এই অসংগতি এখনও ধরা পড়েনি। ধরা পড়েনি বলে এর পিছনে যে সত্য, তা একটুও ম্লান হয়নি। সেইজন্য কোনও লেখার মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া সব সময়ে সংগতিপূর্ণ হবে না। আমি 'কণ্টকল্পিত'তে যা লিখেছি তা সাময়িকভাবেও যদি কোনও পাঠককে তৃপ্তি দিয়ে থাকে, সেটা আমার পুরস্কার। বাকি সবটাই আমার কাছে সাময়িক।

শংকরাচার্য সুদূর কালাডি গ্রাম থেকে বেরিয়ে ভারতবর্ষের চার দিকে চারটি ধর্মসংস্থা স্থাপন করেন। তিনি হয়তো করেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য। আমাদের ধারণা অনুযায়ী সে সময়ে পথঘাটও ছিল না এবং ভারতবর্ষ যে অখণ্ড—এ ধারণাও ছিল না। আমরা এখন শংকরাচার্যের কাজকে উল্লেখ

করে বলি যে, এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ ছিল। ঐতিহাসিকরা শংকরাচার্যের প্রব্রজ্যার যে মানেই করুন, এটা সত্য যে, শঙ্করাচার্য উত্তরে বদরিকাশ্রম, পূর্বে নীলাচল, পশ্চিমে দ্বারকা এবং দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেছিলেন। করেছিলেন এটা সত্য। কিন্তু তাঁর মনে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। গান্ধার, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও স্থাপত্য নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করি। কিন্তু ১৯৭৮ সালে দাঁড়িয়ে এ কথা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করতেন। সেইজন্যই আমি মনে করি যে, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ইতিহাসের সূত্র খোঁজার চেষ্টা না করে যদি লেখাটি পাঠ্য অথবা অপাঠ্য এই বিচার করা হয়, তা হলে লেখকের প্রতি যথোচিত মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আর ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা তো শক্ত। রাজাদের বংশানুক্রমিক তালিকা যেমন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, সেইরকম তৎকালীন সমাজের রীতিপদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক অনুষ্ঠান, অর্থশাস্ত্র, তৎকালীন সাহিত্য—এসবই ইতিহাসের একটি বড় অংগ। সেইজন্য চলতি কথায় যে বলা হয় অমুকের লেখার মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে তা অনেক সময়ে অতিশয়োক্তি। কারণ, ইতিহাস লেখার প্রচলন অনেক দিনের হলেও অনেকেই এখনও ইতিহাসের সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক উপাদানের উপর তত জোর দেন না, যত জোর দেন সাল ও তারিখের উপর। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত The Cultural Heritage of India-তে খুব ভাল কথা লেখা আছে— The stories, epilogues and parables continued in them. Were not put together for the purpose of furnishing a chronologically accurate history. Recent researches have demonstrated that the Itihasas and the Puranas are more accurate historically, geographically, and chronologically than was at one time supposed.'

(The Cultural Heritage of India, Vol. II—Page XXII)

'কষ্টকল্পিত' আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে লেখা। আমি নিজে এতে ইতিহাসের উপাদান দেবার চেষ্টা করিনি। পূর্বেও বলেছি, পুনরায় বলছি। কতকগুলো বিষয় নিয়ে আমার মনে যা হয়েছে সেইগুলি দেবার চেষ্টা করিনি। পূর্বেও বলেছি, পুনরায় বলছি। কতকগুলো বিষয় নিয়ে আমার মনে যা হয়েছে সেইগুলি দেবার চেষ্টা করেছি। যদি এ লেখার মধ্যে কেউ কোনও উপাদান খুঁজে পান, সেটা পাঠকের নিজের গুণে। সেরকম কোনও ইচ্ছা বা অভিরুচি আমার মনে নেই।

১৯৭১-এর বন্যা নিয়ে সকলেই যেন একটু বিভ্রান্ত হয়েছেন। এর আগেও বিধ্বংসী বন্যা, প্লাবন কয়েকবারই হয়েছে। কিন্তু তখন সরকার এত দিশাহারা হননি আর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও এমন নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়নি। ১৯৬৮-তে উত্তরবংগে বিশেষ করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রলয় ঘটেছিল। পাহাড়ে ধস নামা, বিভিন্ন পাহাড়ে নদীতে প্লাবন ও বন্যা ভীষণ ক্ষতি করেছিল। অবশ্য তখন রাজ্যপালের শাসন। ১৯৫৯-এ প্রবল বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলা বিধ্বস্ত হয়। তখন ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা। এর কোনবারই প্রশাসন এবারের মত নিশ্চল হয়নি। একটা কারণ অবশ্য আছে। সেটা এবারের বন্যার আকস্মিকতা। তা হলেও নিষ্ক্রিয়তার কোনও মানে হয় না। কারণ, যেসব জায়গা বন্যাবিধ্বস্ত হয়েছে তার অধিকাংশ জায়গাই পূর্বে বন্যায় তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে।

যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে গঙ্গায় জলোচ্ছ্বাস হলেই মালদার কিছু গ্রাম বন্যাগ্রস্ত হয়। আর গঙ্গায় বানের জন্য যদি বিহার বিপর্যস্ত হয়, তাহলে তার ধাক্কা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার উপরেও পড়ে। মালদা তো আছেই। এবারে উত্তর ভারতের ছবি খুব ভয়াবহ। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলার অবস্থা অত্যন্ত সংগীন। উপর থেকে যত জল নামবে তা যখন মেঘনা, পদ্মা দিয়ে নিকাশি পাবে না তখন সেই জলস্রোত প্রথম ধাক্কা দেবে মালদা জেলায় ও মুর্শিদাবাদের খানিকটা অঞ্চলে। তারপর একমাত্র নিকাশি ভাগীরথী। বর্ষায় ভাগীরথী ভরতি। আর ভাগীরথীর এখন গভীরতাও নেই এবং হুগলী জেলার ওপরে কলকাতা থেকে নৌকো করে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে যাওয়াও যায় না। ভাগীরথী আয়তনে চওড়া হয়েছে বটে কিন্তু এর গভীরতা একেবারেই নেই। সেইজন্যই গংগার ঐ বিপুল জলস্রোত যখন ভাগীরথীর উপর এসে পড়ে তখন বিপর্যয় দেখা দেয়। বোঁজা ভাগীরথী ঐ জল ধারণ করতে পারে না। ফলে ভাগীরথী যে কূলে সুবিধে পায়, বন্যার জল সেদিকে গড়িয়ে গিয়ে গ্রাম, জনপদ সব বিধ্বস্ত করে। মনে রাখতে হবে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের লোকেরা গ্রীষ্মকালে হেঁটে ভাগীরথী পারাপার করেন। উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর জল নিয়ে স্ফীতকায় হয়ে গঙ্গা দৌড়ে আসে, আবার বিহারে এসেও অনেক নদীর জল পায়। ফলে নিম্ন অঞ্চলের অধিবাসীদেরই দুর্দশার অন্ত থাকে না।

পুরানো মানচিত্র দেখলে দেখা যাবে ভাগীরথীর জল নিকাশের জন্য নদীয়া-মুর্শিদাবাদে বহু খাল-বিল ছিল। সেই সব খাল-বিলের অধিকাংশই এখন মজা। নাব্যতা তো নেই-ই, অধিকাংশ জায়গাতেই খাল-বিলগুলো চাষের জমি হয়ে গেছে। কোন এক সুদূর অতীতে কতগুলি দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যেখানে গঙ্গার জল ভাগীরথী দিয়ে নিকাশ হচ্ছে সেইখানকার ভাগীরথীর দুই ধার কুড়ি মাইল অবধি তামার পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দুই ধারের মাটির অবক্ষয় বিশেষ ঘটতে

পারতো না। প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তামার পাত খুলে নেওয়া হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—এই ১৯৭১ সালে বন্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে ধুলিয়ান নদীগর্ভে। আমাদের কোনও পরিকল্পনাই সার্থকভাবে রূপায়িত হয় না। সেইজন্য শুরুতে যা থাকে, শেষ অবধি দেখা যায় তার অনেক কাজ বাকী আছে। গঙ্গায় জল বাড়লেই মালদার খানিকটা অঞ্চল বিপন্ন হয়। এ ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত স্বাধীন ভারতবর্ষে এর কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। ১৯৭১ সালে এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা অনুভব করছি। প্রত্যেকবার বান আসবার সময়েই শোনা যায়—যাতে ভবিষ্যতে আর জনসাধারণ এইভাবে বন্যাক্লিষ্ট না হন, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বন্যা শেষ হয়ে যায়, তারপর আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কাজ হয় না। জওহরলাল একবার বলেছিলেন যে, বন্যার একটা সুফলও আছে, অনেক পলি পড়ে। কথাটা ঠিকই। পলি পড়ে যেমন অনেক জমির উন্নতি হয়, তেমনি বালি পড়ে অনেক জমি পতিত হয়। মাপজোক করলে দেখা যাবে যে, বালি পড়ে পতিত জমির অনুপাত পলি-পড়া জমির চেয়ে ঢের বেশী। এর আরও একটা দিক আছে। সেটা মানবিক। স্বাধীন দেশের শাসনক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের মানবিক দিক উপেক্ষা করা চলে না। বন্যার তাণ্ডবে যদি ঘর-বাড়ি গরু-লাঙল তৈজসপত্র সবই ধ্বংস হয়, তা হলে পলি-পড়া জমির সদ্ব্যবহার কে করবে? মনে রাখতে হবে যে, বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষ সত্যিই সর্বস্বান্ত হয়। নতুন করে প্রত্যেক পরিবারকেই আবার জীবন আরম্ভ করতে হয়। ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনার সঙ্গে ভাগীরথীর নাব্যতা একান্তভাবে যুক্ত। অর্থাৎ ভাগীরথী যদি আর খানিকটা গভীর হয়, তা হলে গঙ্গার যে পরিমাণ জল ভাগীরথী এখন গ্রহণ করতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশী জল ধারণ করার ক্ষমতা তার হবে। মালদা জেলার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে। গঙ্গা দিয়ে বানের জল এলেই মানিকচক থানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ভালুকা দিয়ে জলস্রোত এসে হরিশচন্দ্রপুরকেও বিপর্যস্ত করে। আমি কিছু নতুন কথা বলছি না। কেবলমাত্র এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগেও কেন ক্রমাগত পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটছে—এই আমার প্রশ্ন।

গঙ্গা এবং ভাগীরথীর কথা এতক্ষণ বলেছি। এবার দামোদর ও সংশ্লিষ্ট নদীগুলি বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরে কি বিপর্যয় টেনে আনে সে কথা বলবো। অনেক বছর ধরেই দামোদরের ধ্বংসলীলা চলে এসেছে। বর্ধমান জেলা দিয়ে এসে দামোদর যেখানে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে, তার কিছু আগে বর্ধমান জেলাতেই এক 'হানা' পড়ে। নদী যেখানে বাঁধ ভেঙে দিয়ে নতুন পথ করে নেয়, তাকেই 'হানা' বলে। হানাটির নাম 'বেগোর হানা'। এই বেগোর হানা দিয়ে জল এসে বেশোর খালে পড়ে। বেশোর খালই পরে মুণ্ডেশ্বরী ও হুড়হুড়ে-র খাল বলে অভিহিত হয়। কালে দামোদরের আসল জলস্রোত সবই এই বেশোর খাল, মুণ্ডেশ্বরী, হুড়হুড়ে হয়ে হুগলী জেলার খানাকুল থানার নতীবপুর ও শাবলসিংপুরের মধ্য দিয়ে এক বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়। এই মুণ্ডেশ্বরী প্রবাহিত হয় আরামবাগ থানা ও পুড়শুড়ো থানার মধ্য দিয়ে। আরামবাগ থানার আর এক দিক দিয়ে দ্বারকেশ্বর আসে—যার ওপর আরামবাগ শহর। খানাকুল থানার ঠাকুরণচক গ্রামে এই দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মেলে ঝুমঝুমি নামে একটি মাঠের জলনিকাশী নদী। এই যুক্ত হবার পর এর নাম হয় রূপনারায়ণ। এবং আরও কিছু পরে এই রূপনারায়ণে এসে পড়ে শিলাবতী। এই শিলাবতীর উপরেই

ঘাটাল শহর। এই রূপনারায়ণে মুণ্ডেশ্বরী বা হুড়হুড়ের জল অর্থাৎ দামোদরের প্রধান জলরাশি এসে মিলিত হয়। ফলে বরাবরই জায়গাটা বর্ষাকালে সমুদ্রের মত মনে হত। এই বিশাল জলরাশি নিকাশের একমাত্র পথ ছিল রূপনারায়ণের মধ্য দিয়ে। এবং সেই জল প্রথম বাধা পেত আগেকার বি এন আর-এর বাঁধে। এখন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের বাঁধ। এখন আরও দুটি ব্রীজ হয়েছে। বোম্বে রোডের ব্রীজ এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের আরও একটি ব্রীজ। অর্থাৎ ব্রীজের এই স্বল্প-পরিসর নিকাশি দিয়ে এই বিশাল জলরাশি বেরোতে পারতো না। তার ফলে হাওড়া জেলার আমতা প্রভৃতি অঞ্চল, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা এবং হুগলী জেলার গোঘাটা থানা বাদ দিয়ে সমগ্র আরামবাগ মহকুমা বছরে চার থেকে পাঁচ মাস জলবন্দী অবস্থায় থাকত। ঘাটাল শহরটি দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, এক-একটি বাড়ি যেন এক-একটি দ্বীপ। বর্ষাকালে সবটাই জলে ভরতি হয়ে থাকত। ঠিক অনুরূপ অবস্থা ছিল হুগলী জেলার খানাকুল থানা, পুড়শুড়ো থানা এবং আরামবাগ থানার অধিকাংশ জায়গা। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরামবাগ মহকুমার মায়াপুরে যেখানে বাড়ি করেছেন, কয়েক বছর আগেও সেসব জায়গায় বছরে তিন-চার মাস নৌকো ছাড়া যাওয়া যেত না। এইটি মনে রাখা দরকার, চাঁপাডাঙ্গা বা বাগনানে যে দামোদর আমরা দেখি সে দামোদর আমরা দেখি 'বেগোর হানা' হবার আগেকার দামোদর। বর্তমানে এই দামোদরের সঙ্গে মূল দামোদরের জলস্রোতের কোনও সম্পর্ক নেই। মূল জলস্রোত মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতিতে গিয়ে রূপনারায়ণের জলরাশিকে বাড়ায়। মেদিনীপুরে আর এক দিক দিয়ে বিপদ আসে—কংসাবতী নদী মারফত। যখন কংসাবতী ব্যারেজ হয়, তখন ঠিক ছিল কংসাবতী, কুমারী ও শীলাবতী এই তিনটে নিয়ে হবে কংসাবতী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাকেও পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়নি। ফলে কংসাবতীও শিলাবতীর মত মাঝে মাঝে আশপাশের গ্রাম ও জনপদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অবশ্য চাপ যতটা আসে দামোদর ও দ্বারকেশ্বরের জলরাশির মাধ্যমে, এরা ততটা ধ্বংসলীলা সাধন করতে পারে না।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা যখন হয় তখন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি:

(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

(২) চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা। এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে যে খাল বেরিয়ে এসেছে, তার ভাগীরথী অবধি নাব্যতা।

(৩) মৎস্যচাষ।

সেই সময়ে ঠিক হয় যে, দামোদর, বরাকর, কোনার ও অন্যান্য যেসব ছোট-খাটো ছোটনাগপুরের পার্বত্য নদী আছে, যা দামোদরের মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালায়, তার জলরাশিকে আটটা ড্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথম পর্যায়ে ছিল চারটি ড্যাম। কোনার, তিলায়া, মাইথন ও পাঁচেট। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বেলপাহাড়ী প্রভৃতি আরও চারটি ড্যাম। প্রথম চারটি ড্যাম হয়েছে। তার বন্যানিয়ন্ত্রণজনিত আংশিক সুফলও পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুরের যেসব অঞ্চল বন্যার জলে ডুবে থাকত সেসব জায়গায় এখন চাষ হয় এবং সাধারণত বন্যাকবলমুক্ত বলা যায়। বিপদ হয় যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। তখন আর ঐ চারটি ড্যাম দামোদর প্রভৃতি নদীর জলরাশি ধারণ করতে পারে না। ফলে দুর্গাপুর ব্যারেজের জল সময়ে এবং অসময়ে ছেড়ে দিতে হয় ব্যারেজকে রক্ষা

করবার জন্য। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে যেসব জায়গা reclaimed হয়েছে, সেসব জায়গা আবার বানে ডুবে যায়। জলরাশিকে তো পথ দিতেই হবে। যখন বন্যার বিশাল জলস্রোত নির্দিষ্ট পথ দিয়ে নিকাশ হতে পারে না, তখন সে নিজের পথ নিজে করে নেয়। ঠাকুরবাড়ি, মসজিদ বা বড়লোকের বাড়ি, চাষীর কুঁড়েঘর অথবা চাষের জমি—এসবই জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই দামোদরে বন্যা হয়, তখনই দামোদরের যে চারটি বাঁধ এখনও তৈরি হয়নি সেগুলির কথা ওঠে, তারপরই আবার সব চুপচাপ। এই হলো মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের বন্যার মৌলিক কাহিনী। বর্তমানে অ্যাসেম্বলীতে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ হচ্ছে। সরকার পক্ষের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের উপর দায়িত্ব এবং কর্তব্য ন্যস্ত আছে। কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে সে দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় খুব উদ্বিগ্ন। পনরো হাজার লোক মরেছে—এ কথা কে বলেছে এবং কেন? তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। অস্বাভাবিকভাবে যদি পাঁচজন অথবা পঁচিশজন মরে, তাঁর দায়িত্ব একটুও কমে না। সাধারণ নাগরিকের কাছে সংখ্যার দায়িত্ব বেশী; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সাধারণ নাগরিকের থেকে বেশী। যতদিন দামোদর পরিকল্পনা পূর্ণ রূপায়িত না হবে অর্থাৎ যতদিন না ঐ আটটি বাঁধ সম্পূর্ণ তৈরী হবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গের বন্যাজনিত সমস্যার সমাধান হবে না। মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া—তার কাহিনী অন্য। তারও বিশদ আলোচনা ও সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এ সমস্যা গঙ্গার অববাহিকার সমস্যা।

লখনৌ যখন গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। চন্দ্রভানু (গুপ্তা) গাড়ি ঠিক করেই রেখেছিলেন। কিন্তু মনে হল বেরিলী পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে, সেইজন্য সে রাত্রি লখনৌতেই থেকে গেলাম। সকালে উঠে বেরিলী। বেরিলীতে আই এন টি ইউ সি-র বার্ষিক সম্মেলন। ওয়ার্কিং কমিটিতে ঝড় বয়ে গেল। আই এন টি ইউ সি-র পতাকা কি হবে তাই নিয়ে বিতণ্ডা। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হল যে, কংগ্রেসের পতাকাই হবে আই এন টি ইউ সি-র পতাকা; কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না। এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। কংগ্রেস থেকে বারবার Resolution করা হয়েছে যে, কংগ্রেস কর্মীরা যদি শ্রমিক-সংগঠন করেন, তা আই এন টি ইউ সি-র ছত্রতলে করতে হবে। যদি আই এন টি ইউ সি-র বাইরে কেউ করেন, তা হলে তা আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা ভেঙে দিতে হবে। বর্ধমানের আবদুস সাত্তার আমাকে সভাপতি করে আসানসোল অঞ্চলে একটি ভাল ইউনিয়ন করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। ফলে জওহরলালের কাছ থেকে কড়া চিঠি আসে এবং সে ইউনিয়ন ভেঙে দিতে হয়। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। স্বাভাবিক কারণেই আই এন টি ইউ সি কংগ্রেসের 'বি' টীম হতে

চায়নি। অথচ কংগ্রেসকর্মীদের পুরো সাহায্য ও সহযোগিতা তার প্রয়োজন ছিল। যেসব প্রদেশে রাজ্য আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিল হত না, সেইসব রাজ্যে আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন কখনও শক্তিশালী হয়নি। মাদ্রাজে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছিল। মাদ্রাজের আই এন টি ইউ সি শাখার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোনও দিন মিল হয়নি। মাদ্রাজে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছিল শক্তিশালী। ফলে ওখানে আই এন টি ইউ সি-র নামে শ্রমিক-সংগঠন বিশেষ গড়ে উঠতে পারেনি। আবার যেসব জায়গায় রাজ্য আই এন টি ইউ সি কংগ্রেস-বিরোধীদের হাতে ছিল, সেখানেও খুব অসুবিধা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে সেই অবস্থা হয়।

১৯৫০-এ যখন ডঃ ঘোষ, ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেনদা (সেন) কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি' সংগঠন করেন, তখন পশ্চিম বাংলার শ্রমিক-সংগঠন প্রধানত সুরেশদা, দেবেনদা—এঁদের হাতে। ফলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি হয়। ফলে ইউনিয়নের সভাপতি হয়তো কংগ্রেস প্রার্থী, এবং সম্পাদক কে এম পি পি প্রার্থী। ফল যা হবার তাই হয়। একটা বিশৃংখলা। কর্মীদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি। এসবে মিলে সংগঠন বেশ ঘা খায়। যেসব কর্মী আবার কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা আরও বিপদে পড়েন। অবশ্য এমন কর্মীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের সাহায্য ও সহযোগিতায়, আর রাজনৈতিক দলেরাও তাঁদের সাহায্যের পুরো মাসুল আদায় করে নেন। একদা ভারতবর্ষে এ আই টি ইউ সি ছিল সব দলের সম্মিলিত শ্রমিক-সংগঠন। ধীরে ধীরে সে জায়গা থেকে শ্রমিক-সংগঠন সরে যায়। বল্লভভাইয়ের সাহায্যে সুরেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), খান্ডু-ভাই দেশাই, ভাসোয়াড়া প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা আলাদা করে আই এন টি ইউ সি সংগঠিত করেন। অবশ্য তার আগেই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা কখনও কখনও এমনই দাঁড়ায় যে, আর মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না; তখনই আই এন টি ইউ সি-র সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী-প্রবর্তিত আমেদাবাদে শ্রমিক-সংগঠন খুবই মজবুত ছিল। কিন্তু তা কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি।

আমি প্রত্যক্ষভাবে অনেক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলুম—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সভাপতিরূপে। তখন থেকেই একটা প্রশ্ন শ্রমিক-সংগঠনে আমাদের যাঁরা পুরোধা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি—কোনও দিন সদুত্তর পাইনি। আজও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। প্রশ্নটি অতি সোজা—শ্রমিক-সংগঠনে বাইরেকার লোক অর্থাৎ যে কারখানা বা সংস্থাকে নিয়ে ইউনিয়নটি গঠিত, তার ইউনিয়নে কেন সভাপতি বা সম্পাদক বা অন্য কর্মকর্তা সংস্থার বাইরের লোক হবে! বহু ইউনিয়ন এখনও আছে, যার সত্যিকারের পরিচালক বাইরেকার। অর্থাৎ যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন না। এটা একটা বিসদৃশ ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে ইউনিয়নের সভাপতি বা কর্মকর্তা করা হয়ে থাকে। আর বড় বড় ফেডারেশনের কথা তো সম্পূর্ণ আলাদা। সেগুলো তো রাজনীতিকদেরই কুক্ষিগত। ফলে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে ইউনিয়ন, সেইসব কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার পরামর্শে চালিত হন। শ্রমিক-সংগঠনের কাজ যে রাজ-

নীতির বাইরে এ বোধ অনেক শ্রমিক-সংগঠকের নেই। পরাধীন ভারতবর্ষে যেসব শ্রমিক-সংগঠন হয়েছিল, স্বাভাবিক ভাবেই সেইসব সংগঠনে রাজনীতি এসে পড়ে। কিন্তু স্বাধীন হবার পরও এই অবস্থা থেকে গেছে। এবং এখানে দক্ষিণ, বাম, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, পি এস পি, বর্তমানে জনতা—সব দলই সমানভাবে জড়িত। ফলে শ্রমিক-সংগঠন এখনও রাজনৈতিক দলের 'বি' টিমই হয়ে আছে। যেখানে যে শ্রমিক-সংগঠন, সেখানে সে রাজনৈতিক দলের উত্থান-পতনের সঙ্গে শ্রমিক-সংগঠনের উত্থান-পতন দেখা যায়; অর্থাৎ শ্রমিক-সংগঠনগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যে ইউনিয়নের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক দলের স্বার্থই তাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর এক রকমের শ্রমিক-সংগঠন হয়—যাঁরা মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতায় অনেক সময়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বলি দেন এবং এটাও দেখা গেছে যে, অনেক শ্রমিক ইউনিয়ন মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। যেমন প্রাইভেট সেক্টকে যে-সব কলকারখানা আছে, তার মালিকানা যে এইসব কলকারখানার শ্রমিকদেরই হওয়া উচিত—এমন প্রস্তাব খুব কম ইউনিয়ন করে থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের যেসব শ্রমিক ইউনিয়ন, তাঁরা এখনও এ দাবি তোলেননি যে জেনারেল ম্যানেজার এবং শ্রমিক দুজনেই মর্যাদায় সমান। বিশেষ জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরা তার জন্য বিশেষ সুবিধা পাবেন। কিন্তু সার্বিক ব্যবস্থা তো অন্যরকম দরকার। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কল-কারখানার সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানার পরিচালনায় কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা কি কেবলমাত্র সরকারকে লাভের অংশ পাইয়ে দেবার জন্য? রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানার শ্রমিকরা যে সমান—এ বোধ তা হলে কিভাবে আসবে? সরকার পরিচালনায় যাঁরা আছেন, তাঁদের হয়তো দৃষ্টিভঙ্গী এখনও স্বচ্ছ নয়। কিন্তু শ্রমিক-সংগঠন যাঁরা করছেন, তাঁদের মনে কোনও ধোঁয়াটে ভাব থাকা উচিত নয়। শ্রমিক-কল্যাণ এক জিনিস, আর শ্রমিকদের অধিকার আর এক জিনিস। অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন টাটার শ্রমিকরা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশী সুখ-সুবিধা পায়। বাস্তবিকপক্ষে এ একটা প্রহেলিকা।

যতদিন বাইরেকার লোকে বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পরি-চালনা করবেন, ততদিন একটা অবাস্তব অব্যবস্থা থাকতে বাধ্য। যদি সত্যিই সমাজতন্ত্রের একটা নীতি হয় তা হলে উৎপাদনের যাবতীয় উপাদান রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তার মানে যদি এই হয় যে, লভ্যাংশ সরকারী ট্রেজারিতে জমা পড়তে লাগল, আর শ্রমিকরা যে মালিক এ বোধ কোন দিনই হল না, তা হলে এই রাষ্ট্রীয়করণ উপহাসের নামান্তর মাত্র। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অনেক শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালকের মাসিক আয় সে ইউনিয়নের শ্রমিকের মাসিক আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হারের সঙ্গে আমরা ভারতবাসীর মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের তুলনা করে কিরকম অসমতা যে এখনও ভারতবর্ষে আছে, তা প্রমাণ করি। যদি শ্রমিক-সংগঠকদের আয়ের হিসাব নেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে, গড়পড়তা শ্রমিকদের যে আয় তার সঙ্গে তুলনায় অসমতা খুব বেশী। আবার কোনও কোনও শ্রমিক-সংগঠক যদি ইউনিয়ন সংক্রান্ত কোনও সরকারী বোর্ডের সদস্য হতে পারেন, তা হলে তো কথাই নেই। তাঁদের চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, আহার-বিহার—সবেতেই শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পার্থক্য। বোঝা শক্ত, এ ব্যাপার কেন ঘটবে? আর এ ব্যাপার থেকে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী কোনও দলই বাদ পড়ে না। কয়েক বছর আগে কম্যুনিস্টরা লুম্পেন

প্রোলেটারিয়েট কথাটা খুব ব্যবহার করত। অর্থাৎ যারা প্রোলেটারিয়েটদের উপার্জনের অংশ নিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং নিজেরা খাটেন না। আজকাল এ কথা বড় বেশী শুনতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় অনেক রাজনৈতিক দল লজ্জায় এ কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, রাজনৈতিক দলেরাই তো শ্রমিক-সংগঠক পাঠান। এ একটা অসম্ভব অবস্থা। সব সময়েই যেন শ্রমিকদের নাবালক করে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। শ্রমিক-সংগঠক যদি মাসে দু' হাজার টাকা পান তবে কারখানার ম্যানেজারই বা পাবেন না কেন—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসতে পারে।

বিপ্লবী কথার সংজ্ঞা যেমন খুঁজে বার করা শক্ত, সে রকম বামপন্থী, প্রগতিশীল—এসব কথার মানেও খুঁজে বার করা শক্ত। ভারতবর্ষে তো অনেক কৃষককে প্রগতিশীল বলা হয়। রেডিওতে রোজ বলে থাকে। অর্থাৎ যে কৃষক ক্ষেত বীজ সার—এসব ব্যাপারে সরকারের সাহায্যের সদ্ব্যবহার করতে পারে তারাই প্রগতিশীল। আর যারা বিনা সেচের জলে কঙ্করময় জমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় ফসল ফলাচ্ছে, তারা প্রগতিশীল আওতায় পড়ে না। ঠিক বামপন্থীর সংজ্ঞাও সেরকম খুঁজে পাওয়া শক্ত। যদি প্রস্তাব পাশ করলেই বামপন্থী হওয়া যায় তা হলে তো কংগ্রেস চাষের জমি সিলিং প্রবর্তন করেছে আর urban সিলিং-এর প্রস্তাব অনেকদিন আগেই গ্রহণ করেছে। Crop compensation-এর প্রস্তাব—সেও অনেকদিন আগে নেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভের প্রস্তাব তো কংগ্রেসের নেওয়াই আছে। আর ধীরে ধীরে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কল-কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে—এ প্রস্তাবও নেওয়া আছে। তা হলে প্রতিটি কংগ্রেস কর্মী বামপন্থী। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দেড় বিঘের বেশী জমি নেই—তিনি কোনরকমেই বামপন্থী বলে অভিহিত হতে পারবেন না; আর হরিণখালির রাজার ছেলে, যাঁদের আয় এখনও জনসাধারণের আয়ের তুলনায় বেশী, তিনি বিধানসভার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির টিকিটে দাঁড়ালেই বামপন্থী হয়ে যান—এ অসহনীয় ব্যাপার আর কত দিন চলবে? বামপন্থীরই বা সংজ্ঞা কি? আর প্রতিক্রিয়াপন্থীরই বা সংজ্ঞা কী? অভিধানগত সংজ্ঞা আমরা জানি। কিন্তু যেভাবে ভারতবর্ষে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মানে এখনও পরিস্ফুট নয়। বর্তমানে একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, প্রফুল্লচন্দ্র সেন জোতদার-দের প্রতিনিধি। বেশ! আর যেসব জোতদার কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁরা কাদের প্রতিনিধি? পশ্চিম বাংলায় এবং অন্ধ্রে বহু কম্যুনিস্ট নেতা দেখা যাবে যাঁরা ভারতবর্ষের মান অনুযায়ী ধনী ব্যক্তি। এমনও অনেক কর্মী ও নেতা আছেন, যাঁরা নিজেরা উপার্জন করেন না, ধনী সংসারের সন্তান। এঁরা কিন্তু সকলেই প্রগতিবাদী ও বামপন্থী বলে অভিহিত। সেইজন্যই জানবার ইচ্ছা হয় যে, বামপন্থী ও প্রগতিবাদীর সংজ্ঞাটি কি? প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সংজ্ঞাটি বোঝা যায়। অর্থাৎ যাঁরাই বামপন্থী নন, তাঁরাই প্রতিক্রিয়াপন্থী। অনেক বামপন্থী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা কোনও দিনই সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। আমার মনে হয় যাঁরা নিজেদের বামপন্থী ও প্রগতিশীল বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন যে, কতজন সমাজবিরোধী তাঁদের মধ্যে আছেন। এমন তো আমরা পশ্চিমবাংলা ও কেরালায় প্রত্যক্ষ করেছি যে, বামপন্থী বলে অভিহিত দলেরা যেসব অভিযানকে প্রগতিশীল অভিযান বলে মনে করতেন, তাঁরা যখন ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সেইসব অভিযানকে প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের অভিযান বলা হয়েছে। শ্রমিক-সংগঠনের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা

দেখতে পাওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল—এসব ভুয়ো স্লোগান দেবার দিন চলে গেছে। কর্মের ভিত্তিতেই পরিচিতি থাকা উচিত। ১৯৪২ থেকে ১৯৭১ অবধি কংগ্রেস সর্বত্রই প্রগতিশীল বলে অভিহিত হত এবং জনসাধারণও ধীরে ধীরে তাই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। এক এমার্জেন্সির ধাক্কায় সমস্ত প্রগতিশীলতা ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে, অথচ এমার্জেন্সির সমর্থক সি পি আই দল এখনও বামপন্থী ও প্রগতিবাদী বলে পরিচিত।

'আজ রাত্রে আজ্ঞে, আপনাদের কাকড়া ও মাছ ভাজা সেবা হবে।'
'সে কি! তোমরা রাঢ়ের লোক, রাত্তিরে ভাত থাকবে না?'
'আজ্ঞে, আজ রাত্তিরে ওই সেবাই করতে হবে।'
'আটা-ময়দাও নয়—খালি কাঁকড়া?'
'আজ্ঞে, কাঁকড়া নয়; কাকড়া।'

তারাশঙ্কর (বন্দ্যোপাধ্যায়) একটু করুণভাবে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমরা একটি সভা করতে গিয়েছিলুম। সন্মথও (দত্ত) সঙ্গে ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার রায়পুর গ্রামের লোকদের কথায় আমি কাকড়া জিনিসটা জানতুম। কিন্তু তখন ভাঙলুম না; ভাবলুম খাবার সময় তো টের পাবেনই। তবে উঠে গিয়ে গ্রামের লোকদের বলে এলুম যে, দু-একটা রুটি বা পরোটা যেন থাকে।

খাবার সময়ে তারাশঙ্কর পাতি-পাতি করে কাঁকড়া খুঁজছেন। কিন্তু তিনি চিনবেন কি করে? একটি থালায় আমাদের ভাইফোঁটার সময়ে যেমন প্যারাকির মত খাবার হয় সেই রকম আট-দশটি খাবার, এক কোণে কয়েকটি মাছ ভাজা, দুটি বাটি—একটি বাটিতে পায়েস এবং আর একটি বাটিতে আলু ও মাছের ডালনা। আমাদের প্রত্যেককে একটি করে থালা দেওয়া হয়েছে। আর একটি থালায় এক গোছা পরোটা। তারাশঙ্কর আর কাঁকড়া খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে আমি বললুম, 'ঐ যে প্যারাকির মত খাবার, চালের গুঁড়ি বা ময়দা-আটা দিয়ে হয়। ভেতরে ক্ষীর বা ছানা বা নারকেল নাড়ুর পুর দেওয়া থাকে, কোথাও কোথাও ডালের পুর দেওয়া থাকে—এরই নাম কাকড়া। বাঁকড়োর কোনও কোনও অঞ্চলে এটি অতি প্রিয় খাদ্য।'

বাঁকুড়ার এইসব অঞ্চল অত্যন্ত শুকনো। শোভা অতি মনোরম। চারদিক কত রকম গাছ-গাছালি দিয়ে ভরতি। মাঝে মাঝে মোরামের রাঙামাটির রাস্তা। কিন্তু বড্ড জলকষ্ট।

আহারাদি সেরে আমরা দুর্গাপুর অভিমুখে রওনা হলুম। বড়জোড়ার কাছে এসে দেখা গেল যে, রাস্তা কাটা ডি ভি সি-র একটি খাল কাটা হচ্ছে। যাবার সময়ে দেখে গিয়েছিলাম; তবে খাল-খননকারীরা আশ্বাস দিয়েছিল যে, কাজ শেষ

হলে ওরা গাড়ি যাতায়াতের পথ করে দিয়ে যাবে। কোথায় গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা, কোথায় লোকজন, খানিকটা রাতও হয়ে গেছে—মহা ফাঁপরে পড়লুম। তারাশঙ্করের কোনও উদ্বেগ নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও বড়জোড়ার চৌমাথার কাছে কয়েকটি দোকান খোলা আছে, দেখা গেল। উনি আস্তে আস্তে গিয়ে একটি চায়ের দোকানে বসলেন। আমি সন্মথবাবুকে সেখানে রেখে সঙ্গের সহকর্মীকে নিয়ে বড়জোড়া গ্রামে গেলুম। অনেকেই শুয়ে পড়েছিল, তাই একটু দেরি হল। কয়েকটি লোক, কয়েকটি কোদাল এবং কয়েকখানি বাঁশ নিয়ে ফিরে এলুম। দেখি, তারাশঙ্কর বেশ ভাল করে আড্ডা জমিয়েছেন। আট-দশ জন গ্রামের লোক—সবই চাষী ঘরের লোক, ওঁকে ঘিরে বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর উনি মজলিসী গল্প চালাচ্ছেন। দেখে কে বলবে যে, উনি বাংলা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মনে হল যে, আমরা যদি চেষ্টা না করি, তা হলে সারা রাতই উনি জমিয়ে ঐ আসর চালাবেন।

ওঁর লাভপুরের বাড়িতেও অনেকবার গিয়েছি। সেখানে যারা দেখা-টেখা করতে আসত, তাদের সঙ্গে হুবহু রাঢ়ী টানে কথা কয়ে যাচ্ছেন। আর সে কি উৎসাহভরে কথা—যারা এসেছে প্রত্যেকের বাড়ির খবর! অনেকেরই নাম জানেন। যাঁরা এসেছেন ঐ গ্রাম থেকে বা আশেপাশের থেকে. তাঁদের অনেকেরই এ জ্ঞান আছে দেখলুম যে, তারাশঙ্কর এখন লাভপুর-বীরভূমের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়েছেন। সেজন্য মনে একটা সম্ভ্রমবোধ আছে. কিন্তু কোনও পার্থক্যবোধের সৃষ্টি হয়নি। এই সম্পর্ক স্থাপন করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এবং এটা বোধ হয় একমাত্র তারাশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমি বহুবার লাভপুর গিয়েছি। ভ্রাতা পার্বতীশঙ্করের আতিথেয়তা ভোলবার নয়। সব সময়েই এক পায়ে খাড়া। মাঝে মাঝে পার্বতীকে একটু বকতুমও। সে মিষ্টি হেসে বলত, 'এ আর বেশী কি করছি!' আর তার উপর তো তারাশঙ্করের নিজের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। কলকাতার সমাজেও যেমন, পাড়াগাঁয়ের সমাজের মধ্যেও তেমনি, ওঁর স্বভাবের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। দিল্লীতে যখন পার্লামেন্টের সদস্যরূপে গেলেন. তখনও সেই একই ভাব। শক্ত শক্ত সমস্যার কথা এমন সাধারণভাবে বলতেন যে. তা ভোলা খুব শক্ত।

১৯৫২-য় যখন কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়. তখন কংগ্রেসের নির্বাচনী বোর্ডের তারাশঙ্কর একজন সদস্য ছিলেন। বোর্ডের মিটিং এমন জমে উঠত যে, মাঝে মাঝে মনে হত যেন এটা শুষ্ক নির্বাচনী বোর্ড নয়, যেন অন্য কোনও ঘরোয়া মজলিস। ডাঃ রায়. তারাশঙ্কর এবং বোর্ডের সভাপতি নির্মলবাবু (চন্দ্র) এই তিনজনই মাত করে রাখতেন। মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন কলকাতার বাইরেও গিয়েছি। একবার শুশুনিয়া পাহাড়ে আমি. তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত (দাস), প্রমথনাথ (বিশী) এবং আরও কয়েকজনে ছিলুম। এই তিনজন সাহিত্যের মহারথী যখন একত্রে বসতেন, সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। তারাশঙ্কর ছিলেন বড়বাবু, আর প্রমথনাথ মাঝে মাঝে তারাশঙ্কর আর সজনীকান্তের মধ্যে লাগিয়ে দিতেন. আর নিজে গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকতেন। তারাশঙ্কর আর সজনীকান্ত দুই রাঢ়ীকে লাগিয়ে দিয়ে বারেন্দ্র প্রমথনাথ মজা উপভোগ করতেন।

সজনীকান্ত সম্বন্ধে লেখা খুবই মুশকিল। খুব আড্ডাবাজ. মজলিসী লোক ছিলেন; তাস খেলতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু যখন মনে হত পরিহাসের সুযোগ পেয়েছেন. তখন আর রক্ষে থাকত না। মনে হত জিবে যেন আলপিন আছে।

প্রতি কথার সঙ্গে যাকে পরিহাস করতেন, তার গায়ে একসঙ্গে অনেক আলপিন ফুটছে। বঙ্কিমযুগে অক্ষয়চন্দ্রের (সরকার) সমালোচনা মাঝে মাঝে খুব ধারালো হত। সমাজপতি (সুরেশচন্দ্র) তাকে আরও তীক্ষ্ম করেছিলেন। আর সজনীকান্ত যেন তাতে পূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে মনে হত লেখা এবং কথার মধ্যে যেন কোনও পার্থক্য নেই—দুইয়ের তীক্ষ্মতাই সমান। অন্য দিকে শ্রদ্ধা জানাবার শক্তিও ছিল অদ্ভুত। 'শনিবারের চিঠি'র একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। হ্যাট-কোট পরা বিদ্যাসাগর—নীচে লেখা 'I. C. Banerjee', ধুতি-চাদর পরা মাইকেল—নীচে লেখা 'শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত'। কার মাথা থেকে এই ছবির কল্পনা উদ্ভব হয়েছিল জানি না। আমার ধারণা হয় পরিমলবাবু (গোস্বামী) অথবা সজনীকান্ত—কিন্তু এ ছবি ভোলবার নয়। তারাশঙ্করের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ হলে কোনও ভয়ের কারণ থাকত না; কিন্তু সজনীকান্তর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ—সে কথা ভাবতে এখনও মনে ভয় হয়। অথচ এরকম সহৃদয় বন্ধু জীবনে খুব কম পাওয়া যায়।

সজনীকান্ত এবং পশ্চিম বাংলার এককালীন চিফ সেক্রেটারী সত্যেন্দ্রনাথ (রায়) ছিলেন সহপাঠী। এঁদের দুজনে নাকি পরীক্ষায় কে প্রথম এবং কে দ্বিতীয় হবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। সত্যেন্দ্রনাথও খুব মজলিসী, আড্ডাবাজ এবং রসিক লোক ছিলেন। সজনীকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ যখন একত্রিত হতেন—সে একটা খুব উপভোগ্য ব্যাপার। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না, কিন্তু শেষ অবধি সজনীকান্তেরই জয় হত। কোনও কথা তো সজনীকান্তের মুখে আটকাত না। এবং রাগের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, এও ছিল ওঁর চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। অবশ্য বোঝা শক্ত ছিল, কোনটা সত্যিকারের রাগ, আর কোনটা কপট গাম্ভীর্য। আর বয়সের বাছ-বিচার ছিল না।

আমার মনে আছে একবার হাজারীবাগে একটা করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম। বাড়িতে সজনীকান্ত এবং আমাদের এক অল্পবয়স্ক সহকর্মী দুজনকে রেখে আমরা অন্যত্র গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি আমাদের সেই অল্পবয়স্ক সহ-কর্মী মুখ ম্লান করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আসতেই বললে, 'সজনীদা ভয়ানক রেগে গিয়েছেন। কি যে হবে বলতে পারছি না।' আমার সঙ্গীরা হন্ত-দন্ত হয়ে সজনীকান্তের কাছে এসে দেখে যে, তিনি অত্যন্ত উৎসাহ করে রাত্রে কি রান্না হবে, রাঁধুনীর সঙ্গে তার আলোচনা করছেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে, আমাদের ঐ অল্পবয়স্ক সহকর্মীটি নাকি এক প্রকান্ড অন্যায় করেছে। তার প্রায় ত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু তখনও সে বিয়ে করেনি। এইটা যে কত বড় সামাজিক অপরাধ এটা অনেকক্ষণ ধরে সজনীকান্ত তাকে বুঝিয়েছেন, এবং সেও ধারণা করে নিয়েছে যে, বিয়ে না করার জন্য সজনীকান্ত তার উপর ভয়ানক চটে গিয়েছেন।

আমি কয়েকবারই খুব বিপদে পড়েছিলুম—একবারের কথাই লিখছি। আমরা তখন আমার বাঁকড়োর বাড়িতে। সুরেন কর মশাইও ছিলেন। আমি কথা-প্রসঙ্গে সজনীকান্তকে জিজ্ঞেস করলুম যে, তার 'কে জাগে' কবিতাটি কি এলিয়টের Rhapsody on a Windy Night কবিতা অবলম্বনে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'হতে পারে, এলিয়ট আমার কবিতাটি পড়ে তাঁর কবিতাটি লিখেছেন।' তার উত্তরটি এমনভাবে দিলেন যেন এটাই খুব স্বাভাবিক।

ডায়াবিটিস ছিল। অথচ খেতে খুব ভালবাসতেন। অবশ্য ডায়াবিটিসে যে-

গুলি নিষিদ্ধ সেগুলি খাবার দিকেই বেশী আকর্ষণ ছিল। নির্মলদা (বোস) মাঝে মাঝে ঐসব খাওয়া নিয়ে আপত্তি করায় সজনীকান্ত আমাকে বলতেন, 'নির্মলদা তো ব্যাচিলর—আমরা সামাজিক লোক; ও'র কথায় কান দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।'

সজনীকান্তের কিছু কিছু লেখা পড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, উনি হয়তো রবীন্দ্রবিদ্বেষী। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ও'র শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অপরিসীম। মুশকিল ছিল, উনি আঘাত করবার সুযোগ পেলে কাউকে রেহাই দিতেন না। অথচ এরকম সহৃদয় বন্ধু খুব কমই হয়।

প্রমথনাথের (বিশী) কথা আগেও অনেকবার বলেছি। সুখে-দুঃখে সব কাজেই আমাকে সাহায্য করেছেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। কংগ্রেসের এত বড় ভক্ত অনেক মার্কামারা কংগ্রেসসেবীও নন। ও'র সাহিত্য-প্রতিভার কথা আমার লেখার প্রয়োজন নেই। অনেকে সে কাজ করেছেন এবং আরও অনেকে করবেন। আমরা ও'র মধ্যে যে বন্ধুবাৎসল্য দেখেছি, তা সত্যিই চিরকাল মনে রাখবার মত। বহুবার একত্রে বহু জায়গায় কাটিয়েছি। গুরুগম্ভীর ভাষায় হাস্যরসের এমন সৃষ্টি করেন যে, যখন কথাটি আরম্ভ করেন তখন বোঝা শক্ত যে, তার পরিণতি হবে প্রবল হাসির মধ্যে। বাল্যকাল কেটেছে শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের প্রতি একটা অসীম মমত্ববোধ আছে। কিন্তু বর্তমানে কতগুলি বিষয় নিয়ে খুব মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন।

প্রমথনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথা-বার্তায় কখনও কোনও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন না। অনেক সময়েই ঘন্টার পর ঘন্টা চুরুট মুখে করে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে এমন দু' একটি কথা বলেন যাতে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। আবার সময়ে সময়ে ভাবলেশহীন মুখে এমন সব কথা বলেন যার ধাক্কা সহ্য করা মাঝে মাঝে খুবই কঠিন হয়। ও'র কিন্তু মুখভাবের কোনও পরিবর্তন হয় না। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন; বাড়ির ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই সমান প্রীতি। তারা সকলেই মনে করে যে, এই একজন লোক যাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। ইনি কখনও পাণ্ডিত্য বা ব্যক্তিত্বে অভিভূত করেন না। অতি অনাড়ম্বর জীবন।

এ'র সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচলিত কথা আছে যে, রাস্তায় বেরোলে আমাদের বউদি অর্থাৎ ও'র সহধর্মিণী হাত ধরে ট্রামলাইন পার করান। কথাটা পুরো সত্যি না হলেও আংশিক সত্য। রাস্তায় বেরিয়ে যে কতবার আগু-পেছু করেন, কতবার এদিক-ওদিক তাকান, তার সংখ্যা ঠিক করতে বোধ হয় গণিতজ্ঞদেরও বেগ পেতে হবে। কিন্তু এই লোকটি যখন রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা সাহিত্য বিষয়ে কথা বলেন, তখন তার মধ্য দিয়ে এক বলিষ্ঠ সুর ভেসে ওঠে, যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে আপসের কোনও সংস্পর্শ নেই। রাজনীতিতে আগের দিনে যাঁদের 'স্বদেশী' বলত, উনি তাই এবং সে বিষয়ে ও'র যা মত, তা প্রকাশ করতে কোনও দিন দ্বিধা করেন না। আবার এই লোকই যখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা কন, তখন মনে হয় যে, যত অবাস্তব ছেলেমানুষী গল্প করাই বুঝি ও'র পেশা। একসময়ে কংগ্রেস ভবনে প্রায় নিত্য আনাগোনা ছিল এবং যে কাজ ও'র পক্ষে করা সম্ভব মনে করতেন, একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতেন। তবে সব সময়েই নিজেকে অলক্ষ্যে রাখতেন। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে বহু সাহিত্যিককে সংবর্ধনা দিয়েছি। আয়োজনের পুরোভাগে

প্রমথনাথ থাকতেন। কিন্তু আমরা কোনও দিনই ওঁকে সংবর্ধনা দিতে সক্ষম হইনি। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছেন, উনি কোনও তর্কে যাননি; কিন্তু কোনও দিনই সম্মতি পাওয়া যায়নি। দেশে রাজনীতির আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, অনেক সময়ে উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, কিন্তু কোনও দিনই এইসব ঘটনা ওঁর নিজের মত থেকে ওঁকে সরাতে পারেনি। অভিভূত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন—কিন্তু স্বাদেশিকতার ব্যাপারে কোনও আপসসূত্রকে কোনও দিন মর্যাদা দেননি।

এখন মাঝে মাঝে গণ আদালতের কথা শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের এক সহকর্মী ও বন্ধুর গণ আদালতে বিচার হয়। তিনি সন্ধ্যের পর গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কতকগুলি লোক এসে চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। চেনা, অচেনা—সবরকম লোকই ছিল। উনি স্বাভাবিকভাবেই কুশলপ্রশ্নাদি করলেন। কিন্তু মনে হল লোকগুলি যেন একটু অস্বাভাবিক-রকমের গম্ভীর। ওঁর কথার উত্তর না দিয়ে লোকগুলি একটু রুক্ষভাবেই বলল, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' উনি ভাবলেন যে, কোনও বিপদ-আপদ ঘটেছে অথবা কোথাও ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, তাই ওঁকে ডাকতে এসেছে। একটু থেমে উনি বললেন, 'রাত তো বেড়ে যাচ্ছে, তোমাদের গাঁয়ে যেতে গেলে এখন বাড়িতে খবর দিতে হয়। তা কাল সকালে গেলে হয় না?' একটু গলা চড়িয়ে দু'জন বলে উঠল, 'না, না। আজ রাত্রেই আপনাকে যেতে হবে। বাড়িতে খবর দেওয়ার কথা আমরা জানি না'; উনি তখন বুঝলেন যে, ব্যাপারটি অন্যরকম; কিন্তু কারণ খুঁজে পেলেন না। আবার তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কি এমন কাজ যে, আজ রাত্রেই যেতে হবে!' তখন তাদের রুক্ষতা রূঢ়তায় রূপান্তরিত হল। তারা একটু চেঁচিয়েই বলল, 'গণ আদালতের সামনে আপনাকে যেতে হবে। আপনার বিচার হবে আজ রাত্রে।' উনি তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। গণ আদালত? সেটা আবার কি? তারা বললে, 'সেখানে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে এখনই আপনাকে যেতে হবে।' আমার এই সহকর্মীটি যেমন ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক তেমনি কড়া কড়া কথা শোনাতেও তাঁর পারদর্শিতার অভাব হয় না। উনি একটু শ্লেষ-ভরেই বললেন, 'তোমরা তো বেশ বীর বটে। রাতের অন্ধকারে আমার মত একজন বয়স্ক মানুষকে এতজনে মিলে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ। সাহস বটে! খুব বীর তোমরা। চল আমি যাচ্ছি।' একটু দূরেই ওদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর চেনা গ্রাম। তখন রাত হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজনও বিশেষ চলাফেরা করছে না। গ্রামের এক প্রান্তে উপস্থিত হয়ে দেখেন—পাঁচজন লোক বসে আছে। তার মধ্যে দু'জন ওঁর পরিচিত, আর বাকী তিনজন সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হল

ও জেলারই লোক নয়। ও'কে বসতেও বলা হল না। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে একজন বললে, 'তুমি...গ্রামের...। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তুমি কংগ্রেসের হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দল বাড়াচ্ছ এবং দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে কাজ করছ।' উনি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে বাপু? দু'জনকে তো চিনতে পারছি। কিন্তু তিনজনকে তো এ অঞ্চলে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, এই গ্রামে অনেকবার এসেছি। যেবার আকাল হয়েছিল সেবারে, যেবারে গ্রামে অনেকগুলি ঘর পুড়ে গিয়েছিল সে সময়ে। একবার গাঁয়ে কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সময়ে। বহুবারই তো এসেছি। আর আপদে-বিপদে গ্রামের লোকেরা তো অনেকবারই আমায় ডেকে এনেছে। এর আবার বিচার কি?' যে দাঁড়িয়ে ছিল সে বললে, 'তোমার কথা আমরা শুনেছি, এটি গণ আদালত। গণ আদালতের বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হলে।' এই কথা বলে সে আর চারজনের মুখের দিকে চাইল। সকলেই বলে উঠল, 'ঠিক কথা বটে' এবং সঙ্গে সঙ্গে রায় দেওয়া হল—তাঁর অপরাধের জন্য তাঁর শিরচ্ছেদ হবে। উনি তখন একটু হেসে ফেলেছেন। বললেন, 'তা শিরশ্ছেদ তো হবে বাপু, কিন্তু গাঁয়ের আর সব লোক কই? তুমি তো এখানকার লোক নও।' তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার রায়টি শোনানো হলঃ 'যেহেতু বর্তমানে শিরশ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না, অতএব ওর শিখা ছেদ করে ওর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হউক।' উনি তখন একটু গোলমালে পড়ে গেছেন। একবারও ভাবেননি যে, ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। যাই হোক, দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি কাঁচি এনে ও'র শিখা ছেদ করল। ও'র শিখা অবশ্য বরাবরই বেশ সুপুষ্ট। সেজন্য ছেদনে কোনও অসুবিধা হয়নি। তারপর যারা ওকে সঙ্গে করে এনেছিল, তারাই গ্রামের বাইরে রেখে দিয়ে আসল।

তিনি একবার ভাবলেন গাঁয়ে গিয়ে লোকজনদের ডেকে এই রাত্রেই একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তখন রাতও অনেক হয়ে গেছে আর সারা দিনের পর শরীরও অবসন্ন। তিনি আস্তে আস্তে বাড়ি চলে গেলেন। পরের দিন কংগ্রেস ভবনে আমরা খবর পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে জেলা কংগ্রেস কমিটিকে বলে দেওয়া হল যে, দু' দিনের মধ্যে ঐ গ্রামে যেন জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই গ্রামে আমার এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল, তবু কাঁদরের ধার দিয়ে দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোষের গাড়ি করে সকলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সভায় বেশ জনসমাগম হয়েছে। কিন্তু মনে হল যে, ঐ গাঁয়ের লোক সব আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। সভাস্থলে বিশেষ নেই। সভা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে আমরা বললুম যে, 'এই জেলার খ্যাতনামা কংগ্রেসসেবী, যিনি এই গ্রামের সকলের বহুপরিচিত, ...দিন রাত্রিবেলা পাঁচ-ছ'জন লোক গিয়ে অন্য গ্রামের রাস্তা থেকে তাঁকে ধরে এনে এই গ্রামে গণ আদালতের নামে তাঁকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ঐ লাঞ্ছনায় ও'র ব্যক্তিগত অসম্মান কিছুই হয়নি; বরং বোঝা গেছে যে, কংগ্রেস-বিরোধীরা ও'র ভয়ে ভীত। যাই হোক, উনি তো একা নন। আজ অনেক কংগ্রেস-কর্মী এসেছেন সেই গণ আদালতে পাঁচজন বিচারকের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য।' এইভাবে ঘণ্টা খানেক সভার কাজ চলবার পর গ্রামের কয়েকজন লোক এসে আমাদের জানাল, তারা কিছু বক্তব্য রাখতে চায়। আমরা ভাবলুম এরাই বুঝি গণ আদালতের বিচারক ছিল। যাই হোক, একে একে গ্রামের ঐ ক'জন আমাদের সহকর্মী যাঁকে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল এবং গণ আদালতের সঙ্গে গ্রামের যে কোনও

সম্পর্ক নেই সে কথাও বললে। দেখা গেল যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আমাদের সহকর্মীর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সভাশেষে যখন আমরা গ্রাম ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আবার গ্রামের লোকেরা এসে উপস্থিত। এবারে প্রায় ঘেরাও বললেই চলে। তাদের অনুরোধ—সে রাত্রে গ্রামেই থাকতে হবে এবং সেখানেই আহারাদি করতে হবে। আমাদেরও কোনও উপায় ছিল না। ঘটনাটা যেভাবে মোড় নিল তাতে সে সময়ে গ্রাম থেকে চলে এলে গ্রামবাসীরা সত্যিই মনঃক্ষুণ্ণ হত। তারপর দীর্ঘ রাত ধরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা আলোচনা হল। আর রাত্রে খাওয়াটা সত্যিই রাজকীয় হয়েছিল।

গ্রামটি বীরভূম জেলায়। নাম 'থিব' এবং কংগ্রেস-সেবী হলেন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ও বীরভূম জেলার খ্যাতনামা নেতা শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এরকম আরও ঘটনা জানা আছে। কিন্তু আমি মনে করি একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এ হল দেশ স্বাধীন হবার পর।

দেশ স্বাধীন হবার আগে মাঝে মাঝে বেশ মজার মজার ঘটনা হত। ১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরিয়ে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে আমরা সাত দিন ধরে সভা করছিলাম। চতুর্দিকে সংবর্ধনা, মালা, তোরণ, বাদ্যভাণ্ড। গোঘাট থানার একটি গ্রাম থেকে আর একটি গ্রামে যাবার পথে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে দেখা গেল কতকগুলি পোস্টার এবং আশেপাশে কিছু লোকের অস্ফুট গুঞ্জন ও বক্রোক্তিও শোনা গেল। পোস্টারগুলিতে অবশ্য কংগ্রেস-বিরোধী কথাই লেখা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থির করলুম যে, ঐ গ্রামেই আমাদের সভা করতে হবে। ব্যস! সেখানেই থেমে গেলুম। সঙ্গে ছিলেন অগ্রজপ্রতিম অনুকূলদা (চক্রবর্তী)। তিনি গাঁয়ের কয়েকটি জানাশোনা বাড়িতে গেলেন। ফিরে এসে আমায় বললেন, 'বেশ ভালো লাগলো না। আমরা সভা করবো শুনেও বন্ধুরা কিছু উৎসাহ দেখাল না। শুনে আমাদের সভা করার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আমরা একটি প'ড়ো ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে উনুন কাটা হল। দোকান থেকে হাঁড়ি, চাল-ডাল প্রভৃতি কিনে রান্নার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। দোকানী অবশ্য বলেছিল যে, ঐ ক'জন লোকের খাওয়া তার বাড়িতেই হতে পারে। আমরা সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, না, আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেব। অনুকূলদা রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন; আর দু'জন কর্মী—আমার মনে হয় শান্তি (শ্রীশান্তিমোহন রায়) ও দুর্গা (শ্রীদুর্গা চক্রবর্তী)—এরা ঢুলিদের পাড়া থেকে দু'টি ঢোল সংগ্রহ করে আরও কয়েকজন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে জনসভার কথা প্রচার করতে বেরিয়ে যায়। আহারাদির পর গ্রামে সাধারণত যে জায়গায় সভা হয় আমরা সে জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দোকান থেকে একটি শতরঞ্জি ও হ্যারিকেন এনে সভাস্থলে বসে পড়লুম। আশেপাশের দশ-বারোখানি গ্রামে জনসভার কথা প্রচার হয়েছে এবং ঢোল দিয়েছেন কর্মীরা নিজেরা। সন্ধ্যের আগে থেকেই বেশ মানুষজন আসতে আরম্ভ হল। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পরিচিত। অনেকে আবার কংগ্রেস-কর্মী। যে গ্রামে ঐদিন সভা করবার কথা ছিল, সে গ্রামের লোকেরা একটু ক্ষুব্ধ। তাদের সব কথা বুঝিয়ে বলার পর একটু শান্ত হল। কিন্তু আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললে। আধ ঘন্টার মধ্যেই আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকটি হ্যাজাক ও শতরঞ্জি এল। সঙ্গে কংগ্রেসের পতাকাধারী বহু লোক। সভা তখন বেশ গমগম করছে; আর ঐ গাঁয়েরই দু-চারজন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। আমরা যারা গ্রাম পরিক্রমা করছিলুম তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ

উত্তেজিত। তীব্র ভাষায় শাণিত কথা বলবার জন্য তৈরী। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে উঠলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে, 'এই গ্রামে এসে আমরা শিক্ষালাভ করেছি এবং আমরা যে অহংকারের অন্ধকারে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিলাম সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছি। চতুর্দিকে সংবর্ধনা, ফুলের মালা, বাদ্যভাণ্ড, স্তুতিবাদ—এইসবে আমাদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছিল। আমরা মনে করেছিলাম—বুঝি আমরা আমাদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে সক্ষম হয়েছি। এই গ্রামে এসে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কাজ অনেক বাকী। কংগ্রেসের আদর্শ, স্বাধীনতার কথা বহু গ্রামে এখনও আমরা পেঁছে দিতে পারিনি। কিছু সময় জেলে কাটিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়েছিলাম। এই গ্রাম আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এখনও সংবর্ধনা পাবার যোগ্যতা আমরা লাভ করিনি। স্বাধীনতার কথা এখনও বহু জায়গায় পেঁছে দিতে হবে। সেইজন্যই এই গ্রাম এবং এই গ্রামের অধিবাসীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আজ আমাদের প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্য আমাদের পরম সম্পদ। এই গ্রামবাসীদের কাছে আমরা আশীর্বাদ চাইছি—আমরা যেন আমাদের কাজে কোনরকম অলসতা না রাখি। বহু দূর এখন যেতে হবে। বহু কাজ এখনও বাকী। এই গ্রামের অধিবাসীরা যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হন, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। খালি অনুরোধ—ঔদাসীন্য দেখাবেন না।'

এক ঘন্টা সভা চলে। শান্ত, ধীর এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে। সকলে ধৈর্য ধরে ভাষণ শোনে। সভা শেষ হবার পর আমরা যখন যে গ্রামে থাকবার কথা ছিল, সে গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছি তখন আবার প্রতিরোধ। গ্রামের বহু লোক একত্রিত হয়েছে। তাদের কথা শুনতে হবে। অগত্যা আবার আমাদের বসতে হল। গ্রামের লোক একে একে বলে গেলেন যে, আমরা যখন জেলে ছিলুম সেই সময়ে বিভিন্ন শহরের কিছু কর্মী এসে তাঁদের ওখানে ঘাঁটি গাড়েন এবং তাঁদের প্রচারেই গ্রামবাসীরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। দুটো মূল কথা ছিল। কংগ্রেসের আন্দোলনে জমিদাররা শক্তিশালী হবে, আর অহিংসা আন্দোলনে কংগ্রেস কখনও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ গোঘাট থানারই এক জমিদার জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদকরূপে আমার বিরুদ্ধে ১০৭, ১০৯, ১১০ ধারা অনুযায়ী মামলা করেছিলেন। জমিদারদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক-সম্প্রীতি আমাদের ছিল না। এ কথা ও গাঁয়ের লোকেরাও জানতেন। তবু, গ্রামের লোক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ঐ গ্রামেই অবস্থান এবং রাজসিক ভোজ।
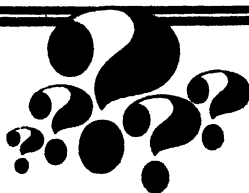
১৯৩৫-৩৬ সাল। দামোদরের বন্যায় বর্ধমান ও হুগলি জেলার কিছু কিছু অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে। এক দিন খবর এল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ডেকে পাঠিয়েছেন।

সায়েন্স কলেজে গিয়ে হাজির হলাম। সেই ঘরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাড়া খাদিমন্ডলের পঞ্চাননদা (বোস) ও সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয় ছিলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর আমাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন যে, তোমাকে খানিকটা বর্ধমান, খানিকটা হুগলী জেলার সংকটত্রাণ সমিতির তরফ থেকে বন্যাত্রাণের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। ঐ দুই জেলার বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে কাজ করা যায়, আবার কলকাতা থেকেও মাল পাঠানো যায় এমন মাঝামাঝি জায়গায় কেন্দ্রের অফিস খুলতে হবে। আমি তো মাথা নীচু করে কেবল শুনে যাচ্ছি। সতীশবাবু বললেন, দু-এক দিনের মধ্যেই যেতে হবে। তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেল এইভাবে বললেন, 'ওখানে তো রেললাইন জলের তলায়। তুই হেঁটে যাবি কি করে?' সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননদা বললেন, 'আইন অমান্য আন্দোলনের ধাক্কায় পড়ে ওর হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ও হেঁটে যেতে পারবে।' সতীশবাবুর কাছে সব ব্যাপারটাই নিখুঁত হওয়া চাই। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও তো জেল থেকে বেরিয়ে স্পাইনাল টি বি-র জন্য প্লাস্টার জ্যাকেট পরে শুয়েছিল। ও এখন যাবে কি করে?' যাই হোক, যা হোক করে প্রশ্নের মীমাংসা হল। কিছুক্ষণ আবার কথাবার্তার পর সতীশবাবু বললেন, 'তুই সাঁতার জানিস?' আমি খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে না, জানি না।' সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু বলে উঠলেন, 'তা হলে তুই যাবি কি করে? তোর তো যাওয়া চলবে না!' খানিক-ক্ষণের জন্য সব চুপচাপ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সব ফয়সালা করে দিলেন—'আচ্ছা, ও যাক, তবে নৌকোয় চাপবে না। ও যা করার অফিসে বসেই করবে।' তারপর খানিকক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর ছুটি মিলল।

আমার সত্যিই একটু অসুবিধা ছিল। পঞ্চুদার (ডঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়) নির্দেশমত অত মাস প্লাস্টার করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকবার ফলে পা দুটো যে স্থবিরত্ব পেয়েছিল তা ছাড়াবার জন্য মাঠে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে হত। যাই হোক, পরদিন তো চাঁপাডাঙ্গায় গিয়ে হাজির হলাম। মনে হচ্ছে চার-পাঁচ মাইল হাঁটিতে হয়েছিল। তখন চাঁপাডাঙ্গা অবধি মার্টিনের ছোট রেললাইন ছিল। চার-দিক দেখেশুনে মনে হল চাঁপাডাঙ্গায় একটি কেন্দ্রস্থল হবে। আর, দু-চার দিনের মধ্যেই রেল চলাচল আরম্ভ হলে জিনিস আসার কোনও অসুবিধা হবে না। কলকাতায় সেইরকমই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁদের সম্মতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপাডাঙ্গার ধান-চালের একটি আড়তে সংকটত্রাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় খোলা হল। খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে কিছু কর্মী এসে পড়লেন। অনেকটা জায়গায় আমরা কাজ শুরু করলাম। বর্ধমান জেলার বড়োবৈনান, গোতান প্রভৃতি গ্রাম (সব নাম মনে নেই), হুগলী জেলার মলয়পুর, কেশবপুর, ভাঙ্গা-মোড়া, চিলেডিঙ্গি, মায়াপুর প্রভৃতি এবং আরামবাগ, পুড়শুড়ো ও খানাকুল থানার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে আমাদের কাজ শুরু হল। তখন বোধ হয় রোজ দু' শো মণ করে চাল আমরা দিতুম। চিঁড়ে প্রভৃতি অন্য খাদ্যদ্রব্যও ছিল। কিছু জামাকাপড়ও গিয়ে পৌঁছেছিল। সতীশবাবু বলে দিয়েছিলেন, যে দিনে যে পরিমাণ সাহায্য দেবার কথা যদি তা সব বিলি না হয় তা হলে বুঝতে হবে, হয় সেখানে ঐ পরিমাণ রিলিফের দরকার নেই, নয়তো যারা রিলিফ দিচ্ছে তারা অকর্মণ্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কড়া নজর ছিল হিসাবের দিকে। যত রাতই হোক, সেদিনকার রিলিফ বিলির হিসাবপত্র মেলাতে হত এবং তিন দিন অন্তর সেইসব কাগজপত্র কলকাতায় যেত।

বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে অনেক সমস্যা। কেবলমাত্র আহার্য ও পরিধেয় দিলেই হয় না, রোগ ও মহামারীর ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হয়। আর একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা হল—কাব্যে যে 'সর্বহারা'র উল্লেখ আছে বা পলিটিক্যাল স্লোগানে যে 'সর্বহারা'র কথা বলা হয়, সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল। কিন্তু সত্যকারের 'সর্বহারা' কাকে বলে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় শিউরে উঠেছিলাম। যারা একখানা অথবা দু'খানা ছোট ঘর নিয়ে বাস করে তাদের ঘরে চার-পাঁচ পুরুষ ধরে শোবার কাঁথা, চ্যাটাই সঞ্চিত হয়েছে, ভাঙ্গাচোরা বাসনপত্রে চাল, তেল, নুন বংশানুক্রমিক ধরে রেখে আসা চলছে। এইরকম খুঁটিনাটি সব উপকরণ বহু পুরুষ ধরে সঞ্চিত হয়েছে। ছোট ঘরটায় হয়তো ঢেঁকি, উনুন, হাঁড়ি, কড়া, এবং গরু ও ছাগল থাকে। এক রাত্রে বানের প্রকোপে এ-সবই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাদের ঘর থেকে মানুষ ভেসে যায়নি, তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। এ দৃশ্য কল্পনা করাও শক্ত। এর মধ্যে বাস না করলে ঠিক বোঝা যাবে না। এইরকম রিক্ত ও সর্বপ্রকারে সর্বস্বান্ত গৃহস্থকে শুধুই রিলিফ দিলে হবে না, যাতে তারা আবার মাথা সোজা করে গৃহস্থালি আরম্ভ করতে পারে, তার সূত্রপাত করে দিয়ে আসতে হবে। বন্যা রিলিফ মানে এই সর্বব্যাপক সমস্যা। এর ওপর যাদের জমিতে বালি পড়ে যায়, তাদের সমস্যা আরও জটিল হয়। এ ছাড়া আর একটা সমস্যা আছে—যেটা মানবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত 'রেনেসাঁস'-এর ফলে বাঙালীর সমাজে যে ভুয়ো মর্যাদাবোধ ঢুকেছে, বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে সেটা বড় সমস্যা। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে শুকিয়ে মারা যাবেন তবু প্রকাশ্যভাবে কিছুতেই রিলিফ নেবেন না। অথচ বন্যার কবলে তাঁরাও সর্বহারা। ঐসব পরিবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের খোঁজ নিয়ে তাদের মারফত রিলিফ পৌঁছে দিতে হয়। সাধারণের অর্থ এবং সম্পদ যেখানে খরচ হচ্ছে, সেখানে প্রতি-টির হিসাব রাখা প্রয়োজন। ঐসব পরিবারে যে রিলিফ দেওয়া হয়, তাদের হিসেব রাখা খুবই অসুবিধাজনক। তবু রাখতে হয়।

আরও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হল। চাঁপাডাঙ্গার ট্রেনে করে রোজ দু' শো মণ চাল যেত। সেই চালের বস্তা নামিয়ে নৌকায় ও ভাঁড়ারে পৌঁছে দেবার জন্য শ্রমিক প্রয়োজন। চাঁপাডাঙ্গায় সেই সময়ে কয়েক শত উড়িষ্যাবাসী শ্রমিক ছিল। তারা নির্ধারিত রেটের চাইতে অর্ধেক রেটে এইসব বস্তা পৌঁছে দিত। আমরা যাঁদের রিলিফ দেওয়া হত তাঁদের কাছে বলেছিলুম—যদি তাঁরা বস্তাগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেন তা হলে নির্ধারিত রেটের ডবল দেওয়া হবে। কেউ রাজী হলেন না। 'আমরা চাষের কাজ করি, স্টেশনের কুলির কাজ করতে পারবো না।' এইরকম ঘটনা জীবনে আরও অনেক প্রত্যক্ষ করেছি। বাঙালীর জীবনে শ্রমের অমর্যাদার জন্যই এরকম মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। উদাসীন সরকারী যন্ত্র অনেক সময়ে অনেক বাধা সৃষ্টি করত। মধ্যে মধ্যে অবশ্য এমন অফিসারও অনেক পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা সবরকমে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আর একটা বড় অসুবিধা হয়—উৎসাহের আতিশয্যে বাইরে থেকে যাঁরা কিছু কিছু রিলিফ নিয়ে যান। অবশ্য, প্রয়োজনের তুলনায় রিলিফ-সামগ্রী এত কম হয় যে কেউ নিয়ে গেলে সার্বিক ক্ষতি কিছু হয় না। কিন্তু যেখানে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব সেখানে সম্মিলিত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হলে বহুসংখ্যক লোক অল্প করেও জিনিস নিতে পারে।

পরে আরও অনেক বন্যাত্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি। ১৯৫৯-এ প্রবল বন্যা পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তখন ডাঃ রায়ের সরকার। যত দূর মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারো কোটি টাকার 'রিলিফ' দিয়েছিলেন। এ ছাড়া কেন্দ্রের সাহায্য তো ছিলই। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার রিলিফের কাজ করেছিলাম। এর মধ্যে সরকারী সাহায্য কিছু ছিল না। আহার্য ও পরিধানের ব্যবস্থা তো প্রাথমিক। কিন্তু তারপরই মাথা গোঁজবার একটা জায়গা, শোবার জন্য কিছু একটা পাতা ও গায়ে দেবার ব্যবস্থা, রান্না করার তৈজসপত্র, কেরোসিনের ডিবে বা লম্প। মনে রাখতে হবে—বন্যায় সবই ভেসে যায়। নবজাতক শিশু যেমন নিঃসম্বল হয়ে আসে, বন্যাকবলিত গৃহস্থ সেইরকম নিঃসম্বল। আমার বেশ মনে আছে, বহু ওয়াগন বাঁশ আমরা আসাম থেকে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় এনেছিলুম মুর্শিদাবাদে দেবার জন্য। উত্তর-প্রদেশের বন-জঙ্গল থেকে ব্যানা, মুথো, কেশে—এই শ্রেণীর ঘাস এসেছিল বহু ওয়াগন, ঘরের আচ্ছাদনের জন্য। আর আমরা সংগ্রহ করেছিলুম ও কিনেছিলুম হাজার হাজার চট, চটের থান। এই চটের থান কোথাও গায়ে দেওয়া হত, কোথাও পেতে শোয়া হত, কোথাও বা দুই ঘরের পার্টিশন হিসেবেও ব্যবহার করা হত। বহু টন লোহার পাত কিনে সহৃদয় কালোয়ার দিয়ে হাতা, খুন্তি, কড়া, রুটি তৈরির তাওয়া তৈরি করানো হয়েছিল। আর তৈরি করানো হয়েছিল তারের এবং লোহার পেরেক, ঘর তৈরির কাজে লাগবে বলে। নারকেল দড়ি এবং পেটা দড়ি এত কেনা এবং সংগ্রহ করা হয়েছিল যে, মাঝে মাঝে কংগ্রেস ভবনকে মনে হত দড়ির ভাঁড়ার। অনেক অ্যালুমিনিয়াম এবং কলাইকরা বাসন সংগ্রহ হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম।

অর্থ সংগ্রহ এবং জিনিস সংগ্রহ কঠিন কাজ হলেও বিলিব্যবস্থায় যে পরিশ্রম করতে হয়, তার তুলনায় সংগ্রহকার্য ঢের সোজা। সবচেয়ে বড় কথা, যথোচিত জায়গায় যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া। এ কাজ স্বেচ্ছাব্রতী ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিনা পারিশ্রমিকেও এ কাজ করবার কর্মীর কোনও অভাব হয়নি।

সবচেয়ে বড় কথা হল সামগ্রিক ছবিটা সামনে রেখে মানসিক স্থৈর্য ও বুদ্ধি-মত্তা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা। ১৯৭১-এর বন্যায় যা প্রত্যক্ষ করলাম তা যেমন দুঃখদায়ক তেমনি কলঙ্কজনক। বাংলায় যেমন বহু জনপদ, বহু গ্রাম, বহু মানুষ এবং বহু গবাদি পশু ভেসে গেছে, তেমনি ভেসে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় লেফ্‌ট ফ্রন্ট পার্টির প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষের ষড়যন্ত্রে বর্তমান সরকারের অপসারণের কথাই বেশী ছিল, বন্যার কথা ছিল না বললেই চলে। অথচ তার আগে পশ্চিমবঙ্গ বন্যায় কবলিত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে শুনলাম যে, সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা বহু বন্যার্ত অঞ্চলে যখন পৌঁছেছেন তখনও সেইসব অঞ্চলে কোনও সরকারী কর্মচারী গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি। আমি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশের ভোট পেয়ে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের পুরো সময় কাজ করবার সুযোগ নেওয়া উচিত। এই মন্ত্রিমণ্ডলীতে অনেক দক্ষ এবং সৎ লোক আছেন। তবু ভেবে পাচ্ছি না সরকার কি করে এমন নিশ্চল, অচল হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদের প্রতিবাদ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ কাজ তো তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের। তাঁর কাজ তো

বন্যা পরিকল্পনাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংযত, সুসংহত করা।

১৯৫৯ সালে বন্যার সময়ে নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তিন দিন খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁর সঙ্গে নদীয়া সদরের অথবা অন্য কোনও জায়গার যোগাযোগ ছিল না। তিনদিন বাদে জানা গেল যে, তিনি 'জলবন্দী' অঞ্চলে বিভিন্ন স্থান থেকে বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধার করছিলেন। এক বস্ত্রে এবং তিন দিন তিন রাত অনিদ্রার মধ্যে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন এবং এখনও আছেন। তবু সরকারী কর্মচারীরা নিষ্ক্রিয় কেন? সরকারী কর্মচারীরা জানেন যে, মন্ত্রীরা মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং তারা সরকারী কর্মচারীদের বিশ্বাস করেন না। সেইজন্যই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কত দায়িত্বহীন, অকর্মণ্য তা এক বানের ধাক্কায় প্রমাণিত হল।

আমি কিছু দিন হাওড়া পোর্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলুম, অবশ্য আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন। এ বিষয়ে আমার সহকর্মীরা বেশ মজার নিয়ম করে-ছিলেন। তাঁরা যখন যেখানে সুবিধে হত, আমার নাম দিয়ে দিতেন।

কোনও ইউনিয়নের একটার বেশী সভাতে আমি যোগদান করেছি বলে মনে হয় না। এটা তো রাজনীতির খেলা। পোর্টার্স ইউনিয়ন করে একটা অভিজ্ঞতা হল যে, পশ্চিম বাংলার যত রেল-স্টেশন আছে, তার সব স্টেশনেই পোর্টাররা হল অবাঙালী। অদ্ভুত। আমি প্রাদেশিকতার কথা বলছি না. আমি অক্ষমতার কথা বলছি। ভাবালুতা বর্জন করে যদি দেখা যায়, তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, চা বাগান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থা বর্তমান। সব জায়গাতেই বাংলার বাইরের লোকেরা শ্রমিক, আর কেরানীরা বাঙালী। অনেক অনেক বছর আগে যখন শ্রীরামপুরে থাকতুম, তখন দেখেছিলুম পাটকলের প্রায় সব তাঁতীই বাঙালী। এখন এঁদের অনেক মাইনে, কিন্তু বাঙালী পাটকলে তাঁত চালায় না বললেই হয়—দক্ষিণ থেকে আসে। চা-বাগানে গেলেই শোনা যাবে মদ্দেশীয়; আর কয়লার অঞ্চলে তো গোরখপুরিয়া। স্বতই প্রশ্ন জাগে—কেন? কি আমাদের অসাধারণ কৃতিত্ব যার জন্য আমরা শ্রমবিমুখ এবং শ্রমকে অমর্যাদা করি? আগে বরাবরই দেখেছি যে, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানে চাষের কাজ আরম্ভ ও শেষ করবার জন্য ছোটনাগপুর থেকে 'মিতে'রা আসত। তারা এসে ধান বসিয়ে-টসিয়ে চলে যেত, আবার পুজোর পর এসে ধান কাটত। এই যে সব কাজেই শ্রমবিমুখতা—এর কারণ কি?

আগে লোকে বলত যে, এই বর্ধমান বিভাগ ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্নে গেছে, সেই-জন্য লোকে খাটতে পারে না। কিন্তু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কেবলমাত্র এই কারণেই আমাদের শ্রমবিমুখতা নয়। আমাদের শ্রমবিমুখতার সব-চেয়ে বড় কারণ হল আমাদের ভুয়ো মর্যাদাবোধ। এই সেদিন একজন বাংলার

রেনেসাঁস যুগের প্রাতঃস্মরণীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির লেখা পড়ছিলুম। এই লেখাটি আবার স্কুল পাঠ্য বইয়ে আছে। 'অতঃপর তিনি ব্যাগ নামক একটি বস্তুর মধ্যে দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়া ভদ্রবেশী মুটে সাজিলেন।' অর্থ অতি প্রাঞ্জল। নিজের দু'খানি কাপড় নিজে বয়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্মানজনক। সেইজন্যই 'ভদ্রবেশী মুটে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরও বহু ঘটনার সূত্রপাত ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছে, যা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং লজ্জাকর। সমাজপতি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বাড়ির মেয়েরা ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা। কিন্তু ঐসব অসাধারণ ব্যক্তি নিজেদের রক্ষিতাদের নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আমোদ-আহ্লাদ করতেন। সমাজের ভয় তো ছিলই না, নিজের পুত্র-পৌত্রাদির কাছেও লজ্জা অনুভব করতেন না। দান-ধ্যান প্রচুর ছিল। নাটক, সাহিত্য—এসব কাজে উৎসাহও প্রচুর হত। কিন্তু অর্থোপার্জন করে সম্ভ্রান্ত হবার পথ ছিল একটাই। কোনরকমে ইংরেজ শাসকের মনোরঞ্জন করে তাঁদের অনুগ্রহে অর্থোপার্জন করা। হঠাৎ মাঝখানে শোনা গিয়েছিল যে, বাঙালী সিপাহী-বিদ্রোহকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে আখ্যা দিচ্ছে। এখন দরকার হলেই মঙ্গল পাণ্ডের নামোল্লেখ করা হয়। কিন্তু এটা সত্য যে, ১৮৫৭-র ঘটনা—তাকে যাই বলা হোক, বিদ্রোহই বলা হোক বা সংগ্রামই বলা হোক—বাঙলা দেশ অথবা বাঙালীর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐ 'গৌরবময় যুগের (?)' কেউ কেউ এমন ব্যাখ্যাও করেছিলেন যে, দিল্লীর অকর্মণ্য সম্রাট, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের বিলাসী ও দায়িত্বহীন নবাব—এঁরা জুটেছিলেন। ধুন্দুপন্থ নানাসাহেবের সঙ্গে। এই ধুন্দুপন্থ নানাসাহেব বিদ্রোহ করেছিলেন ইংরেজ তাঁকে পেশোয়া বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করায়। এর মধ্যে দেশভক্তি বলে কোনও জিনিস ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে একে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের চেষ্টা বলা চলে। তার কিছু দিন আগেও দিল্লীতে মারাঠা শক্তির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। শিবাজীকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তিলক এবং আরও বহু মারাঠী আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মারাঠাদের প্রতি বাংলার সর্বসাধারণের কোনও শ্রদ্ধা বা প্রীতি থাকবার কথা নয়।

'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?'

এবং মারাঠা মানে বর্গীর আক্রমণের কোনও বাছ-বিচার ছিল না। যেসব অঞ্চলে হানা দিতে দিতে তারা যেত, সে অঞ্চলে সমস্ত গ্রাম যেমন পুড়িয়ে দিত, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে যেমন হত্যা করত, ঠিক সেই বর্বরতা নিয়েই মেয়েদেরও ইজ্জত নষ্ট করা হত। এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও বাদ-প্রতিবাদের কথা উঠতেই পারে না।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বারবার করে প্রতাপাদিত্যের কথা বলেছেন; আবার জয়ন্তীও আরম্ভ হয়েছে। প্রতাপাদিত্য দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে সনদ নিয়ে মহারাজা হন। তারপর পর্তুগীজ বোম্বেটেদের সাহায্য নিয়ে বাংলা দেশের কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য দখল করে নেন। এই হল তাঁর বীরত্বের গাথা। তাঁর নামে আমরা জয়ন্তী করি কিন্ত চাঁদ রায়, কেদার রায়ের কথা আমরা ভুলে গেছি।

আলিবর্দী খাঁ নামে একজন ভাগ্যান্বেষী ইরান বা ঐ অঞ্চল থেকে উড়িষ্যায় আসেন। উড়িষ্যায় তাঁর সাহস এবং বুদ্ধির খুব সুখ্যাতি হয়। পরে তিনি বাংলায় আসেন এবং তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর জামাই হন। মুর্শিদকলী খাঁ এবং আলিবর্দী খাঁয়ের মধ্যে অন্য যে দু'জন নবাব হয়েছিলেন, আলিবর্দী খাঁ ষড়যন্ত্র

করে তাঁদের হত্যা করান এবং নিজে নবাব হন। তিনি বাঙালীও ছিলেন না, বাংলা ভাষাও জানতেন না, আর বাংলার সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। অথচ তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব বলা হয়। বাংলা কি করে স্বাধীন ছিল বুঝি না; কারণ, ও'রা দিল্লীর সম্রাটের ফরমান নিয়ে নবাব হয়েছিলেন এবং দিল্লীর সম্রাটকে কর দিতেন। কি করে যে ও'কে স্বাধীন বলা আরম্ভ হল সেটা বলা শক্ত। তা হলে সবটাই কি গোঁজামিল দেবার চেষ্টা? অথচ সত্যিই যিনি দিল্লীর সম্রাটকে মানেননি, সেই ঈশা খাঁয়ের নামও করা হয় না।

আগেও লিখেছি, আবার লিখছি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলা দেশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়েছে বলে যে সোৎসাহ চিৎকার করা হয়েছিল, সেটা আমাদের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ইংরেজ সরকার মুসলমান-প্রধান একটি প্রদেশ গড়বার জন্য ইস্ট বেঙ্গল এবং আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ গড়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে যা হল, তাতে গোটা বাংলা দেশই মুসলমান-প্রধান হয়ে গেল। আর সমূহ আর্থিক ক্ষতি হল। আমরা খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ সিংভূম, মানভূম ছেড়ে দিলুম। আর পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যে সমৃদ্ধ শিলেট, কাছাড় বাংলা থেকে বেরিয়ে গেল। অথচ আমরা গর্ব করে বলে আসছি যে, আমরা জয়ী হয়েছি। ইংরাজ রাজকে ভারতবর্ষে শিকড় গাড়তে সাহায্য করেছে দক্ষিণের লোকেরা সৈন্যরূপে, আর বাংলার লোকেরা কেরানীরূপে। অনেক বাঙালী সে সময়ে কমিসারিয়েটে চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল ইংরেজকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য জয়ে সাহায্য করা এবং দুর্গ লুটের টাকার বখরা নেওয়া। এই প্রভুভক্তির ফলেই ইংরেজ খুশী হয়ে অনেককে অনেক ইনাম দেন। তার থেকে আমাদের অনেক জমিদার-বাড়ির পত্তন। যাদের আমাদের সমাজে অভিজাত বলে বর্ণনা করা হয়। এ'রা অবশ্য রাজা-মহারাজ খেলাত পেয়েছিলেন। আবার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে অনেক এইসব জমিদার পরিবার বহু প্রাচীন পরিবারকে উচ্ছেদ করায় ইংরেজকে সাহায্য করার জন্য জমিদারি পেয়েছিলেন। জমিদারি যখন দেওয়া হয়, তখন অনেক শর্তের মধ্যে জমিদারকে একটি শর্ত লিখতে হত যে, ইংরেজের সৈন্যরা যখন কোনও জমিদারির মধ্য দিয়ে যাবে কোথাও ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমন করতে, সেই সময়ে যত দিন ঐ সৈন্যরা জমিদারির মধ্যে থাকবে, তত দিন সেই সৈন্যদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ঐ জমিদারকে বহন করতে হবে। এই দাসত্বের দাসখত যাঁরা লিখে দিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন সমাজপতি।

বিদ্যাসাগর একটা দিক নিয়েছিলেন—শিক্ষা বিস্তারের দিক। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত কাঠামো থেকে বার করে এনে তার নতুন রূপ দেন। শুধু স্কুল খোলেননি, স্কুলে যাতে বাংলা ভাষা ভালভাবে পড়া যায়, তার জন্য বই লিখেছিলেন এবং ছাপিয়েছিলেন। অক্ষর পরিচয় থেকে আরম্ভ করে বই পড়ে জ্ঞান যাতে হয়, তার সব ব্যবস্থাই বিদ্যাসাগর করেন। বাংলা ভাষা ভাল করে শিখতে গেলে সংস্কৃত জানা প্রয়োজন। সেইজন্য সংস্কৃত বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেন। ইংরেজী ভাষা এসে পড়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—উপার্জনের জন্য তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেইজন্য ইংরেজী ভাষারও অনুবাদ করে লোকের মন সেদিকে আকর্ষণ করেন। বিধবাবিবাহ বা দান-ধ্যান এ-সমস্ত না করলেও কেবলমাত্র শিক্ষা প্রচলনের জন্যই বিদ্যাসাগর অমর, অক্ষয় হয়ে থাকতেন। এই শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান তাঁকে আরও বরণীয় করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র

কমলাকান্তের দপ্তরে মাতৃপূজা লিখেছেন, ভারতবাসীকে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি শিখিয়েছেন। 'বন্দে মাতরম' গান দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর জমিদারদের বিরুদ্ধে লেখা তখনকার দিনে এক অসমসাহসিক কাজ এবং নিজে সমৃদ্ধ ঘরের ছেলে হয়েও তখনকার দিনের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে যা সব লিখে গেছেন আজকেও তার দাম কিন্তু কমেনি।

বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে; কিন্তু সত্যিই কি কারণ নির্ধারণ হয়েছে যে, কেন অর্থনীতিতে বাঙালী এত পেছিয়ে পড়েছে? ইংরেজ প্রথম আসার ফলে তাঁদের কৃপাদৃষ্টিতে বাংলায় অনেক ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু সেইসব ব্যবসায়ে যাঁরা ধনী হলেন, তাঁদের সন্তানসন্ততিরা আর ব্যবসার জন্য পরিশ্রম করলেন না কেন? বাঙালী বড়, বাঙালী বড়, বাঙালীর একটা বিশেষ গুণ আছে, বাংলা দেশ একটা বিশেষ জায়গা—এসব কথা কাব্যে ভাল, সাহিত্যসৃষ্টিতেও এর মূল্য আছে; কিন্তু বাস্তব জীবনে এর মূল্য কতটুকু? স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আমরা অনেক করেছি—ভালই তো। আমাদের নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা নিজেরা করেছি। তার জন্য অতিরিক্ত বাহবা পাবার তো কিছু নেই। কোনও চাষী যদি তার নিজের জমিতে আট মনের জায়গায় দশ মন ধান ফলায়, তা হলে দেশে দু' মন ধান অধিক ফলেছে—এটা সত্য; কিন্তু এটাও তো সত্য যে, সে চাষীও লাভবান হয়েছে। সেজন্যই যে কথা গোড়ায় বলেছিলুম যে, একটু আমাদের নিজেদের দিকে সার্চলাইট ফেলা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ অনেক দুঃখে বলেছিলেন, 'তোরা ভাল না হতে পারিস, খারাপ হ।' খারাপ হতে গেলেও স্থবিরত্ব বা জড়ত্ব ঘোচানো দরকার। সেই কথাই তিনি বারবার বলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণযুগ থেকে আমাদের মধ্যে নানারকম আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা ভুয়ো আভিজাত্যবোধই বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের উৎকট নগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

যেসব কথা লিখলুম তা অনেকের কাছে কঠোর বলে মনে হতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি। যেরকম শ্রমের ও শ্রমিকের অমর্যাদা বাংলায় আছে, ভারতবর্ষের কোথাও তা দেখিনি। বাংলা দেশে সবর্ণ-অবর্ণের বিশেষ পার্থক্য নেই। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের তফাতও বিশেষ নেই। কিন্তু শ্রমে অপটুতার সঙ্গে শ্রমিকদের পার্থক্য—যা জমিদারি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন এখনও রয়েছে। রয়েছে বললেই শুধু হয় না, তা যেন বাড়'ব দিকেই। আমার ঘরের ছেলে যদি ধর্মতলায় গিয়ে জুতো বুরুশ করে অর্থোপার্জন করে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি বেরিয়ে যাবে—যেন সে অসাধারণ কিছু করছে। এই মনোভাব থেকেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রেই তাই। যারা মাধ্যমিকের পর উচ্চশিক্ষা করছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আর কিছু করার নেই বলেই করছে। ভেতরে ভেতরে একটা সামাজিক চাপও আছে। আমার বাড়ির ছেলে কারখানায় গিয়ে হাতুড়ি পেটা শিখবে, সেটা কি ভাল? তার চেয়ে কেরাণী হওয়ায় ঢের মর্যাদা আছে। এই অস্বাভাবিক মর্যাদাবোধই আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে পঙ্গু করে ফেলেছে।

দিল্লীতে বহু দিন ধরেই যাচ্ছি। একই বাড়িতে বাস করেছিলুম প্রায় উনিশ বছর। বাস করেছিলুম মানে, যখন কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে হতো বা দিল্লীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরতে হতো, তখনই থাকতুম। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের শেষ অবধি দিল্লী থাকা খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমার নামে বাড়ি ছিল—১৯ নং ক্যানিং লেন। বাড়িটি বেশ কিছু সংবাদপত্রসেবীরও আড্ডা হয়ে উঠেছিল। রাজনীতিকরা তো নিশ্চয়ই আসতেন। বিশেষত কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডী, সুচেতা (কৃপালনী), দেবকান্ত বড়ুয়া, মোহনলাল সুখাড়িয়া, প্রফুল্লদা, বিমলা চালিহা। এইসব ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্‌দের সংগে দেখা করতেও অনেকে ও বাড়িতে আসতেন। স্বাধীনতার পূর্বে যখন দিল্লী যেতুম, তখন দিল্লী ছিল একটু অন্যরকমের। নতুন দিল্লী আর পুরাতন দিল্লীর মধ্যে বেশ স্বাতন্ত্র্য তখন বজায় ছিল। নতুন দিল্লীর কেনা-বেচার জায়গা কনট প্লেস, কনট সার্কাস; আর পুরনো দিল্লীর চাঁদনীচক। আচার-ব্যবহার, চালচলনে এই দুই দিল্লীর স্বাতন্ত্র্য বেশ ধরা পড়ত। নতুন দিল্লীর বড় বড় কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি; কম্পাউন্ড আয়তনে এত বড় যে, অনেক সময়ে রাস্তা থেকে বাড়ি দেখতে পাওয়া যেত না। স্বাধীনতার আগে এইসব বাড়িতে তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কর্তারা থাকতেন—মায় সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী অবধি। স্বাধীন হবার পরেও এর বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। এখনও মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী প্রভৃতিদের বাড়ির কম্পাউন্ড সবটা ঘুরতে হলে বেশ খানিকটা সময় লাগে। সেক্রেটারী স্তরের কর্মচারীদেরও প্রায় অনুরূপ অবস্থা। এর জন্য নতুন দিল্লীতে বেশ একটা থাক সৃষ্টি হয়ে আছে। বড় কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি মানেই বেশ সম্ভ্রান্ত; আর ছোট কম্পাউন্ড বা কম্পাউন্ডহীন বাড়ির মালিকরা বেশ নিম্নমানের। সেইজন্য ভেদপ্রথা খুব প্রকট। অবশ্য স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা বেশ বাড়ায় এই ভেদপ্রথা কিছুটা কমে গেছে। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ফ্ল্যাটে থাকেন।

সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের তরফ থেকে ভেদপ্রথা বজায় রাখবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি হয়নি। কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য অনেক নগর গড়ে ওঠে। যারা নিম্নস্তরের কর্মচারী, তাদের কলোনীর নাম দেওয়া হয়েছিল “বিনয় নগর”; অর্থাৎ যাঁরা কম মাইনে পান, তাঁদের সব সময়ে বিনীত থাকা উচিত। আর যাঁরা একটু বেশী মাইনে পেতেন, তাঁদের কলোনীর নাম ছিল “মান নগর”—অর্থাৎ, মানী লোকদের বাড়ি। অনেক চেঁচামেচি করায় এখন অবশ্য এ-সব নাম বদলে গিয়েছে। শুরু থেকেই আমরা আচার-ব্যবহারে ভারতীয় ভাবধারা বজায় না রাখবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা আরম্ভ করি। আমাদের পরিচিত এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (তিনি বাংলার নন), যিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেছেন, গভর্নরগিরিও করেছেন, তাঁকে বরাবর ধুতি পরেই দেখেছি। দিল্লীতে দেখলুম তাঁর পরনে ট্রাউজার আর বুশ শার্ট। আমার অন্তরঙ্গ

বন্ধু, কিন্তু বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি বেকুবের মত জিজ্ঞেস করলুম, 'এ কি, হঠাৎ এমন পরিবর্তন?' তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'দিল্লীর সমাজে মিশতে গেলে এটা দরকার।' বুঝলাম। এই আচার-আচরণ প্রবর্তনের জন্য আমরা সকলেই দায়ী—কিন্তু মূলত দায়ী ছিলেন জওহরলাল। এলাহাবাদের জওহরলালকে অনেক সময়ে ধুতি-পাজামাতেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দিল্লীর জওহরলালকে কোনওদিন সরকারী পোশাক ছাড়া দেখা যায়নি।

আমাদের বহু দিনের চিফ হুইপ এবং মন্ত্রী ছিলেন শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। স্বাধীনতার আগেও তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি আতর এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখতেন। আর সদা-সর্বদাই ঘোরতর সুসজ্জিত। যারা পরিচয় জানত না, তাদের পক্ষে ওঁকে দেখে ভাবা মুশকিল ছিল যে, উনি কংগ্রেসের মত একটি দলের চিফ হুইপ। এদিকে খুব রসিকও ছিলেন। মৌলানার ছবি পার্লামেন্ট হাউসে রাখা হবে। আমাদের চার-পাঁচজনকে ডেকে পাঠালেন অনেকগুলি ছবির মধ্য থেকে একটি ছবি বাছাই করবার জন্য। আমরা সকলেই একটি ছবি পছন্দ করলুম। উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, "হতে পারে না।" তা আমি জিজ্ঞেস করলুম যে, আমাদের মত নেবার দরকার কি? উনি তখন খুব হেসে বললেন, "একটা গল্প শোনো। হিটলার, গোয়েবলস, গোয়েরিং আর একজন—চারজনে বসে তাস খেলছেন। একজন বললেন 'থ্রী হার্টস', আর একজন বললেন 'থ্রী স্পেডস', আর তৃতীয়জন বললেন 'থ্রী নো ট্রাম্প।' শেষোক্ত ব্যক্তিটি বললেন 'ওয়ান ক্লাব।' আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিনজন—'নো বিড, নো বিড, নো বিড'। শেষোক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন হিটলার।" এই গল্পটির নীতিবাক্য প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। জওহরলাল নিজে একটা ছবি পছন্দ করে দিয়েছেন। অতএব আমাদের পছন্দ-অপছন্দের কোনও কথা ওঠে না। আমার মত একজন বেকুব পার্লামেন্ট সদস্য জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আমাদের মত নিলেন কেন?' সত্যনারায়ণ এক কথায় বললেন, 'মত নেওয়াই তো নিয়ম'। ব্যস।

জওহরলালকেও মাঝে মাঝে অসুবিধেয় পড়তে হত। আমার বিশেষ বন্ধু ইউ এস মালিয়া ছিলেন কংগ্রেস দলের ডেপুটি চিফ হুইপ, কিছুকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং লোকসভার হাউসিং কমিটির চেয়ারম্যান। বিরোধী দলের এক লোকসভা-সদস্য বেআইনী করে একটি বাড়ি দখল করে বসে ছিলেন। যাঁর নামে ওই বাড়ি দেওয়া হয়েছিল, তিনি কিছুতেই দখল না পেয়ে তখন হাউসিং কমিটির চেয়ারম্যান মালিয়ার শরণাপন্ন হন। মালিয়া তখন ঐ বেআইনী দখলকারী সদস্যকে বাড়ি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। বিরোধী সদস্য মালিয়ার কথায় কর্ণপাত না করে সটান জওহরলালের কাছে যান এবং তাঁকে এমন কিছু বলেন যাতে জওহরলাল তাঁকে সমর্থন করেন। মালিয়া জওহরলালের খুব বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। মালিয়া দেখলেন খুব বিপদ। তিনি স্পীকারকে গিয়ে সব ঘটনা বলেন এবং এটাও জানান যে, ঐ সদস্যকে বাড়ি ছাড়ার জন্য তিনবার নোটিস দেওয়া হয়েছে। স্পীকারকে জানানো প্রয়োজন; কারণ, স্পীকার হাউসিং কমিটি তৈরি করেন এবং এই বিভাগ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। স্পীকার সব কাগজপত্র দেখে পুলিসকে সঙ্গে সঙ্গে কেসটা তুলে দেন যাতে বেআইনী দখলকারীকে ঘর থেকে সরানো সম্ভব হয়। তার পরদিন পার্লামেন্ট বসার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ এগারোটার সময় জওহরলাল মালিয়াকে বলেন যে, ঐ বিরোধী সদস্যকে সরানো চলবে না। মালিয়া খুব মুখ কাঁচুমাচু করে, হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, 'ও তো আর আমার

হাতে নেই, আমি সব কিছু স্পীকারকে জানিয়ে দিয়েছি।' ঠিক এই সময়ে জওহরলালের কাছে ঐ বিরোধীপক্ষের সদস্যও আসেন। তিনি খুব ক্রুদ্ধ স্বরে জওহরলালকে জানান যে, পুলিস এসে তাঁর ঘরের জিনিসপত্র বার করে দিয়ে অপর এক সদস্যকে ঘরের দখল দিয়ে গেছে। জওহরলাল মালিয়ার দিকে চাইলেন। মালিয়া অতি ভালোমানুষের মত জওহরলালকে উত্তর দিলেন, 'তা হলে আমি একবার স্পীকারের কাছে খবর নিয়ে আসি।' ঘটনাটা আর এগুলো না। সেই বিরোধী পক্ষের সদস্যকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হল এবং জওহরলাল স্পীকারকেই দায়ী ভাবলেন। অতএব মালিয়া নির্দোষ।

মৌলানা ছিলেন একেবারে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁর আচরণে এমন একটা ভাব ছিল যেটাকে রাজসিক বলা চলে। কিন্তু বিপদ হত কেউ কোনও অভিযোগ করলে বিশেষ খোঁজখবর না নিয়েই তিনি অভিযোক্তাকে সমর্থন করতেন। আগে তো তিনজনকে নিয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড ছিল। সর্দার বল্লভভাই সভাপতি এবং অন্য দু'জন সদস্য হলেন মৌলানা এবং রাজেন্দ্রবাবু। স্বাধীনতার পর যখন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড আরও বড় হয়, তখনও মৌলানা ছিলেন পার্লামেন্টারী বোর্ডের একজন প্রভাবশালী সদস্য। এই পার্লামেন্টারী বোর্ডই কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী শাখার তত্ত্বাবধায়ক। অবশ্য সাধারণ নির্বাচনের সময়ে এ আই সি সি থেকে নির্বাচিত আরও কয়েকজন সদস্য এই পার্লামেন্টারী বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত হতেন এবং গঠিত হত সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি। সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়ন দিতেন সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি। বাই-ইলেকশনে মনোনয়ন অবশ্য পার্লামেন্টারী বোর্ডই দিতেন। মাঝে মাঝে একটু অসুবিধের সৃষ্টি হত। লোকে অনাবশ্যকভাবে মৌলানার কাছে অভিযোগ পেশ করত এবং তিনি তাই নিয়ে মনোনয়নের সময়ে কথা তুলতেন। একবার সাধারণ নির্বাচনের সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে মাদ্রাজ রাজ্যের জন্য যে সুপারিশ এসেছিল, তার বিরুদ্ধে মৌলানা আপত্তি করেন। খুব বিপদ—মৌলানার সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। আমি, কামরাজ আর মালিয়া অনেক পরামর্শ করলুম। দু'দিন বাদেই আবার ইলেকশন কমিটির সামনে মাদ্রাজের তালিকা উঠবে। তার আগেই যা হোক ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা একটা হলোও। নির্ধারিত দিনে যখন মাদ্রাজের প্রশ্ন এল, মৌলানা টুকরো টুকরো কতগুলো কাগজ বার করলেন। উনি সাধারণত দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে এবং চশমার খাপের মধ্যে কাগজ গুঁজে রাখতেন। সেই কাগজগুলি খুলে উনি কতগুলি কন্‌স্টিটিউয়েন্সীর নাম এবং ঐ সব কন্‌স্টিটিউয়েন্সীতে কতগুলি নতুন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করলেন। আমরা কামরাজকে জিজ্ঞেস করলুম। কামরাজ তো তৈরীই ছিলেন—পুরো মাদ্রাজ রাজ্যের ভোটার লিস্ট তাঁর সঙ্গে। তন্নতন্ন করে ভোটার লিস্ট খুঁজে দেখা গেল যে, মৌলানা যেসব কন্‌স্টিটিউয়েন্সীতে পরিবর্ত প্রার্থীদের নাম দিয়েছেন, তাঁদের কারো নাম ভোটার লিস্টে নেই। লালবাহাদুর মুখ কাঁচুমাচু করে যখন জানালেন যে, মৌলানা যাঁদের নাম দিয়েছেন তাঁদের কেউই ভোটার নন তখন মিটিং-এর মধ্যে প্রায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কারো হাসবার উপায় নেই: কারণ, মৌলানা পরম শ্রদ্ধেয়। আবার গাম্ভীর্য রাখাও দায়। সে এক মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। যাই হোক, শেষমেশ কামরাজের প্রেরিত নামগুলি অনুমোদিত হল। ভেতরের ব্যাপারটি অত্যন্ত অসাধু। কিন্ত তার জন্য আমার মনে কোনও গ্লানি নেই। আমরা যে তিনজনে পরামর্শ করেছিলুম, সেই পরামর্শের ফলস্বরূপ মাদ্রাজের কয়েকজন কর্মী

মৌলানার কাছে বিভিন্ন স্লিপে ঐসব ভিত্তিহীন নামগুলি দিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামরাজের প্রেরিত নামগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। সংবাদপত্রের লোকেরা মাঝে মাঝে মৌলানার কাছ থেকে বেশ খবর সংগ্রহ করে নিতেন। তাঁরা গিয়ে বলতেন যে, ক্যাবিনেটে এইসব হল কেন? এগুলো তো ঠিক হয়নি! মৌলানা অমনি সোৎসাহে বলে উঠতেন, 'না, না; এ তো গলদ বাত্!' বলে উনি আবার মাঝে মাঝে ক্যাবিনেটে যা হয়েছে, হয়তো প্রকাশ হয়নি, বলতেন।

নতুন দিল্লীর আবহাওয়ার সঙ্গে মৌলানাকে মানাতও বেশ। সন্ধ্যের পরে তো কারো সঙ্গেই দেখা করতেন না। দিনের বেলাতেও খুব কম লোকই দেখা পেত। নতুন দিল্লীর মন্ত্রীদেরও বেশ বিচিত্র ধরনধারণ ছিল। অধিকাংশ মন্ত্রী-কেই সকাল ন'টা অবধি পাওয়া যেত না। সব স্নানের ঘরে অথবা পুজোর ঘরে। তা সে পূর্ণ মন্ত্রীই হন বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীই হন। সকলেরই এক ধরন। অবশ্য জওহরলাল, কি গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কিংবা লালবাহাদুর, মোরারজীভাই— এঁদের কথা ছিল স্বতন্ত্র। নতুন দিল্লীর আবহাওয়াটাই ছিল কৃত্রিম। সকলের ভাব যেন ভয়ানক ব্যস্ত। অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাঁরা গল্পই করতেন। আর চালচলন দেখে তো বোঝারই উপায় ছিল না যে, কোনও রাজনৈতিক দলের লোক। সকলেরই বেশ একটু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আত্মম্ভরী ভাব। তার সঙ্গে ব্যস্ততা আর অভিনয়ও ছিল। নতুন দিল্লীতে তো কোনও সমাজ গড়ে ওঠেনি! মন্ত্রী, পার্লামেন্টের সদস্য আর অফিসার। মাঝে মাঝে দু-একজন অন্য শ্রেণীর লোককেও দেখা যায়। তাঁদের মধ্যেও চালচলনের গমক কম নয়। আর এক দল আছেন যাঁরা সব এমব্যাসিতে কাজ করেন সেই সব দেশের লোক। আবার সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁদের প্রায় সব সময়েই বিদেশী দূতাবাসের মধ্যে বা আনাচে-কানাচে দেখা যেত। এইসব এমব্যাসিতে নাকি সব সময়েই ভাল ভাল খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। অতএব—। আবার যদি কোনও অফিসার বা পার্লামেন্টের সদস্যের বাড়ি জওহরলাল যেতেন তা হলে তো সেই বাড়ির কর্তার কিছু দিনের জন্য কথাবার্তার ঢঙই বদলে যেত। আর সব সময়েই সেই গল্প। এইসবে মিশে নতুন দিল্লীতে যাঁরা বছরের অধিকাংশ দিন থাকেন, তাঁরা মাটির সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই যে যোগসূত্র নেই, এই বোধও তাঁদের থাকে না। অথচ এঁরা সব বিষয়েই কথা বলেন এবং কথাগুলি বলেন যেন উপরতলা থেকে। আমরা বেশী দিন দিল্লীতে থাকতুম না, সেইজন্য আমরা অধঃপতিত হতে পারিনি। আর উপায়ই বা কি। যাঁদের একটু নাম হয়েছে, তাঁদের বাড়িতে সব সময়ে ভিড়। তিনি বাড়িতে থাকলেও ভিড়, না থাকলেও ভিড়। সব সময়েই যে উমেদাররা যেতেন, তা নয়; আবার উপদেশ দেবার জন্যও অনেকে আসতেন। কিন্তু এক বিষয়ে সকলের মিল থাকত। যেন খুব বড় কিছু একটা করছেন, আর পৃথিবীর যত জ্ঞান-ভান্ডার যেন কতিপয় অধিবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এঁদের বাড়িতে যখন কোনও বিয়ে হত, তখন সে এলাহী কান্ড। মনেই হত না যে, এঁরা ভারত-বর্ষের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য বিশেষ একটি গোষ্ঠী আছে, যাঁদের বিবাহ সভায় ভোজ্যের চেয়ে পানীয়ের ব্যবস্থা বেশী। আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে নতুন দিল্লীর এই বদ্ধ আবহাওয়া ও সীমাবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাপনের ফলে এখান থেকে কোনও কাজই ভালোভাবে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

১৯২৩-এ দ্বারকেশ্বরের বন্যায় বড়ডোঙ্গলে সাতজন লোক মারা যায়। প্রফুল্লদা (সেন) বন্যাত্রাণের কাজ নিয়ে বড়ডোঙ্গলে যান। তার আগে উনি ১৯২১-এ ভূপতিদার (মজুমদার) সঙ্গে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের প্রচারের জন্য গোটা আরামবাগ মহকুমা ঘুরে এসেছিলেন। তখন হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে, হুগলী শহরে—জাতীয় বিদ্যালয় 'বিদ্যামন্দির' ছিল। প্রফুল্লদার সঙ্গে অনেকেই বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতা করতেন। উনি বিদ্যামন্দিরের কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বড়ডোঙ্গলে যান। গিয়েছিলেন একান্ত সাময়িকভাবে বন্যাত্রাণের জন্য। তারপর সেখানেই প্রধান কেন্দ্র করে বসবাস আরম্ভ করেন। বড়ডোঙ্গল তখন শহরের লোকের কাছে প্রায় অগম্য ছিল। নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন চাঁপাডাঙ্গা —মার্টিনের ছোট রেল চলত তখন; বড়ডোঙ্গল থেকে ষোল মাইল। আর চাঁপাডাঙ্গা থেকে চার মাইল দূরে বড় লাইনের রেল-স্টেশন তারকেশ্বর। চাঁপাডাঙ্গা থেকে বড়ডোঙ্গল যাবার কোনও রাস্তা ছিল না। তখন আরামবাগ মহকুমায় কোনও রাস্তা ছিল না বললেই চলে। আবার বছরের চার-পাঁচ মাস চাঁপাডাঙ্গা থেকে বড়-ডোঙ্গল যে মাঠের পথে যাতায়াত করতুম, তারও আট-দশ মাইল জলের তলায় থাকত। দামোদরের জল। স্বাধীনতার পর কিছু কিছু বড় পাকা রাস্তা হয়েছে। কিন্তু ডি ভি সি-র সব জলাধার হবার আগে সে রাস্তাও ভেঙ্গে যেত। কাজে-কাজেই বছরের ছ' সাত মাস বড়ডোঙ্গল সাধারণভাবে অগম্যই ছিল।

বড়ডোঙ্গল ছিল আরামবাগ থানার প্রায় শেষ গ্রাম। তারপরই হুগলী জেলার খানাকুল থানা, অন্য দিকে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা। বড়ডোঙ্গল গ্রামের মাঝখান দিয়ে দ্বারকেশ্বর বয়ে গেছে। গ্রামটির যেখানে প্রফুল্লদারা বসবাস আরম্ভ করেন, সেখানকার চাষের জমি বন্যায় বালি পড়ে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নদীর অপর পারের নাম হয়ে গিয়েছিল ছোটডোঙ্গল। সেখানে চাষবাস সবই হত। যানবাহনের মধ্যে ছিল পাল্কি—যা বেশ সম্পদশালী ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে পারত না। আর অসুখ-বিসুখ হলে লোকেরা খাট বা চারপাই উল্টো করে তার চারদিকে কানাত দিয়ে ঘিরে রুগীকে নিয়ে যেত। কাছের হাস-পাতাল আরামবাগ শহরে—আট মাইল দূরে। আর কাছেপিঠে কোথাও স্কুল ছিল না। পরে বেচারাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে বড়ডোঙ্গলেই একটা স্কুল হয়ে-ছিল। এই স্কুলের সঙ্গে প্রফুল্লদা এখনও বিশেষভাবে জড়িত আছেন। বড়-ডোঙ্গল গ্রামের আর এক পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যায়, নাম ঝুমঝুমি। এই ঝুমঝুমির ধারে, বড়ডোঙ্গলের অপর পারে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বালি। বড় বড় দোতলা মাটির বাড়িতে অনেক পিতল-কাঁসার বাসনের কারখানা ছিল। এই কাজে শ্রমিক ছিল দশ হাজারের উপর। সাধারণ পিতলের চাদরের কলসী, আর নানারকমের রেকাবী তৈরী হত। বড় আড়ৎ ছিল ঘাটাল, আর তারপরই কলকাতার

বড়বাজার। বর্ষাকালে নৌকাপথে ঘাটাল, রানীচক, কোলাঘাট এবং কলকাতা অবধি যাতায়াত চলত। অন্যান্য সময়ে একেবারেই দুর্গম। তবুও পিতলের এই শিল্প বেশ সমৃদ্ধ ছিল।

প্রফুল্লদারা বড়ডোঙ্গলের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন খুব ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার জন্য অনেকেই চলে আসত, থাকতে চাইত না। আর ও'রা খদ্দরের মশারি ছিল না বলে মশারি ব্যবহার করতেন না। তার ফলে রাত্তিরে মশার কামড় এবং সব সময়েই প্রায় ম্যালেরিয়া জ্বর। প্রফুল্লদার সঙ্গে হুগলী থেকে একজন কর্মী গিয়েছিলেন—সাগর হাজরা। সাগরদা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়ে চলে আসেন, তারপর টি বি হয়ে মারা যান। তাঁর নামেই 'সাগর কুটির'—যেটা প্রফুল্লদাদের বাসস্থান ছিল। এখনও সাগর কুটির আছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এই সাগর কুটির হুগলী জেলার আইন অমান্য পরিষদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমি অনেক দিন বাস করেছি সাগর কুটিরে। কোথাও রাস্তা ছিল না, কোনও যানবাহন ছিল না। সেইজন্য কর্মীরা হেঁটে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অসুখ-বিসুখ অনেক বেড়ে যাওয়ায় প্রফুল্লদা গান্ধীজীকে চিঠি লেখেন যে, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে হয়তো তাঁকে আরামবাগ ছেড়ে চলে যেতে হবে। গান্ধীজী উত্তরে লেখেন—

My dear Prafulla,

It is against my grain to advise you to leave Arambagh and go elsewhere. Drink boiled water and use mosquito curtain even if it is foreign.

অনেকের পক্ষে এখন ভাবতে অসুবিধে লাগবে যে, গান্ধীজী ফরেন জিনিস ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

তখন বিভিন্ন জেলায় অনেক এইরকম কর্মীদের থাকবার আস্তানা গড়ে উঠেছিল। কোথাও নাম ছিল 'বিদ্যামন্দির', কোথাও নাম ছিল 'আশ্রম'। কিন্তু থাকতেন কংগ্রেসকর্মীরা। খুবই শক্ত ছিল, যে পারিপার্শ্বিকে কর্মীরা মানুষ হয়েছেন, সেই পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেদের ছিনিয়ে নিয়ে এই অগম্য স্থানে থাকা। তবুও অনেকে যেতেন এবং থাকতেন, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় সেইখানেই বসবাস করেছেন। অনেকে যে বলেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, তা পুরোপুরি সত্যি নয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যে হাজার-লক্ষ লোক বেরিয়ে এসেছিলেন, তার অধিকাংশই ফিরে গিয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু যে অংশ থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা হয়তো খুবই কম, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। সংখ্যাবাচক হলে অসহযোগ আন্দোলন হয়তো সার্থক হয়নি, কিন্তু যদি গুণবাচক হয়, তা হলে অসহযোগ আন্দোলন সার্থকতার মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হুগলীতে জেলা কংগ্রেস অফিসের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তার মধ্যে নগেনদা (মুখোপাধ্যায়) পেশায় ছিলেন উকিল। (কিন্তু অসহযোগের পর আর ওকালতি করেননি)। আর গৌরদা (শ্রীগৌরহরি সোম) শিক্ষায় ছিলেন এম এ, বি এল, তখনকার দিনে ভালো সরকারী চাকরী করতেন। ১৯২১ সালের পর আমৃত্যু ওকালতিও করেননি, চাকরিতেও যোগ দেননি। আরও ছিলেন মোক্ষদা সামাধ্যায়ী মশাই। সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রকাণ্ড পণ্ডিত। আর ছিলেন দুর্গাদা, রঞ্জিতদা, সাগর হাজরা (যাঁর কথা আগেই বলেছি)। দুই ভাই হামিদুল হক ও সিরাজুল হক—

এ'রা কেউই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে নিজেদের ঘরে ফেরত যাননি এবং সব সময়েই কংগ্রেসের কাজ করতেন। বর্তমান লোকসভার সদস্য বিজয় মোদক—সেও এই দলে ছিল। বিজয়ের বাবা বিনয়বাবু ছিলেন খ্যাতিমান ইঞ্জিনীয়ার। তিনি তাঁর বৃত্তিতে কোনও দিন ফিরে যাননি। আর বিদ্যামন্দিরে আমাদের খাওয়া ছিল একেবারে নির্ভেজাল। ভাত এবং দু' পয়সার ডাল। এর সঙ্গে যদি কোনও দিন শাকের তরকারি হত, তা হলে এত কলরব হত যে, পাড়াপড়শীরা মনে করতেন যে, এরা পোলাও-কালিয়া খাচ্ছে।

হুগলী জেলায় কংগ্রেস-কর্মীদের আরও বড় আস্তানা ছিল। একটি ছিল হরিপালে—'কল্যাণ সংঘ', প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ আশুতোষ দাস। আশুদা পার্মানেন্ট কমিশন পেয়েছিলেন। কিন্তু ২১ সালে যে ছেড়ে দিয়ে আসেন, তারপর আর কোনও দিন চাকরি করেননি। আশুদা ১৯৪০-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে জেল থেকে ফেরত এসে মারা গেছেন। কল্যাণ সংঘের পরিচালক ছিলেন বিজয়দা (বিজয়কুমার ভট্টাচার্য)। আরও অনেক কর্মী সেখানে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন, শরৎ ভট্টাচার্য, এখনও ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শরৎ বারো বছর বয়সে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে জেলে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি, এখনও কল্যাণ সংঘে আছে। বিজয়দা ১৯২১-এ অসহযোগ করে হেডমাস্টারি ছেড়ে আসেন। সব আন্দোলনে জেল খেটেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর বর্ধমানের এক ছোট্ট গ্রামে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজে লিপ্ত হন। আশি বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও সেই কাজই করছেন। গ্রামটির নাম ছিল নবগ্রাম। এখন নাম হয়েছে কলানবগ্রাম। কল্যাণ সংঘের খাওয়া-দাওয়া হুগলী বিদ্যামন্দিরের চেয়ে উচ্চ মানের ছিল। সংলগ্ন জমিতে কিছু তরিতরকারির গাছ বসানো হত। কোনও গাছে যদি ঝিঙে হত, বিজয়দা বলতেন, 'ওহে শরৎ, গাছে যে বেশ ঝিঙে হয়েছে। কচি ঝিঙে।' শরৎ অমনি সোৎসাহে বলে উঠত, 'কচি ঝিঙে ভাতে আর ভাত। সে তো অপূর্ব।' ব্যস। সেদিন আমরা সব তোফা খেলুম। এ'রা সবাই অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মধ্যে আর কেউ বাড়ি ফেরেননি।

কংগ্রেস কর্মীদের আর একটা বড় আস্তানা ছিল বাঁকুড়ার 'অমরকানন'। স্থাপয়িতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ। অমরকানন হয়েছিল তখনকার এক কর্মী অমর চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে। পরিবেশ অতি মনোরম। কাছেই ছোট্ট পাহাড়। সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে মেজে অবধি। তার অপর দিকে রানীগঞ্জ। এই মেজেতেই আগে দামোদর পারাপারের অস্থায়ী সেতু হত। রাস্তার দু' ধারে শালবন। আবার মালিয়াড়া থেকে গঙ্গাজলঘাটি হয়ে শালতোড়ার রাস্তা বেরিয়ে গেছে। চতুর্দিকে শিশু শাল উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর মধ্যে মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়। চারদিকে মহুয়া গাছ ছড়ানো। মহুয়া ফুল যখন পড়ত, সন্ধ্যের পর ভাল্লুকরা সেই মহুয়ার মধু খেতে আসত। নজরুল লিখেছিলেন,

> 'মহুয়ার মধু খেয়ে
> মন উচাটন,
> অমর কানন মোদের
> অমর কানন।'

গোবিন্দবাবুর জনপ্রিয়তার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ১৯৫২-র

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ও'র গ্রামের যে পোলিং বুথ, সেই পোলিং বুথের দু'টি লোকসভা আসনে ও বিধানসভা আসনে পোলিং বুথের অন্তর্গত সমস্ত ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। তিনজন অনুপস্থিত এবং একজন মৃত বলে চারটি ভোট কম পড়ে এবং সব ভোটগুলিই পড়ে কংগ্রেস-প্রার্থীদের পক্ষে। অমরকাননও গঙ্গাজলঘাটি গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল। গোবিন্দবাবুর সহকর্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউই নিজেদের পেশায় ফিরে যাননি। ভাবতে পারি না, এইসব আস্তানায় যাঁরা ছিলেন—রামলোচনবাবু, শিশুবাবু—তাঁদের কেন বিপ্লবী বলা হবে না? তাঁরা তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আর ঘরে ফিরে যাননি। যে কাজ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তখনকার দিনে তো আমার বেশী জেলায় যাতায়াত ছিল না। আমি কেবল হুগলী, বাঁকুড়া আর বর্ধমান জেলার কথাই বলতে পারি। মেদিনীপুরের কথাও জানি। সেখানকার অসংখ্য কর্মী সেই '২১ সাল থেকে সংগ্রামের কাজ এবং গঠনমূলক কাজ একসঙ্গে করে এসেছেন। বাইরের লোক হয়তো নাম জানে কেবলমাত্র অজয়দা (মুখোপাধ্যায়), সতীশদা (সামন্ত), নিকুঞ্জবাবু (মাইতি), রজনীদা (প্রামাণিক), চারুদা (মহান্তি), সুশীলের (ধাড়া)। কিন্তু আমি অন্তত আরও একশ কর্মীর নাম করতে পারি যাঁরা অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে সব কিছু ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। অনেকে আমৃত্যু করেছেন। অনেকে এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু এঁরা তো কেউ ঘরে ফিরে যাননি।

বর্ধমানে আলাদা কোনও বাড়ি বা আস্তানা ছিল না। জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিসই ছিল কর্মীদের আস্তানা। পাঁজা মশাই (যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) ছিলেন সব সময়েই অভিভাবকরূপে। নিজে এম এ, বি এল। অসহযোগের পর আর কোনও দিন আদালতে যাননি। সব সময়ে কংগ্রেসের কাজ করেছেন। কংগ্রেস-কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বারবার জেল খেটেছেন। আর একজনের নাম মনে পড়ছে—অন্নদাবাবু (মণ্ডল)। কালনায় বাড়ি। পেশা ওকালতি। অসহযোগ আন্দোলনের পর আর আদালত যাননি। ১৯৩০ সালে কালনায় এমন আন্দোলন হয় যে, রেলের কামরা থেকে তাড়ির কলসী স্টেশনে নামানো সম্ভব হয়নি। উনি বাড়িতে থাকতেন, কিন্তু সপরিবারে আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিলেন। মনুমেন্টের যে সভায় সুভাষচন্দ্র প্রহৃত হয়েছিলেন, সেই সভাতেই পুলিসের মারে ওর এক ভাইয়ের হাত ভেঙে যায়। বিচার্য বিষয় এই যে, এঁদের কি বলে অভিহিত করব! যাঁরা সাংসারিক সুখ বিসর্জন দিয়ে আজীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু কোনও দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি, তাঁদের কেন বিপ্লবী বলা হবে না? একটা গতানুগতিক ধারা চলে এসেছে যে, অহিংসার পথে যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এবং আজীবন—তাঁদের বিপ্লবী বলা হয় না। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—কেন? আর এঁরা যেসব কাজ করেছেন তাতে তো সামাজিক কুপ্রথা অনেক দূর হয়েছে। অনেক জায়গায় পল্লীশিল্প গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে লোকের মন থেকে ভয় দূর হয়েছে। এঁরা যদি বিপ্লবী না হন, তবে বিপ্লবী কারা?
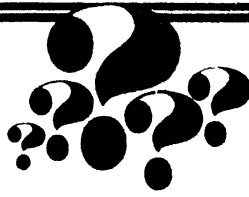
কাকদ্বীপে সম্মেলন। বোধ হয় ১৯৫৮-৫৯ সাল। মৃগাঙ্কবাবু এক মাস আগেই যাতায়াত আরম্ভ করলেন। বন্ধুবর মৃগাঙ্কমোহন সুর সম্বন্ধে কিছু লেখা খুব শক্ত। নীরবে, নিঃশব্দে, লোকলোচনের অজ্ঞাতে থেকে কংগ্রেসের এত কাজ করেছেন যে, বলা শক্ত। Split-এর আগে কংগ্রেসের যেখানে যত সম্মেলন বা প্রদর্শনী হয়েছে, অবশ্য কলকাতার কাছেপিঠে, তার প্যাণ্ডেল প্রভৃতি যত আনুষঙ্গিক কাজ ওঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছে। কল্যাণী কংগ্রেস ও দুর্গাপুর কংগ্রেস, লেক, বেলেঘাটা ও দুর্গাপুর এ আই সি সি সেশন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী—এসবের নির্মাণকার্য সবই ওঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছে। প্রদর্শনীর পুরো দায়িত্বই ওঁর উপর থাকত। কলকাতার বাইরে হলে সেখানে আগে থাকতে গিয়ে একটি ঘর ভাড়া করতেন। একটি রাঁধবার লোক থাকত। আমরাও গেলে সেখানেই খেতুম—সবই অবশ্য ওঁর খরচে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাস করে বিলেতে গিয়েছিলেন—সেখানে অধ্যয়ন করে এসে এখানে অধ্যাপনার কাজ নেবেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে চলে আসেন। আর চাকরি করা চলবে না, ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসায় সারা ভারতবর্ষে সুনাম ও কৃতিত্ব হয়েছিল। অনেকদিন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ওঁর দান যে কত আমার জানা নেই, তবে মনে হয় বহু লক্ষ টাকা। একবার আমি, খগেনবাবু (দাশগুপ্ত), সম্মথ (দত্ত) ও মৃগাঙ্কবাবু আরামবাগ হয়ে বাঁকড়ো যাবার পথে জয়রামবাটীতে থেমেছিলুম। তখন সেখানে যে স্বামীজী ছিলেন, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, অতিথিনিবাস তৈরি প্রায় সম্পূর্ণ, আর কয়েক হাজার টাকা হলেই হবে। আহারাদির পর যখন জয়রামবাটী থেকে বেরোচ্ছি, তখন স্বামীজী বললেন যে, একটি সুসংবাদ আছে : যে টাকা তাঁর প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমরা বুঝলুম যে, এটি মৃগাঙ্কবাবুরই কাজ।

মৃগাঙ্কবাবু কাকদ্বীপ কনফারেন্সের সময়ে খুব বিপদে পড়েছিলেন। বিস্তীর্ণ জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছিল প্যাণ্ডেলের জন্য। ওঁর সংকল্প ছিল সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তারপর গোবরমাটি লেপে দেওয়া হবে। অবাক কাণ্ড। অনেকের হয়তো বিশ্বাস হবে না; কিন্তু সত্যিই, কাকদ্বীপ অঞ্চলে গরুর এত অভাব ছিল যে, গোবর পাওয়া গেল না বললেই চলে। কলকাতা থেকে ট্রাকে করে মৃগাঙ্কবাবুকে গোবর নিয়ে যেতে হয়। অবিশ্বাস্য। কিন্তু নিখাদ সত্যি। তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলে সম্মেলন বা প্রদর্শনী করতে গেলে যাতায়াতের রাস্তা যেখানে আছে, সেখানে প্যাণ্ডেল প্রভৃতি নির্মাণের জিনিস কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে হত। সম্মেলনে বহু কৃষক এসেছিল। মোটামুটি বোঝা গেল যে, ঐসব অঞ্চলে চাষের জমি অধিকাংশই মেদিনীপুরের লোকের। নদীর ওপার থেকে এসে বিত্তশালীরা জমি সংগ্রহ করতেন এবং অনেক জায়গায় নিজেদের পছন্দমত লোকবসতি করিয়ে-

ছিলেন। স্থানীয় লোক যারা থাকত, তারা হয়ে যেত কৃষি-মজুর। বিরাট বিরাট 'লাট'। তাতে চাষ হত। আর তার অধিকাংশ ধানই মালিকরা অন্য পার থেকে এসে হয় নিয়ে যেতেন, নয় ওখানেই বিক্রি করতেন। নোনা জল থেকে জমিকে রক্ষা করবার জন্য অনেকে সুবিধেমত বাঁধ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধ রক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। আর পানীয় জল পাওয়া তো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা ছিল না। আলপথই ছিল একমাত্র পথ। সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে আমরা বহু জায়গায় গিয়েছিলুম। দারুণ জলকষ্ট। কোনও কোনও জায়গায় তিন-চার মাইল দূর থেকেও জল আনতে হত। বাইরে থেকে বিত্তশালী লোক গিয়ে যেসব ঘাঁটি করেছিলেন, সেখানে তাঁদের প্রয়োজনমত স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকত না। দূরে যাতায়াত নদীপথেই ছিল। তবে ভাঁটা পড়লে বিপদ হত। নৌকায় উঠতে গেলেই কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর কাদা ভাঙ্গতে হত। তরিতরকারির চাষ তেমন ছিল না বললেই হয়। অবশ্য চেষ্টা-চরিত্তির করলে মাছ কিছু পাওয়া যেত। ওখানে অনেক প্রতিনিধি এসেছিলেন। মহিলা সম্মেলনেও অনেক প্রতিনিধি হয়েছিল। সবজি সবই কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে হয়। সেই সময়ে আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। তার ফলে দুর্গম রাস্তা অগম্য হয়ে ওঠে। কাকদ্বীপ সম্মেলনের কিছু আগে সুনন্দা (বন্দ্যোপাধ্যায়) খুব জেদ ধরে যে, সে কাকদ্বীপ সম্মেলনে কাজ করবে। সুনন্দা তখন অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি। আমরা তো প্রমাদ গুনলাম। তাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করা হল। সে তখন যাবার জন্য তৈরী। সে তার কয়েক বছর আগে থাকতেই কংগ্রেস ভবনে যাতায়াত করছে এবং কিছু কিছু কাজও করে। আমি বললুম, 'সর্বনাশ! তোমার নাম শুনলেই তো ভিড় হবে। আর ঐ কাদার রাস্তায় তো তুমি ক্রমাগত আছাড় খাবে।' তাকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে অনেকগুলো গ্রামে ঘুরেছে। আমরা নাম প্রকাশ করিনি। কেউ চিনতেও পারেনি। একদিন এক পাশের গাঁয়ের দু'জন লোক তাকে চিনে ফেলে। ব্যস! আর যায় কোথায়! ভিড় আর ভিড়! ফলে সুনন্দাকে যাতায়াত একটু কম করতে হল। আশেপাশের গাঁয়ে গিয়ে গ্রামের অবস্থা দেখে সুনন্দা যেন একটা নতুন জগতের খোঁজ পেয়েছে। প্রায়ই বলত, 'এদের এত কষ্ট, আর আমরা কিভাবে থাকি!'

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকড়ো, মালদার বরিন্দ অঞ্চল এবং সুন্দরবন অঞ্চল বোধ হয় সবচেয়ে দরিদ্র। ওসব জায়গাগুলো জলাভাবে, আর সুন্দরবন অঞ্চল অতিরিক্ত নোনা জলের জন্য। কাব্যে শুনতে ভালো লাগে বটে 'বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি', কিন্তু ডাঙ্গায় বাঘ এবং জলে কুমির, আর তার সঙ্গে নোনা জলের প্রাচুর্য ও পানীয় জলের অভাব, যাতায়াতের ব্যবস্থা অগম্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বললেই হয়—এই সমস্ত অব্যবস্থার ফলে সুন্দরবনের মানুষদের জীবন অন্যান্য দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জায়গার চেয়ে দুর্বিষহ। কলকাতা থেকে ট্রাক করে বসিরহাট যাওয়া যায়। কিন্তু হাসনাবাদে নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার পরই পানীয় জলের জন্য খোঁজখবর করতে হবে। কিছু কিছু রাস্তাঘাট হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এখনও ঐসব অঞ্চলে বহু অসুবিধে। ক্যানিং থেকে হ্যামিলটনগঞ্জে যাওয়া যায়। হ্যামিলটন সাহেব অনেক জমিদারি করেছিলেন এবং অনেক খরচও করেন। কিন্তু তার ফলে আশেপাশে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অবসান হয়নি।

কাকদ্বীপ সম্মেলনে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডেবরভাই এসেছিলেন। কয়েকজন কৃষককে সংবর্ধনাও জানানো হয়েছিল। কিন্তু মূল কথার আলোচনা বেশী দূর এগোতে পারেনি। অর্থাৎ তার বহু পরে মায়াপুর সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ওঠানোই সম্ভব হয়নি। আমাদের মজ্জাগত একটা এমন অধিকারবোধ আছে যে, সে অধিকার থেকে আমরা একটুও নড়তে চাই না। এ আমি সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সম্বন্ধেই বলছি। এখানে কংগ্রেস দল ও কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। সকলের জমিতেই কৃষি-মজুর যারা কাজ করত, তাদের অবস্থা রাশিয়ায় যাদের "সার্ফ" বলা হত, প্রায় তাদেরই মতন। তফাত এই যে, আমাদের এখানকার কৃষি-মজুরদের দু' কাঠা, পাঁচ কাঠা, দশ কাঠা জায়গার উপর ভিটে বা একটু জমি আছে—যার মালিক ওই কৃষি-মজুররাই। কিন্তু ওই জমিতে তো কিছুই হয় না! এবং অন্য সব ব্যাপারে জোতদারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়! আর এ থেকে কারও অব্যাহতি নেই। যারা কৃষি-মজুর নয়, যেমন গোয়ালা, এদেরও সেই বিত্তশালীদের কাছ থেকে দাদন নিতে হয় এবং বাজারের সিকি দামে দুধ দিতে হয়। ধান বা অন্যান্য চাষের জিনিষের কথা আগেই বলেছি। কোথাও কোথাও বর্ষাকালে যে ধান ধার নেওয়া হয়, নতুন ধান ওঠবার পর সেই ধানের মন পিছু আধ মন করে সুদ দিতে হয়। যেখানে আলুচাষ হয়, সেখানেও তাই। বসাবার সময় যে বীজ সার ধার নেওয়া হয়, আলু ওঠবার পরে তাকে বাজারের অর্ধেক দামে দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ গ্রামে নাম-করা মহাজন বিশেষ নেই। গ্রামের অনেকেই, যাদের কিছু সম্পদ আছে, তারা মহাজনী কারবার করে। এ কারবার এখনও চন্দ্রসূর্য সাক্ষী করে চলছে, একখানা হাতচিটেও নেই। কেউ খোঁজখবর করতে গেলে যারা ধার দেয় তারা তো অস্বীকার করবেই, যারা ধার নেয় তারাও অস্বীকার করে। যারা ধার নেয় তাদের তো আর কোনও উপায় নেই। বাড়ির কারও অসুখ-বিসুখ বা মেয়ের বিয়ে—এর জন্য বিনা জামিনে কোনও ব্যাঙ্কও টাকা দেবে না, বা কোনও কো-অপারেটিভও টাকা ধার দেবে না। কাজে কাজেই এ প্রথা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আমরা শহরে বসে বসে নানা আইন পাস করতে পারি, কিন্তু যতদিন না বিপদে-আপদে বিনা জামিনে কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা পাবার সুযোগ হবে ততদিন এ প্রথা বন্ধ হতে পারে না। সমূহ বিপদ উপস্থিত, অথচ জামিন দেবার সঙ্গতি নেই, জামিনদারও নেই, ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারেটিভের আইনমত সব শর্ত পূরণ করা যাবে না, অগত্যা স্থানীয় ছোট ছোট যেসব মহাজন আছে তাদেরই দ্বারস্থ হতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিধ্বংসী বন্যা ও বৃষ্টি হয়ে গেছে। এর সঙ্গে অন্য কোনও বন্যার তুলনা করা যায় না। সামগ্রিকভাবে তুলনা করা যায় না বটে, কিন্তু বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কতটা স্থান বা কতগুলি জেলা জুড়ে বন্যা হয়েছে তার উপর তাদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে না। এবারে হয়তো এক লক্ষ বাড়ি বন্যায় ভেসে গেছে; কিন্তু যেবারে পঁচিশ হাজার বাড়ি ভেসে গিয়েছিল সেই পঁচিশ হাজার বাড়ির অধিবাসীর অবস্থা আজকের যারা বন্যার্ত তাদের সমান। আর সবচেয়ে বিপদ হয় সেইসব পরিবারের, যাঁরা প্রকাশ্যভাবে সাহায্য নিতে চান না বা পারেন না। নীতিশাস্ত্র আউড়ে তাদের কাছে হয়তো বলা চলে যে, যাঁরা সর্বহারা হয়েছেন তাঁদের আবার সাহায্য নিতে মর্যাদায় বাধবে কেন। কিন্তু পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার বন্যাতেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এই নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেক কৃষকও পড়েন। এইসব কৃষক পরিবার কোনরকমে গ্রামে

বাস করে নিজেদের সম্বচ্ছরের খরচ চালিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু বাড়ি চলে যাওয়া মানে একেবারেই সর্বহারা হওয়া। পাঁচ পুরুষ ধরে যে কাঁথাটি ব্যবহার করছি তার হয়তো বাজারে কোনও মূল্য নেই, কিন্তু গৃহস্থের কাছে শীতের দিনে কাঁথাটি মহামূল্যবান সম্পদ। তৈজসপত্র সম্বন্ধেও সেই কথা ওঠে। একটা ভাঙা থালা তার হয়তো বাজারদর কিছুই নয়; একটা ভাঙা বালতি, কলসী—বাজারে তার কোনও মূল্যমান নেই; কিন্তু বহু বছর ধরে তাই নিয়েই পরিবারের চলে যাচ্ছে। রিলিফ যাঁরা দেন তাঁরা তো এত খুঁটিয়ে ভাবেন না! আর এত লোককে দেওয়া সম্ভবও নয়। যেখানে যাঁরা প্রকাশ্যভাবে রিলিফ নেবার প্রার্থী হচ্ছেন, সেখানে আবার যাঁরা পূর্বসংস্কারবশত প্রকাশ্যভাবে রিলিফ চাইতে পারছেন না, তাঁদের অবস্থা হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংকটত্রাণ সমিতি শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সুপরিচালনায় এ সমস্যার কিছুটা সমাধান করেছিলেন। সতীশবাবুর পন্থা অনুসরণ করে আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বন্যা-ত্রাণের সময়ে এ নিয়ে খানিকটা কাজ করতে পেরেছিলুম। অর্থাৎ যাঁরা প্রকাশ্যভাবে রিলিফ নিতে পারবেন না, খোঁজখবর করে তাঁদের পাড়ার দু'জন অধিবাসীর মারফত ঐ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যায়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীতেই কেবলমাত্র বর্ষাকালে জল থাকে, আর অন্যান্য সময়ে বালিতে ভরতি। বন্যায় শুধু যে পলি বয়ে আনে তা নয়, বালিও বয়ে নিয়ে আসে। যে জমিতে বালি পড়ে, সে জমি আবার reclaim করে চাষ করতে প্রায় পনরো বছর লেগে যায়। এ সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের বাইরের লোকেদের বোঝানো প্রায় অসম্ভব। তাঁরা বলেন, 'দু-চার ইঞ্চি বালি পড়েছে তো কি হয়েছে!' অধিকাংশ জমিতেই দু-চার ইঞ্চি নয়, দু-চার ফিট বালি পড়ে। যাদের জমিতে বালি পড়েছে, অথচ বাড়ি বানেতে ভেসে যায়নি তাদের কি হবে? তাদের মাথা গোঁজবার জায়গা আছে কিন্তু আয়ের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাদের বাড়ি ও জমি দুই-ই গিয়েছে, তারা তো সর্বহারা। কিন্তু যাদের বাড়ি থেকে গিয়েছে, জমি গিয়েছে তাদের উপায় কি? তাদের ঐ গ্রামের মহাজনদের কাছেই যেতে হবে। যতই সুদ লাগুক।

পশ্চিমবঙ্গের যেসব অঞ্চল খুবই দরিদ্র, সেখানকার সুব্যবস্থা করতে গেলে কেবলমাত্র আইনের সাহায্যে হবে না; সামাজিক কাঠামোর কথা ভেবে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে এগোতে হবে। সমাজের অস্থিমজ্জায় নানারকম দুষ্ট গ্রহ জড়িয়ে আছে, যা আইন করে হয়তো উঠিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে তাদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে না। গোপনীয়তার সুড়ঙ্গপথে তার ব্যবস্থা ঠিকই কায়েম থাকবে।
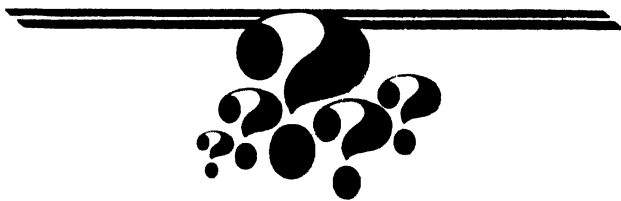
সেদিন অনিল (ভট্টাচার্য) বলছিল, '৫২ সালে কলকাতায় আপনারা বেশী আসন না পেলেও পশ্চিম বাংলার বেশির ভাগ শহরের আসন কংগ্রেস পেয়েছিল। মুশকিল হয়েছে যে, নেতারা এবং সাংবাদিকরা সব সংবাদ সঠিক রাখবার প্রয়োজন মনে করেন না। অনেক বছর আগেকার একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন জওহরলাল ডেকে পাঠালেন। বছরটা বোধ হয় ১৯৫৩। কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'সাধারণ নির্বাচনে কলকাতায় তোমরা একেবারেই আসন পাওনি। তা নিয়ে কি ভাবছ?' আমি ধরেই নিলুম যে, কলকাতায় আমরা যতগুলো আসন পেয়েছিলুম তার সংখ্যা উনি জানেন এবং জেনেই এ কথা বলছেন। আমি আমতা-আমতা করায় আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না, না, তোমরা বড় কম পেয়েছ। এ নিয়ে ভাবতে হবে।' আমি গলার স্বর যত দূর নামানো যায় নামিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক কম। কিন্তু বড্ড কম কি করে হবে? কলকাতার ছাব্বিশটি আসনের মধ্যে পঁচিশটিতে আমরা প্রার্থী দিয়েছিলুম। একটিতে প্রার্থী দেওয়া হয়নি; কারণ, সেটিতে দাঁড়িয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতেই ঐ আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি এবং এই ব্যাপারে এ আই সি সি-রও সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। পঁচিশটি আসনের মধ্যে সতেরোটি পাওয়া গিয়েছে। এটা কম বটে, কিন্তু খুব কম তো নয়।' জওহরলাল একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সতেরোটা? আমায় তো...বাবু বললেন যে, পাঁচ-ছয়টি।' আমি একটু হাসলাম। বললুম, 'আজ্ঞে আমি নিরুপায়। এ আই সি সি অপিসে তো রেকর্ড আছে, আনিয়ে দেখে নিন।' জওহরলাল একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন। এরকম ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত। কয়েকজন প্রবীণ দেশসেবক যাঁরা কংগ্রেসে ছিলেন, তাঁরা সুযোগ-সুবিধে পেলেই তৎকালীন প্রদেশ কমিটি সম্বন্ধে জওহরলালের কাছে নানারকম বলতেন। তবে অবশ্য বিরুদ্ধেই বলতেন; সোজাসুজি নয়, একটু ঘুরিয়ে। এর মধ্যে আবার কয়েকজন ছিলেন লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য। এ'দের বলায় কোনও দিন আমি আপত্তি করিনি। জওহরলাল কোনও খোঁজখবর না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতেন—এটাই ছিল আপত্তিকর। এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যে, নেতারা শুনেই বিশ্বাস করেছেন, অথচ সেই ঘটনার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ডাঃ রায় ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি অনেক অভিযোগের গুরুত্ব দিতেন না। যেগুলোয় গুরুত্ব দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোককে ডেকে বলতেন, 'ওহে, তোমার সম্বন্ধে এইসব বলে গেল।'

একবার জওহরলালকে কে বলেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে লেখাপড়া-জানা লোকেরা কেউ কংগ্রেসে নেই। জওহরলাল সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়কে লেখেন। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে-পড়ে লাগেন তথ্য সংগ্রহে। পঃ বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের কে কতদূর

পড়াশুনা করেছে—এই সংবাদ সংগ্রহে লেগে যান। কালীবাবু (কালীপদ মুখোপাধ্যায়) হাসতে হাসতে আমাকে এই খবরটি দেন। আমি ডাঃ রায়কে বলি, 'এ আপনি কি করছেন? আমি তো লেখাপড়া জানি না। কিন্তু এতে তো অনেকে হাসির খোরাক পাবে। প্রফুল্লদা গ্র্যাজুয়েট এবং অজয়দা ও কালীবাবু গ্র্যাজুয়েট নন। তা হলে বিচারটা কিসের ভিত্তিতে হবে?' ডাঃ রায় বুঝলেন এবং নিরস্ত হলেন। এইরকম মাঝে মাঝে অহেতুক সমস্যা এসে হাজির হত। সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু অনর্থক খানিকটা সময় তার জন্য দিতে হত। মাঝে মাঝে মজার ঘটনাও ঘটত। মোরারজীভাই একবার কলকাতায় এলেন। উনি তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য—ওঁর তখন খুবই প্রভাব। কলকাতায় আসবার সময় জওহরলাল ওঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা কতকগুলো অভিযোগ করেছেন। সম্ভব হলে এঁদের ডেকে পাঠিয়ে এঁরা কি বলতে চান, শুনে আসবেন।' মোরারজীভাই আসার পর যেমনভাবে তাঁকে স্বাগত জানাতে হয় জানালুম। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ রইলুম, তারপর চলে এলুম। মোরারজীভাই তাঁর কাজকর্ম সেরে পত্রলেখকদের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসবার জন্য খবর দেন। আমাকেও জানান ঐ সময়ে যাবার জন্য। আমি সব শুনে তাঁকে জানিয়ে দিই যে, পি সি সি-র বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ, তখন মোরারজীভাইয়ের একান্তে শোনাই ভাল—আমি আর যাব না। খানিকবাদেই ডাঃ রায়ের ফোন এল, 'ওহে, ওই সময়ে মোরারজীভাইয়ের ওখানে তুমি এসো, আমিও যাচ্ছি।' ব্যস্। আমার কোনও উত্তর দেবার অবকাশই হল না। আমি নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পেঁছলুম। অভিযোগকারীরা একটি ঘরে বসে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লুম। অনেকেই প্রবীণ, কেউ কেউ আমার চেয়েও বয়সে বড়। অভিযোগকারীরা আমার উপস্থিতি আশা করেননি। যাই হোক, আমরা গাল-গল্প করতে লাগলুম। খানিকবাদে মোরাজীভাই ডেকে পাঠালেন। আমরা সবাই গেলুম। আমি একটু কুণ্ঠিতভাবে মোরারজীভাইকে বললুম, 'এঁদের যখন পি সি সি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি তখন একটু অন্য ঘরে বসি।' মোরারজীভাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'পি সি সি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ বলেই তো আপনার থাকা দরকার। এঁদেরও কোনও আপত্তি নেই।' বলে অভিযোগকারীদের মুখের দিকে চাইলেন। তাঁরাও অগত্যা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। যাই হোক, ওঁরা তো কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। শুরুতে অবশ্য অনেক নানারকম কথা হল। তারপর অভিযোগের কথা ওঁরা আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে ডাঃ রায় এসে হাজির। ডাঃ রায় আসতেই মোরারজীভাই জওহরলাল যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, সেটি ডাঃ রায়কে পড়তে দিলেন। ডাঃ রায় চিঠিটি পড়ে নামগুলিও পড়লেন। ডাঃ রায় চিঠিটি পড়ে, যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিঠিতে যাদের সই আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আসেনি, আর যাদের নাম নেই তাদের মধ্যে অনেকেই এসেছে। তা এ নিয়ে জওহরলালকে লেখবার কি ছিল? এ তো এ আই সি সি-র ব্যাপার নয়, পি সি সি-রও ব্যাপার নয়, এ তো মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির ব্যাপার। তোমরা কংগ্রেসের সংবিধানও পড় না?' ডাঃ রায় তার কিছু দিন আগেই সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে এসেছেন। সবাইকে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির ব্যাপার বুঝিয়েছেন। ডাঃ রায় তখন অভিযোগকারীদের কংগেসের সংবিধান ও মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি বোঝাতে আরম্ভ করলেন। এইসব করে প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। মোরারজীভাই তখন

ডাঃ রায়কে বললেন যে, আর দশ মিনিট বাদে তাঁর (মোরারজীভাইয়ের) আর একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এবং তাঁকে উঠতে হবে। ডাঃ রায় সানন্দে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যান। আমি এদের সঙ্গে আলোচনা করছি।' বলে অভিযোগকারীদের বললেন, 'কি গো, তোমরা কি বলছ?' তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আরও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ডাঃ রায় তাঁদের কংগ্রেসের সংবিধান ও মন্ডল কংগ্রেস কমিটির গঠনতন্ত্র বোঝালেন। তারপর শেষ করবার সময়ে বললেন, 'জওহরলাল কিছু করতে পারবেন না, অতুল্যও কিছু করতে পারবে না। তোমরা তো সব শহরে থাক—এখন গাঁয়ে গিয়ে মন্ডল কংগ্রেস কমিটিগুলো দেখে এস। তা হলে সব বুঝতে পারবে।' বলে তিনি উঠে পড়লেন। ব্যস্। যাঁরা অত খরচপত্র করে দিল্লী গিয়ে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগপত্র দিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কথা বলার কোনও সুযোগই হল না।

আবার প্রশাসনিক দিকেও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটত। মাদ্রাজে কামরাজের মুখ্যমন্ত্রিত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ছোট মন্ত্রিসভা। এবং প্ল্যানিং কমিশন থেকে অন্যান্য সকলেই মাদ্রাজ রাজ্য সরকারের প্রশাসনের খুব সুখ্যাতি করতেন। কামরাজের সঙ্গে একবার মাদ্রাজ রাজ্যের কতগুলো অঞ্চলে গিয়েছিলুম। সফর শেষ করে কামরাজ মাদ্রাজে এসে রাস্তার মধ্যে একটি ভাঙ্গা পোল মেরামতের আদেশ দেন। কয়েকদিন বাদে কামরাজ রিপোর্ট পেলেন যে, তিনি যেরকম বর্ণনা দিয়েছেন, সে রাস্তায় ওইরকম পোল নেই। কামরাজ মনে মনে খুবই চটে গেলেন। তারপর খোদ ওই বিভাগের মন্ত্রী ওই জায়গা তদন্ত করে এসে জানালেন যে, পোল আছে এবং ভাঙ্গা। অর্থাৎ কামরাজের মত একজন দক্ষ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দায়িত্বহীন অফিসারের অভাব ছিল না। এরকম বিভিন্ন রাজ্যে আরও ঘটনা ঘটেছে। সঞ্জীব রেড্ডি যখন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী, তখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তফাত এই যে, মাদ্রাজ রাজ্যে পোলটির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল, আর অন্ধ্রে ভাঙ্গা পোলটি ছ'মাস আগে মেরামত হয়ে গেছে—এইরকম রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। দুটোই ভুয়ো। এর দ্বারা একটি জিনিসই প্রমাণ হয় যে, অনেক সময়ে প্রচন্ড প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও প্রশাসনযন্ত্রে গলদ ঠিকই থেকে যায়। ডাঃ রায়ের প্রশাসক হিসেবে খুবই সুনাম ছিল। তাঁর সময়ের মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ডাঃ রায় বিভিন্ন জেলা ঘোরবার সময়ে কৃষ্ণনগরে ওঁকে কিছু লোক ওইখানে একটি কৃষিভিত্তিক কো-অপারেটিভ গঠনের কথা জানায়। তারপর কৃষ্ণনগরের ঐ বন্ধুরা দশ মাস রাইটার্স বিল্ডিং-এ হাঁটাহাঁটি করেও ঐ কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রি করাতে পারেননি। ডাঃ রায়ের চেষ্টা সত্ত্বেও করা যায়নি, এ কথা হয়তো অনেকে অবিশ্বাস করবেন। কিন্তু এ ঘটনা নিছক সত্য। আমি ১৯৬৪ সালে কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডি এবং ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালের এই তিনটি ঘটনা সম্বন্ধে কলকাতার বিভিন্ন কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলুম। এইসব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রশাসনযন্ত্র ঠিক করবার জন্য স্বাধীনতার পর আর বিশেষ কেউ চেষ্টা করেননি। স্বাধীন হবার পরই আমরা কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলুম বিভিন্ন মঙ্গলকার্য ত্বরান্বিত করার জন্য। কিন্তু যে প্রশাসনযন্ত্রের মারফত এই মঙ্গলকার্য অনুষ্ঠিত হবে সে প্রশাসনযন্ত্র ছিল অনুসৃত 'কলোনিয়াল' প্রশাসনযন্ত্র। ইংরাজের প্রশাসনযন্ত্রের অন্য সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করা এবং সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা। যাঁরা প্রশাসনযন্ত্রের পরিচালক ছিলেন,

তাঁরা ছিলেন হয় ইংরাজ, নয় তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত 'ভারতীয় ইংরাজ'। ভারতবর্ষের স্বার্থের চেয়ে সাম্রাজ্যের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা। একটা দেশ স্বাধীন হবার পর প্রশাসনযন্ত্রের যে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন, এ বোধও বিশেষ ছিল না এবং এ নিয়ে কাজও হয়নি। শুনতে বেশ ভাল লাগে যে, ইংরাজের ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেল, সেখানে অশোকচক্রলাঞ্ছিত পতাকা উড়ল। পতাকা সম্বন্ধে এটা ঠিকই কথা। কিন্তু একটা কলোনিয়াল শাসনযন্ত্র চালাতে যাঁরা সুদক্ষ হয়েছিলেন তাঁদের রাতারাতি কি করে পরিবর্তন হবে? যেহেতু প্রশাসন-কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন হল না, নতুন যারা এল তারাও সেই প্রশাসনিক অকর্মণ্যতার সামিল হল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল বোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের বহু বছর সভাপতি ছিলুম। নিজের অভিজ্ঞতার কথাই জানাচ্ছি। স্কুল বোর্ডগুলি ছিল এডুকেশন বিভাগের অধীন। নিয়মকানুন এডুকেশন বিভাগই করে দিতেন। সেই অনুযায়ী স্কুল বোর্ডসমূহকে চলতে হত। হিসাব রাখা ও টাকাকড়ি খরচ সম্বন্ধে একটা নিয়ম ছিল যে, যেসব দফায় (head) যত টাকা ধরা হত, সেই দফার বাইরে অন্য কোনও দফায় (head) সেই টাকা খরচ করা ছিল নিয়মবিহর্ভূত। বছরের প্রথমেই বিভিন্ন জেলা স্কুল বোর্ড বাজেট তৈরি করে পাঠিয়ে দিত। সেই বাজেট অনুযায়ী সারা বছর খরচ হবে। অবশ্য এডুকেশন বিভাগের অনুমোদনসাপেক্ষ। মার্চ মাসের মধ্যে অনুমোদিত না হলে স্কুল বোর্ডের খরচ করার অধিকার ছিল না। সাধারণত এডুকেশন বিভাগ বাজেট অনুমোদন করে পাঠাতেন নির্দিষ্ট সময়ের ছ' মাস আট মাস বাদে। এই ছ' মাস আট মাস স্কুল বোর্ডগুলিকে আইনবহির্ভূতভাবে খরচ করতে হত এবং এর জন্য সরকারী অডিট রিপোর্টে স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হত। এই নিয়মবহির্ভূত কাজের জন্য সম্পূর্ণ দোষ ছিল সরকারী প্রশাসনের—এডুকেশন বিভাগের। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এর কোনও সুরাহা হয়নি। আরও একটা নিয়মবহির্ভূত কাজ হত। তাঁরা যে খাতে (head) যে টাকা অনুমোদন করতেন, সরকারী দপ্তর থেকে টাকা পাঠাবার সময়ে অনুমোদিত টাকা পাঠাতেন না। ফলে এক খাতের (head) টাকা স্কুল বোর্ডকে অন্য খাতে খরচ করতে হত। এর জন্যও অডিট রিপোর্টে মন্তব্য হত জেলা স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে। অথচ পুরো দোষটি ছিল এডুকেশন বিভাগের। এরকম আরও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। মূল কারণ একটাই। মঙ্গলকার্যের জন্য আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, যে পথ দিয়ে মঙ্গলকার্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে, সে পথ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিনি। তার ফলে প্রশাসনের সর্বত্র বহু দুর্বলতা শেকড় গেড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।
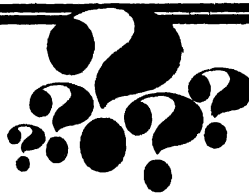
১৯৩০ থেকে ১৯৪২ অবধি যেমন আমরা আইন অমান্যর কাজ করেছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে হুগলী জেলায় অনেক গঠনমূলক কাজও করেছিলুম। তখন তো

ডি-ভি-সি হয়নি; সেজন্য প্রতি বছরই আরামবাগ মহকুমার খানাকুল, পুরশুড়ো থানা এবং আরামবাগ থানার কতকাংশ জলের নীচে ডুবে থাকত। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা। কোথাও ছ' হাত, আট হাত, দশ হাত, বারো হাত অবধি জল; আবার কোথাও বা একহাঁটু। সেইজন্য নৌকো নিয়ে সর্বত্র যাওয়া যেত না। ফসল তো অনেক জায়গায় হতই না, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও বোরো ধান, যেটার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে চাষ-আবাদ হত। সেখানেও মুশকিল, সেচের জল পাওয়া যেত না। আমরা একবার খানাকুল থানার একটা নদী বেঁধে জল আটকে রেখে সেই জলে সেচের ব্যবস্থা করে বোরো চাষে উৎসাহ দিয়েছিলুম। চাষীরা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ফসল পেয়েছিল। প্রধানত রতনদার (চট্টোপাধ্যায়) উৎসাহেই এই কাজ হয়। রতনদা ছিলেন শ্রীসতীশ সেনগুপ্ত মশায়ের খুব কাছের লোক। অসহযোগ আন্দোলনের আগে ওঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতেন এবং সে অনুযায়ী কাজও করতেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর সতীশদা, রতনদা এবং ওঁদের আরও কয়েকজন সহকর্মী অহিংস পথে জনসাধারণকে সংগঠিত করে যে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব তাতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। রতনদার বাড়ি বালিতে। কিন্তু সব আন্দোলনেই উনি হুগলী জেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকা যখন বাংলায় প্রকাশিত হয়, তখন রতনদা ছিলেন তার সম্পাদক।

প্রতি বছরই চাষ-আবাদ করা সম্ভব হয় না বর্ষাকালে। এই অসহায় অবস্থা থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায়, তাই নিয়ে একটি অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে রতনদা বহু আলোচনা করেন। চাষীরাই তাঁকে জানায় যে, স্থানীয় নদীটি যদি বাঁধা যায়, তা হলে সেখানে যে জল জমবে, সেই জল থেকে সেচের ব্যবস্থা করে চাষীরা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বোরো ধানের চাষ করতে পারবে। চাষীদের ভয় ছিল যে, নদী বাঁধলে জমিদার বা সরকার হয়তো তাদের বাধা দেবে। আমাদের কাছে উৎসাহ পেয়ে কতগুলি গ্রামের লোক জোটবদ্ধ হয় এবং কোনও বাধা না মেনে বাঁধ বাঁধার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! কয়েকখানি গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে নিজেরাই মাটি কাটছে, ঝুড়ি করে মাটি বইছে, নদীতে বাঁধ দিচ্ছে! কোনও ইঞ্জিনিয়ার নেই, ওভারসিয়ার নেই, কন্ট্রাক্টর নেই, সবটাই চাষীদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে হচ্ছিল। কিছু কিছু বাধা উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু গ্রামবাসীদের একত্রিত দেখে বাধাদানকারীরা আর বেশী এগোননি। গান্ধীজীর কাছে যখন এই বাঁধ বাঁধা এবং গ্রামের অতগুলি চাষী উপকৃত হয়েছে এই খবর পেঁছিয় তখন তিনি 'হরিজন'-এ লিখেছিলেন যে, অনেক সময়ে শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির অভাবের জন্য অনেক কাজ হয় না। কিন্তু হুগলী জেলার খানাকুল থানার ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রমাণ করেছে যে, পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতায় অনেক দুরূহ কাজ করা যায়। গান্ধীজী 'পুরুষ পরম্পরাগত' কথাটি দেবনাগরীতে লিখে-ছিলেন। সত্যই আমাদের জীবনে এ এক প্রকান্ড অভিজ্ঞতা। সব সময়েই আমরা শুধু শিক্ষিত নয়, বিশেষজ্ঞ খুঁজি এবং অনেক কাজ এইসব বিশেষজ্ঞের অভাবে হয় না। আমাদের গ্রামের লোকদের যে নিজেদের একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তারা অনেক কাজ করে, এ সত্য আমরা ভুলে যাই। আমাদের চাষের মাঠে জলসেচের যেসব পুরনো খালবিল ছিল, এবং সেইসব খালবিল থেকে বিভিন্ন জমিতে সেচের জল নিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তা সত্যিই অপূর্ব। এর জন্য যে শুধু অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা নয়, অনেক বুদ্ধিও খরচ করতে হয়েছিল। যেখানে সেচের নালা বড় আল ভেদ করে

গেছে, সেখানে তালগাছে খানিকটা ফোঁপরা করে জল চলাচলের ব্যবস্থা করা হত। এটা পাইপের পরিবর্ত ব্যবস্থা। আবার নৌকার পরিবর্তে হত 'জুড়কে ডোঙ্গা' বা জোড়া ডোঙ্গা। যেসব জায়গায় জল অগভীর অর্থাৎ নৌকা চলাচল করা সম্ভব হত না, সেইসব জায়গায় তালগাছের খোলসের অর্ধেকটা বজায় রেখে এবং বাকী অর্ধেকটা ফোঁপরা করে ডোঙ্গা তৈরী হত। দু'খানা ডোঙ্গা জোড়া করলে হত 'জোড়া ডোঙগা'। এইসব ডোঙ্গা অগভীর জল দিয়ে যেতে পারত; কোথাও আটকে যেত না। আর এইসব অঞ্চলের মানুষ তাঁদের আত্মনির্ভরতার উপর যে কতটা বিশ্বাস করতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কতবার এমন হয়েছে যে, যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেছে, ফেরার সময় দেখা গেল যে, রাস্তার খালের উপর কাঠের পোলটি ভাঙ্গা। গাড়ি নিয়ে খাল পেরোবার উপায় নেই, আর খালের উপর পোলটি তো বন্ধ। আমরা অসহায়ের মত বসে আছি। দু-একজন করে গাঁয়ের লোক এসে হাজির হলেন। আমরা তিন-চারজন ছিলুম। সুরেন কর মশাই ও সজনী দাস ছিলেন। দেখা গেল সজনীবাবু কি গুজ্‌গুজ ফুসফুস করছেন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে। তারপরেই কতগুলি গাঁয়ের লোক চলে গেল। খানিকবাদে দেখি অনেকগুলি কাঁচা বাঁশ নিয়ে হাজির। কাঠের পোলের যে অংশ থেকে কতগুলি কাঠ কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছিল, সেখানে বাঁশগুলি সাজিয়ে দিল। তারপর আমাদের তারা জানাল যে, আমরা গাড়িটা এখন অপর পারে নিয়ে যেতে পারি। আমরা একটু ইতস্তত করছি দেখে তারা বলল যে, এ কাঁচা বাঁশ কিছুতেই ভাঙ্গবে না। সত্যিই, গাড়ি অনায়াসেই পেরিয়ে গেল আর আমরা হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। সজনীবাবুকে জিজ্ঞেস করা হল— 'কি ফুসফুস গুজগুজ করছিলেন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে? আপনি কি কাঁচা বাঁশ এনে এই গাড়ি পারাপারের পরামর্শ দিলেন?' সজনীবাবু উত্তরে বললেন, 'রামঃ, এ সমাধান আমি অনেক ভেবেও বার করতে পারতাম না। এটা চাষীরা নিজেদের বুদ্ধিতেই করেছে। আমি অতুল্যবাবুকে দেখিয়ে বলি যে, ও'র মেয়ের খুব অসুখ। তাই প্রবীণ, অভিজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সুরেনবাবুকে ডাক্তার বলে দেখিয়ে দিই।' অসুখের কথা শুনে গ্রামের লোক ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাই এই বাঁশের ব্যবস্থা।

জীবনে এমন অনেক বিপদে-আপদে অসুবিধেয় পড়েছি, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে গাঁয়ের লোকেরা সমাধান করে দিয়েছে। এ ব্যাপারটা বোঝানো শক্ত। কিন্তু এই সাধারণ বুদ্ধি গ্রামের লোকের বেশ ভাল আছে। নিরক্ষর কারোই হওয়া উচিত নয় এবং সকলেরই শিক্ষিত হওয়া উচিত—এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের যে একটা মজ্জাগত ধারণা আছে যে, অশিক্ষিত মানেই মূর্খ— এখানেই আমার আপত্তি। মাসের পর মাস গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এবং তাদের বাড়িতে বাস করে এ বোধ আমার হয়েছে যে, শিক্ষাহীনতার নামান্তর মূর্খতা— একথা ভুল। এ তথ্য ঠিক নয়। এক দিকে চাষবাস, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজের পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতা ও অন্য দিকে রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালি, কথকতা এইসবের মধ্য দিয়ে একটা মানসিক শিক্ষা—এই দুইয়ে মিশে গ্রামে নিরক্ষররা সাধারণ বুদ্ধিতে কোনও পণ্ডিত লোকের চেয়ে কম ছিলেন না। এত কোর্ট, উকিল, আইন প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও বিনা সাক্ষী এবং জামিনে যে গাঁয়ের মধ্যে এখনও কায়েত খুড়ী, বামুন পিসি, ময়রা গিন্নি প্রভৃতির সঙ্গে গাঁয়ের লোকের টাকার লেনদেন হয়, এটা ভারতীয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বললেই সাধারণ-

ভাবে এখন একটা উদ্ভট জিনিস বোঝায়। কোথাও যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে লেখা থাকে, তা হলে লোকে মনে করে যে, কতকগুলি বাংলা, হিন্দী গান হবে। এই বোধটাই অভারতীয়। আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবহারে, লোকজনের সঙ্গে সম্ভাষণে, অর্থের আদান-প্রদানে অনেক অশালীনতা এসে গেছে। সেগুলিই আমাদের অপসংস্কৃতি। এখনও বহু গ্রাম আছে যেখানে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আমাদের অপসংস্কৃতি চালু করতে পারিনি। আমার এ ধারণার মধ্যে কোনও ভক্তিবাদও নেই, জড়বাদও নেই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এসব কথা বলছি। তর্ক উপস্থিত হলে উদাহরণ দিতে পারব। যেখানে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে এক শ'-দেড় শ' টাকা মাইনের পিওন মানি অর্ডার বিলি করতে পারে এ কেউ ভাবতেও পারেন না, সেই যুগে ভারতবর্ষে এখনও সামান্য বেতন-ভুক পিওনরা মানি অর্ডার এবং ইন্‌সিওরেন্স বিলি করেন। এত হাঙ্গামা-হুজ্জোত হয়, কিন্তু সংবাদপত্রে ক'জন পড়েছেন যে, পিওন আক্রান্ত হয়েছে এবং তার কাছ থেকে টাকাকড়ি লুঠ হয়েছে? এখনও নির্জন রাস্তা দিয়ে, গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রানাররা মেল ব্যাগ নিয়ে যায়। ক'টা খবর বেরিয়েছে যে, রানাররা নির্যাতিত হয়েছে? যাঁরা বললেন ভারতবর্ষে এখনও এইসব আদিম ব্যবস্থা পুষে রাখা হয়েছে, এটাই ভারতের কুসংস্কার, সবিনয়ে তাঁদের উত্তর দেওয়া যায়, এটা কু বা অপসংস্কার নয়, এটাই ভারতবর্ষের সভ্যতা। আদিম হতে পারে, কিন্তু গ্লানিকর ও কলঙ্কময় নয়। এখন তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিন—ভারতবর্ষ নাকি এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যদি সত্যিই তাই হয়, তা হলে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—এখনও কেন মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বন্যায় নিরাশ্রয় হয়। আমি ১৯৭৮ সালের কথা বলছি না। এ একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু অন্যান্য বছরেও কিছু-না-কিছু জায়গা তো বন্যাগ্রস্ত হয়! তার মানে এ নয় যে, আমরা বন্যা নিরোধের চেষ্টা করব না অথবা বন্যায় যে জলটা নষ্ট হচ্ছে সেটা কাজে লাগাবো না। এগুলো সবই করতে হবে এটা ঠিক, কিন্তু লোকে তো ফল দেখতে চায়। ফল যদি না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, আংশিকভাবে এইসব সমস্যার সমাধান করতে যাওয়াই কুসংস্কার এবং অপসংস্কার।

যেকথা বলছিলুম সেকথায় ফিরে আসি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সুবর্ণ যুগে (?) বাংলা দেশের শহরাঞ্চলে যেমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, গ্রামগুলিও তা থেকে বাদ যায়নি। গ্রামে গ্রামে যেসব জমিদার বা বিত্তশালীরা থাকতেন, তাঁদের বাড়িতে যেমন দোল, দুর্গোৎসব, রাস, কালীপুজোর ধুমধামের অন্ত ছিল না, ঠিক সেইরকমই নাচ-বাড়ি, বাগান-বাড়ি, বাঈজী-বাড়ি, রক্ষিতা-বাড়িরও অভাব ছিল না। ফলে, গ্রামের সাধারণের সঙ্গে এইসব বাবুদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। গ্রামের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইসব বাড়ির ছেলে। ফলে, ভারতবর্ষের এত বছরের যে সংস্কৃতি, যার ধারক ও বাহক ছিল এইসব জনসাধারণ, তাদের সঙ্গে এইসব শিক্ষিত লোকেদের ভাবের কোনও আদান-প্রদান ছিল না। মাটির সঙ্গে সংযোগহীন এক উদ্ভট সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বিদেশী এবং দেশী বহু বিষয়ের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ এইসব বাবুরা পড়তেন। কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগসূত্র ছিল না বলে সাধারণ সমাজের উপর পাণ্ডিত্যের কোনও প্রভাবই পড়েনি। কলকাতা থেকে গজিয়ে ওঠা সভ্যতার অনু-করণ বাংলা দেশের আরও কয়েকটি ছোটবড় শহরে অনুশীলিত হলেও গ্রামবাংলার অধিকাংশ লোকই বরাবরই তা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে, এবং এই সভ্যতা কোনও-

দিন গ্রামের সাধারণ লোককে স্বীকৃতি বা মর্যাদা কোনটাই দেয়নি। ফলে, বিভিন্ন প্ল্যানের যে পরিণতি হয়েছে—সংস্কার, শিক্ষা ও সভ্যতার পরিণতি হয়েছে সেই-রকম। পাশ্চাত্ত্যকে পুরোপুরি নিতে পারেনি; তার যে অনুকরণ হয়েছে সেটাও হাস্যকর এবং বীভৎস। আর ভারতীয় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখনও পরম বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় গ্রামের লোকেরা আঁকড়ে আছে তার সন্ধানও সমাজপতিরা রাখেননি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই উদ্ভট অবস্থা। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শহরে ধনী, আধা-ধনী, সিকি-ধনীর বাড়িতে যদি বিয়ে হয়, এইসব বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রে যে অভিনব কান্ড ঘটে তা যেমন হাস্যকর, তেমনি লজ্জাকর, তেমনি কলঙ্কজনক। নববধূ একটি চেয়ারে বসে থাকেন আর কয়েক শো জোড়া চোখ তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে করতে শাড়ি, ফুল ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেয়। পাশে বসে থাকেন পরি-বারেরই এক বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি একটি খাতায় লেখেন রামচন্দ্র বসু—এক জোড়া দুল; ভজহরি সামন্ত—একখানা সিল্কের শাড়ি; অপূর্বচন্দ্র ঘোষ—একটা টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি। যেন রামু ময়রার দোকানের রোকড়ের খাতা লেখা হচ্ছে—তিন বস্তা চিনি, দু'বস্তা মসুর, দু'টিন ডালডা, এক টিন কেরোসিন। পাশ্চাত্ত্যে Presentation-এর রীতি আছে, তার ঢঙ আলাদা এবং সেখানে নববধূরূপে একা চেয়ারে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে হয় না। আমাদের দেশেও রীতি ছিল। সেখানে আত্মীয়স্বজনের বাইরে আর কারো দেওয়ার অধিকার ছিল না। সেইজন্যেই এখন বাংলায় পরিষ্কার থাক হয়ে গেছে—একদল সভ্যতাভিমানী—যারা সভ্যতা ও কুসংস্কার দূর করার নামে যত কিছু অপকর্ম করে যান। তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হ'ল যারা পরিশ্রম করে—তাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে দূরে সরিয়ে দেওয়া।
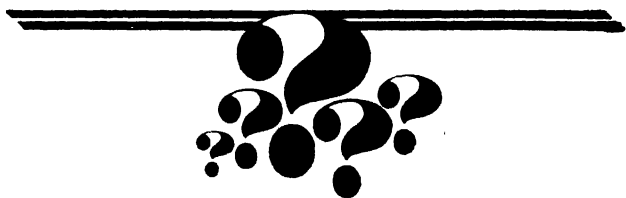
ডাঃ রায় পুরুলিয়া জেলায় দু'টি পরিকল্পনা নেন। একটি অযোধ্যা পাহাড়ে ট্যুরিস্ট সেন্টার করা, আর অন্যটি তুলিনে পাবলিক স্কুল করা। দুটো জায়গাই খুব মনোরম। যে-কোনও কারণেই হোক, দু'টি পরিকল্পনাই রূপায়িত হয়নি। অযোধ্যা পাহাড়ে ঠিক ট্যুরিস্ট সেন্টার খুব জনপ্রিয় হত না। কারণ, গ্রীষ্মকালে ট্যুরিস্টরা যেত না। আর কেবলমাত্র ঠান্ডা পড়ার পর খালি ভ্রাম্যমাণদের নিয়ে একটা সেন্টার গড়ে ওঠাও শক্ত। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অতি মনোরম। পাশ দিয়ে ছোট পাহাড়ী নদী আছে, চতুর্দিকে জঙ্গল, ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে—সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধে ছিল না।

সুবর্ণরেখার ধারে তুলিন-এর জন্য যে জায়গা দেখেছিলেম, তাও ভাল জায়গা। সুবর্ণরেখা পেরোলেই রাঁচী জেলা। কাছেই বড় লাইনের মুরী স্টেশন। তুলিনে তখন ছোট রেলের স্টেশন ছিল। কেন পাবলিক স্কুল হয়নি, সে কারণ আমার জানা নেই। তবে পাবলিক স্কুল আথবা সেন্ট্রাল স্কুল সম্বন্ধে আমার মনে একটু

গোলমাল আছে। এই দুই স্কুল বললেই সাধারণত বোঝায় বিত্তশালী লোকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল। বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততি-দের জন্য। যারা পড়ে তাদের পেছনে অভিভাবকদের খুবই কম টাকা দিতে হয়। তাতে সব খরচ ওঠে না। সেইজন্য সরকারী তহবিল থেকে অনেক টাকা দিতে হয়। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, এ খরচটা কেন? ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে এখনও বহু অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়নি, সেখানে কেবলমাত্র কয়েকজন সঙ্গতি-শালী ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের জন্যে কেন সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারকে নিশ্চয়ই অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এক শ্রেণীর লোকের জন্য আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে যে টাকা সরকারী তহবিলে সংগৃহীত হয়, কেন তা থেকে খরচ হবে? এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে হয়তো সরকারী অর্থানুকূল্য যায় না। তর্কের খাতিরে যদি তাদের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে পাবলিক অথবা সেন্ট্রাল স্কুলের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় নিতান্ত অসমীচীন ও গর্হিত। আর এইসব বিদ্যালয়ে যারা পড়ে, তাদের সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর কোনও সম্পর্ক থাকে না, যাকে ইংরেজীতে বলে 'Protected life'—এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেইভাবেই বাস করে। যে যে স্কুলে হোস্টেল আছে তার ব্যবস্থা আলাদা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আলাদা, শিক্ষাপদ্ধতিও অন্যরকম। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব হোস্টেল বা ব্যবস্থা আছে, তার সঙ্গে কোনও মিল থাকে না। সেই জন্যই প্রশ্ন জাগে, একটি বিশেষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করার জন্য কেন সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে?

ইংরেজী মাধ্যমে যেসব স্কুল আছে, সে-সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও দেশবাসীর কোনও যোগ নেই। সেখানে ইংরেজী উচ্চারণ শেখা হয়, চলতি ইংরেজী ভাষাও শেখা হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই যে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। অবশ্য 'টাই' বাঁধা ভাল করে শেখে—যা কতগুলি শহরের ছেলেদের মধ্যে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। এরা যেন একটা আলাদা জাতি। এদের চালচলন, কথা-বার্তা সবই অন্য রকম। এরা জীবনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বইও পড়তে পারল না, আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের নামও শোনেনি। বিলাতের বা ইউ-রোপের পারিপার্শ্বিক নিয়ে যেসব ছোটদের জন্য বই লেখা হয়, সেগুলো এরা পড়ে অথচ তার মধ্যে যেসব শিক্ষণীয় আছে, তাও গ্রহণ করে না। যেমন কাছাকাছি সমুদ্দুরে নিজেরা নৌকো নিয়ে যাওয়া, অথবা হেঁটে যেতে যেতে কোনও দিন কারও গোলাবাড়িতে রইল, কোনও দিন কারো খড়ের গাদায় রাত কাটাল। আবার কেউ কেউ বা গৃহস্থের বাগানের বেড়া বেঁধে দিয়ে সবজি ক্ষেতে কাজ করে অথবা গৃহস্থের বাড়ি পরিষ্কার করে দিয়ে কিছু রোজগারও করে। আবার অনেকে উঁচু উঁচু পাহাড়েও ওঠে। অর্থাৎ নিজেরা একটা আনন্দোচ্ছল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য পরিশ্রম করে। আর আমাদের এখানে যারা এইসব বই পড়ে, তাদের হাঁটা বারণ, গাছে চড়া বারণ, পাহাড়ে ওঠা বারণ, নৌকো চালিয়ে নিয়ে নদীতে যাওয়া বারণ। অভিভাবকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি যেন এইসব কুকার্য (?) ছেলেমেয়েরা না করে। দেরাদুনে এই রকম যে-সমস্ত ছেলে আছে, তাদের খুব কমজনই হেঁটে মুসৌরীর পাহাড়ে উঠেছে। দার্জিলিং, সিমলায় যে-সমস্ত স্কুল আছে, তাদেরও সেই একই অবস্থা। কলকাতার কাছেই দেওঘর, মধুপুর, শিমুলতলা, হাজারিবাগ, রাঁচী এইসব বেড়াবার জায়গা আছে। ছোট ছোট পাহাড় তো আছেই। আর

রাস্তাতেও কলকাতার মত ভিড় নেই। কিন্তু এইসব স্কুলের ছেলেমেয়েরা আধ মাইল হেঁটেই হিসাব করে যে, কতটা হাঁটা হল। কাছেই পরেশনাথ পাহাড় মোটে ৪ হাজার ফুট উঁচু। সেখানে যাবার কথা কারো মনেই হয় না। আর দু-চারজন অসমসাহসিক (?) ছেলেমেয়ের যদি মনেও হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের কড়া মন্তব্য, 'পরেশনাথে কি আছে? সেখানে কেন যাবে? যেতে হয় দার্জিলিং যাও, মুসৌরী যাও, নৈনিতাল যাও, কাশ্মীর যাও, সিমলা যাও ইত্যাদি। সাধারণ গৃহস্থবাড়ির ছেলেমেয়েদের এই আচরণের একটা মানে বোঝা যায়। তাদের প্রতি-নিয়ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতে হয়। সেইসব গৃহস্থের যদি কোন রকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়, তাদের আর বাছ-বিচার করবার মনোভাবও থাকে না, সুবিধেও হয় না। কোন রকমে কোথাও বেড়িয়ে এলেই তারা খুশী। সীমায়িত আয়ের গৃহস্থের পক্ষে অন্য কিছু ভাবা সম্ভবও নয়। কিন্তু যাঁরা অনেক খরচ করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বা পাবলিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ান, তাঁদের তো সঙ্গতির কথা ভাবতে হয় না। তবুও তাঁদের এ মানসিক জড়তা কেন? আর এই-সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে, তা সে পাবলিক স্কুলেই হোক বা সে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই হোক, তাদের পেছনে সরকার কেন অর্থ ব্যয় করবে? এরা ক্রিকেট, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলতে পারবে—যা ব্যয়সাধ্য খেলা। কবাডি, খো খো, জিমন্যাস্টিক, অ্যাথলেটিকস, এসবের এরা ধার ধারে না। যোগব্যায়াম কেউ কেউ শেখে, কারণ যোগব্যায়াম আমেরিকা ঘুরে এসেছে। মোটা সরকারী খরচে এইসব ছেলেমেয়ে যেভাবে তৈরী হচ্ছে, তাতে দেশ সম্বন্ধে এরা কিছুই জানে না এবং অভিভাবকরা জানবার সুযোগও করে দেন না। জীবনের প্রতিটি দিন এমন নিশ্চিন্ততার মধ্য দিয়ে এরা বড় হয় যে, দেশের প্রাত্যহিক সমস্যার সঙ্গে এদের পরিচয় হবার কোনও সুযোগ ঘটে না। দোষ ছেলে-মেয়েদের নয়, দোষ অভিভাবকদের—যাদের উপর এইসব ছেলে-মেয়েদের পুরো দায়িত্ব। মনের দিক দিয়ে যারা একটু সচেতন তাদের আবার অনেক দুঃখ। বাবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী অথবা বড় ব্যবসায়ী—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগই হয় না। হয়তো রাত্তিরে দুটো কথা হয়। মা যদি শিক্ষকতা বা অন্য চাকরি না করেন, তাহলে সমাজসেবিকা বা কোনও আশ্রমের ভক্ত। অর্থাৎ বাপ-মায়ের দু-জনেরই সময় হয় না ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেশবার। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গী থাকে হয় বাড়ির পরিচারিকা, অথবা দারোয়ান অথবা বেয়ারা। ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ থাকলেও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সংস্রব থাকে না। তারা তো রেশন আনে, বাজার করে, দুধ আনে, কেরোসিন আনে, তাদের সঙ্গে কি করে সম্পর্ক থাকবে? তারা তো অন্য স্তরের লোক। অতএব, অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই কম বয়সে প্রায়ই সঙ্গীহীন থাকে। তারপর তাদের অবলম্বন হয়ে ওঠে সিনেমা রেস্টুরেন্ট আর ক্লাব। বাড়িতে তো সঙ্গী নেই, সঙ্গী খুঁজে নিতে হয়। আমাদের এক বন্ধুর মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলল। বন্ধু যখন সরোষ আর্তনাদ করছিল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আচ্ছা, তোমার মেয়ের বাড়িতে সঙ্গী কে? তুমি তো তোমার কাজে সারাদিনই বাইরে থাক। তোমার স্ত্রীও চাকরি করেন। বাড়িতে থাকবার মধ্যে এক বুড়ী পরিচারিকা আর রেশন আনবার জন্য একটি অল্পবয়স্ক ছেলে। তুমি বা তোমার স্ত্রী তো মেয়ের স্কুলের মাইনে, বই কিনে দেওয়া আর বাড়িতে গৃহশিক্ষকের মাইনে দিয়ে তোমাদের দায়িত্ব শেষ করেছ। তোমাদের মেয়ে মিশবে কার সঙ্গে? সে একজন সঙ্গী খুঁজে

নিয়েছে। সে কিছু তো অন্যায় করেনি।' এই অবস্থা প্রায় সব ছেলে-মেয়েরই। তার উপর আবার বিশেষ বিশেষ স্কুল করে থাক সৃষ্টি করা কেন?

আমার মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি সেন্ট্রাল স্কুল আছে, তার মধ্যে একটি সল্ট লেকে, আর একটি বোধ হয় ফোর্ট বা বারাকপুর অঞ্চলে। তার উপর ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল তো বহু আছে। সেন্ট্রাল স্কুল সম্বন্ধে একটি যুক্তি দেখানো হয় যে, গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের তো বদলির চাকরি—অভিভাবকরা বদলি হলে নতুন জায়গায় গিয়ে ছেলে-মেয়েদের হয়তো সেই বদলির জায়গায় কোনও স্কুলে ঢোকার অসুবিধা হয়। এই যুক্তিটা একটা কথার কথা। যদি সত্যিই তা হত, তা হলে যে পরিমাণ সরকারী কর্মচারী বদলি হন, তার তুলনায় সেন্ট্রাল স্কুলের সংখ্যা এত কম কেন? আর সর্বস্তরের কর্মচারীর ছেলেপুলেরা তো ভরতি হবার সুযোগই পায় না। আর একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। সরকার কি কেবলমাত্র সরকারী কর্ম-চারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য দায়ী? এত যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে. তাদের কর্মচারীদেরও তো বদলি হতে হয়, তারাও তো ভারত-বর্ষের নাগরিক। তাহলে তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হবে না কেন? এ একটা এমন অব্যবস্থা যার পিছনে কোনই সংগত যুক্তি নেই। অনেকের মনে হতে পারে যে, ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলের বিষয়েই বা আপত্তি কেন? আপত্তির প্রধান কারণ আগেই বলেছি। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের কোনও সংবাদ রাখার সুযোগ পায় না। সংবাদ রাখার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে, অভিভাবকরা তা বিশ্বাসও করেন না। অনেক ছেলেমেয়ে এমন আছে, যারা নিজেদের ভাষায় চিঠিও লিখতে পারে না—ইংরেজীর মাধ্যমে চিঠি লিখতে হয়। ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে যেসব ছেলেমেয়ে এইসব স্কুলে শিক্ষালাভ করছে, তাদের ভবিষ্যৎও খুব আশাপ্রদ নয়। বহু রাজ্য সরকারই রাজ্যের ভাষায় সব কাজকর্ম আরম্ভ করেছেন। ধরে নিলুম. হিন্দী ভাষা ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বীকৃত হবে না। কিন্তু বাংলা. ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়া—এগুলোই তো চলবে এবং কালে এগুলোই শিক্ষার মাধ্যম হবে। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য হয়তো কোথাও কোথাও ইংরেজীর ব্যবহার হবে। তাহলে এই-সব স্কুলে এত খরচপত্র করে ছেলেমেয়েদের পড়াবার কি যুক্তি আছে? আরও একটা যুক্তি আছে যে, সাধারণ স্কুলে তেমন লেখাপড়া হয় না এবং অনেক জায়গায় তেমন নিয়মানুবর্তিতাও নেই। কি করে হবে? সমাজের ভাল ভাল জায়গায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা সব যদি সেন্ট্রাল স্কুল বা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে যায়, তাহলে সাধারণ স্কুলের উন্নতি কি করে হবে? ইংরাজী মিডিয়াম স্কুল বলেই যে সেগুলো সম্পর্কে আপত্তি, তা নয়। বিপদ এই যে, এই সব স্কুলে যারা পড়ে তারা দেশ সম্পর্কে সচেতন হয় না, আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় না। এ একটা ভয়াবহ অবস্থা। পারিপার্শ্বিক. সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছেলে-মেয়েরা যখন উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল কাজ করে, তখন তার নীচে কোনও ভিত থাকে না। আমার এক বন্ধুর নাতি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, 'দাদু Yacht কাকে বলে?' আমি তাকে অনেক বোঝালুম, গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে পানসীও দেখিয়েছিলুম, তার মন আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়নি। সে Yacht মানে শুনেছে Sailing Vessel যাতে Hommock আছে, Cupboard আছে, Pantry আছে, Toilet আছে; কাজে কাজেই সে পানসী দেখে ভুলবে কেন? পানসীতে তো এসব কিছুই নেই। আর সাধারণত আমাদের এসব অঞ্চলে Yacht

আসে না। বম্বের দিকে হয়তো দু-চারখানা থাকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ছেলে-মেয়েদের তো সাধারণভাবে Yacht-এর সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই। অথচ ইংরেজী অ্যাডভেনচার কাহিনী পড়লে Yacht-এর অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব গল্পের বই যারা পড়ে, তারা কি করে মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবে তা ভাবা খুব শক্ত। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তার সংখ্যা এত কম যে, তাই দেখে মনে সাহস হয় না। যেমন শ্রীমান দেবাশিস বসু। ১৯৭৮-এর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১২ ক্লাস) সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ৬০০-র মধ্যে ৫৪৬ পেয়েছে। বাংলায় পেয়েছে ৯০, আর ইংরেজীতে ৭২। ইংরেজীতে ৭২ পাওয়া তার অন্য ফলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু বাংলায় ৯০ পাওয়া সত্যিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান দেবাশিসের ছেলেবেলা কেটেছে লন্ডনের বিদ্যালয়ে। কিছু বয়স হবার পরই কলকাতার ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। তবু বাংলায় ইংরেজীর চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, তার মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু সাধারণত তা তো ঘটে না। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে অভিভাবকদের সস্নেহে ও সতর্ক চেষ্টায়।

১৯৪৭-৪৮ সাল। হুগলী জেলা বোর্ডের নির্বাচন। হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ হুগলী জেলার দুই জমিদার গোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল। ১৯৩৬-৩৭-এ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে দু'জনেই কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। সেইজন্য প্রতিপত্তি একটু কমে গিয়েছিল। তবুও জেলা বোর্ডে তাঁদের প্রতিপত্তি বেশ ছিল। অবশ্য আগে দু'জনেই কংগ্রেসের নামেই হতেন। কিন্তু তারপর কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। '৪৭-৪৮-এর নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ থেকে জেলা বোর্ডের সব আসনেই প্রার্থী দেওয়া হয়। আমাদের অনেকেরই সই করা মনোনয়নপত্র জেলা কংগ্রেস অফিসে জমা ছিল। নিজেদের মধ্যে ঠিক ছিল যে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে সেইসব মনোনয়নপত্র দাখিল করা হবে না। শেষ অবধি আমার মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলুম এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সবটাই আমার অনুপস্থিতিতে হয়েছিল। কারণ, ইচ্ছা করে জেলা বোর্ডে যাওয়ার কোনও বিশেষ যুক্তি ছিল না। তখনকার দিনে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান নামেই ছিল, কাজ করবার কোনও উপায় ছিল না। কারণ, কি মিউনিসিপ্যালিটি, কি জেলা বোর্ড অথবা ইউনিয়ন বোর্ড, কারোই বিশেষ কোনও আয় ছিল না। যা সামান্য আয় ছিল, তা কর্মচারীদের মাইনে দিতেই খরচ হয়ে যেত। অথচ জেলা বোর্ডের নিজস্ব ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার—এইসব বড় বড় গাল-ভরা নামের অনেক কর্মচারী ছিলেন। কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের কোনও কাজ ছিল না। কারণ, জেলা বোর্ডের অধীন যেসব রাস্তা ছিল—জেলার প্রায় সব রাস্তাই—তাতে মাটি ফেলবার টাকাও ছিল না। তা হলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার কি কাজ করবেন? ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসারেরও সেই অবস্থা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে যে ক'টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তাদের ওষুধ কেনার টাকাও ছিল না। অতএব ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার এবং স্বাস্থ্য বিভাগ একেবারেই বেকার।

ইউনিয়ন বোর্ডেরও সেই অবস্থা। যে টাকা আয় ছিল, তা চৌকিদার, দফাদার এবং আদায়কারীর মাইনে দিতেই ফুরিয়ে যেত। ইউনিয়ন বোর্ডের আওতায় খুব কমই কাজ ছিল। কিন্তু যেটুকু ছিল, তার জন্য খরচ করার সামর্থ্য ইউনিয়ন

বোর্ডের ছিল না। প্রফুল্লদা (সেন) আরামবাগ মহকুমার শালেপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আদায়কারীর পদ তুলে দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নিজেরাই আদায় করতেন। ও'রা এমন কৃতিত্ব দেখান যে, বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের দরবারে ওই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রফুল্লদাকে একটি ছড়ি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। প্রফুল্লদা অবশ্য দরবারেও যাননি, ছড়িও নেননি। শালেপুর ইউনিয়ন বর্ধমান বিভাগে প্রথম হয়। ও'রা শতকরা তিরানব্বই ভাগ আদায় করেছিলেন। কিন্তু আদায় করলে কি হবে, সব টাকা মাইনে দিতেই খরচ হয়ে যেত। অবশ্য স্বাধীন হবার আগে এইসব জায়গা থেকে কিছু কিছু রাজনীতি করা যেত। তখনকার নিয়ম ছিল (এখনও আছে) যে, লাটসাহেব যদি কোনও জায়গা পরিদর্শনে যেতেন, তবে রাস্তা মেরামত করতে হত। জেলা বোর্ডের খরচে না কুলোলে সরকারী পি ডবলিউ ডি বিভাগ থেকে মেরামত করে দেওয়া হত। বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মণি সিংহ মশাই। বাঁকড়োর কোনও একটি গ্রামে লাটসাহেব যাবেন, সেজন্য রাস্তা মেরামত করাতে হবে। মণিবাবু জেলা বোর্ড থেকে তো রাস্তা মেরামত করালেনই না, উপরন্তু পি ডবলিউ ডি-কেও করতে দেননি। ফলে লাটসাহেবের যাওয়া হয়নি। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত মেদিনীপুরের বীরেন শাসমল মশাই। এইরকম কিছু কিছু রাজনৈতিক কাজও হত। কিন্তু কল্যাণমূলক কোনও কাজ করাই সম্ভব হত না। কলকাতা কর্পোরেশনেরও অবস্থা প্রায় তাই। আমি ১৬।১৭ বছর কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলের চেয়ারম্যান ছিলুম। কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু আয় কোথায়? বোম্বাই শহরের ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং বাস সার্ভিস বোম্বাই কর্পোরেশনের নিজস্ব। তা থেকে যা আয় হয়, সবই বোম্বাই কর্পোরেশন পায়। এখানে কলকাতা কর্পোরেশনের এরকম কোনও আয় নেই। বোম্বাইয়ে অকট্রয় ছিল বরাবর। কলকাতায় সেদিন অবধি চুঙ্গি করের কোনও নিয়ম ছিল না। কলকাতার রাস্তায় মোটর, ট্রাক, বাস, টেম্পো সব সময়েই চলছে। আর মোটর ভেহিকলস্ ট্যাক্স থেকে কর্পোরেশন পায় মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ। অথচ রাস্তা মেরামত করার পুরো দায়িত্ব কর্পোরেশনের। বোম্বাই-দিল্লীর তুলনায় কলকাতায় ট্যাক্স ধার্যের পরিমাণ অনেক কম। এই হল স্বায়ত্তশাসনের অপূর্ব (?) ব্যবস্থা। এখনও এই ব্যবস্থাই চলছে। আরও আছে। সরকারী বহু বাড়ির উপরই ট্যাক্স বসানোর আইন নেই। কিন্তু সরকারী যে সম্পত্তির উপর ট্যাক্স বসানোর নিয়ম আছে, তাও বাকী পড়ে দশ বছর, পনেরো বছর, কুড়ি বছর। আমার যত দূর মনে হচ্ছে এক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কর্পোরেশনের পাওনা ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা।

আর্থিক এই অব্যবস্থার ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় এবং সে অনুদানও সময়মত আসে না। জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি যতই অভাবের মধ্য দিয়ে যাক, রাজ্য সরকারের খেয়ালের উপর এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান নির্ভর করতে হয়। ফলে বিপর্যয় আরও বাড়ে। একটা সাধারণ হিসাব দিলেই বোঝা যাবে। বোম্বাইয়ের চেয়ে কলকাতার লোক-বসতির ঘনত্ব অনেক বেশী। বোম্বাই কর্পোরেশনের আয় প্রায় ১২০ কোটি টাকার মত। আর কলকাতা কর্পোরেশনের আয় মাত্র কুড়ি কোটি টাকা। অবশ্য এসব সত্ত্বেও সরকারের সঙ্গে যে সংঘর্ষ বাধে না, তা নয়। একবার কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘর্ষ বেধেছিল। তখন ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী

এবং আমি কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলের চেয়ারম্যান। বিভাগীয় তদন্তের পর জানা যায় যে, বাজারে সাগু বলে যা বিক্রি হচ্ছে তা সত্যকারের সাগু নয়, ট্যাপিওকা নামক দাক্ষিণাত্যের এক প্রকার গাছের মূলকে চূর্ণ করে তাকে গুলি পাকিয়ে বাজারে সাগু বলে বিক্রয় করা হয়। আমরা পার্টি মিটিং-এ স্থির করি যে, বাজারে ঐ সাগু বিক্রি বন্ধ করতে হবে এবং কর্পোরেশনের সভাতে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে দোকানদারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় যে, তারা ওই জিনিস বাজারে সাগু বলে বেচতে পারবে না। দাক্ষিণাত্য থেকেই ট্যাপিওকা হতে তৈরী ঐ সাগু বেশী আসত। বিশেষ করে তখনকার মাদ্রাজ, বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের সালেম জেলা থেকে। তখন কেন্দ্রে টি টি কৃষ্ণমাচারী শিল্পমন্ত্রী। তাঁর বিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি লেখা হয় যে, কলকাতায় ঐ সাগু বিক্রি বন্ধ হওয়ায় সাগু শিল্পের অনেকগুলি কারখানা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাবিনেট মিটিং-এ টি টি কৃষ্ণমাচারীর চিঠির বিশদ আলোচনা হয় এবং তাঁরা স্থির করেন কর্পোরেশন থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্পোরেশনে চিঠি আসে এবং ডাঃ রায় টেলিফোনে আমাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা তুলে নিতে বলেন। সরকারী চিঠির ভাবার্থ পার্টি মিটিং-এ পেশ করা হয় এবং আমিও ডাঃ রায় আমাকে যা বলেছিলেন তা সকলকে জানাই। পার্টি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে, এ নিষেধাজ্ঞা তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ডাঃ রায় আমাদের নেতা। তাঁর এবং তাঁর ক্যাবিনেটের অমর্যাদাও আমরা করতে পারি না। সেইজন্য কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যরা কর্পোরেশন থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট পদত্যাগ করার অনুমতি চাওয়া হয়। নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট যে Pledge দিয়েছিলেন, সেই Pledge-এর শর্তানুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। ঘটনাটায় ডাঃ রায় খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমরা অবশ্য সোজা রাস্তাই নিয়েছিলুম—নিষেধাজ্ঞা তুলব না, কর্পোরেশনেও থাকব না। খুব ঘোরাল অবস্থা। টি টি কৃষ্ণমাচারী আমাদের বোঝাবার জন্য এলেন। আমরা শুনলুম, কিন্তু তাঁর যুক্তি গ্রহণ করতে পারলুম না। এদিকে বাজারে সাগু বিক্রি বন্ধ। তা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গেছে। শেষ অবধি কি হত বলা যায় না, কিন্তু মীমাংসা হয়ে গেল অন্য পথ ধরে। কতগুলি সাগু ব্যবসায়ী কর্পোরেশনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন। আমাদের এই বিরোধের সময়ে আদালতের রায় বেরুলো যে, তাঁরা কর্পোরেশনের নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তই বজায় রাখলেন এবং রায়ে একটা কথা সুস্পষ্ট লিখে দিলেন যে, ঐ সাগু বাজারে বেচা চলবে, কিন্তু গায়ে লিখে দিতে হবে 'ট্যাপিওকা হইতে প্রস্তুত'। আদালতের রায় রাজ্য সরকার মেনে নিলেন। কংগ্রেস সদস্যদেরও আর পদত্যাগ করার প্রয়োজন রইল না।

স্বাধীনতার আগেই জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হয়। তখন ছিল সরকারের মনোনীত চেয়ারম্যান। স্বাধীনতার পরে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে স্কুল বোর্ড গঠিত হল। তবে নিয়মকানুন কিছুই পাল্টালো না। জেলা স্কুল বোর্ডগুলি তৈরী হয়েছিল জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য, কিন্তু কার্যত কিছুই হত না। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে স্কুল বোর্ড থেকেই যেত। কিন্তু স্কুল বোর্ডের নিজস্ব কোনও অর্থসংস্থান ছিল না—সমস্ত খরচই আসত সরকারের কাছ থেকে। স্বাধীনতার আগে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই

কম। কিন্তু স্বাধীনতার পর যখন হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল হল, তখনও নিয়ম একই। স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও সেক্রেটারী হতেন পদাধিকারবলে জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর। আর জেলার যত স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর, তাঁরা ছিলেন সরাসরি জেলা স্কুল ইন্সপেক্টরের অধীনে। তাঁদের সঙ্গে জেলা স্কুল বোর্ডের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর এই সাব-ইন্সপেক্টররাই সমস্ত প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করতেন এবং তাঁদের মতামত অনুযায়ী কাজ হওয়া প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ নামে স্কুল বোর্ডের অধীন, অথচ কার্যত জেলা স্কুল ইন্সপেক্টরই সর্বেসর্বা। এ একটা বিচিত্র ব্যবস্থা। প্রাথমিক স্কুলে যে শিক্ষককে জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্যরা ভাল মনে করেন এবং অভিভাবকরাও ভাল বলেন, তাঁকে হয়তো সাব-ইন্সপেক্টর বদলি করে দিলেন। ব্যস, স্কুল বোর্ডের আর বলার কিছু নেই। আমি জেলা বোর্ডেও বাজেটের সময়ে যেতুম কেবল দু' দিন। আর স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েও সেই ধারা বজায় রেখেছিলুম। কিন্তু সব ব্যাপারটাই এত অবাস্তব যে, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। এডুকেশন মিনিস্টরকে এ বিষয়ে বলেও কোনও ফল হত না। মাঝে মাঝেই গোলমাল বেধে যেত। কেন যে এইসব প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছিল, আর কেন যে এইসব উদ্ভট আইনকানুন হয়েছিল, তা কেউ কোনও দিন বোঝাতে পারেননি, আর আমিও ভেবে পাইনি। সে সময়ে বড় বিশদ আলোচনাও কেউ করতে চাইতেন না। কল্যাণ করবার জন্য সকলে এত ব্যস্ত যে, কল্যাণ হল কি না তা বোঝবার বা দেখবারও সময় কেউ দিতেন না। স্বাধীনতার পর যখন ক্রমাগত নতুন নতুন কাজ হচ্ছে, তখন বুঝতে না পারার মানেটা বুঝতে পারি। কিন্তু বরাবর তাই চলল কি করে? মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকে না-হয় অনভিজ্ঞ ছিলেন, নতুন এসেছিলেন। কিন্তু চিফ সেক্রেটারি, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি—আরও কতরকমের সেক্রেটারী, এঁদের তো অভিজ্ঞতা ছিল না বললে চলবে না। অনেক আই সি এসও ছিলেন। তা হলেও এইসব জিনিস চলে আসছিল কেন এবং এখনও এমন অনেক বিচিত্র ব্যবস্থা চলছে কেন? দলের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে প্রশাসনের সঙ্গে আমার যোগা-যোগ ছিল সত্য। কিন্তু প্রশাসনের খুঁটিনাটি জানবার অবস্থা আমার কোনও দিনও হয়নি। তাই এখনও ভাবি—এ জিনিস চলছে কেন? এর আগে তিনজন দক্ষ মুখ্য-মন্ত্রীর কথা লিখেছি। ডাঃ রায়, কামরাজ এবং সঞ্জীব রেড্ডীর কথা। তাঁদের দক্ষতা সম্বন্ধে কারো মনে কোনও সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নেই। তবু তাঁদের আমলেও অব্যাহত গতিতে এসব বিচিত্র ও অস্বাভাবিক নিয়ম সযত্নে রক্ষিত এবং প্রতিপালিত হয়েছে।

জেলা বোর্ড, কর্পোরেশন এবং ইউনিয়ন বোর্ড—এসব ব্যাপারে মূলতই গলদ ছিল। আয় নেই, অথচ পরের পর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছে। সামর্থ্য নেই, তবু জেলা বোর্ডের সমস্ত বিভাগই সগৌরবে বিরাজ করত। আর ইউনিয়ন বোর্ড, তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আলোচনা করলে, কেন হয়েছিল, তা বোঝা শক্ত। বিদেশী সরকার না-হয় অবহেলাভরে তাচ্ছিল্যভরে নাম-কা-ওয়াস্তে এসব করেছিল। কিন্তু আমরাও সেগুলো রেখে দিয়েছিলুম কেন? সেজন্যই এখন গভীরভাবে সব বিষয়-গুলি বিবেচনা করার সময় এসেছে। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশের পক্ষে সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হতে হয়তো দেরি হতে পারে। কিন্তু তা হলেও সেটা তো প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। একটা

নিঃস্ব, রিক্ত বিশাল দেশকে তিরিশ বছরেই সম্পূর্ণভাবে গড়া যায় না—এ আমি জানি, এ বোধ আমার আছে। কিন্তু কোনও একটা সময়ে তো সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে বিচার করে একটা পথ গ্রহণ করতে হবে! না হলে তো বরাবরই অব্যবস্থা থেকে যাবে! যা লিখেছি, সব আমার অভিজ্ঞতা থেকে। যেসব অসংগতি হয়েছে, তার জন্য আমি নিজেকেও দায়ী মনে করি। কিন্তু ত্রুটিস্বীকার বা ক্ষমাভিক্ষা করলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না!

আমি কয়েক বছর তারকেশ্বর মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলুম। তারকেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধীয় সত্যাগ্রহের ইতিহাস কিছু কিছু লোকের মনে থাকলেও এখন অনেকেরই জানা নেই এবং মনে নেই। আগে তারকেশ্বরের মোহন্ত মন্দির এবং তারকেশ্বর স্টেটের সর্বেসর্বা ছিলেন। মন্দিরের যা কিছু আয় এবং স্টেট থেকে যা আদায় হত, সবেরই তিনি কর্তা ছিলেন। মন্দিরের আয় অনেক ছিল, তার বিশেষ কোনও হিসেব প্রকাশ করা হত না। 'তারকনাথ' যে জমিদারির মালিক ছিলেন, তারও আয়-ব্যয়ের হিসেব বিশেষ থাকত না। মোহন্ত সম্বন্ধে অনেক রটনা ছিল, তবে তাব বেশির ভাগই অপবাদ। তীর্থযাত্রীদের ওপর অযথা নির্যাতন, জমিদারিতে অত্যাচার—এসব তো ছিলই; এ ছাড়াও চারিত্রিক অপবাদও প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। সে একটা বিভীষিকার রাজত্ব। এরকম ভয়াবহ অবস্থাতেও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কিন্তু কমেনি। অনেক পুণ্যার্থী যেমন শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে হেঁটে গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন, সেইরকম অনেক পুণ্যার্থী অসম্মান এবং অমর্যাদা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে তারকেশ্বর যেতেন। এ একটা আলাদা মনোভাব। বিশ্লেষণ করে ঠিক এই মনোভাব বোঝা যায় না। তারকেশ্বরের এক মোহন্ত গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে হুগলী জেলে কয়েক বছর ছিলেন। তিনি সেখানে ঘানি ঘোরাতেন। সে সময়ে তা নিয়ে অনেক গানও লেখা হয়েছিল। আমি যখন হুগলী জেলে ছিলুম, সেই ঘরে কিছুদিন থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। জেলের ওয়ার্ডাররা সেই ঘর দেখিয়ে বলত, এই ঘরে মোহন্ত ছিলেন এবং তিনি ঘানি টানতেন। অদ্ভুত অবস্থা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও জেলখানা এবং বাইরে তাঁর চরণবন্দনা করবার লোকের অভাব হয়নি। ধর্মচর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের বোধ হয় এমন মনোভাব হয় যে, তাঁদের পূজনীয়দের কোনও অপরাধই তাঁরা গণ্য করেন না। এ একটা আলাদা উন্মাদনা। অনেকে আফিং খাওয়ার নেশার সঙ্গে ধর্মের নেশার তুলনা করেন। সেরকম কোনও মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার পরিচিত এমন বহু লোক আছেন, যাঁরা সত্যিই সৎ লোক, কিন্তু ধর্মাচরণের ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে সীমাবদ্ধ। সেখানে যুক্তি-তর্কের কোনও স্থান থাকে না। আমি এমন মহিলাদের জানি, যাঁদের পরিবারের মেয়েরা কখনও হেঁটে রাস্তায় বেরোননি। কিন্তু তাঁরাই হেঁটে গঙ্গাজল নিয়ে তারকেশ্বর গিয়েছিলেন। এ মনোভাব বোঝা শক্ত। সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু এই যে হাজার হাজার লোক প্রতি বছর বৈশাখ মাসেব প্রচণ্ড গরমে শুধু পায়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গঙ্গাজল নিয়ে হেঁটে তারকেশ্বর যাচ্ছেন—তাঁরা কেন যাচ্ছেন? তাঁদের পন্থা আমি গ্রহণ করতে না পারি, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে অসম্মানজনক মন্তব্য করা আমার মতে একান্ত অশোভন। যে অনুভূতিতে স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়ে দেয়, শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যায়, সে কাজকে আমি গ্রহণ করতে না পারি, কিন্তু যেসব মানুষ এই কৃচ্ছ্রসাধন করছেন, তাঁদের অমর্যাদা করার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না। ধর্মাচরণের এই মানসিক অবস্থার

জন্য গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও মোহন্ত পুজো পেতেন এবং অন্যায় কাজও করে যেতেন। এ খালি তারকেশ্বর কেন, বহু দেবস্থানেই এ জিনিস ছিল এবং এখনও আছে। দক্ষিণে যেসব মন্দির, তাদের আয় বিরাট। কিন্তু প্রায় সব রাজ্য সরকারই এইসব মন্দিরের জন্য অছি পরিষদ বা পরিচালকমণ্ডলী করে দিয়েছেন। পুরোহিত পুজো করবার জন্য বেতন পান। তার বেশী এক কানাকড়িতেও তাঁর অধিকার নেই। সমস্ত টাকাই খরচ হয় জনসেবায়। তিরুপতি একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তিরুপতির আয় বেশ কয়েক কোটি টাকা। সেই টাকায় ইউনিভার্সিটি হয়েছে, মেয়েদের কলেজ হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং আরও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তিরুপতির আয় থেকে চলে। নিজস্ব বারো মাইল রাস্তা আছে, বাস সার্ভিস আছে, যাত্রীদের সুখ-সুবিধার অনেক ব্যবস্থা আছে। বাংলা দেশে এরকম কিছু ছিল না, এখনও নেই। ফলে যেখানে যত বিখ্যাত দেবস্থান আছে, তার আয় সেবাইতরাই পান। এই বিপুল অর্থ জনসেবা বা অন্য কোনরকম সাধারণের কাজে খরচ হয় না।

দেশবন্ধু তারকেশ্বরের অনাচার বন্ধ করার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দায়িত্ব নেন। সে এক বিরাট আন্দোলন। হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা বহু নির্যাতন ভোগ করেন। বিদেশী সরকার পুরোপুরি মোহন্তকে সমর্থন করায় সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচারের অন্ত ছিল না। কয়েক হাজার সত্যাগ্রহীর জেলও হয়েছিল।

একটু আগের ইতিহাসে যাওয়া যাক। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় ১৯২৪-এ। তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তৎকালীন মোহন্তর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে একটি মর্মান্তিক ঘটনা সে সময়ে বাংলা দেশে খুব তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। এলোকেশী নামে একটি বিবাহিতা যুবতীকে তার ধর্মান্ধ অভিভাবকরা তৎকালীন মোহন্তর বাসস্থানে পাঠিয়ে দেয়। অভিভাবক-অভিভাবিকার মনে হয়েছিল যে, মোহন্তর সেবাদাসীর কাজ করলে এলোকেশীর অক্ষয় পুণ্যার্জন হবে। এলোকেশীর স্বামীর নাম ছিল নবীন। সে খবর পেয়ে মোহন্তর বাসস্থানে গিয়ে এলোকেশীকে খুন করে। এ নিয়ে সে সময়ে অনেক গান, ছড়া এবং অনেক ছোট ছোট বইও লেখা হয়েছিল। মোহন্তর অবশ্য সাজা হয়। সেই ব্যাপারেই মোহন্তর আসন টলে ওঠে। তারপর নানা অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। তীর্থযাত্রীদের অনর্থক হয়রান, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, উৎপীড়ন করে অর্থ আদায়, 'তারকনাথের' যে জমিদারি ছিল সেখান থেকেও অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি ও আলোচনা হয়, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হয় না। সরকার বিভিন্ন অভিযোগের বিশেষ আমল দিতেন না এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও শ্রীরামপুরের এস ডি ও মোহন্তকেই সমর্থন করতেন। প্রথম সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করেন স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে দুই স্বামিজী। তাঁরা মহাবীর দল গঠন করে প্রচার আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং নানাভাবে যাত্রীদের সাহায্য করতে থাকেন। মোহন্তরও একটি দল ছিল। নাম বীরভদ্র দল। কথিত আছে, এই বীরভদ্র দলের সকলেই মোহন্তর দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট হয়ে অত্যাচারে যারা বাধা দিত, তাদের ওপর নির্যাতন চালাত। পুলিসে খবর দিয়েও বিশেষ সুরাহা হত না। বিশ্বানন্দ এবং সচ্চিদানন্দ স্বামীরা বলেন যে, (১) মন্দির থেকে যা আয় হবে তার পঁচাত্তর ভাগ মন্দির এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য খরচ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্যও খরচ করতে হবে। (২) যে শতকরা পঁচিশ ভাগ খরচ হবে না, তা

সময়ে-অসময়ে প্রয়োজনের জন্য একটি রিজার্ভ ফান্ড গঠন করতে হবে। (৩) মোহন্ত-দের সরিয়ে সমস্ত সম্পত্তি একটি ট্রাস্টের অধীনে করতে হবে। (৪) সৎ এবং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এমন লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যাঁরা মন্দির এবং অন্যান্য বিষয় পরিচালনা করবেন। (৫) মন্দিরে যা ধনরত্ন আছে তা কোনও ব্যাঙ্কের মারফত লগ্নী করতে হবে এবং তৎসংক্রান্ত আয় ম্যানেজিং কমিটি প্রয়োজনমত খরচ করবেন।

এ নিয়ে আন্দোলন যখন জোরদার হয়, তখন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তারকেশ্বরে গিয়ে তদন্ত করেন। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্র সম্পাদক। ও'দের তদন্তের সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও সাক্ষ্য দেন এবং অনেকে চোখের জল ফেলে অত্যাচারের বর্ণনা দেন। আরও যেসব তদন্ত কমিটি হয়, সকলেরই রিপোর্ট অনুরূপ। তারপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রথমে শুরু করেন স্বামী বিশ্বানন্দ এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ধীরে ধীরে জোরদার হয়ে ওঠে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। মোহন্ত অপসারিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হুগলী জজ কোর্ট থেকে রিসিভার নিযুক্ত করা হয়। কালক্রমে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় এবং ম্যানেজিং কমিটির উপর মন্দির ও সম্পত্তি পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়।

আমরা অনেকেই সে সময়ে তারকেশ্বর গিয়েছিলুম। সেখানে মোহন্তর পক্ষ থেকে যে অনাচার এবং যাত্রীদের উপর নির্যাতন করা হত, তা লিখলে তাতেই একটা বই হয়ে যাবে। বিশদভাবে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের কথা লিখলুম এই জন্য যে, দেবস্থানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা যদি থাকে, তা হলে সেইসব জায়গায় যেমন অত্যাচার নির্যাতন অবাধে হতে পারে, তেমনি অনেক কলঙ্কময় কাহিনীরও সৃষ্টি হয়। কোনও পরিশ্রম না করে যেখানে প্রচুর অর্থের সমাগম হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেই অর্থ দেবসেবা বা জনসেবায় খরচ না হয়ে ব্যক্তিগত ব্যভিচার, বিলাসিতা প্রভৃতিতেই ব্যয় হয়। এখনও পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক দেবস্থান আছে, যার সেবাইতরা যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তার হিসাব দেন না। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই এখন দেবস্থান সম্পর্কে আইন হয়ে দেবস্থানের যে আয় হয় তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে। বহু রাজ্যেই দেবতার উপর মালিকানা-স্বত্ব উঠে গেছে এবং পরিচালিত হয় ট্রাস্টি বোর্ড বা ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা। ধর্মাচরণে কোনও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়—এই নীতিবাক্য যদি মেনেও নিই, তা হলেও এটা বোঝা শক্ত যে, সাধারণে যেসব দেবস্থানে যান, সেসব দেবস্থানে মালিকানা-স্বত্ব ব্যক্তিবিশেষের কেন থাকবে। আর যদি ভালভাবে খোঁজখবর নেওয়া যায়, দেখা যাবে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁরা দেখেন না; বরং উল্টোটাই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে এই অসঙ্গত, অযৌক্তিক অবস্থা অচল। আবার নিত্য নতুন দেবস্থানের উদ্ভব হচ্ছে। সার্কুলার রোড ও মানিকতলা মোড়ের কাছে দু' দিকে দু'টি শনিঠাকুর আছেন। শনিবার সন্ধ্যায় ওখান দিয়ে যাতায়াত করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগেও এই দুই শনিঠাকুর ছিলেন না। হঠাৎ একটা প্রধানতম রাস্তার দু' পাশে দু'টি শনিঠাকুরের উদ্ভবের কথা ভাবা যায় না। আমি একটি মোড়ের কথাই বললুম। এইরকম কত মোড়ে, কত রাস্তার দু' পাশে কত যে ঠাকুর বিরাজ করছেন, তার সংখ্যা বোধ হয় কলকাতা কর্পোরেশনের জানা নেই। কলকাতা

কর্পোরেশনের রাস্তার অনেকটা অংশ অন্যায়ভাবে এইসব ঠাকুরেরা দখল করে আছেন। আর এঁরা এত শক্তিমান যে, ডাঃ রায়, যুক্ত ফ্রন্ট, সিদ্ধার্থ রায়, বাম ফ্রন্ট—কোনও সরকারই এঁদের সাধারণ জায়গা থেকে উচ্ছেদ করতে পারেননি। বহু বছর আগে গিরিশ পার্কের একটা অংশ দখল করে একটা মন্দির গজিয়ে উঠেছিল। অনেক চেষ্টা করে গিরিশ পার্কের অংশটুকু মন্দিরের আওতা থেকে বার করে আনা হয়। কিন্তু তার ফলে বহু দায়িত্বশীল নাগরিক ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হন। আমাদের কর্পোরেশন পার্টি মিটিং-এও বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। বেআইনীভাবে দেবস্থানের মালিকরা যদি কোনও অন্যায় করেন, তা হলে তা রদ করা কত শক্ত, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেইজন্য এইসব ঠাকুরকে সাধারণের রাস্তা অবরোধ করার অপরাধে উৎখাত করা হোক--এ পরামর্শ আমি কোনও সরকারকে দিতে পারি না। পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু কাজটি বড় কঠিন। বহু শত বছরের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা এমনভাবে আমাদের মধ্যে শেকড় গেড়ে আছে যে, ন্যায্য কথা যদি বলা হয়, তা হলে তাকে বলা হবে ধর্মাচরণে বাধা দান। কিন্তু এইসব ঠাকুর-দেবতা বসিয়ে যাঁরা বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করছেন তাঁদের উপার্জন যদি বন্ধ করা হয়, তা হলে তো অযৌক্তিক বা অসঙ্গত বলা যাবে না। যেসব সাধারণ দেবস্থান আছে এবং মাঝে মাঝেই যেসব দেবস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, এ সবগুলিরই ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব লোপ করা সম্ভব। সরকার ও জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি ম্যানেজিং কমিটি তো সমস্ত দেবস্থানের পরিচালনভার গ্রহণ করতে পারেন। যেখানে জমিতে খাটে না বলে জমির মালিকের জমির ওপর কোনও অধিকার নেই এ নীতি প্রচারিত হয়, সেই দেশে কি করে ঠাকুর-দেবতা ভাঙিয়ে এতগুলি লোক বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করছেন?
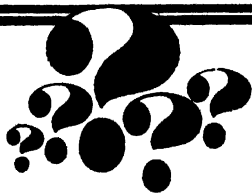
অনেক দিন ধরেই দীঘা যাতায়াত চলছিল। ডাঃ রায়ের সঙ্গে তো গিয়েছিলুমই, একলাও গিয়েছি। ডাঃ রায়ের খুবই ইচ্ছা ছিল যে, ঐ দীঘাকে এমন মনোরম করে সাজাবেন যে, সব সময়েই যাত্রীদের ভিড় হবে। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-উপকূল অনেকটা। কিন্তু পর্যটকদের যাবার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না; আর গিয়ে পৌঁছলেও অন্যান্য সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা ছিল না। দীঘার অবশ্য আগে থাকতেই নাম ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর জেনারেল, তিনি নাকি জুড়ি ঘোড়ার গাড়িতে দীঘা যেতেন। আর দীঘার বীচে নাকি তাঁর জুড়ি ঘোড়ার গাড়ি দৌড়তো। এশিয়ার মধ্যে নাকি অত লম্বা আর অত ভাল বীচ আর নেই। আমরা দেখেছি, এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব দীঘায় থাকতেন। তাঁর ছোট্ট একটা প্লেন ছিল। ঐ প্লেন দীঘার বীচে নামত। কলকাতা থেকে যেতে হয় অনেক ঘুরে। ট্রেনে কন্টাই রোড হয়ে, সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল বাসে। আজকাল কলকাতা থেকে অবশ্য সরাসরি বাস যায়; তাতেও অনেক সময় লাগে।

কলকাতা থেকে দীঘা আরও তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেইজন্য নদীতে পোলও তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মোটে নব্বই মাইল পথ হবে।

দীঘার সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল—প্রায় জনশূন্য জায়গা। কোনও জিনিস-পত্র পাওয়া যেত না। ডাক্তার-বদ্যিও ছিল না, হাসপাতালও অনেক দূর। থাকবার মধ্যে ছিল কয়েকখানি বাড়ি, আর গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের তিন-চারটি বাংলো। যাঁরা উৎসাহ করে যেতেন, তাঁদের অসুবিধার অন্ত থাকত না। আমি অবশ্য কিছু দিন দীঘার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলুম। একটা ছোট পুলিস ফাঁড়িও হল। একটা ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল। বাজারের ব্যবস্থা হল। বিদ্যুতের বাতিও জ্বলল। তারপর তৈরী হল 'সৈকতাবাস'—পর্যটকদের থাকবার জায়গা। আরও বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, যাতে অনেক জায়গা নিয়ে একটা ছোটখাট শহর গড়তে পারা যায়। ওখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে উড়িষ্যার মধ্যে চন্দনেশ্বর শিবমন্দির। উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, চন্দনেশ্বর থেকে দীঘা পর্যন্ত যে রাস্তা, তার উড়িষ্যার মধ্যেকার রাস্তাটুকু যেন তাঁরা তৈরী করেন, আমাদের দিকের রাস্তা আমরা তৈরি করে নেব। সেটা অবশ্য কার্যকরী হয়নি। দীঘায় এখন অনেক লোক যান। কিন্তু সমুদ্রের ধারে যেসব আকর্ষণ থাকলে পর্যটকরা বেশী যায়, তার ব্যবস্থা না থাকায় দীঘা বাড়তে পারছে না। উড়িষ্যার গঞ্জামের কাছে গোপালপুর-অন-সী একসময়ে বেশ জমজমাটি ছিল। এখন যেন হৃতসর্বস্ব একটি কঙ্কাল। অনেকগুলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি ছিল। তার অধিকাংশই এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। 'ওবেরয়'-এর একটি হোটেল আছে। সেখানে দৈনিক তিন-চারশ' টাকা ঘরভাড়া দিয়ে যাঁরা থাকতে পারেন, তাঁদের যাতায়াত আছে। সাধারণ পর্যটক নেই বললেই হয়। গোপালপুর-অন-সী'র যে সমুদ্র তার বীচ ভাল নয়। কাছেপিঠে অন্য কোনও আকর্ষণীয় জায়গাও নেই। দীঘার বীচ খুব ভাল। কিন্তু সমুদ্র নিস্তরঙ্গ বললেই চলে। আমাদের কলকাতার গঙ্গায় বান এলে গঙ্গার যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, দীঘার সমুদ্রে ততটুকু চাঞ্চল্যও নেই। সেইজন্য সমুদ্র সম্বন্ধে যারা কল্পনা নিয়ে যায় যে, সমুদ্র রোজ প্রতিটি মুহূর্তে পাড়ের সঙ্গে লড়াই করছে, তারা হতাশ হয়। আমাদের এদিককার লোকের সমুদ্রের কথা মনে হলেই পুরীর সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। সমস্তক্ষণ তার আছাড়ি-পিছাড়ি শব্দ, ফুঁসে-রুষে খালি আঘাত করছে—যেন পাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চায়। আর সূর্যালোকে তার রঙের বাহার অপূর্ব। অনেক কবি এ সম্বন্ধে লিখেছেন। আমি যত বর্ণনাই দিই, তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারব না। এই সমুদ্রের সঙ্গে যাঁরা দীঘার সমুদ্রের তুলনা করেন, তাঁদের মন অতৃপ্ত থেকে যায়। কি যেন একটা অভাব, অথচ সেটা কি, তা অনেকে প্রকাশ করতে পারেন না। যেখানে সমুদ্র ছাড়া আর কোনও আকর্ষণ নেই, সেখানে সমুদ্রের আকর্ষণই যদি পুরীর সমুদ্রের তুলনায় খুব সাধারণ বলে মনে হয়, তা হলে লোক সাত দিন—আট দিন—দশ দিন—পনেরো দিন থাকবার জন্য যাবে কেন? সেইজন্য দীঘায় যারা যায়, তারা পিকনিকের মনোভাব নিয়ে যায়। বড় জোর দু-এক দিন রইল, তারপর চলে আসে। পুরীতে যাঁরা যান তাঁরা সমুদ্র ছাড়াও, যাঁরা বয়স্ক, তাঁরা যান মন্দিরে। তাঁদের চেয়ে যাঁদের কম বয়স, তাঁরা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে বেড়ান। আরও কম যাদের বয়স, তারা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োয়, অন্য সময়ে সিনেমা দেখে, গোসাপ বা হরিণের চামড়ার জুতোর খোঁজ করে, আর Filigree-র কাজ দেখে। আর সমুদ্রে স্নান করা তো আছেই।

সে যেন একটা লড়াই করা, মানুষ জেতে কি সমুদ্র জেতে এই রকম মনোভাব। একঘেয়ে মত মনে হলে কেউ চলে যায় সাক্ষীগোপালে। সাক্ষীগোপাল খালি কালো কষ্টিপাথরের ঠাকুর নয় তো, এর পেছনে মস্ত রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প আছে। আর একটু দূরে যারা যায়, তারা যায় কোনারকে। অমনিই তো কোনারক একটা যাবার মত জায়গা, আবার পুরী আর কোনারক যদি এক সঙ্গে হয়, তা হলে সেটা তো একটা মস্ত আকর্ষণ। আবার কেউ কেউ ধৌলি যান। যেখানে অশোকের শিলালেখ আছে। পারলে উদয়গিরি খণ্ডগিরিও ঘুরে আসেন। পুরীতে থেকে এত জায়গা ঘোরা যায়, তার ওপর পুরীর নিজের আকর্ষণ তো আছেই। আর দীঘায়? কেউ কেউ শখ করে জোনপুটের মৎস্যাগার দেখতে যান। আর ষোল মাইল দূরে কাঁথি শহর। সেখানে বাধ্য না হলে কেউ কোনও দিন যান না। বর্তমানে যেসব ইতিহাসাশ্রিত জায়গা তৈরী হয়েছে, তার তো খোঁজ রাখার কোনও প্রয়োজন আছে, এ কথা পর্যটকরা মনে করেন না। কালীনগর, পিছাবনী—এসব দীঘার কাছেই। লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলনে এসব জায়গা সোনার অক্ষরে ইতিহাস রচনা করে গেছে। কিন্তু আমরা যতটা পুরনো ইতিহাসের দিকে আগ্রহী,—যেসব ইতি-হাসাশ্রিত জায়গা দেখার জন্য, আমরা রাজস্থান যাই বা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যাই, সেই মনোভাব ভারতবর্ষ স্বাধীন করবার জন্য যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একটুও নেই। সে সম্বন্ধে যদি সামান্যতম আগ্রহও থাকত, তা হলে দীঘা আজ পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় জায়গা বলে পরিগণিত হত। সেই অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে এই কাঁথি থেকেই বীরেন শাসমল মশাই ইংরাজ সরকারের দাপট চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে-ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের মানুষ সমস্ত নির্যাতনকেই ব্যর্থ করে দিয়ে-ছিলেন। সরকার ইউনিয়ন বোর্ড করতে চেয়েছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড করা সম্ভব হয়নি। আর এসব অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এর চরম আত্মত্যাগের কাহিনী। মনে রাখতে হবে, এসব জায়গায় কেবলমাত্র বাড়ির একজন পুরুষ বা মহিলা নির্যাতিত হননি, সমস্ত পরিবার, সমস্ত গ্রাম রক্তের আখরে ইতিহাস রচনা করেছে। ব্যক্তিগত সাহস যাঁরা দেখিয়েছেন, ইংরাজের শত নির্যাতনেও যাঁরা নতি স্বীকার করেননি, তাঁদের আমরা দেশের বীর সন্তান বলি, বিপ্লবী আখ্যা দিই। তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সপরিবার যাঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হাসিমুখে নির্যাতনকে বরণ করে নিয়ে ইংরাজের পশুশক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, ত্যাগের যাঁদের কোন মাপজোক নেই, তাঁদের অনেকেরই ইতিহাস এখনও সম্যক মর্যাদা এবং সম্মান পায়নি। এর কারণ অতি সোজা। ইতিহাস রচনা করেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের ইচ্ছামতই কতগুলি ঘটনা প্রাধান্য পায়, আর কতগুলি ঘটনার উল্লেখ অবধি থাকে না। এই বুদ্ধি-জীবীরা নিজেদের শ্রেণীকেই চেনেন। সেইজন্য এইসব শ্রেণী থেকে যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের উল্লেখ করেই ইতিহাস, কাব্য, গান উপন্যাস, গল্প রচিত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সমষ্টিগতভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই বুদ্ধি-জীবী শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না, ইতিহাসের ছাত্রও তাঁদের ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এ যে কত বড় গ্লানি ও কলঙ্ক—এ বোধও আমাদের নেই। আমরা বরাবরই যে মুষ্টিমেয় লোক অসাধারণ সাহস দেখিয়েছেন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁদের পূজাই করে আসছি। তাঁদের পূজা করায় কারও কোনও আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু প্রশ্ন

থেকে যায় যে, সেখানেই আমরা থেমে গিয়েছি কেন? হাজার হাজার পরিবার বছরের পর বছর মর্মান্তিক অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়ে এসেছেন। তাঁরা স্বীকৃতি পান না কেন? উত্তরে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, যখন বড় বড় যুদ্ধ হয় তখন সেনাপতিদের নামই জানা যায়, সৈনিকদের নাম জানা যায় না। এটা উত্তর, কিন্তু সদুত্তর বা যুক্তিযুক্ত উত্তর নয়। যে অভিনব ও সক্রিয় উপায়ে গান্ধীজী-প্রদর্শিত পথে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছে, তাতে যাঁরা সপরিবার অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের অনেক তফাত। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকরা বেতনভুক এবং তাঁদের পরিবারবর্গ লড়াইয়ের ময়দানে দুঃখ-কষ্টে তাঁদের সাথী হয় না। আর ভারতবর্ষের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় এক একটি মানুষ নিজে খালি লড়াই করেনি, সপরিবার লড়াই করেছে। ঝড়েশ্বর মাঝির ধানের গোলা এবং বাড়ি যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখনও ঝড়েশ্বর মাঝি তার সমস্ত পরিবার সঙ্গে নিয়ে বার বার ক'রে ঘোষণা করেছে, 'বিদেশী, তুমি আমার ধানের গোলা জ্বালিয়ে দিতে পার, বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু তোমার আইন আমি কিছুতেই মানব না।' ঘটনাচক্রে শ্রদ্ধেয়া মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুক শহরে গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হয়তো ইতিহাসের এক কোণে একটু আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কত মাতঙ্গিনী হাজরা অসীম সাহস নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইতিহাসের ছাত্ররা তা জানবার প্রয়োজন অনুভব করে না। বাঘা যতীনের পাদস্পর্শে ধন্য বালেশ্বরে আমরা প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রা করি। এই তীর্থযাত্রা মহতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার যাত্রা। বাঘা যতীন ইংরাজ সরকারের পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর গর্ব করার মত ঘটনা এটা। কিন্তু গান্ধীজীর পথে বছরের পর বছর গ্রামে-গ্রামে যে হাজার-হাজার মানুষ লড়াই করেছেন তাঁদের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও তো দেখানো যায়। সেটা হয় না কেন? কারণ অতি সুস্পষ্ট। যে শ্রেণীর লোক এইভাবে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তাঁরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নন। বিচার করে দেখলে, এঁদের ত্যাগের কি তুলনা আছে? চাষের গরু চলে গেল, সম্বচ্ছরের খোরাক পুড়ে গেল, জমির ফসল নষ্ট হল, সামনে ঘোর তমিস্রা—গোটা পরিবার নিয়ে শুকিয়ে থাকতে হবে। তবু এঁরা মাথা নোয়াননি। এ ত্যাগের কি তুলনা হয়? আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য, সক্রিয় কাজ করার জন্য কত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁরা পেন্সনের কথাও জানেন না, তাঁদের ছবিতে মালাও পরানো হয় না। কিন্তু সেজন্য তাঁদের কাজ তো অনর্থক হয়নি। দুঃখ তা নয় যে, এঁদের কথা বেশী আলোচনা হয়নি। দুঃখ এই যে, আমাদের মত কর্মী, যাদের নেতৃত্বে এইসব পরিবার ধ্বংসকে বরণ করে নিয়েছিল, আমরাও তাঁদের স্বীকৃতি দেবার সাহস দেখাতে পারিনি। এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে, যা বক্তৃতায় বলা হয় যে, শত শত সহস্র সহস্র লোকের ফাঁসি কাঠ বরণ করে নেওয়ার জন্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কানাই দত্তের ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ পাউন্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তাঁকে নিশ্চয়ই প্রণাম করব। কিন্তু তা বলে এ কথা স্বীকার করব না যে, ভারতবর্ষের শত শত লোক ফাঁসি গিয়েছিলেন। অথচ এ কথা সত্য যে, শত সহস্র লোক সপরিবার স্বেচ্ছায় হাসিমুখে নির্যাতন বরণ করে নিয়েছিলেন। লড়াইয়ে সৈন্যদের উপর চাপ থাকে, আইন থাকে। সৈন্য শিবির থেকে পালিয়ে গেলে কোর্ট মার্শাল হয়। কিন্তু এই যে শত সহস্র মানুষ বিনা চাপে, কেবলমাত্র দেশপ্রেমের জন্য বছরের পর বছর সব কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছিলেন, বুদ্ধি-

জীবীদের লিখিত স্বাধীনতার ইতিহাসে তার স্থান কোথায়? অবশ্য এর জন্য এইসব পরিবারের যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের মনে কোনও গ্লানি নেই। তাঁরা তো স্বীকৃতি লাভের জন্য সংগ্রাম করেননি।

এশিয়ান গেমসের ফুটবলে ১৯৭১-এ ভারতবর্ষ যা কৃতিত্ব (?) দেখিয়েছে, তাতে ক্রীড়ামোদী, বিশেষ করে ফুটবল অনুরাগী সব ভারতবাসী বেশ মনে আঘাত পেয়েছে। অথচ ফুটবল সম্বন্ধে আমরা, বিশেষ করে বাঙালীরা কত গৌরব বোধ করি। এখন তো মনে হয় যে-কোনও দেশ গুণে গুণে আমাদের গোল দিতে পারে। ভারতবর্ষের খেলার জগতে এই অধঃপতিত অবস্থার কারণ অনেক আছে এবং তার মধ্যে খেলোয়াড়দের দোষ সবচেয়ে কম। কলকাতার বড় বড় ক্লাবে এখন তো খেলোয়াড় তৈরী হয় না বললেই চলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফুটবলে যাঁরা একটু নাম করেন, অমনি তাঁদের নানারকম সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব নিয়ে আসে। একমাত্র লক্ষ্য শীল্ড ও লীগ জয় করা—তা সে যেভাবেই হোক। খেলোয়াড় তৈরির দিকে নজর নেই, কিন্তু কোনও খেলায় যদি হার হয়, তা হলে খেলোয়াড়দের উপর সমর্থকদের নির্যাতনের অন্ত থাকে না। কলকাতার একটি বিখ্যাত নামজাদা ক্লাবের খেলোয়াড়দের প্রবেশপথ টিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঢাকা না থাকলে খেলোয়াড়দের আসবার সময়ে তাদের মাথা ও মুখে নানারকম খারাপ জিনিস ফেলা হয়। কোচদের মার খাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। আবার এ ঘটনাও ঘটেছে, এক নামজাদা ক্লাবের ক্যাপ্টেন রেফারীকে প্রহার করতেও দ্বিধা করেননি। শুনি যে, স্পোর্টস হচ্ছে পরিচ্ছন্ন জিনিস এবং কোনও মানুষকে সরল এবং পরিচ্ছন্ন বোঝাতে গেলে চলতি কথায় 'স্পোর্টস্‌ম্যান' বলা হয়। কিন্তু এখানকার খেলার জগতে দেখি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। পতৌদির মত জনপ্রিয় খেলোয়াড়, যিনি বহু টেস্টে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন, তিনি লিখেছেন যে, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের টেস্টের পর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা পরস্পর করমর্দন করেননি। কারণ, অতীতের নজির আছে যে, করমর্দনকারীদের মধ্যে একজন হাতে এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে কিছু দিনের জন্য আর ক্রিকেট খেলতে পারেননি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। স্বয়ং পতৌদি এ কথা লিখেছেন এবং বহু দুঃখেই এ কথা লিখেছেন। শুনেছি ক্রিকেট নাকি এমন লোকেদের খেলা যাঁদের ব্যবহারে কোনও কালিমা বা কলঙ্ক থাকে না। ইংরাজীতে ক্রিকেট শব্দ বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়, যার মানে করা হয় ভদ্রতাসূচক। সেই ভদ্রব্যক্তিদের খেলায় যদি করমর্দনের সময়ে একজনের হাত ক্ষুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়, তা হলে পরিষ্কার বলা যায়, অনুরাগীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা ভদ্র নামের অযোগ্য।

ক্রিকেট সম্বন্ধে আরও কিছু কথা স্বতই মনে পড়ে। ইংরাজের সাম্রাজ্যকালে

ইংল্যান্ডের অনুকরণে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্রিকেট খেলা চালু হয়। ইংরাজ চলে গেছে, কিন্তু খেলাটি এখনও চালু আছে। অবশ্য কানাডায় চালু হয়ওনি, চলেওনি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যের 'ক্লাইমেট' ক্রিকেটের অনুকূল নয়। অনেক রাজ্যে অত্যধিক গরমের সময়ও ক্রিকেট খেলা হয়। অতিরিক্ত গরমে প্রখর রৌদ্রে ক্রিকেট খেলা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও আমরা তা করেই চলেছি। কারণ, টাই বাঁধতে যেমন আমরা ক্রমশই সুশিক্ষিত হচ্ছি, সেই-ভাবেই ক্রিকেটেও আমাদের অনুরাগ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ইংরাজদের কলোনীর বাইরে কোথাও ক্রিকেট খেলা হত না, এখনও হয় না। কলকাতায় ক্রিকেট খেলার অবস্থা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। ভালো স্টেডিয়াম নেই। যে স্টেডিয়াম আছে, তাতেও আসন এমনভাবে করা হয়েছে, যেখানে দু'জন লোক ভালভাবে বসতে পারে না সেখানে তিনজনকে বসতে হয়। আর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের নিয়মকানুনও অদ্ভুত। সি এ বি-র যাঁরা মেম্বার, তাঁদের কোনও ভোটাধিকার নেই। কলকাতায় নাকি পঁচাশিটা ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা সি এ বি-র কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। অনেকে এই পঁচাশিটা ক্লাবের অনেকগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। আমার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তবে এটা লক্ষ্য করেছি, যে বছর কলকাতায় টেস্ট খেলা হয়, সে বছর এই পঁচাশিটা ক্লাবের বেশ কতগুলির মধ্যে উৎসাহ ও মাতামাতি দেখা যায়। এইসব ক্লাবের প্রত্যেকটিই কয়েকখানি করে টেস্ট খেলার টিকিট পান। ব্যস্। তাই নিয়ে তাঁরা বেশ কিছুদিন উৎসাহী থাকেন। আবার যে বছর অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ এবং লাইফ মেম্বারশিপ দেওয়া হয়, সেই বছর ক্লাবগুলি বেশ মোটা অর্থ সংগ্রহ করে। অবশ্য সদুপায়ে (?) টিকিট যাঁরা নেন, তাঁরা তো দাম বেশী দেন না, তাঁরা অন্য নামে ক্লাবে বেশ মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে থাকেন।

কলকাতার অবস্থা বিচিত্র। মাঠের, তা সে ফুটবলই হোক, ক্রিকেটই হোক, সব ক্লাব ও খেলাই গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন, যদিও সি এ বি বা অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে গভর্নমেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে খেলার টিকিট বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মিনিস্টার, এম এল এ, গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন প্রভাবশালী লোকেদের কোটা ধার্য করতে হয়। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। এঁদের যে কেন টিকিট প্রাপ্য, তার কারণ এখনও কেউ দর্শাতে পারেননি। শিক্ষা বিভাগের মধ্যে খেলাধুলা বিভাগ। শিক্ষা বিভাগকে হয়তো অনেক পরিশ্রম (?) করতে হয়, তাই তাঁরা দাবি করতে পারেন টিকিট। কিন্তু কৃষি বিভাগ, শ্রম বিভাগ, সেচ বিভাগ, শিল্প বিভাগ, সমবায় বিভাগ প্রভৃতি বিভাগের মন্ত্রী ও বিভাগীয় অফিসারদের জন্য কেন টিকিটের কোটা ঠিক করা হয়, এটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। আর পুলিস বিভাগের তো কথাই নেই —তাঁরাই সর্বেসর্বা। তাঁরা ইচ্ছে করলে খেলা হবে, ইচ্ছে না হলে খেলা হবে না। অতএব সেইসব বিভাগের কেষ্টবিষ্টুদের হাতে রাখতেই হবে। এই টিকেটের কোটা ধার্য ব্যাপারটা অসাধু নয়, কিন্তু গভীর কলঙ্কজনক। ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পতৌদি যা বলেছেন,— 'What is sadder is that Bedi and Mustaque are good friends, or at least were before Lahore. They have played much of their cricket for the same county and Bedi is, or was, closer to Mustaque than many of the 'brothers' the Pakistani captain thanked on T. V. after the Test. If two well-known chums,

albeit in opposing camps, cannot organise a game to be played as it is meant to be, who can? পতৌদির মত অধিনায়ক যদি ক্রিকেট সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন তা হলে আর কারও এ সম্বন্ধে মতামত দেবার প্রয়োজন হয় না।

আমি কয়েক বছর ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলুম। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল যখন তৈরী হয় তারও আমি চেয়ারম্যান ছিলুম। কলকাতার লোকের ফুটবলের প্রতি অনুরাগ সারা ভারতবর্ষ জানে। কিন্তু কলকাতায় কোনও ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম নেই। স্টেডিয়াম না থাকায় ফুটবল ফেলার অনুরাগীদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। মাঝে মাঝেই স্টেডিয়াম করবার চেষ্টা হত। কিন্তু বরাবরই সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একবারের ব্যর্থতার কাহিনী প্রকাশ করছি। কলকাতার প্রায় সমস্ত বড় ক্লাব আমার সঙ্গে স্টেডিয়াম নিয়ে অনেক দিন আলোচনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে লিখেও দেন যে, কলকাতায় একটি ফুটবলের স্টেডিয়ামের জন্য তাঁরা আমাকে সব রকমের সাহায্য করবেন। স্টেডিয়ামের জায়গা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়। ডাঃ রায় বরাবরই আমাকে সমর্থন করতেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই বলতেন, 'দেখ, শেষ অবধি হয়তো অনেক ক্লাবই পেছিয়ে যাবে।' সকলেরই মত যে, ময়দানেরই কোনও জায়গায় স্টেডিয়াম করতে হবে। কিন্তু ময়দানে কোনও জায়গা নেই। আর ময়দানে অনুমতি দেবার মালিক ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট। সেখানে একটা ধারা আছে যে, ময়দানে যদি কোনও স্ট্রাকচার করতে দেওয়া হয়, দেশে তেমন কোনও জরুরী অবস্থা হলে ময়দানের যে-কোনও স্ট্রাকচার চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ভেঙে ফেলতে পারবেন। অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমরা স্থির করেছিলুম যে, পুরানো এলেনবরা কোর্স-এ স্টেডিয়াম করা হবে। এখন এলেনবরা কোর্স-এর মধ্যে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট-এর অনেক বাড়ি-ঘরদোর উঠেছে। তখন মাত্র কয়েকটি অস্থায়ী স্ট্রাকচার ছিল। খোঁজখবর নেওয়ায় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট না বলে দিলেন। কৃষ্ণমেনন তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দিল্লীতে গিয়ে তাঁকে ধরে পড়লুম। অনুমতি মিলল। এমন কি, মোটামুটি স্থিরও হয়েছিল যে, জওহরলাল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং কৃষ্ণমেনন তখন উপস্থিত থাকবেন। এই উদ্যোগ-আয়োজনে ডাঃ অমরনাথ (মুখোপাধ্যায়) এবং বন্ধুবর অক্ষয় বসু মশায় খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট-এর অনুমতি পাবার কয়েক দিন পর ডাঃ রায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডেকে পাঠালেন। ডাঃ রায় মৃদু হেসে বললেন, 'দেখো, আমি গোড়াতেই তোমায় বলেছিলুম যে, অনেক ক্লাব শেষ অবধি পেছিয়ে যাবে। দেখো, তাঁরা এই চিঠি দিয়েছেন।' ডাঃ রায়কে যাঁরা চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেতে আমাকে লিখেছিলেন যে, স্টেডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাঁরা পুরোপুরি সক্রিয় হবেন। আবার ডাঃ রায়কে তাঁরাই লিখেছেন যে, এলেনবরা কোর্স স্টেডিয়ামের অনুপযুক্ত এবং তাঁদের মতে বর্তমানে স্টেডিয়ামের চেষ্টা না করাই ভাল। ব্যস্। আমার উদ্যমের সেইখানেই ইতি। আমার ধারণা, শক্তিশালী ক্লাবগুলি যতদিন স্টেডিয়াম সম্বন্ধে সক্রিয় না হবেন, ততদিন জনসাধারণের পক্ষ থেকে কলকাতায় স্টেডিয়াম হওয়া অসম্ভব। অবশ্য সরকার যদি করে দেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সরকার করে দিলে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সরকারের হাতে থাকবে এবং সেখানে সেই মিনিস্টার, এম এল এ, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী প্রভৃতিদের টিকিটের কোটা আগে থাকতেই

ধার্য করা হবে। খেলার ব্যাপারে সরকারী আধিপত্য কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু উপায় কি? কলকাতা মহানগরীতে কিছু লোক অগ্রণী হয়ে কয়েক কোটি টাকা তুলে স্টেডিয়াম করাটা খুব শক্ত কিছু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগী লোকের একান্ত অভাব।

এই খেলাধুলোর ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যও কম নয়। সেবারে জাকার্তায় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের ফুটবল দল যাবে। তাদের ব্লেজার তৈরী হয়ে গেছে, প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এমন সময়ে কয়েকজন এসে আমায় বললেন যে, ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত ব্যাপারে বোধ হয় জাকার্তায় ফুটবল দলের যাওয়া হয়ে উঠবে না। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা। এশিয়ান গেমসের কর্তৃপক্ষ জানেন যে, ভারতবর্ষ থেকে ফুটবল দল যাচ্ছে। খেলোয়াড়রা সব উৎসাহ নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন। অকস্মাৎ এই নিদারুণ খবর। যাঁরা এই বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করলেন, তাঁদের একবারও এ কথা মনে হল না যে, একটি বিদেশের কাছে ভারতবর্ষের মুখ পুড়ে যাবে এবং ভারতবর্ষে ফুটবল যারা খেলে, তারা এমন আশাহত হবে যে, পরে কোনও খেলাতেই তাদের পক্ষে ভালভাবে খেলা সম্ভব হবে না। এর নাম সরকারী যন্ত্র। অবাক হয়ে বহু দিন ভেবেছি যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন দুর্ঘটনা কি করে ঘটছিল!

ফুটবলের কর্তারা এসে ধরলেন। আমাকে দিল্লী যেতে হল। সকলেই বলেছিলেন যে, অর্থমন্ত্রীর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে তদবির করতে হবে। অর্থমন্ত্রী তখন শ্রীমোরারজীভাই দেশাই। আমি মোরারজীভাইয়ের কাছে না গিয়ে সটান জওহরলালের কাছে চলে গেলুম। তিনি সংগে সংগেই বললেন যে, তুমি অর্থ-মন্ত্রীকে গিয়ে বল। উত্তরে আমি তাঁকে জানিয়েছিলুম যে, ঘটনা এত দূরে গড়িয়েছে যে, সেটা আর অর্থমন্ত্রীর এলাকায় নেই; এর সংগে ভারতবর্ষের মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত হয়ে গিয়েছে। বিদেশে ভারতবর্ষের টিম যাবার কথা এবং যে দেশে এশিয়ান গেমস্ হচ্ছে তাঁর কর্তৃপক্ষ সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষ থেকে টিম যাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি ভারতবর্ষ থেকে টিম না যায়, তা হলে ভারতবর্ষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। ফুটবল খেলোয়াড় বা ক্লাবের মর্যাদা এখন অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। জওহর-লাল ইচ্ছে করলে খুব কোমল হতে পারতেন এবং তখন তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। শেষে মোরারজীভাইয়ের কাছে গেলুম। চিরাচরিত পদ্ধতিতে মোরারজীভাই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললুম এবং জওহরলালের সংগে যা আলোচনা হয়েছিল, তাও বললুম এবং এমন সময়ে জওহরলালেরও এই সম্বন্ধে টেলিফোন এল মোরারজীভাইয়ের কাছে। মোরারজীভাই সব শুনে একজন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনের মধ্যে যা কথা হল, তা ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপার নিয়েই। খানিক বাদে এই পদস্থ অফিসারটি চলে গেলেন। আমি তখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি। মোরারজী-ভাইও খুব গম্ভীর। আমি তখন খুব আস্তে আস্তে বললুম, 'এই বিষয় নিয়ে যেমন ভারতবর্ষের মর্যাদা জড়িত আছে, ঠিক সেইভাবেই কতগুলি অল্পবয়স্ক তরুণের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে আছে, এখানে সমস্যাটি পারিবারিক।' মোরারজীভাই খুব আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি আরও আস্তে আস্তে বললুম, 'যেসব খেলোয়াড়রা যেতে পারবে না, তাদের বয়স অনেক কম। বাড়িতে তাদের কারো কারো স্ত্রী আছে, বোন আছে, অন্য বয়ঃকনিষ্ঠা মেয়েও আছে। তাদের

কাছে কি করে তারা মুখ দেখাবে?' পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই মোরারজীভাইয়ের গাম্ভীর্য কোথায় তলিয়ে গেল। ক্রমাগত জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমি বুঝলুম সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, এশিয়ান গেমসে ফুটবলে ভারতবর্ষের সোনা পাওয়া সেই শেষ। তারপরে ভারতবর্ষ ফুটবলে আর সোনা পায়নি। অধিনায়ক ছিল সুবিমল গোস্বামী অর্থাৎ চুনী।

স্বাধীনতার আগে যতগুলি কংগ্রেস অধিবেশনের কথা মনে হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত হরিপুরা কংগ্রেস এবং এত লোক সমাগমও এর পূর্বে কোনও কংগ্রেসে হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামগড় কংগ্রেসের কথা বারবার মনে পড়ে। ছবিটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

মুষলধারে বৃষ্টি। জল জমে হাঁটু অবধি উঠল। কিন্তু সেই বিশাল জনসমুদ্রে কোনরকম চাঞ্চল্য ঘটল না। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিভাষণ, নবনির্বাচিত সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের অভিভাষণ, জওহরলালের প্রস্তাব এবং আচার্য কৃপালনী কর্তৃক তার সমর্থন—সবই ঐ প্রবল বৃষ্টিধারার মধ্যে সম্পন্ন হল। প্রতিনিধি, দর্শক, স্বেচ্ছাসেবক, সকলেই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিলেন। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনও বিধিনিষেধের প্রয়োজন হয়নি—অগণিত জনগণ নিজেদের কাঁধে শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তুলে নিয়েছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রামগড়ের আবহাওয়ায় শীতের প্রকোপ কম নয়—সেই অবস্থায় ঐ প্রচণ্ড বর্ষাকে উপেক্ষা করে, বাধা-বিঘ্নকে জয় করার যে দৃষ্টান্ত রামগড়ে স্থাপিত হয়েছিল, তা এক অচিন্তনীয় ঘটনা। রামগড় কংগ্রেসে পরাধীন, ভীরু, মেরুদণ্ডহীন জাতি প্রমাণ করেছিল যে, তারা স্বাধীনতা লাভের অধিকারী হয়েছে, মানসিক স্থৈর্য ও কর্তব্যপরায়ণতায় তারা পৃথিবীর যে-কোনও শ্রেষ্ঠ শক্তির সমতুল্য।

কংগ্রেস মণ্ডপের দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চতুর্দিকে জল, জল, জল। সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে নেতৃবর্গ তাঁদের সুকঠোর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন এবং জনগণ অপূর্ব নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করেছিলেন। মানুষের নিষ্ঠার কাছে প্রকৃতিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল—রামগড় কংগ্রেস তাই ব্যর্থ না হয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য-গৌরবের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে।

প্রথম দিনের অধিবেশনের সমাপ্তিতে বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'বৃষ্টিতে বহু ঘর ভেঙে গেছে, জল-সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে—অন্যান্যভাবেও থাকবার অসুবিধা—তাই কংগ্রেস-নগর থেকে লোক চলে যাওয়া প্রয়োজন। অন্য প্রদেশের যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিহারের অতিথি, তাঁদের সেবাযত্নের ভার বিহারবাসীর উপর। সেই জন্য বিহারের দর্শক ও প্রতিনিধিদের

কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন নিজেদের বাড়ি চলে যান।'

আমরা অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের আবেদনের অপূর্ব কার্যকারিতা। বিহারের অধিকাংশ প্রতিনিধি ও দর্শক—সর্ব বয়সের ও সর্ব শ্রেণীর—'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে সেই দুর্যোগ-সন্ধ্যায় নেতার নির্দেশ পালন করার জন্য পথে বের হয়েছিল। কেউ যাবে বিশ মাইল, কেউ যাবে পঁচিশ মাইল, কেউ বা তারও বেশী। ভিজে কাপড়জামায়, ভিজে সন্ধ্যায়, ভিজে মাটির পথ দিয়ে বিহারের মুক্তিকামীর দল বেরিয়ে পড়েছিল—আমরা গভীর বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। পরদিন সকালে ছিল 'ঝাণ্ডাচকে' প্রকাশ্য অধিবেশন। সারা রাত্রি বর্ষণের পর সবেমাত্র বৃষ্টি থেমেছে, সেই সুযোগে মৌলানা সাহেব অধিবেশন শেষ করে দিয়েছিলেন। নেতৃবর্গের বক্তৃতা হয়েছিল—প্রস্তাব—সংশোধন প্রস্তাব—যথারীতি আলোচিত হয়েছিল। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মনে করে সেখান থেকে চলে আসছিলাম, হঠাৎ পতাকাদণ্ডের মূলে দৃষ্টি পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা করছিলেন—কংগ্রেসের তৎকালীন অধিবেশনের সেটা এক স্মরণীয় ঘটনা। যে সজীব ও প্রাণপুরুষের লোকোত্তর সাধনায় কংগ্রেস 'জনগণমন অধিনায়ক' হয়েছিল—যাঁর অপূর্ব নেতৃত্বে পরাধীন জাতির সেই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি লাভ করেছিল—যাঁরা অনন্যসাধারণ কর্মকুশলতায় সমগ্র ভারতবর্ষ এক দেশ ও জাতিতে পরিণত হয়েছিল, সেই সাধক বীর কর্মিশ্রেষ্ঠ প্রকাশ্য কংগ্রেসে জাতীয় সংগ্রামের পরিচালন-ভার পুনরায় গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষের দশদিক প্রতিধ্বনিত করে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হয়েছিল, 'আপনারা আমায় চান কেন—জনসাধারণ আমায় চায় বলে—জনসাধারণ জানে আমি তাদের লোক, আমি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সুপরিচিত। তাদের বাণীর মূর্ত প্রকাশ হয় আমার কণ্ঠে—সেই জন্যই তারা আমাকে বিশ্বাস করে। জনসাধারণের এই বিশ্বাসের আমি অপব্যবহার করতে পারি না—সেই জন্যই আন্দোলন আরম্ভ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকেই দিতে হবে—যদি আমাকে আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়; কংগ্রেস অথবা ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারেন—এটা করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে সেনাপতি করতে চান তা হলে আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করতে হবে। আপনারা আমাকে সেনাপতি মনোনীত করেছেন—আপনারা সৈন্য মাত্র, সৈন্যরা যদি সেনাপতির নির্দেশ না মানে তা হলে সংগ্রামে জয় হতে পারে না। আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি আপনারা আরও বেশী করে গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করুন—কুটিরে কুটিরে চরকা ও কুটিরশিল্পের প্রচলনের মধ্যেই সংগ্রামের শক্তি ও সাফল্য নির্ভর করছে।'

উদাত্ত গম্ভীর বাণী ঘুরে ঘুরে রয়ে রয়ে ভারতবাসীর চিত্তাকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—মহাত্মা গান্ধী জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ঘুরে ঘুরে 'মজহর নগরী' দেখেছিলাম। বর্ষাবিধ্বস্ত নগরী—শিল্পী, স্থপতি, ভাস্কর মিলে বহু দিনের প্রচেষ্টায় যে মনোরম নগরী নির্মাণ করেছিল—বর্ষাদেবীর এক দিনের প্রচণ্ড উদ্দামতায় তা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মাগধী তোরণ ও তার রূপচর্যার মধ্য দিয়ে রূপদক্ষেরা যে অপূর্ব কারুশিল্প সৃষ্টি করেছিল, সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবার আগেই তা ঝরে পড়েছিল বর্ষার তাণ্ডবে। মন খুবই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখনও মনে আছে

ঘুরতে ঘুরতে দামোদরের তীরে গিয়ে পড়েছিলাম। আমরা হুগলী জেলার লোক—দামোদরের রুক্ষ, জলহীন বালুকারাশির সঙ্গেই আমাদের পরিচয়—কিন্তু সে দামোদর! অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম প্রকৃতিদেবী তাঁর ভান্ডার নিঃশেষ করে দামোদরের দুই তীর সাজিয়ে দিয়েছেন।

দিগন্তবিস্তারী পর্বত-বনানীর অপরূপ শ্যামলিমা, শাল, তমাল, পলাশ, পিয়ালের শ্যাম সমারোহের মধ্যে পলাশের রক্তরাঙা বিজয়কেতন যে অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছিল—তার বর্ণনা করবার ভাষা কোনও সাহিত্যিক, কোনও কবি, কোনও ভাবুক এখনও সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। দেখে দেখে, ভেবে ভেবে বর্ষার ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও গর্জনের কারণ বের করেছিলাম। যেখানে প্রকৃতিদেবী রূপ, রস ও গন্ধ অজস্রধারে পরিবেশন করেছেন, সেই স্নেহসিক্ত ধরণীর বুকে শিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতির শিল্প সৃষ্টি করতে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার অবসান ঘটাবার জন্যই বুঝি রুদ্র ভৈরবের সেই প্রচন্ড তান্ডবলীলা।

প্রতিনিধি-শিবিরে দেখেছিলাম কন্যাকুমারিকা থেকে হিমাচল পর্যন্ত সকল প্রদেশের অধিবাসীর সমাবেশ—পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ—সব দেশের সকল স্তরের নরনারী ভারতবর্ষের সেই মহামিলন যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন, লক্ষপতি ধনী সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক, বাণী ও কমলার বরপুত্র—তাঁদের সঙ্গে একই পর্ণকুটিরে বাস করেছিল দীন, দরিদ্র, সর্বহারা গ্রামবাসী। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, অভিজাত-সাধারণ—সব এক স্তরে, এক আসনে সমান আনন্দে পর্ণকুটিরের দড়ির খাটিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

এ দৃশ্য কি ভোলবার! তিন দিনের জন্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশের, সব স্তরের, সব শ্রেণীর মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে এক বিরাট সত্তার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক জাতি ও এক দেশে পরিণত হয়েছিল। ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার এই রূপ যিনি কল্পনা করেছিলেন ও তার রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই বিরাট পুরুষের উদ্দেশে নতি জানিয়ে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। বিরাট ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের বিশাল সম্ভাবনার কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলাম। ভারতবর্ষের নিভৃততম পল্লীর দরিদ্রতম ননরারীর হস্তজাত দ্রব্যে সুসজ্জিত দোকানগুলি অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছিল। চারদিকে থরে থরে সুসজ্জিত জিনিসের মধ্যে ভারতের —পল্লী-ভারতের সজীব প্রাণের স্পর্শ অনুভব করা গিয়েছিল। কিন্তু তখন সেদিকে লক্ষ দেবার মত সময় ও সাহস ভারতবাসীর মধ্যে ছিল না। সোনার কাঠির পরশ পেয়ে এইসব লুপ্ত শিল্পে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের মন্ডপে একটি গৃহস্থের বাড়ির পরিকল্পনা ছিল—সমুদয় পরিবারের নিত্যব্যবহার্য সব জিনিসই যে কুটিরশিল্পজাত হতে পারে, তা দেখানো হয়েছিল। বর্ধিষ্ণু ও সম্পন্ন পরিবারের যা যা প্রয়োজন হয়—শোবার খাট, বসবার চেয়ার, পড়বার টেবিল, বৈঠক-খানাঘরের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম, সংসারের প্রয়োজনীয় সাধারণ ওষুধপত্র খাদ্যসম্ভার প্রভৃতি সব জিনিসই কুটিরশিল্পজাত। একমাত্র কুটিরশিল্পের দ্বারা যে সাধারণ মানুষ তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে তা আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না। এই কুটিরশিল্পের প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়ানো দীনদরিদ্র-দুঃখীর ব্যথা অবসানের যে ছবি ফোটানো হয়েছিল, তাও ভোলবার নয়।

প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে নেতৃবর্গের শিবির, স্বেচ্ছাসেবক-শিবির, অভ্যর্থনা সমিতির শিবির, দর্শকদের শিবির ঘুরে ঘুরে সবই দেখেছিলাম। সর্বত্র একই

দৃশ্য—দড়ির খাটিয়া ও পর্ণকুটির। সমস্ত লোক এক জাতি ও এক শ্রেণী হয়ে একই পল্লীতে বসবাস করছে—এটাই ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ, কংগ্রেস ভারতবর্ষের এই রূপ কল্পনা করে তা বাস্তবে পরিণত করার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। রামগড় কংগ্রেস সেই সংগ্রামেরই একটা অধ্যায়।

রামগড় কংগ্রেসের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি এইজন্য যে, ঐ অবিরাম বর্ষণের মধ্যেও প্রদর্শনীটি ঠিক বজায় ছিল। প্রদর্শনী বজায় ছিল বটে, কিন্তু সে যে কি করে সম্ভব হয়েছিল, তা আজকের দিনে কল্পনা করাও মুশকিল। প্রদর্শনীতে যেসব কর্মী দিনরাত কাজ করে প্রদর্শনীটিকে খাড়া রেখেছিলেন, তাঁদের খাবার থাকবার জায়গা অবিরাম বর্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি রক্ষা করার দিকে নজর না দিয়ে কর্মীরা অক্লান্ত চেষ্টায় প্রদর্শনীটিকে রক্ষা করেছিলেন। এবং কর্মীরা প্রায় সকলেই ভিজে কাপড়ে অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন। এটা কাহিনী হিসাবে শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু না দেখলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ছোটনাগপুরে ঝড়জলের রুদ্র তাণ্ডব উপেক্ষা করে কতগুলি কর্মী কেবলমাত্র মনের জোরে ঐ প্রদর্শনীটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল খুব অসুবিধার মধ্য দিয়ে। সেখানে মণ্ডপ এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি ও সেবাদল-কর্মীর বাসস্থান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই একই জায়গায় তার পরের দিন প্রদর্শনী দেখে মনে হয়েছিল কর্মীদের কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষের বহু গ্রামে যেসব শিল্প ও শিল্পী তখনও কোনরকমে টিকেছিল, সেই মহার্ঘ সম্পদ যাতে লোকের সামনে অক্ষতভাবে উপস্থিত করা যায়, তার জন্য কর্মীরা অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদের চেষ্টার কাছে প্রকৃতিকে পরাভব স্বীকার করতে হয়। সেইজন্যই সেদিনকার সেই ছবি আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯৪০-এর মার্চ মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়।

'মাথায় তুষারমৌলি নগাধিরাজ : যাঁর স্নেহধারা বাংলাদেশকে স্নিগ্ধ ও শস্যশ্যামলা করে রেখেছে। নদ-নদী, গিরি, বন-উপবন—সবই বাংলাদেশের মধ্যে। এর স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় সবুজের সমারোহ। আর নীচে দিগন্ত প্রসারী নীলাম্বুরাশি রোজ বিশালবিস্তৃত তটভূমিকে আলিঙ্গন করছে। আর মধ্যে মহাকবির 'তাল-তমাল-বনরাজিনীলা' বাস্তবরূপ নিয়েছে। এই বাংলাদেশের রূপ। চৈতন্য প্রেমোন্মাদে এই বাংলাদেশকে ভাসিয়েছিলেন। জয়দেব-চণ্ডীদাসের বাংলা—কত বাউল, কত কবি অহরহ যেখানে সুরের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, তোমরা সেই বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে সাদা শাড়ি পর কেন? তাহলে কি ভাবপ্রবণ প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল বাংলাদেশ তার নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে?" আমরা তো

বক্তৃতা শুনে অবাক। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সর্বজনস্বীকৃত বিদুষী ইংরেজী সাহিত্যে যাঁর পাণ্ডিত্য প্রায় গল্পের আকারে মুখে মুখে ঘোরে, সেই সরোজিনী নাইডুর এই বক্তৃতা! বক্তৃতা যদিও ইংরেজীতে, যেমন গলার স্বর, তেমনি সুর। অনর্গল পঞ্চান্ন মিনিট ধরে বলে গেলেন। তার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকলেও বাঙালী মেয়েরা যে সাদা শাড়ী পরে ও মাথার চুলে ফুল না দিয়ে রূপ, রস ও গন্ধ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখছে, সে সম্বন্ধে তীব্র ভর্ৎসনা। যেমন ভাষা, তেমনি বলার ভঙ্গী।

প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু এখনও যেন কানে কথায় সুর বাজছে। সরোজিনী নাইডুর জন্ম-শতবার্ষিকী হচ্ছে।

জীবনে অনেক নেতা, অনেক পণ্ডিত, যাকে Cultured বলে—এমন অনেক লোকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মহান মর্যাদায় মহীয়সী এবং শান্ত, স্নিগ্ধ স্বভাব, আর কথায়, ভাবে-ভঙ্গীতে আভিজাত্য—খুব কম লোকেরই দেখেছি। ওপরে ওঁর বক্তৃতার যে অংশ দিলুম, তা ১৯৩৭ সালে হুগলী জেলায় এক সভায় বলেছিলেন। সাদা শাড়ি পরা ও ফুল ব্যবহার না করা নিয়ে যে অত তীব্র অথচ মিষ্টভাবে বলা যায়, তা ধারণা করা অসম্ভব।

কংগ্রেস সেই প্রথম মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে। আমরা উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের প্রধানমন্ত্রীদের—তখন মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হত—হুগলী জেলায় সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। সেইসময় শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডুকেও হুগলী জেলায় আনিয়েছিলাম। আমাদের এক বন্ধুর ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তা নইলে তাঁকে সেইসময় বিনা গুরুতর কাজে হুগলী জেলার মত একটি ছোট জেলায় আনা সম্ভব হত না। তাঁকে জনসভায় দেখেছি, কংগ্রেস অধিবেশনের ডায়াসে দেখেছি, 'All India Congress Committee'-র সভায় দেখেছি। কিন্তু ঐ দেখা মাত্রই সার—কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না এবং আলাপ-পরিচয় করবার সাহসও হত না। যখন একটু জানাশুনা হবার সুযোগ হল, দেখলুম, অপূর্ব এবং অসামান্য। বাঙালীর মেয়ে, মানুষ বাংলার বাইরে এবং লেখাপড়া ভারতবর্ষের বাইরে। ইংরেজী কবিতা লেখায় কিছু নাম হয়েছিল। কিন্তু কবি হলেই তো 'Nightingale of India' বলে অভিহিত হয় না। ভাষা এবং কণ্ঠস্বরের এমন সমন্বয় সহজে দেখা যায় না; আর তেমনি তেজস্বিতা। ইংরেজী সাহিত্যে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছব বয়সেই ইংলণ্ডে "Fellow of the Royal Society of Literature" হয়েছিলেন। কবিতার বই বেরিয়েছিল তিনখানি। ১৯০৫-এ The Golden Threshold, The Bird Of Time ১৯১২-তে। আরও একখানি বই বেরিয়েছিল—নাম . The Broken Wing। ১৯২৮-এ বেরোয় কবিতা সংকলন—The Sceptred Flute। আর মারা যাবার পর ১৯৬১-তে বেরিয়েছে The Feather of the Dawn—এ হল সরোজিনী নাইডুর একটা দিক। প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা মুসলিম লীগের সভায় লখনউ-এ। তারপর ১৯১৭-এ Besant কংগ্রেসে—কলকাতায়। গান্ধীজী কংগ্রেস-নেতৃত্ব নেবার পর পুরোপুরি কংগ্রেসে এবং গান্ধীজীর অনুগামী। ১৯৩০, ১৯৩২ এবং ১৯৪২-এ জেল খেটেছেন। ১৯২১-এ দেশবন্ধুর লেখা বক্তৃতা আমেদাবাদ কংগ্রেসে পড়েন। দেশবন্ধুর লেখা আর সরোজিনী নাইডুর পড়া—এই দুইয়ে মিলে আমেদাবাদ কংগ্রেস ভাববন্যায় ভেসে গিয়েছিল। ১৯২৫-এ কানপুর কংগ্রেসে প্রথম ভারতীয় মহিলা সভানেত্রী হন। আজ পর্যন্ত কোন কংগ্রেস অধিবেশনে কোন কংগ্রেস সভাপতি এত সংক্ষিপ্ত ভাষণ

দেননি। আর সে কি ভাষণ! যেমন পরিষ্কার, তেমনি মাধুর্যপূর্ণ। ভাষণের ছত্রে ছত্রে নির্ভীকতা ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। ভাষাটি কবির, কিন্তু ভাবটি দেশ-প্রেমিকের,— "Mine, as becomes a woman, is a most modest, domestic programme merely to restore to India her true position as the supreme mistress in her own home, the sole guardian of her own vast resources, and the sole dispenser of her own hospitality. As a loyal daughter of Bharata-Mata, therefore, it will be my lovely though difficult task, through the coming years, to set my mother's house in order, to reconcile the tragic quarrels that threaten the integrity of her old joint-family life of diverse communities and creeds, and to find an adequate place and purpose and recognition alike for the lowest and the mightiest of her children, and foster-children, the guests and the strangers within her gates.'

তার আগেই কংগ্রেসের কাজে খুব নাম হয়েছে। ১৯২৩-২৪-এ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে আফ্রিকা ঘুরে এসেছেন। সেই কাজে যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। গান্ধীজী যখন ১০ই মার্চ, ১৯২২-এ প্রথম গ্রেপ্তার হন এবং ১৮ই মার্চ আমেদাবাদে বিচার আরম্ভ হয়, সেই সময় একটি পুস্তিকায় সরোজিনী যা লেখেন, তা এখনও অনেকের মনে আছে।

"A convict and a criminal in the eye of the law; nevertheless the entire court rose in an act of a spontaneous homage—when Mahatma Gandhi enters,—a frail, serene, indomitable figure in a coarse and a scanty loin cloth."

এমন অবস্থা হয়েছিল যে যেখানেই কংগ্রেসের কোন আলোচনার প্রয়োজন হত, সেখানেই সরোজিনীর ডাক পড়ত।—সে কি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, কি কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য—সবেতেই সরোজিনীকে দরকার পড়ত। মধ্যে একবার কংগ্রেসের কথা বলবার জন্য আমেরিকা ঘুরে এলেন। সেখানেও বিপুল সংবর্ধনা। ঠিক যখন পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হল, সেখানেও প্রথম সারিতে সরোজিনীকে প্রয়োজন। গান্ধীজী তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান শেষে ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডি পৌঁছান। সরোজিনীও ঐদিন পৌঁছান। ভারতবর্ষ তখন উত্তাল। দেশের সর্বত্র ডাণ্ডি অভিযান এক বিচিত্র ভাবাবেগ এনে দিয়েছে। গান্ধীজী আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পরই আব্বাস তায়েবজী লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন, আর তাঁর পরই সরোজিনী নাইডু। গান্ধীজী গ্রেপ্তারের সময় সরোজিনী এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ যোগদান করতে গিয়েছিলেন। তার আগে গান্ধীজী গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন : "A powerful government could have paid no more splendid tribute to the far-reaching power of Gandhi than by the manner of his arrest and incarceration without trial, under the most arbitrary law on their Statute Book. It is really immaterial that the fragile and ailing body of the Mahatma is imprisoned behind stone walls and steel bars. It is the least essential part of it. The man and his message are identical and his message is the

living heritage of the Nation today and will continue to influence the thought and action of the world, unfettered and unchallenged by the mandate of the most autocratic government of the earth."

এলাহাবাদে আব্বাস তায়েবজীর গ্রেপ্তারের খবর পেয়েই উনি ডান্ডি চলে আসেন আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এবং ১৬ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হন। ডান্ডি অভিযানের বিশদ বিবরণ দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই—ভারত ইতিহাসের তা একটি সুবর্ণময় অধ্যায়। তারপর গান্ধী-আরউইন চুক্তি হল। গান্ধীজী গেলেন রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে, সঙ্গে সরোজিনী।

তারপর থেকে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন পর্যন্ত সরোজিনী ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন। উনি ছিলেন একজন প্রকৃত ভারতবাসী। বাঙালী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে, মানুষ হয়েছেন হায়দ্রাবাদে, রাজনীতিতে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরের কূলে মাদ্রাজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন, আবার আরব সাগরের কূলে বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও হয়েছিলেন। যত বড়ই সমস্যা হোক, সরোজিনী তার সমাধানে এগোতে একটুও ভয় পেতেন না। কোন সভায় জনতা যদি উচ্ছৃঙ্খল হত, তখন তাদের মধ্যে গিয়ে হাজির হতেন একেবারে নির্ভীক-ভয়শূন্যভাবে। আর বশও করতে পারতেন।

সরোজিনীর দু'ভাই খুবই খ্যাতিমান। একজন হলেন বারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন মহাবিপ্লবী এবং জার্মানী থেকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্র পাঠাতেন। চলতি কথায় লোকে বলত 'চটু'। আর আরেক ভাই সুকবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃতি শুনেছি। সরোজিনীর কবিতাও অনেক জায়গায় আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। অসাধারণ। সরোজিনীর দুই মেয়ের মধ্যে একজন তো কলকাতায় সুপরিচিতা। তিনি রাজনীতিতেও যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি তাঁর বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন পদ্মজা নাইডু। আর এক মেয়ে ছিলেন লীলামণি। এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগে কাজ করতেন। ছেলে পাঁচ বছর লোকসভার সদস্য ছিলেন। নাম জয়সূর্য। ওঁরা বলেন 'জয়সুরিয়া'। বক্তৃতার সঙ্গে অনর্গল কবিতা বলতে পারতেন। পদ্মজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মায়ের ভাষা ও কণ্ঠস্বর পেয়েছিলেন। তিনি লিখতেন কিনা আমার জানা নেই।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের নাম উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে ঘোষিত হয়। ডাঃ রায় তখন ভারতবর্ষের বাইরে থাকায় সরোজিনী অস্থায়ী রাজ্যপাল হন। ভারতবর্ষে ফেরার পর ডাঃ রায় রাজ্যপাল হতে অস্বীকার করায় সরোজিনী স্থায়ী রাজ্যপাল হন। সরোজিনী প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যপাল হয়েছিলেন। সরোজিনীর আগে অবশ্য একজন মহিলা কংগ্রেস সভাপতি হন।—তিনি ইউরোপীয়—অ্যানি বেসান্ত। ১৯৪৯-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্মদিনের আগে সরোজিনী দিল্লী যান এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে আনবার পর ডাঃ রায় তাঁকে লখনউ-এ দেখতে যান। মার্চ মাসের প্রথমে তাঁর নার্সকে বলেন তাঁকে একটি গান শোনাতে। গান শোনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নার্সকে বলে দেন, "আজ রাত্রে কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে না আসে।" সেই তাঁর শেষ কথা। ৩রা মার্চ জওহরলাল পার্লামেন্টে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন,—"Here was a person of great brilliance, here was a person vital and vivid, here was a person with so

many gifts which made her perfectly unique. She began life as a poet......Her whole life became a poem and a song, and she did that amazing thing, she infused artistry and poetry into the national struggle."

'কণ্টকল্পিত' লেখার মধ্যে বহু জায়গায় বিপ্লব ও বিপ্লবী শব্দ ব্যবহার করেছি। 'দেশ'-এর সম্পাদক কি চিঠি পেয়েছেন জানি না, তবে আমার কাছে যে-সব চিঠি এসেছে, তাতে মনে হয়েছে, বিপ্লব ও বিপ্লবী কথার সংজ্ঞা নিয়ে একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। কিছু লোক মনে করেন, যাঁরা বোমা, রিভলবার প্রভৃতির ব্যবহারে অথবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই বিপ্লবী। অন্য সকলে—যাঁরা স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিলেন, তাঁদের গঠনমূলক কর্মী বলা চলে, রচনাত্মক কর্মী বলা চলে, শ্রদ্ধা করা যায়, সম্মানও দেখানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী বলা চলে না। এখানেই আমার একটু অসুবিধে হয়েছে। আমি, যাঁরা গঠনমূলক কর্মী বলে অভিহিত, তাঁদের অনেককেই বিপ্লবী আখ্যা দিয়েছি। প্রচলিত অব্যবস্থা, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা যে মতে বা যে পথেই করে থাকুন, তাঁদের আমি বিপ্লবী আখ্যা দিয়েছি। অবশ্য পরাধীনতা দূর করার প্রশ্ন এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। বিদেশী শাসনের মধ্যে থেকে তাকে উৎখাত করবার চেষ্টা না করে যিনি যত বড় কাজই করে থাকুন, তাঁকে বিপ্লবী বলা যায় না। আবার কেবলমাত্র বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার চেষ্টাকেও বিপ্লব বলা যায় না। প্রচলিত অব্যবস্থা, কুপ্রথা, কুসংস্কার ও বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছেন আমার মতে তাঁরাই বিপ্লবী। মত বা পথের কথা স্বতন্ত্র। আরও স্পষ্ট করে বলি, কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতা দূর করাকে বৈপ্লবিক কাজ বলব না, যদি না তার সঙ্গে পরাধীনতা দূর করবার চেষ্টা যুক্ত হয়।

রাজনীতি সংক্রান্ত বহু কথা আমরা ইংরেজী ভাষা থেকে নিয়েছি। ইংরেজী 'রেভলিউশন'-কে বাংলায় বিপ্লব বলা হয়। অকস্ফোর্ড ডিক্সনারীতে রেভলিউশন-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে— 'Complete change; turning upside down; great reversal of condition; fundamental reconstitution'.

আর বাংলা 'সংসদ অভিধানে' বিপ্লবের অর্থ দেওয়া হয়েছে—'রাষ্ট্র বা সমাজের অতি দ্রুত পরিবর্তন'; চলন্তিকায় আছে—'আমূল পরিবর্তন'। কি ইংরেজী কি বাংলা—দু'য়েরই অভিধানগত অর্থ খুব পরিষ্কার। অর্থাৎ কেবলমাত্র কোন একটি কাজ করলে তাকে বিপ্লব বলে না। তার উদ্দেশ্য থাকা চাই আমূল পরিবর্তন। কোন ব্যক্তি তাঁর কাজের দ্বারা তাঁর জীবিতকালের মধ্যে কোন আমূল পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কিনা, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, তিনি যখন কাজ আরম্ভ

করেছিলেন, তার লক্ষ্য। বোমা, পিস্তল ব্যবহার করলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না; সেইরকম গঠনমূলক কাজ করলেও বিপ্লবী হওয়া যায় না। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ফরাসী বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ করা হয় এবং রাজতন্ত্রের লোপ করা হয়। কিন্তু তাকে বিপ্লব বলে এখনও অভিহিত করা হয় না। ক্রমওয়েল-এর পরই আবার রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং আজ অবধি তা চলে আসছে। অর্থ অতি সুস্পষ্ট। রাজতন্ত্র সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছিল বটে, কিন্তু যেসব ব্যবস্থার উপর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেসব লোপ পায়নি। অথচ রাজতন্ত্র বজায় রেখেও ইংল্যাণ্ডে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন' সম্ভব হয়েছিল। আভিধানিক অর্থে রেভলিউশন-এর যে ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন-এ তা কিন্তু সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে জীবনধারার পরিবর্তন হয়েছিল। আবার ফরাসী বিপ্লবে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্র—সবই উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের যাঁরা প্রবক্তা ছিলেন, যেমন—রুশো, ভল্টেয়ার—তাঁরা বিপ্লবের সময় ছিলেন না। যাঁরা বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানগুলি করেছিলেন, যেমন রোবেসপিয়ের প্রভৃতি—এঁরা শেষ অবধি নিজেদের হাতেই সব ক্ষমতা রাখতে চেয়েছিলেন। সেখানেও বিপ্লবের সংজ্ঞামত কাজ হয়নি। নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানের পর তাঁকে বলা হত 'সন অব রেভলিউশন'। নেপোলিয়ান যখন নিজে সম্রাট হলেন তখন তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারা থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কতকগুলি কাজ করেছিলেন যা ফরাসীদেশের লোক বৈপ্লবিক বলে ধরে নিয়েছিল এবং নেপোলিয়ানের পর আবার যদিও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরই বংশীয় একজন পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পেরেছিলেন নেপোলিয়ানের বৈপ্লবিক কর্মধারার সূত্র ধরে। নেপোলিয়ান ইউরোপের প্রায় সর্বত্র রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের মূল উপরে ফেলে দিয়েছিলেন। বিপ্লবের সময় যে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা বিপ্লবের অনেক নায়ক ভোগ করতেন, নেপোলিয়ান সেটা বন্ধ করেন। বিপ্লব যে বিশৃঙ্খলা নয়, সেটা নেপোলিয়ান প্রমাণ করেন এবং যে-কোন অবস্থা ও যে-কোন পরিবারের লোক যে-কোন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন, সেটাও নেপোলিয়ান প্রমাণ করেন। এটা ইতিহাসের এক বিচিত্র ঘটনা। ঐতিহাসিকরা বিচার করেছেন এবং এখনও বিচার করছেন, বিপ্লবের আর একটি বড় আঙ্গিক হল নৈরাজ্যবাদ। নৈরাজ্যবাদের যিনি প্রধানতম প্রবক্তা, মাইকেল বেকুনিন, তিনি আবার বিপ্লবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অতি স্পষ্ট।

"The people, the poor class, which without doubt constitutes the greatest part of humanity; the class whose rights have already recognized in theory but which is nevertheless still despised for its birth, for its ties with poverty and ignorance, as well as indeed with actual slavery—this class, which constitutes the true people, is everywhere assuming a threatening attitude and is beginning to count the ranks of its enemy, far weaker in numbers than itself, and to demand the actualization of the right already conceded to it by everyone."

নৈরাজ্যবাদ উপলক্ষে ধ্বংসাত্মক কাজের সমর্থনে বেকুনিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা যেমন অভিনব, সেইরকম অপরূপ ও অতুলনীয়।

"Let us therefore trust the eternal spirit which destroys and annihilates only because it is the unfathomable and eternal source of all life. The passion for destruction is a creative passion, too !"

অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক কাজ সৃষ্টিকার্যের অগ্রদূত। অবিস্মরণীয় ব্যাখ্যা। বেকুনিনের সঙ্গে মার্কস-এর মতান্তর হয় এবং পৃথিবীর সর্বত্রই কম্যুনিস্টরা বেকুনিনকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বেকুনিন-এর কথার তো একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। ধ্বংসের উপর সৃষ্টি নির্ভর করছে। অনেক সময় সত্যিই তাই মনে হয় এবং কম্যুনিজমের অনেক প্রবক্তা প্রকারান্তরে তাই বলেছেন। কিন্তু তাঁরা স্বীকার করতে ভয় পান। পৃথিবীর যত কুপ্রথা ও কুসংস্কার আছে, সেগুলোকে সংস্কার করার চেষ্টা করাতেই তার শিকড় আরও মজবুত হচ্ছে। কিন্তু একেবারে ধ্বংস করলে নতুনভাবে নতুন জীবন, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব।

আমাদের দেশে বিপ্লব এবং বিপ্লবী বলতে যা বোঝায়, সেই কথায় আসা যাক। সাধারণত সহিংস উপায়কেই বিপ্লব আন্দোলন বলা হয় এবং যাঁরা সেই পথ নিয়েছিলেন তাঁদের বলা হয় বিপ্লবী। পরাধীনতা দূর করবার জন্য যাঁরা সহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের বিপ্লবী বললে অপর সবাইকে অর্থাৎ অন্য পথে যাঁরা পরাধীনতা দূর করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বাদ দেওয়া হবে কেন? পৃথিবীর ইতিহাসে চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী সহিংস উপায় যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদেরই বিপ্লবী বলা হয়।—ঠিক কথা। কিন্তু সাধারণত যেসব বড় বড় দেশে বিপ্লব হয়েছে বলে ইতিহাসে লেখা আছে, তার সঙ্গে কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন তুলনা হয়? যে ফরাসী বিপ্লবকে 'মাদার অব রেভলিউশন' বলা হয়, সেই ফরাসী দেশ তো পরাধীন ছিল না। ঠিক রাশিয়া সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। চীন সম্বন্ধেও এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যদি বিচার করা হয়, তা হলেও সেখানকার পরাধীনতা আর ভারতবর্ষের পরাধীনতার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়ায় সেই দেশেরই লোকেরা একটা শাসনব্যবস্থা সরিয়ে আরেকটা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষে একসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই ও কুপ্রথা, কুসংস্কার ও সামাজিক অব্যবস্থা দূর করার বিরুদ্ধে লড়াই চলেছে। ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি—এই সমস্যার সম্মুখীন ফ্রান্স, রাশিয়া বা চীনকে হতে হয়নি। ভারতবর্ষে আমরা সবরকম ভাবে অধীন হয়ে ছিলাম। নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। আর বিদেশীর শাসন ছিল অব্যাহত। সেইজন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবলমাত্র পরাধীনতা দূর করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রথা, কুসংস্কার ও অব্যবস্থা দূর করার সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হয়। এই বিপ্লব ঘটানোর জন্য কিছু লোক চেষ্টা করেছিলেন সহিংস উপায়ে, আর কিছু লোক চেষ্টা করেছিলেন অহিংস উপায়ে। পথ ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য একই এবং দুই পথাশ্রয়ীই নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ কম করেননি। যিনি হাসতে হাসতে সহিংস কাজের জন্য ফাঁসিকাঠকে অবলম্বন করেছিলেন, তাঁকে নিশ্চয়ই প্রণাম করব, আবার যিনি হাসতে হাসতে সপরিবারে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন ও চরম দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন অহিংস আন্দোলন, আইন অমান্য ও ভারত ছাড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁকেই বা বিপ্লবী বলে প্রণাম করব না কেন? কানাই দত্ত মশায়ের যে জেলায় বাড়ি, সেই জেলারই অনুকূল চক্রবর্তী।

সচ্ছল পরিবারের লোক। কিন্তু অহিংস পথে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করার জন্য কপর্দকশূন্য হয়ে সপরিবারে দিনের পর দিন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটিয়েছেন কিন্তু কোন দিন পথ ত্যাগ করেননি। শ্রদ্ধেয় যাদুদাকে (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) ঘনিষ্ঠভাবে জানতুম। বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তকেও জানতুম। অসহযোগ আন্দোলনে সিভিল সার্জেনের চাকরি ছেড়ে সপরিবারে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে হাসিমুখে দিন কাটিয়ে গেছেন। কোন দিন কেউ কোন অভিযোগ শোনেনি। পরিবারের অনেকে জেল খেটেছেন, জীবনধারণের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। কিন্তু সবটাই আদর্শের মহিমায় উজ্জ্বল। শ্রদ্ধেয় সতীশ দাশগুপ্ত মশায়ও বড় চাকরি ছেড়েছেন, আদর্শের জন্য পুত্রবিয়োগও নিষ্কম্পভাবে সহ্য করেছেন। গ্রামের মধ্যে গিয়ে চাষের ধারা বদলাবার চেষ্টা করেছেন। উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী—জননী হেমপ্রভা দেবী। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর সুপারিনটেনডেন্ট-এর স্ত্রী—যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না, সেই মহিলাই গঠনমূলক কর্মীদের হাসিমুখে জেলে পাঠিয়েছেন। জেলের বাইরে যখন তারা এসেছে, স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে তাদের লালন-পালন করেছেন। সতীশবাবুর সুযোগ্য ভাই ক্ষিতীশবাবু সেদিন আসামে পরলোকগমন করেছেন। যে মনোভাব নিয়ে জেলে ডান্ডাবেড়ির সাজা ভোগ করেছিলেন, যখন জেলের বাইরে থাকতেন, সেই মনোভাব নিয়েই নানারকম রচনাত্মক কাজ করতেন। এঁরা কোন দিন কুসংস্কার, কুপ্রথা ও অব্যবস্থার সঙ্গে আপস করেননি। এঁরা বিপ্লবী বলে অভিহিত হবেন না কেন? কল্যাণীয় সুশীল (সুশীল দাশগুপ্ত) মেদিনীপুরে জেল ভেঙ্গে এসে আমার কাছে অনেক দিন ছিল। হিংসাশ্রয়ী পথে জেলে গিয়েছিল। আবার অহিংস পথে হিন্দু-মুসলমান রায়ট থামাতে গিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণ দেয়। কোন কাজের জন্য তাকে বিপ্লবী বলব?

আরও অনেকের নামই দেওয়া সম্ভব, যাঁরা বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে বন্দুকের গুলি বুকে নিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, আবার যাঁরা অহিংস সংগ্রামের পথে তিলে তিলে সব নির্যাতন ও দুঃখ সহ্য করে তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। অ্যালবেয়র কামু বিপ্লবের ভাল সংজ্ঞা দিয়েছেন। "দেশের জনসাধারণ যখন মনে করবে যে প্রচলিত অব্যবস্থা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা লোপ পেয়ে জনসাধারণের ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, তাকেই বিপ্লব বলে।"

১৯৬২-র ৪ জুলাই ময়দানের এক মহতী জনসভায় ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাতেই শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সভাপতি ও আমার নাম সম্পাদকরূপে গৃহীত হয়। পরে অবশ্য আমরা একটি কমিটি করে তাকে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিই।

ডাঃ রায়ের মৃত্যু হয় ১ জুলাই, ১৯৬২। তার চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই ডাঃ রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমাদের ঠাট্টা করে বলতে আরম্ভ করেন, 'তোমরা সব রয়েছ। ভাবনা কি?' তাঁর কথা বেশ ভাল লাগত না। কারণ, ডাঃ রায় এরকম ঠাট্টা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিকভাবেই আসবে, তাই এসব বিষয় নিয়ে কোন দিন আলোচনা করেননি। সত্যি কথা বলতে গেলে, তাঁর কথা শুনে আমি বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। যাঁরা চিকিৎসা করছিলেন, সেইসব ডাক্তাররাও বলেছিলেন যে, বিশেষ চিন্তা করবার কিছু নেই, তবে অসুস্থ। ঐ ক'দিন ডাঃ রায় রাইটার্স বিল্ডিং-এও যাননি। তবে কাজের কোন বিরাম ছিল না। সব ফাইলই আসত, সেক্রেটারীরাও আসতেন। দোতলার বারান্দাটা রীতিমত অফিসে

পরিণত হয়েছিল। একদিন আমি কয়েকটি শক্ত শক্ত কথা বললুম। উত্তরে হাসতে হাসতে বলেন, 'তুমি আমার বড় হিতৈষী! তুমি চাইছ যে, আমি কাজ না করে পঙ্গু হয়ে বসে থাকি।' বলে আবার হাসতে লাগলেন। সেদিন থেকে আমি ওপরে ওঠা বন্ধ করি। তবে নীচে অনেকক্ষণ সময় কাটাতুম। আমার একটা কথা রেখেছিলেন। ১ জুলাই ও'র জন্মদিনে আমি সকাল ছ'টা থেকে নীচে থাকব এবং বেশী লোককে ওপরে উঠতে দেব না। কিন্তু সেও তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, শুভেচ্ছা জানাবার এত আগ্রহ যে, কাকে বন্ধ করা যাবে! ফলে বেশ কিছু লোকই ওপরে উঠেছিলেন। এগারটার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য কংগ্রেস ভবনে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ফোন পাই যে, সব শেষ হয়ে গেছে। আমি তখনই আবার ডাঃ রায়ের বাড়িতে ফিরে আসি।

আমরা কয়েকজন ঠিক করেছিলুম যে, ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষার কাজ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করতে হবে এবং তাঁর নামে একটি শিশু হাসপাতাল করে তা জাতির সেবায় উৎসর্গ করা হবে। ময়দানের জনসভায় স্থির করা হয় যে, পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ২০০ আসনবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল করা হবে। ১২ জুলাই আমরা অর্থ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করি। ২০ অক্টোবর চীন ভারত আক্রমণ করে ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদায়ের কাজ বন্ধ করা হয়। মোটে সময় পেয়েছিলুম আমরা তিন মাস এক সপ্তাহ। বাইরেকার অনেকেরই ধারণা হয়েছিল এই অল্প সময়ে হয়তো পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক সকলকে বিস্মিত করে দেন। পঁচিশ লাখ টাকা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে এই অল্প সময়ে আমরা একান্ন লাখ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলুম। ঐ কয়েক মাসে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। আমরা ভাষার ছটা ছড়িয়ে বলি 'ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে', কিন্তু বাস্তবে তা খুব কমই হয়। স্মৃতিরক্ষা কমিটির তহবিল সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম যে, 'ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে' কথাটা শুধু ভাবোচ্ছ্বাস নয়, বাস্তবেও তা সম্ভব। প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা উঠেছিল এক টাকা থেকে একশো টাকা চাঁদায়। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আসানসোলের কয়েকটি কলিয়ারীর শ্রমিকরা বললেন, 'আমরা এক টাকা করে চাঁদা দেব, তবে দাঁড়িয়ে থেকে নিতে হবে।' সেখানেই তিরিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। গ্রামের লোকও পিছিয়ে ছিল না। গ্রামে যেখানে যত ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ছিল, সবাই সংগ্রহ করতে লেগে যায়। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে কার্যলয়ে এসে দিয়ে যান। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে বন্যার জল যেমন আসে, সেইভাবে টাকা আসতে থাকে। যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটি গড়ে উঠেছে ও যাঁদের দানে মেমোরিয়াল কমিটি পরিপুষ্ট হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধে কোন কিছু লেখাই অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ যে কিভাবে ডাঃ রায়কে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত, তা আমরা ঐ তিন মাস প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেছি। রিকশাওয়ালা দিয়েছে, বাস কণ্ডাক্টর দিয়েছে, ট্যাক্সিওয়ালা দিয়েছে। আবার বাজারে যারা সবজি বেচতে আসে, তারাও অকুণ্ঠভাবে দিয়েছে। ধনী বলে যারা অভিহিত, তাদের দানও এসেছে। কিন্তু তাদের দেওয়া ও দরিদ্র মধ্যবিত্তের দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। ধনী তার বিত্তের একাংশ দিয়েছে, আর দরিদ্র দিয়েছে তার সাধ্যের অতীত।

১৯৬৩-র ১ জুলাই জওহরলাল শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সতেরো বিঘা জমির ওপর হাসপাতাল স্থাপিত হয়। আর ১৯৬৬-র

১৪ নভেম্বর তৎকালীন রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল হাসপাতালের উদ্বোধন করেন।

ময়দানের জনসভায় স্থির হয়েছিল যে ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ২০০ শয্যা-বিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল করা হবে। হাসপাতাল ভালভাবেই করা হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের তৎকালীন চেয়ারম্যান হাসপাতালটি দেখে খুব খুশী হন এবং বলেন যে, যে কোন আধুনিক হাসপাতালের মত ভাল ভাবেই এটা করা হয়েছে। জনসাধারণের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতায় স্মৃতিরক্ষার এই কাজ শেষ হওয়ায় সকলেই খুশী ও সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছিল। স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার নিয়ে যে কেউ ঠকাবার চেষ্টা করবেন, তা কোন দিন কল্পনাতেও আসেনি। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছিল। ১৯৬৩-র ১ জুলাই জওহরলাল হাসপাতলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সে অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পারিনি। আমি অসুস্থ হয়ে বাড়িতে ছিলুম। পরে শুনেছি যে, সে অনুষ্ঠানে কেউ কেউ স্মৃতিরক্ষা কমিটির জন্য জওহরলালকে কিছু নগদ অর্থ ও চেক দেন। তা সভায় ঘোষিত হয় এবং পরের দিন তা সংবাদ-পত্রে দাতাদের নাম সহ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর জওহরলাল আমার বাড়িতে আমাকে দেখতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও পদ্মজা নাইডু। অন্যান্য কথাবার্তার পর জওহরলাল আমাকে স্মৃতিরক্ষা কমিটির জন্য প্রদত্ত অর্থাদি দেন এবং বলেন, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। তোমার জন্য এক লাখ টাকার চেক নিয়ে এসেছি।' তিনি আমায় এক লাখ টাকার একটি চেক দেন। পরের দিন আমি সবই কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিই। চেকটি যখন ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়, তখন অনিল (চট্টোপাধ্যায়) একটু সন্দেহ প্রকাশ করে। অনিল আমাদের যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ। দু' সপ্তাহ বাদে চেকটি ফেরত আসে। চেকটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক ব্যাঙ্কের নামে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে, সে চেক ভাঙ্গানো যাবে না। চেকটি দিয়েছিলেন কলকাতার এক বড় শিল্পপতি। তখন আমাকে প্রায়ই দিল্লীতে যেতে হত। আমি জওহরলালকে চেকটি দিয়ে বলি, 'কিছু করা যায় কিনা দেখুন', বলে তাঁকে আনুপূর্বিক ঘটনা জানাই। জওহরলাল শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিল্পপতিকে টেলিফোনে যোগাযোগ করবার নির্দেশ দেন। আমি সবিনয়ে জানাই, 'আপনি টেলিফোন করতে পারেন। কিন্তু যিনি ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষা কমিটিকে ভুয়ো চেক দিয়ে ডাঃ রায়ের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছেন, তাঁর কাছ থেকে কোন অর্থ নেওয়া সঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না।' জওহরলাল সঙ্গে সঙ্গে আমার কথায় সায় দেন। অবশ্য পরে ঐ শিল্পপতি জানতে পেরেছিলেন এবং বন্ধুবান্ধব মারফত আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা তাঁর কাছ থেকে কোন অর্থসাহায্য গ্রহণ করিনি। পৃথিবীতে হয়তো এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এ ব্যাপারটি আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

হাসপাতাল সম্পূর্ণ হবার পর দেখা যায় যে, তখনও কিছু অর্থ রয়েছে। তখন একটি শিশু উদ্যানের জন্য জায়গা খোঁজা আরম্ভ হয়। প্রথমে বর্তমান গড়িয়াহাট ব্রিজ যেখানে, তার পাশে খানিকটা জায়গা দেখা হয়েছিল। জায়গার আয়তন অবশ্য বেশী ছিল না। আর ইঞ্জিনিয়াররা বলেন যে, জল সরিয়ে মাটি ভরাট করতে অনেক টাকা লেগে যাবে। তখন অনেক চেষ্টা করে বর্তমান জায়গাটি ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে লিজ নেওয়া হয়। জায়গাটির এমন অবস্থা ছিল—কোন কালে

জায়গাটিকে ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে তা প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। তবুও আমরা জায়গাটি সংগ্রহ করি। সংগ্রহ করে প্রথমে প্রাচীর দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে মাটি ভরাট করার কাজ শুরু হয়। অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সময়ে সল্ট লেক 'বিধাননগরে' একটি রাজনৈতিক দলের মহাসম্মেলন হয়। আমাদের কারো সম্মতি না নিয়েই সেই মহাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষ পাঁচিলের খানিকটা ভেঙ্গে ফেলে car park করেন। পরে তৎকালীন সরকার সেখানে খালি পিচের ড্রামের গোডাউন করেন। অন্যান্য উপসর্গও ছিল। যেমন কোন একটি দলের পতাকা নিয়ে ষাট ঘর লোক জায়গা জবরদখল করে বসবাস আরম্ভ করে। তাদের কাজ ছিল পুকুরধার ও অন্যান্য জায়গা, যেখানে মাটি আছে, কেটে নিয়ে গুল পাকানো ও গুলের ব্যবসা করা। অনাচার চরমে পেঁছয় যখন একটি রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মী মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদের ভয় দেখায় যে, পাইলিং-এর কাজ তাদের দিতে হবে, নইলে তাঁদের মুণ্ডু কাটা যাবে। যে চিঠি তাঁরা দেন, সেই চিঠি এখনও মার্টিন কোম্পানির দপ্তরে আছে। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আমাদের কমিটির একটি মিটিং-এ আলোচনা করা হয় যে, ঐ স্থানে শিশু উদ্যান করা সম্ভব হবে না। যাই হোক, অনেক চেষ্টায় শেষ অবধি জায়গাটিকে অনাচার-মুক্ত করা সম্ভব হয়। এ কাজে তৎকালীন পুলিস কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল প্রচণ্ড। বিশ বিঘা আয়তনের ঝিলের বিভিন্ন জায়গা থেকে গুল পাকাবার মাটি কেটে নেওয়ার ফলে পাড় ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। ফলে পুকুরটি বাঁধাবার কাজ আরম্ভ করতে হয়েছে। অনেক খরচ। তিন ভাগের এক ভাগ পাড় আমরা বাঁধতে পেরেছি। এই পুকুর বাঁধাই এবং গুল তৈরি করার জন্য মাটি কাটার ফলে মাঠে যে বড় বড় গর্ত হয়েছিল, তা ভরাট করতে আমাদের প্রায় সাত লাখ টাকার উপর খরচ হয়ে গেছে। অবশ্য টাকার কোন অভাব হয়নি। পঁচিশ লাখ টাকার লক্ষ্য স্থির করে কমিটি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এখন প্রায় আটাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। সবটাই এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে। আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ থাকা উচিত নয়। রোজই আমরা নতুন নতুন কার্যক্রম নিচ্ছি এবং জনসাধারণ অর্থ যোগাচ্ছেন। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যে, বিধাননগরে মহাসম্মেলন করার কর্তৃপক্ষ কি করে বিধান স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিধান শিশু উদ্যানের পাঁচিল ভাঙ্গতে পারলেন? কোন্ মনোভাবেব ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল?

বিধান শিশু উদ্যান তৈরী হয়েছে। মাত্র তিন বছর বয়স। কিন্তু এরই মধ্যে হাজার হাজার শিশুর কল-কাকলিতে শিশু উদ্যান ভরে থাকে। শিশুদের মনকে স্পর্শ করবার অনেক বিভাগই খোলা হয়েছে। আর পার্কল্যাণ্ডে যেখানে অসংখ্য দোলনা, চরকি, সী-স, স্লাইড এবং অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম আছে, সেখানে রোজই দেখা যাবে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা শিশুর সঙ্গে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরা ছেলেমেয়েরা সানন্দে একসঙ্গে স্লাইড দিয়ে নামছে। কলকাতায় তেমন ভাল পিকনিকের জায়গা নেই। শিশু উদ্যানের পিকনিকের জায়গা সব সময়েই দেখা যায় ভরতি। বড় বড় নামজাদা স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যেমন আসে, তেমনি নিম্ন মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত স্কুলের ছেলে-মেয়েদের আসাও অব্যাহত। বহু রকম খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে এবং এই খেলায় যারা অংশ গ্রহণ করে, সেখানে যেমন সমাজের অতি দরিদ্র ঘরের ছেলেও সবরকম সুযোগ-সুবিধে পায়, সেইরকম যারা ধনী বলে কথিত, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও

মিশে যায়। রিডিং রুমে একশ'টি ছেলেমেয়ের বসার জায়গা। সেখানেও সেই একই দৃশ্য—স্তরভেদ নেই, জাতিভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই। ছবি আঁকার জায়গাতেও তাই। আর ঠিক অনুরূপ অবস্থা গান, নাচ, নাটক শেখাবার ঘরে। বিধান শিশু উদ্যানে যেতে যেমন কোন দর্শনী লাগে না, তেমনি যারা শিক্ষালাভ করে, তাদেরও কোন অর্থ দিতে হয় না। সাঁতারের জন্যও নয়, লাইব্রেরীর জন্যও নয়। আবার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এক বছর ধরে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাও আছে। এটাকে যেমন শিশু উদ্যান বলা চলে, সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ইচ্ছেমত খেলাধুলো, পড়াশুনা, নাচ, গান, অভিনয় ও ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠানও বলা চলে। সাধারণত শিশু উদ্যানে এইসব ব্যবস্থা থাকে না।—ভারতবর্ষের কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। জনসাধারণ যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তার কিছু প্রতিদান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। এ কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং কিছু কিছু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, বয়স্ক লোকেরা অবুঝের মত অশোভন আচরণ করেন। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

[ঠিক বিধান শিশু উদ্যান নিয়ে লেখার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অনেকে ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটির ইতিবৃত্ত ও এতদিনের কার্যধারা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন।]

কেষ্টনগর থেকে একটি তরুণ এসেছিল 'শিশুবর্ষ' নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। ছেলেটি এবারে বি এ পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে, অনার্স নিয়ে। ওরা উদ্যোগী হয়ে শিশুবর্ষ উপলক্ষে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটি পত্রিকা বার করছে। কিন্তু ছেলেটির মন কেবলমাত্র পত্রিকা বার করেই খুশী নয়, সে আরও কিছু করতে চায়। কিন্তু কি করবে, তাই নিয়েই ভাবনা।

কলকাতা এবং ভারতবর্ষের আর আর বড় বড় শহরে শিশুবর্ষ উপলক্ষে যে-ভাবে ঢক্কানিনাদ হয়েছে তাতে আওয়াজ খুব হয়েছে বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্যটা কি, তা গুলিয়ে গেছে। 'শিশুবর্ষ' মানে কি খালি র‍্যালি অর্থাৎ নানারকম উপায়ে কিছু কিছু সুসজ্জিত ছেলেমেয়ে এনে 'শিশুবর্ষ' পালন করা? দিল্লীতে ১ জানুয়ারী ত্রিশ হাজার শিশুর সমাবেশে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিয়েছেন। খুবই ভাল। কিন্তু সেই সমাবেশে যেসব শিশু এসেছিল, কেবলমাত্র তারাই ভারতবর্ষের শিশু নয়। অনুরূপ অনুষ্ঠান কলকাতা ও ভারতবর্ষের বহু ছোট বড় শহরে হয়েছে। শিশুদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়েছে, গানের প্রতিযোগিতা হয়েছে, খেলা-ধুলোও হয়েছে। অর্থাৎ চিরাচরিত শিশুদের দিয়ে যেসব অনুষ্ঠান হয়, তাই বড় করে, ভাল করে, অনেক আওয়াজ তুলে ধরা হয়েছে। তা হলে শিশুবর্ষের তাৎপর্য

কি? ইউনাইটেড নেশন্‌স শিশুবর্ষ বলে ১৯৭৯ সালকে অভিহিত করেছেন। তার জন্য একটি ফান্ডও সৃষ্টি হয়েছে। ফান্ডটি UNICEF বলে অভিহিত। এই ফান্ডে ভারতবর্ষের দেয় অর্থ ৮৮ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষ যদি সামর্থ্য অনুযায়ী ৮৮ ক্রোড় দিতে পারে, তা হলেও কেউ অখুশী হবে না। কারণ, উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল করবার উপায় কি? ভারতবর্ষে এখনও অধিকাংশ পরিবারের পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করবার সামর্থ্য নেই। তারা কি করে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য যোগাড় করবে? অন্যান্য ব্যবস্থাও ঠিক তাই। দশ-বারো বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েরা বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করুক, কেউ চায় না। কিন্তু এর থেকে অব্যাহতি আসবে কি করে? কলকাতার চা ও খাবারের দোকান, মোটর গ্যারেজ ও অন্যান্য সব জায়গায় এই অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য। তারা নিজেদের খোরাকিটা করে নেয়, আর বাড়িতেও হয়তো মাঝে মাঝে দু-এক টাকা পাঠায়। বাড়িতে যাঁরা চাকর রাখেন, তাঁদের কাছে অল্পবয়স্ক চাকরের চাহিদাই বেশী। অল্পবয়স্করা কম খায়, কম মাইনে নেয় এবং মুখ বুজে কাজ করে। অল্প-বয়স্ক ঝি-এর সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আইন করে অবশ্য এটা বন্ধ করা যায়। কিন্তু তার ফল কি হবে? এখন তবু চাকরিসূত্রে দু' বেলা পেট ভরে খেতে পায়, তখন তাও জুটবে না। গাঁয়ে থাকা ছেলেদের করতে হয় রাখালি, আর মেয়েরা গোবর কুড়োয়, ক্ষেত থেকে ফসল তুলে নিয়ে যাবার পর যেসব গুঁড়ো-গাঁড়া পড়ে থাকে, তাও কুড়োয়। বৃষ্টি, রোদ্দুর, শীতে এ কাজে এক দিনও কামাই নেই। তাতেও দু' বেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে না। ছবি আঁকা বা গানের সমাবেশে এদের যাবার কথা ওঠেই না, কেউ ভাবতেও পারে না। আর বড়লোকদের জন্য যেসব শিশু সমাবেশ করা হয়, তাতে এরা অপাঙ্‌ক্তেয়। কারণ, বেরোবার মত জামাকাপড়ও এদের নেই। সেইজন্যই প্রচলিত চিরাচরিত কথা ভুলে গিয়ে অন্য পন্থা ভাবতে হবে।

শিশুবর্ষ সম্পর্কে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। যখন পৃথিবীর কোন দেশ শিশুবর্ষের কথা বলেনি, তখন সেই পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষের প্রতি-নিধি ইউনাইটেড নেশন্‌স-এ একটি বছরকে 'শিশুবর্ষ'রূপে চিহ্নিত করার কথা বলেছিলেন। শুধু যে সেইজন্য বিশেষ দায়িত্ব, তা নয়। এখন ভারতবর্ষ উন্নতির পথে, ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এমন কি, ভারতবর্ষ থেকে চাল পাঠিয়ে বাইরে থেকে পেট্রোল আনার কথাও হচ্ছে। এইখানেই প্রশ্ন ওঠে, যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে কেন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের অধিকাংশ দু' বেলা পেট ভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পাচ্ছে না? আর যতদিন তা না পাবে, ততদিন কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাবে? ভারত সরকারের হিসেব অনুযায়ী, অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার জন্য ভারতবর্ষে প্রতি বছর এক লাখ শিশু মারা যায়, আর প্রায় ২৫ লক্ষ শিশু চোখের অসুখে ভোগে। তা হলে কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলবে? আর যদি সত্যিই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে যে ব্যবস্থার ফলে এখনও চোখের অসুখে শিশুরা ভুগছে এবং মারা যাচ্ছে, সে ব্যবস্থা রদ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন দরকার। সব প্রাজ্ঞ লোকই বলেন, 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'। যে দেশে আণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং সে বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়াও গেছে, সে দেশে এখনও কেন হাজারের মধ্যে ১২২ জন শিশু মারা যায়? তার মধ্যে আবার পাঁচজন জন্মাবার বছরেই মারা যায়! এই অবস্থাই যদি চলে, তা হলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কি?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আমরা এত দূর অগ্রসর হয়েছি যে, অন্য দেশে আমরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছি এবং আমাদের দেশের বিশারদরা গিয়ে সেসব দেশে শিক্ষাদানও করছেন। খুবই আনন্দের কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গেই যদি দেখা যায় যে, অপুষ্টির জন্য শিশুরা মারা যাচ্ছে এবং অন্যান্য রোগে ভুগছে, তা হলে জাতিগঠনের ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলতে হবে। ঠিক শিক্ষার ব্যাপারেও তাই। প্রতি এক শ' জন শিশুর মধ্যে মাত্র কুড়ি জন বিদ্যালয়ে যায়। অথচ আমাদের সংবিধানে আছে যে, চৌদ্দ বছর অবধি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধান গৃহীত হয়েছে ১৯৫০-এ। তা হলে এতেও কি আমরা ব্যর্থ হয়েছি? সমস্ত ব্যাপার দেখে মনে হয়, বিভিন্ন জাঁকজমকের উচ্চ-রোলের মধ্যে এত ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, আসল সমস্যাগুলো নিয়ে যে আলো-চনা করার প্রয়োজন—এ সত্যও কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই ভুলে গেছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, শিশুবর্ষ কি কেবল শিশুদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, অথবা এমন কাজ শুরু করতে হবে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশু-দের সব সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়? ভারতবর্ষে নবজাতক থেকে চোদ্দ বছর বয়স অবধি শিশুর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। আর প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে শিশু জন্মায়। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে হয়তো জন্মহার কিছু কমতে পারে, কিন্তু সে দিয়ে তো কিছু সমস্যার সমাধান হয় না! পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি হচ্ছে, জানা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা খুব শক্ত নয়। পরিকল্পনা আমরা অনেক করি এবং তার কিছু কিছু সফলও হয়েছে। তা হলে শিশুদের নিয়ে কোন পরিকল্পনা করলে তাই বা সফল হবে না কেন? সরকারের পক্ষ থেকে এরকম পরিকল্পনা করা এবং তাকে রূপ দেওয়া অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সরকারী খতিয়ান অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের নীচে যাদের আয়, তাদের দায়িত্ব সরকার অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। বহু অর্থ নিশ্চয়ই ব্যয় হবে এবং সে ব্যয় করতে হবে। আণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে ব্যয় হয়, দেশরক্ষা খাতে যে ব্যয় হয়, সেটা যেমন অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বলে খরচ করা হচ্ছে, তেমনি শিশুদের জন্য খরচ করাও অবশ্য-পালনীয়। তফাত দৃষ্টিভঙ্গীর। দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। সে ব্যয়ে কোন কোন লোক আপত্তি করলেও বেশির ভাগ লোকেরই আপত্তি নেই। সেইরকম শিশুদের জন্য ব্যয়ও দেশে সুস্থ, সবল, সামাজিক জীবন আনবার জন্য। উচ্চবিদ্যাশিক্ষার জন্য যে খরচ হয়, তাতে দেশ কতটা সমৃদ্ধ হয়, বলা শক্ত। কিন্তু শিশুদের জন্য খরচ না হলে দেশ কখনও সমৃদ্ধ হতে পারবে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে—কিছু লোক এমন ধনী, তাদের সংখ্যা যতই নগণ্য হোক, কিন্তু পার্থক্যের দিকটা এত প্রকট যে, তাদের সঙ্গে তুলনায় নিম্নমানের পরিবারের তুলনাই করা চলে না। এই পার্থক্য বজায় রেখে কোন দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। বাইরে থেকে সমৃদ্ধ মনে হলেও একটা গণতান্ত্রিক দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উপর। বড় বড় কলকারখানা কিছু হতে পারে, শিল্প-সৃষ্টিতে দেশ স্বনির্ভরও হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যদি নিম্নতম মানেরও নীচে থাকে, তা হলে সে দেশ কোন দিনও সমৃদ্ধ দেশ বলে বিবেচিত হতে পারে না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের কাছে এখনও শিক্ষা গিয়ে পেঁছতে পারেনি। ঠিক পানীয় জলও তাই। অথচ ঐ দু'টি বিষয়ের কথাই সংবিধানে আছে,

তা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। সেইজন্যই মনে হয় যে, দেশের চিন্তাবিদ্‌দের এবং দেশের নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে আছে তাঁদের এই মূল ও প্রাথমিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। এ কাজ সম্ভব মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা এবং এইসব সমস্যার সঙ্গে শিশুদের সমস্যাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা নয়। যে পরিবারের মানুষরা দু' বেলা পেট ভরে খাবার খেতে পায় না, সে পরিবারের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খেতে বলা নিতান্ত পরিহাস মাত্র।

সরকারের দায়িত্ব যেমন আছে, তেমনি যাঁরা বিত্তশালী ও যাঁদের হাতে নানারকম ট্রাস্ট আছে, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। জাতি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা ধর্মাচরণের অনেক জায়গা করে দিয়েছেন। উচ্চবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও প্রভূত, আর অজস্র লোকের রোগ নিরাময়ের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ করাতেও তাঁরা কার্পণ্য করেননি। কিন্তু এতেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যেসব জায়গায় তাঁরা হাস-পাতাল বা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেইসব জায়গায় তাঁরা শিশু-দের ব্যবস্থাও করতে পারেন। ব্যবস্থা করা মানে আংশিক ব্যবস্থা নয়। নবজাতক থেকে চোদ্দ বছর বয়স অবধি শিশুদের সামগ্রিক ব্যবস্থা করতে হবে এবং বেছে নিতে হবে একটা নির্দিষ্ট আয়ের নীচে যাদের আয়, সেইসব পরিবারকে। পরি-বারের মধ্যে রেখে যদি শিশুকে লালন-পালন করতে হয়, তা হলে পরিবারের আয় বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা তিন-চার বছর বয়সের শিশুদের পরিবার থেকে এনে তাদের সামগ্রিক দায় বহন করতে হবে। এর মধ্যে কোন আপস করা চলবে না, কোন গোঁজামিলের স্থান নেই। অনেকে বিপ্লবের কথা বলেন। এটাও একটা বিপ্লব এবং সেটা মনোজগতে।

কোন উন্নতিকামী দেশ স্থিতাবস্থায় খুশী থাকতে পারে না। দেশকে সমৃদ্ধ করার আয়োজনে তাদের ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। ঠিক কথা। এই চিন্তার সঙ্গে কারো মতপার্থক্য থাকতে পারে না। কেবলমাত্র চিন্তাজগতে এই ভাবধারার সৃষ্টি করতে হবে যে, উন্নতিকামী দেশগুলির শিশুরা যদি অনাদৃত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত থাকে, তা হলে কোন দিনই সে দেশের উন্নতি হবে না। কারণ, এই শিশুরাই এক-দিন দেশের ও সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জীবনারম্ভের শুরু থেকেই যদি তারা বঞ্চিতদের দলে থেকে যায়, তা হলে কোন দিনই তারা নিজেদের পুরো দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এবং স্বাভাবিক নিয়মেই যখন এইসব শিশু বড় হবে, তখন তারা দেশকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে, এ কথা ভাবাটাই অস্বাভাবিক। যেমন-ভাবে তারা মানুষ হবে, ঠিক সেভাবেই তারা দেশ গড়ার কাজে লাগবে। ভারত-বর্ষের অধিকাংশ শিশু এখন যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থাতেই রেখে বা তাদের উন্নতির নামে কিছু হইচই করে, আর যাই হোক, দেশের কল্যাণ করা হবে না। কল্যাণ যারা বহন করে আনবে, তারা যদি অকল্যাণ, অমঙ্গল ও অশান্তির মধ্য দিয়ে বড় হয়, তা হলে তাদের দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে নিন্দা করা চলবে না; দোষী তাঁরাই, যাঁরা দেশের ও সমাজের কর্ণধার। শিশুবর্ষে এই পথে যদি কিছুটাও যাত্রা শুরু করা যায়, তা হলে একদিন হয়তো ভারতবর্ষের বর্তমান শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে। দায়িত্ব আজ তাদের ওপর নয়, দায়িত্ব তাঁদেরই উপর যাঁরা আজ কথায় কথায় Juvenile Delinquency বলেন, সমাজবিরোধীর কথা বলেন, ছেলেমেয়েরা অধঃপতিত হচ্ছে বলেন। বর্তমানে এই সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি শিশুবর্ষের

কাজ শুরু করা হয়, তা হলে শিশুবর্ষ শুরু করা সফলতা ও সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হবে।

উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। নানাবিধ আলোচনা হতে হতে তাঁরা জনতা পার্টির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করলেন। অবশ্য এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অনেকেই হাটে-মাঠে-বাজারে ও পার্টি অফিসে এই আলোচনা করছেন। সাধারণে যখন আলোচনা করেন, তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞরা যখন—বিশেষ করে জনতা পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল রাজনীতিকরা যখন আলোচনা করেন, তখন সেটা বোঝা সত্যিই শক্ত হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জনতা পার্টির গঠন এক সত্যিই অপূর্ব ঘটনা। পরস্পর-বিরোধী কয়েকটি দল যে কখনও এক হতে পারবে এবং তারপর মন্ত্রিসভা গঠন করে দু' বছর চালাতে পারবে, এটা অনেকেই বিশ্বাস করেননি। সংগঠন কংগ্রেস, বি এল ডি, জনসঙ্ঘ, সোস্যালিস্ট পার্টি ও সি এফ ডি—এই পাঁচটি দলের বিলোপ সাধনের উপর জনতা পার্টির ভিত্তি। প্রথম চারটি দল ছিল। সি এফ ডি গঠিত হয় এমারজেন্সীর সময় যাঁরা কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বশীল পদে ছিলেন, তাঁদেরই একাংশকে নিয়ে। এই পাঁচটি দল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, জনতা পার্টির নেতাদের পক্ষে এক হওয়া ও একসঙ্গে কাজ করা কি দুরূহ ব্যাপার!

১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হবার আগে শ্রীমোরারজীভাই ও চন্দ্রশেখর—দু'জনেই কংগ্রেসে ছিলেন। সে সময় পার্লামেন্টে চন্দ্রশেখর যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার শতকরা পঁচাত্তরটিই ছিল মোরারজীভাইয়ের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস যখন ভাগ হয়, তখন চন্দ্রশেখর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুরো সমর্থক। এই চন্দ্রশেখর জনতা পার্টির সভাপতি এবং মোরারজীভাই জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তিন বছর আগেও এটা কল্পনা করা অনেকের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সি বি গুপ্ত জনতা পার্টির কোষাধ্যক্ষ, আর চরণ সিং জনতা সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী। সি বি গুপ্ত যখন মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময় সেই সরকারের অবসান ঘটান চরণ সিং। যদিও চরণ সিং সেই সময় সি বি গুপ্ত যে দলভুক্ত, সেই দলেই ছিলেন। ইউ পি-র রাজনীতি যাঁরা করতেন, তাঁরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এই দু'জনের মধ্যে একজন হবেন দলের কোষাধ্যক্ষ, আর একজন হবেন সেই দলেরই সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী। তখনকার দিনে উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় কংগ্রেসী সভা পন্ড করত জনসঙ্ঘ। কাশ্মীর নিয়ে কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত ছিল, জনসঙ্ঘ বরাবর তার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। সেই জনসঙ্ঘের তৎকালীন প্রধান কংগ্রেসের তৎকালীন স্তম্ভ জগজীবন রামের সঙ্গে একই সরকারে যোগদান করবেন, একই দলের নামে, তা ভাবাও শক্ত। আর সোস্যালিস্ট পার্টি তো বরাবরই বামপন্থী দল বলে অভিহিত

হত। অন্যান্য বামপন্থী দলের মত সোস্যালিস্ট পার্টিও তৎকালীন কংগ্রেস পার্টি ও কংগ্রেস নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী বলে অভিহিত করে এসেছে এবং সেসব তাঁরা অতি আন্তরিকভাবেই করতেন। সেই দলের বিশিষ্ট সদস্যরা এখন মোরারজীভাই যে জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী, সেই সরকারের মন্ত্রী। এইসব ব্যাপরই অচিন্তনীয়। কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নানারকম ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও বেশ শক্তভাবে টিকে আছে। বিস্মিত যদি হতে হয়, তবে এটাই তা একটা পরম বিস্ময়ের কারণ যে, এতদিন এ'রা একসঙ্গে আছেন। সেজন্যই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা মতপার্থক্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, সেটাই তো স্বাভাবিক।

অনেকে নানারকম আলোচনা করছেন। কেন্দ্রে যাঁরা সরকার গঠন করেছেন, তাঁদের নীতি, রীতি, কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা কিছুটা রাজনীতির পাঠও নিয়েছেন এবং যাঁরা জনতা পার্টির সমর্থক, তাঁদের চিন্তাধারা দেখে বিস্মিত হতে হয়। জনতা পার্টির সমর্থকদেরও সমালোচনা করার পুরো অধিকার আছে, কিন্তু বিস্মিত হবার কোন অধিকার নেই। জনতা পার্টির গঠন হওয়াই তো পরম বিস্ময়। এই বিস্ময়কর ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন সেই বিস্ময়কে বরাবর টেনে নিয়ে যাওয়ার তো কোন মানে হয় না। যদি সত্যিই বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে ১৯৭০-এর ১৮ জানুয়ারি যখন ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন, তখন ক'জন ভেবেছিলেন যে, জনতা পার্টি গঠিত হতে পারবে? আবার যখন ১৬ থেকে ২০ মার্চ অবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখনই বা ক'জন ভাবতে পেরেছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতের দুইটি রাজ্য ছাড়া উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারত থেকে নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! কল্পনাতীত ঘটনার ফলে জনতা পার্টি জয়ী হয়েছে। তারপর আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? জনতা পার্টির এই জয়ের জন্য নানা জনে নানা মত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নির্যাতনের জন্য, কেউ বলেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই প্রভৃতি লক্ষ লোকের গ্রেপ্তারের ফলে, কেউ বা বলেছেন প্রেসের কণ্ঠরোধ করার জন্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসবই সত্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠেছিল, এটাও একটা বড় ঘটনা। কংগ্রেস প্রথম ভাগ হবার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, সেই সময় থেকেই তাঁকে যাঁরা শক্তি যুগিয়েছিলেন একে একে তাঁদের সরাতে থাকেন। মোহনলাল সুখাড়িয়ার কথাই ধরা যাক। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শক্তিশালী করার জন্য যাঁরা সব রকমে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সুখাড়িয়া তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজস্থানে বেশ কয়েক বছর মন্ত্রিমণ্ডলী স্থায়ী হতে পারেনি। মোহনলাল সুখাড়িয়া মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ষোল বছরের উপর মুখামন্ত্রী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, কংগ্রেস সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির সদস্য—সবই ছিলেন। কংগ্রেসের বেশ একজন বড় নেতা বলে পরিগণিত হন এবং ইন্দিরা গান্ধীর সব কাজের সমর্থক। কংগ্রেস ভাগ হবার তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭০-এ তাঁকে রাজস্থান ছেড়ে রাজ্যপাল হয়ে চলে যেতে হয় কর্ণাটকে। ব্যস। তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, শক্তি তাঁকে রাজস্থানে ধরে রাখতে পারল না। আর একজন ছিলেন ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী। অন্ধ্রের প্রবল প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থক। তাঁকে অন্ধ্র ছাড়তে হয় ১৯৭০-এ। আর একজন ছিলেন শ্রী কে কে শাহ। এককালীন

বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকও ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস মন্ত্রিসভাতেও শ্রী কে কে শাহকে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ভাগ হবার ঠিক দু' বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭০-এ চলে যান তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল হয়ে। ইনিও ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভি পি নায়েক, তিনি ছিলেন ইন্দিরার সমর্থকদের মধ্যে অন্যতম। ঠিক এমারজেন্সীর আগে ১৯৭০-এ তাঁকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থকদের মধ্যে আর একজন প্রধানতম ছিলেন শ্রীহেমবতীনন্দন বহুগুণা। তিনি ছিলেন কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরার মন্ত্রিসভার সদস্য। তাঁকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ১৯৭০-এ। তিনি মহা অপরাধ করেন। ভারতবর্ষের এক বড় শিল্পপতিকে ইউ পি থেকে রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থীরূপে শ্রীমতী ইন্দিরার পরামর্শদাতারা দাঁড় করান। বহুগুণা শ্রীমতী গান্ধীর অনুরোধ সত্ত্বেও এই শিল্পপতির পক্ষে কাজ করতে রাজী হননি। ফলে এই শিল্পপতি হেরে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণারও মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যায়। কংগ্রেস ভাগের সময় মোহন ধারিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। মোহন ধারিয়া চন্দ্রশেখরের একান্ত বন্ধু। অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও মোহন ধারিয়া মন্ত্রিসভায় টিকে ছিলেন। তারপর ১৯৭০-এ তিনিও প্রায় অকারণেই মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত হন এবং এমার্জেন্সী ঘোষিত হবার পরই গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। আর তিনি লোকসভায় নির্বাচন ঘোষিত হবার পরে মুক্তি পান। সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে জগজীবন রামকে নিয়ে। জগজীবন রাম এমার্জেন্সীর মধ্যেও টিকে ছিলেন। ১৯৭০এ যখন শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন, তখনও জগজীবন রাম শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রীসভায় ছিলেন। গোলমাল বাধল লোকসভার প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে। বিহারের কংগ্রেসপ্রার্থীর তালিকা থেকে অধিকাংশ প্রার্থীর নাম বদল করার চেষ্টা হয় এবং সে চেষ্টা হয় শ্রীমতী গান্ধীর দিল্লীর পরামর্শদাতাদের দ্বারা। জগজীবন রাম মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সবচেয়ে কঠিন আঘাত হয় দেবকান্ত বড়ুয়ার উপর। উনি শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে বলেছিলেন, Indira is India আর শ্রীমতী গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্রকে বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই দেবকান্ত বড়ুয়ার নিজের রাজ্য গৌহাটিতে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হয়, তখন দেবকান্ত বড়ুয়া কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু একবারও দেবকান্ত বড়ুয়ার নামে জয়ধ্বনি হয়নি। বারবার জয়ধ্বনি হয় শ্রীমতী গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্রের নামে এবং এক-আধবার শ্রীমতী গান্ধীর নামে। কংগ্রেস সভাপতির নাম সেদিন উচ্চারিতও হয়নি। এই সমস্ত ঘটনা এবং তার সঙ্গে আরও অনেক ঘটনা যদি একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে দেখা যাবে কংগ্রেস বাইরে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একদম ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। একটা হতাশা এবং নৈরাশ্যের ভাব কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের আচ্ছন্ন করেছিল। নন্দিনী শতপথী, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—এঁদের অবস্থা অনুরূপ হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় শ্রীমতী গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র যখন প্রথম আসেন তখন তাঁকে যে রাজকীয় সংবর্ধনা জানানো হয়, তার প্রধান হোতা যিনি ছিলেন তিনিও পরে পরিত্যক্ত হন। বোম্বাই-এর কম্যুনিস্ট পার্টির একজন প্রধানতম নেতা রজনী প্যাটেল রাতারাতি বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আবার ঠিক সেইভাবেই সরে

যেতে তিনি বাধ্য হন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তা বেশ রহস্যজনক। শ্যামাচরণ শুক্ল মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাই বিদ্যাচরণ শুক্ল শ্রীমতী ইন্দিরার একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং কেন্দ্রের ইন্‌ফর্মেশন অ্যান্ড ব্রড-কাস্টিং-এর মন্ত্রী। তা সত্ত্বেও কিন্তু শ্যামাচরণকে যেতে হল, কারণ তাঁর চেয়েও বিশ্বাসভাজন লোককে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে হলো। আমি কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলুম। এইভাবে সব রাজ্যেই কংগ্রেস পরিষদ দলের বাহ্যত অস্তিত্ব থাকলেও তারা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ আই সি সি এবং ওয়ার্কিং কমিটিরও আর কোন মর্যাদা ছিল না। এইভাবেই সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের প্রায় অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল, যদিও কাগজে-কলমে সবই ছিল। কংগ্রেসের দু'টি বিভাগেরই পার্লামেন্টারি এবং অরগ্যানাইজেশন-এর সব দায়িত্ব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে এসে গিয়েছিল। এতে খালি শ্রীমতী গান্ধীকে দোষ দিলে হবে না—কংগ্রেসের প্রায় সব বড় বড় নেতাই শ্রীমতী গান্ধীর একক নেতৃত্ব মাথা নীচু করে মেনে নিয়েছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সেই-জন্যই এমার্জেন্সীর পর যখন লোকসভার নির্বাচন এল, সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল-মাত্র কর্ণাটক ও অন্ধ্র ছাড়া কোথাও কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। নির্বাচনের এরকম ফলাফল কেবলমাত্র জনতা হাওয়ার জন্য হয়নি। কংগ্রেসের সব বিভাগ ধ্বংস হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু কাঠামো। কঙ্কাল নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু নির্বাচন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া যায় না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ফলেছে। এইভাবেই জনতা দল ভারতবর্ষের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সবল, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে প্রবেশ করেছে। তার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে, কেবলমাত্র তার দলের প্রধানদের আচরণের উপর নয়; তার সমর্থকদেরও ব্যবহারের ওপর।

এমার্জেন্সী সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গেছে। আবার তার উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই। তবে এমার্জেন্সী সম্বন্ধে যে কথা রটেছে যে, ঐ সময় সরকারী প্রশাসনযন্ত্র খুব কর্মতৎপর ও সচল হয়েছিল, এটা ভুয়ো কথা। নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মাত্র দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। কলকাতা থেকে মধুপুর যাচ্ছিলাম। একটি ফার্স্ট ক্লাস কুপে রিজার্ভ করা ছিল। হাওড়ায় যখন ট্রেন ছাড়ল, দেখা গেল অতিরিক্ত চারটি বার্থের রিজার্ভেশন টিকিট দেওয়া হয়েছে। সেই চারজন যাতা-য়াতের পথে বিছানা করে শুলেন। ব্যান্ডেল স্টেশনে দেখা গেল আরও তেরোজন অতিরিক্ত রিজার্ভেশনের টিকিট নিয়ে উঠলেন। ব্যস্। যাতায়াতের পথ একে-বারেই বন্ধ। মধুপুর থেকে বেনারস যাচ্ছি। সেও ফার্স্ট ক্লাস কুপে। যশিডি ছাড়-বার পরই মোগলসরায়ের আগে অবধি বড় বড় দাঁতনের বোঝা নিয়ে বিনা টিকিটে লোক উঠতে লাগল। তাতেও যাতায়াতের পথ বন্ধ। আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি। কিন্তু মনে হয়, দেবার প্রয়োজন নেই। প্রেস সেন্সরের ব্যবস্থা আরও ভাল। মালদহ থেকে একজন সংবাদদাতা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, অনাবৃষ্টির জন্য আম ভাল হয়নি। সেন্সর এ খবরটা ছাপতে দেননি। সেন্সর অফিসারদের ধারণা ছিল এমার্জেন্সীর সময় অনাবৃষ্টি হয়েছিল, এ কথাও লেখা উচিত নয়। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্র সেন আটবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু আট-বারই তাঁকে বাড়িতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হয়েছিল, তিনি যখন আরামবাগের মায়াপুরে সত্যাগ্রহ করেন। আড়াই শ' পুলিসের ছাউনি পড়েছিল, আর জেলার সমস্ত পদস্থ কর্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন. কত হাজার টাকা খরচ হয়েছিল, তা আমার জানা নেই; তবে বেশ কয়েক হাজার যে

হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেখান থেকে প্রফুল্লবাবুকে এনে তাঁর কলকাতার বাসস্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়। গৌরের (শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ) ব্যাপার আরও অভিনব। এক বছর জেলে থাকার পর সে খালাস হয়। খালাস হবার দেড় মাস পর তার বাড়িতে পুলিস অফিসাররা এসে তাঁকে একটি কাগজে সই করে দিতে বলেন, কাগজটিতে লেখা ছিল যে, গৌর Parole চেয়েছে। গৌর সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে জানায় যে, সে কোনদিন Parole-এর দরখাস্ত করেনি এবং সে সই করবে না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরও যখন গৌর রাজী হয় না, তখন পুলিস অফিসারটি চলে যান। আবার দেড় মাস বাদে এসে পুলিস অফিসার অনুরূপ অনুরোধ জানান। গৌর আবার অস্বীকার করে। এমার্জেন্সীর কোন ধারা মতে যে পুলিস এরকম হাস্যকর কাজ করতে পারে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়; কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। সেজন্যই গোড়ার কথায় ফিরে যাচ্ছি। জনতা দল যে জয়ী হয়েছিল, সেটা যেমন দেশব্যাপী একটা প্রকাণ্ড বিক্ষোভের ফল, তার সঙ্গে সঙ্গে জনতা দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস নামক যে প্রতিষ্ঠান, তার আর বাস্তব কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৭০-এর লোকসভা নির্বাচন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই পশ্চাৎপটটি মনে রাখতে হবে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবটা না বিচার করলে বিশ্লেষণ ভুল হবে। জনতা দলের সাফল্যের জন্য যদি কোন একজনের নাম করতে হয়, তা হলে তিনি হলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ; আর কংগ্রেস ধ্বংসের জন্য যদি একজনের নাম করা হয়, তা হলে ভুল করা হবে। কংগ্রেসের ছোট বড় সব নেতা একান্তভাবে শ্রীমতী ইন্দিরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলেই কংগ্রেস ধ্বংস হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও কয়েক হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যের লোক এ খবরে নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খুব সাধুবাদ দেবেন। সত্যিই তো কবির এতদিনের দুঃখ-বেদনার বুঝি অবসান হল—

> 'পর দীপমালা নগরে নগরে
> তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।'

এটা বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতবর্ষ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে ভারতবর্ষ এখন বহু দেশে যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, রেলের ওয়াগন পাঠাচ্ছে। আর প্রযুক্তিবিদ্যা-বিশারদরা তো যাচ্ছেনই। খাদ্যেও আমরা স্বয়ম্ভর। এমন স্বয়ম্ভর যে, রাশিয়া থেকে ধার করা দশ লক্ষ টন গম এ বছর শোধ দেওয়া হচ্ছে এবং আরও পাঁচ লক্ষ টন গম রাশিয়াকে দেওয়া হচ্ছে তেলের পরিবর্তে। আণবিক শক্তিতে আমরা অনেক দূর এগিয়েছে। এ অবস্থায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়া খুব সঙ্গত এবং সমীচীন কাজ।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এই ঘোষণায় এই রাজ্যের অধিবাসীদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগের সরকার অর্থাৎ সিন্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার বলেছিলেন যে, দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া হবে এবং সত্য সত্যই কিছু গ্রামে বিদ্যুতের লাইন বসাবার খুঁটি, কিছু গ্রামে বিদ্যুতের তার এবং কিছু গ্রামে আলোও জ্বলেছিল। অবশ্য দশ হাজারের কাছেও পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তবুও গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেসব জায়গায় বহু দিন বিদ্যুতের লাইন আছে, তারা অকেজো হয়ে পড়ে। অবশ্য সে সরকারের কথা না তোলাই ভাল। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্ট দল মনে করেন যে, অতীতে এবং বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যে ও কেন্দ্রে যেসব সরকার হয়েছে বা আছে, তারা সকলেই অকেজো এবং গণদরদী নয়। ভয় এইখানেই। যদি সত্যি সত্যিই বাম ফ্রন্ট সরকার আরও কিছু গ্রামেও বিদ্যুৎ নিয়ে যান, তা হলে যে-সমস্ত অঞ্চল ছিটেফোঁটা বিদ্যুৎ পাচ্ছে, তারা তা থেকেও বঞ্চিত হবে।

এখন তো কলকাতা এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ আছে সেখানকার অবস্থা অসহনীয়। কথাটি হল 'লোড শেডিং'। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। 'লোড শেডিং'-এর মানে একটাই হয়। যেখানে পূর্ণ লোড বহন করছে, সেখানে তা থেকে কিছু shedd করাকে বলে 'লোড শেডিং'। এখানে কথাটি হল বিদ্যুৎ ঘাটতি। সেটা যন্ত্রপাতির জন্যও হতে পারে, এই বিভাগের অপদার্থতার জন্যও হতে পারে। কিন্তু 'লোড শেডিং' একে কিছুতেই বলা যায় না। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কখনও-সখনও আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি, কখন পাব তা জানি না। সরকারের তরফ থেকে যে ঘোষণা করা হয় যে, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক এলাকায় অমুক অমুক সময়ে বিদ্যুৎ থাকবে না—সে শুধু কথার কথা, তার কোন কার্যকারিতা নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বিধান শিশু উদ্যানের কথা। সকাল থেকে এগারোটা-সাড়ে এগারোটা অবধি বিদ্যুৎ থাকে না। তারপর বিদ্যুৎ আসে, থাকে বেলা দুটো-আড়াইটে অবধি। আবার বিদ্যুৎ আসে চারটে নাগাদ, চলে যায় ঠিক পাঁচটা পনের থেকে পাঁচটা ত্রিশের মধ্যে। অর্থাৎ সন্ধ্যের সময় যখন ছেলে-মেয়েদের বাড়ি যাবার সময় হয়, তখন না থাকে উদ্যানে আলো, আর আশেপাশের রাস্তায় তো থাকেই না। এইসব ছোট ছেলেমেয়েদের কষ্টের কথা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। অভিভাবকরাও খুব সঙ্কটে পড়েন। আর উদ্যান-কর্তৃপক্ষের বিপদের অন্ত নেই। বিদ্যুতের অভাবের জন্য এক দিকে অন্ধকার, অন্য দিকে পানীয় জলের একান্ত অভাব। বাগানের গাছপালায় জল দেওয়া দূরে থাক, হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত ছেলে-মেয়ে খেলাধূলা-ব্যায়ামের পর এক ফোঁটা জলও পায় না। এ ঘটনা প্রাত্যহিক। এখানে বিধান শিশু উদ্যানের কথাই লেখা হল; কিন্তু শহরের বিভিন্ন অঞ্চল এমন কালো অন্ধকারে ঢেকে থাকে, যার মধ্যে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। আর বিদ্যুৎ ঘাটতি ক্রমাগতই বাড়ছে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বেরোয় যে, ডি ভি সি থেকে এত মেগাওয়াট কম এসেছে, ব্যান্ডেল প্রকল্প ঠিক দিতে পারেনি, সাঁওতালডিহি ঠিক কাজ করতে পারছে না, জলঢাকায় গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। দিনের বেলায় এসব পড়া যায়, তখন আলোর দরকার হয় না। কিন্তু এসব পড়লেই তো লোকের কষ্ট লাঘব হয় না। কৈফিয়ত দিলেই কি সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়? তা হলে জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে জনবিদ্বেষী (?) অন্যান্য সরকারের তফাত কোথায়? কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা, উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বস্তি রিহ্যাবিলিটেশন স্কীম অনুযায়ী কয়েক হাজার ফ্ল্যাট আছে। সবগুলিই চারতলা। সরকারী বন্দো-

বস্তুত এইসব ফ্লাটে ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হয়। মাঝে মাঝে নোটিশ পড়ে যে, বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য দু' দিন জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। ব্যস্, এই ঘোষণা করেই সরকারের দায়িত্ব শেষ। তা হলে চারতলা-তেতলার বাসিন্দারা জল নিয়ে যাবেন কেমন করে? আর একতলা-দোতলার কথাই বা বাদ দেওয়া হবে কেন? এ'রাই বা জল পাবেন কোথা থেকে? এইসব ফ্ল্যাটে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবার। এ'দের কষ্টের সীমা নেই। এ'রাও যদি এত কষ্ট পান তা হলে জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে অন্যান্য সরকারের পার্থক্য কোথায়? আর ইলেকট্রিক অধ্যুষিত অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থাও প্রায় অচল। যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ পেশছয়নি, সেসব জায়গার ছেলেমেয়েরা পড়ার জন্য বিদ্যুতের আলোর উপর নির্ভর করে না। কিন্তু বিদ্যুৎ থাকার জন্য অনেক অঞ্চলেই পরিবর্ত ব্যবস্থা নেই। ছেলেরা তো ব্যবস্থা করতেই পারে না, অনেক সময় অভিভাবকরাও সক্ষম হন না। একটা পথে অভ্যস্ত জীবনধারাকে অন্য ব্যবস্থা না করে ওলট-পালট করে দিলে ক্ষতি হতে বাধ্য এবং এই ক্ষতির শিকার হয়েছে ছেলেমেয়েরা এবং তাদের পড়াশুনো। সব অভিভাবকেরও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করবার উপায় নেই। বাতির দাম আকাশছোঁয়া, আর কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। কেরোসিন তেলের দামের কথা বাদ দিচ্ছি, আনবার জন্য যে 'কিউ' দিতে হয় এবং তাতে যে সময় যায়, তাতে অন্য সব কাজ ছেড়ে কিউ-এর জন্যই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যারা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি পরিশ্রম করে কোন-রকমে সংসার চালায়, তাদের পক্ষে কিউ-এ দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সেই গিয়ে দাঁড়াতে হয় নয়-দশ-এগারো-বারো বছরের ছেলেমেয়েদের। লেখাপড়া তো হয়ই না, তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্লানিও অনেক বাড়ে। বিস্ময়ের বিষয়, এই বিদ্যুৎ ঘাটতি রোজই বাড়ছে এবং এ নিয়ে সরকারের মধ্যে যে কোন প্লানিবোধ আছে, তা তাঁদের কথায়বার্তায়, কাজে-কর্মে মনেও হয় না। কোন অভিযোগ করলেই পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকারের মুখপাত্ররা বলেন, 'ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে ভাল।' অথবা বলেন, 'আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে এইসব গলদ পেয়েছি।' কিন্তু এ-কথায় তো দায়িত্ব শেষ হয় না। উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এবং তার জন্যেই এত খারাপ অবস্থা, মন্ত্রিত্বের মসনদে বসে এ কথা বলা যায় সত্য, কিন্তু এর পিছনে কোন যুক্তি নেই। বামফ্রন্ট সরকার তো জেনেশুনেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ঘাড়ে তো জোর করে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। যদি তাঁরা অক্ষম হন, তা হলে তাঁরা দায়িত্ব নিতে গেলেন কেন? পূর্বতন সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারের সময় বিদ্যুৎ ঘাটতি উপলক্ষে অনেক বিরোধী নেতাই বলতেন, ক্ষমতা পেলে আমরা তুড়ি দিয়ে সব ঠিক করে দেব।' পূর্বতন সরকারের সময় যাঁরা এসব বলতেন, তাঁদের হাতেই এখন এই রাজ্যের শাসনব্যবস্থা। তাঁরা হয়তো বুঝছেন যে, তুড়িটা একটা মস্ত বড় তুড়ি, দু' আঙুলে কুলোয় না। ফলে সমস্যা সমাধানের পথে না গিয়ে রোজই জটিলতর হচ্ছে। আর অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কথা জনসাধারণের কাছে নিবেদন করারও একটা ভঙ্গি আছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কর্ণধাররা এ নিয়ে এতটুকু চিন্তিত বা দুঃখিত নন। এমন ভঙ্গিতে তাঁরা ব্যর্থতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন যে, মনে হয় সবটাই বুঝি ধনতন্ত্রে বিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ঘটছে। এ এক অপূর্ব অবস্থা। যে সরকার নিজেরা বুঝে-সুঝে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কোনরকম ত্রুটি-স্বীকার দেখতে পাওয়া না যায়, তা হলে অক্ষমতা ও ব্যর্থতা রোজ বেড়ে যেতে বাধ্য।

বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত সাধারণ দুঃখ-দুর্দশার কথাই আমরা বলে থাকি, কিন্তু এর ফলে ছোট ছোট কলকারখানায় যে বিপর্যয় এসেছে তার বলি হয়েছেন দেশের সেই সম্প্রদায়, যাঁদের সর্বহারা বললে অত্যুক্তি হয় না। ছোটখাট কত কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে, তার খবর ক'জন রাখেন? সরকার নিশ্চয়ই বড় বড় কলকারখানার খবর রাখেন। খবর অন্য কারণেও রাখতে হয়। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের একটা বড় শক্তি হল কলকারখানার শ্রমিক সম্প্রদায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খেটে-খাওয়া যত লোক আছে, তার মধ্যে এই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের সংখ্যা কতটুকু? ছোট ছোট ছাপাখানা ও অন্যান্য ছোট ছোট কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় এই খেটে-খাওয়া লোকদের অধিকাংশেরই তো আজ দুর্দশার সীমা নেই। কলকাতায় ও বিভিন্ন শহরাঞ্চলে সন্ধ্যের পর তরিতরকারি ও মসলাপাতির বিরাট বাজার বসে রাস্তার ধারে। এইসব বাজারে কেনাবেচা অনেক কমে গেছে। অন্ধকারে লোক আসতে পারে না আর যারা আসে, তারাও অন্ধকারে সবজি চিনতে পারে না। পেট্রোম্যাক্স জ্বালাবার ক্ষমতা অধিকাংশেরই নেই, তারা তাই পেট্রোম্যাক্সের বদলে কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে বেচাকেনা করে। এতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়। কলকাতায় দেশী পাড়াগুলোয় অনেক তেলেভাজা ও ভুজাওয়ালার দোকান আছে। সেখানেও জিনিস তৈরি করতেও যেমন অসুবিধে আলোর অভাবে, বেচতেও তেমনই অসুবিধে। কোন রকমে জিনিস যদি বা তৈরি হল, কিন্তু কিনবে কে? আবর্জনা-বোঝাই ও গর্তবহুল এইসব রাস্তায় তো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, দোকানে আসবে কে? যাদের বাধ্য হয়ে আসতে হয়, তাদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এরা এইসব দোকান করেই যা হোক করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছিল। এরা তো সঙ্ঘবদ্ধ নয়, তাই কোন পরিবর্ত ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু এরাও তো পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। এদের ব্যবস্থা কি হবে? আবার যদি অন্য স্তরের কথা ধরা যায়—যারা ইস্কুল-কলেজে পড়ে—তারা হয়তো খেটেখুটে ভালই পড়া তৈরি করেছে, কিন্তু বহু দিনই স্কুল বা কলেজে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হতে পারে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যারা ছাত্রছাত্রী, তাদের লেখাপড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এদের ব্যবস্থা কি হবে?

এরকম বহু অব্যবস্থার কথাই বলা যায়। কিন্তু কোন কথা বললে বা লিখলে বামফ্রন্ট দলের কর্তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ক্রোধ তো তাঁদের সাজে না। তাঁরা তো এখন বিরোধী দলের কর্তা নন! সকলের কথা শোনার মত মনোভাব তাঁদের অর্জন করতে হবে। এটা কেউই বিশ্বাস করে না যে, বামফ্রন্ট সরকার আসার ফলে দু' বছরের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের যাঁরা সমর্থক তাঁরাও এই দলের নেতাদের যে মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, তা দেখতে চান। কেউ কোন সমালোচনা করলেই এঁরা ষড়যন্ত্র দেখেন। যাঁরা আইনসভায় ঐরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তাঁদের এত ষড়যন্ত্রভীতি কেন? সমস্ত অভিযোগই তাঁরা নস্যাৎ করে দেন। তা হলে কি মনে করতে হবে বামফ্রন্ট সরকার ত্রুটিহীন? তা কি সম্ভব? কোন সরকারী যন্ত্র, তা সে যত দক্ষ লোকের হাতেই থাক, তা সব বিষয়েই ত্রুটিহীন হতে পারে না। কিন্তু যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁদের মনোভাব অনেক সময় অচল যন্ত্রকেও সচল করে তুলতে পারে। এবং সমালোচককেও সমর্থক করে তুলতে পারে। বামফ্রন্ট দলকে এ কথা মনে রাখতেই হবে যে, স্বাধীন দেশে কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। সরকারী যন্ত্রের নানারূপ প্রয়োগে সমালোচনা হয় তো সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য স্তব্ধ করা যায় না। আর সত্যই যারা সমর্থক, তাদের সমালোচনার অধিকার

দিতেই হবে। গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বুর্জোয়া, বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র—এসবের যে তত্ত্বকথা, তার বাইরে একটা সত্য আছে। যার নাম দায়িত্বপালন। দায়িত্বপালনে ব্যর্থতা শত কৈফিয়তেও ঢাকা দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যারা দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁরা সর্বপ্রকার প্রযত্নে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছেন, অপরের উপর দোষ না দিয়ে, তা হলে অনেক সময় দায়িত্ব পালনের অক্ষমতাও ক্ষমার্হ হয়। মনে রাখতে হবে যে, বামফ্রন্ট দল নিজেরা দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেছেন। শত কৈফিয়ত, চিৎকার, হট্টগোল ও চোখরাঙানির দ্বারা এ সত্যকে ঢাকা দেওয়া যাবে না। পথ বামফ্রন্ট সরকারকেই খুঁজে বার করতে হবে। পথ সুগম না হতে পারে, কঠিন হতে পারে; কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই আছে। জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাবারও তাঁদের অধিকার আছে। কিন্তু সে সমর্থন অপরের উপর দোষারোপ করে কখনও পাওয়া যাবে না।

১লা এপ্রিল ১৯৭০ থেকে বিহার রাজ্যে মদ্যপান ও মদ্য তৈয়ারী বন্ধ হয়েছে। এর আগে থেকেই তামিলনাড়ুতে (মাদ্রাজ) নিষিদ্ধ আছে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে বিহার সরকার ভাল কাজই করেছেন। মদ্যপান যে কতদিক দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করে তা লেখাও যায় না। মদ্যপানের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, সে বিষয়ে সবিস্তারে বলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফলে বহু সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সে সব সমস্যাও গুরুতর। অনেক সমস্যাই এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে যাঁরা মদ্যপানের বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ করেন, তাঁদেরও মাঝে মাঝে ভাবতে হয়। আমেরিকায় প্রোহিবিশন চালু করবার পর বহু 'বুট-লেগার'-এর সৃষ্টিও হয়। 'বুট-লেগার'-এর অর্থ হল যারা বেআইনীভাবে মদ্য আমদানী করে সাধারণের কাছে দিত। এক-একজন 'বুট-লেগার' লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করত, এমন কি কেউ কেউ কোটিপতিও হয়েছে। চারদিকে এমন মদের ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়ে যায় যে, আমেরিকা বাধ্য হয়ে প্রোহিবিশন তুলে নেয়। আমাদের যখন বম্বে রাজ্য ছিল, সেখানেও প্রোহিবিশন চালু হয়েছিল। পরে তাতেও অনেক ছাড় দিতে হয়।

৬০ দশকে গোয়াতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় মোরারজীভাই প্রোহি-বিশন-এর প্রস্তাব নিয়ে আসেন এবং আমি তা সমর্থন করি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হলেও ঠিক এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করতে পারেনি। প্রোহি-বিশন স্বাধীনতার আগেও কংগ্রেসের একটি বিশেষ কার্যক্রম ছিল। ১৯৩০-এ যেমন লবণ সত্যাগ্রহ করে লবণ আইন অমান্য করা হয়, তেমনি মদের দোকানেও পিকেটিং করা হত। আমেরিকার পুশিফুট জনসন মশাই প্রোহিবিশন-কে খুব সমর্থন করতেন। তিনি এই নিয়ে অনেক দেশও ঘুরেছেন এবং প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে জ্ঞানদাকে (জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী) তিনি উৎসাহিত করেন। ১৯২৫-২৬ সালে দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়। জ্ঞানদা এই সমিতির প্রধান প্রচারক ছিলেন। তিনি ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে বক্তৃতা দিয়ে সাধারণকে মদ্যপান থেকে বিরত করবার চেষ্টা করতেন। জ্ঞানদার অনেক সহকর্মীও তাঁর সঙ্গে এই কাজে যুক্ত ছিলেন। তখন কংগ্রেসের একটা বড় কার্যক্রম ছিল প্রোহিবিশন। এ বিষয়ে সেই সে যুগেই গান্ধীজী প্রধান প্রচারকরূপে কাজ করেন। গান্ধীজী এ সম্বন্ধে আইনের সাহায্য নেবার সুবিধা থাকলে কর্মীদের তার সাহায্যও নিতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

"এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের মতই ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে যতটা আগ্রহ দেখানো উচিত কংগ্রেসীরা তাহা দেখান নাই। যদি অহিংসার পথেই আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে হয়, তবে এই সহস্র সহস্র নরনারী যাহারা মদ্যপানাদি ও অহিফেনাদি নেশার কবলে পড়িয়া আছে, তাহাদের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ গভর্নমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না।

"এই অন্যায় দূর করার কার্যে চিকিৎসকেরা বড় অংশ লইতে পারেন। মদ ও আফিম ইত্যাদি নেশার কবল হইতে লোককে উদ্ধার করার পথ তাঁহাদিগকে বাহির করিতে হইবে।

"এই কার্যকে অগ্রসর করাইয়া দিতে নারীসমাজ ও ছাত্র সমাজের বিশেষ সুযোগ আছে। তাঁহারা প্রেমপূর্ণ সেবা দ্বারা যাহারা নেশার কবলে পড়িয়াছে তাহাদিগকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন যাহাতে মদ্যপায়ীরা নেশা ছাড়িতে বাধ্য হয়।"

"কংগ্রেস কমিটিসমূহ বিশ্রামাগার খুলিতে পারেন, যেখানে ক্লান্ত শ্রমজীবীরা হাত-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিতে পারে এবং সস্তা ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলযোগ পাইতে পারে ও উপযুক্ত খেলাধূলা করিতে পারে। অহিংসার দৃষ্টিতে স্বরাজের দিকে লক্ষ করা একটা নূতন জিনিস। ইহাতে পুরানো মূল্যবোধ বদলাইয়া গিয়া নূতন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। হিংসার পথে এই ধরনের সংস্কারের কোন স্থান নাই। যাঁহারা হিংসা-লভ্য স্বরাজে বিশ্বাসী, তাঁহারা তাঁহাদের অধীরতায় বা অজ্ঞতায় আখেরের দিন পর্যন্ত এই ধরনের সংস্কার ফেলিয়া রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান যে, স্থায়ী ও স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তির ভিতর হইতে আত্মশুদ্ধি দ্বারাই লভ্য।

"গঠনমূলক কর্মীরা আইন দ্বারা মাদকতা তুলিয়া দিবার পথ যদি বা পরিষ্কার করিতে না পারেন, তবে অন্তত আইনের প্রবর্তন সহজ ও কার্যকরী করিতে পারেন।"

গান্ধীজী আইনের সাহায্য নিতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রোহিবিশনকে সর্বপ্রথম কংগ্রেস প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা সাধারণের কাছে যখনই কোন বক্তৃতা দিতেন, তখনই প্রোহিবিশন-এর কথা বলা হত। যেমন পরাধীনতা দূর করার জন্য সক্রিয় আহ্বান করা হত, ঠিক সেইভাবেই খাদি প্রচলন, মাদকতা বর্জন ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের সম্বন্ধে নিরন্তর প্রচার করা হত। স্বাধীনতার পর ৪/৫ বছর এই প্রচার অব্যাহত ছিল। যেখানেই কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা জনসভা করতেন, সেখানেই মাদকতা বর্জনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করা হত। আমার যত দূর মনে হয় ১৯৫২-৫৩ সালের পর মাদকতা বর্জন নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আর বিশেষ প্রচার করা হয়নি। অবশ্য কংগ্রেসের বা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বরাবরই মাদকতা বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রচার করলেই ত' লোকের কাছে পৌঁছন যায় না। স্বাধীনতার আগের যুগে যা হত এখন আর সেইভাবে হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, পথে-প্রান্তরে প্রচার হয় না। এখন এ ব্যাপারে আমরা সরকারের উপর বেশী নির্ভর করি। আমার মত, কেবলমাত্র সরকারের প্রচেষ্টায় মাদক বর্জন নীতি কোথাও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। যেমন আইনের সাহায্য

নিতে হবে সেই রকম নিরন্তর বেসরকারী প্রচারের সাহায্যে এটা সাফল্য-মণ্ডিত হতে পারে। তাছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে। আমাদের ছেলেবেলায় যখন বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যেত, তখন যারা তাড়ি খেত, তাদের ম্যালেরিয়া হত না। অনেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ম্যালেরিয়াকে 'হাঙ্গার ডিজিজ' বলতেন। গ্রামাঞ্চলে যারা তাড়ি খেত তাদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল অন্য অনেকের চেয়ে। আমি ঠিক তাড়ি খাওয়ার প্রশংসা করছি না বা তাড়ি খাওয়ার উপকারিতার কথা বলছি না। এটা সত্য যে ভারতবর্ষের এখনও অনেক অনেক লোক পেট ভরে যথোচিত খাদ্য খেতে পায় না। সেইখানে যদি তাদের কোন পরিবর্ত খাদ্য থাকে এবং যেটা স্বাস্থ্যহানিকর নয়, তাহলে সেই পরিবর্ত খাদ্য থেকে নীতির দোহাই দিয়ে, তাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। একথা প্রায়ই আজকাল শোনা যায় যে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছি। এ কথাটির পুরো মানে যদি করতে হয় তাহলে ধরে নিতে হয়, সব লোকই দু' বেলা পেট ভরে খাদ্য পাবে—যাকে বলে 'টু স্কোয়ার মিলস এ ডে'। বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই এখনও দু'বেলা যথোচিত খাদ্য খেয়ে পেট ভরাতে পারে না। আমরা রাশিয়ার থেকে ঋণ নেওয়া ১১ লক্ষ টন গম শোধ করেছি। ৫ লক্ষ টন গম দিয়ে তেল নিয়ে আসছি। এগুলো সত্য হতে পারে, কিন্তু একেই তো স্বয়ম্ভর হওয়া বলা চলে না। অর্থনীতির প্রশ্ন উঠতে পারে। যদি বাইরে না পাঠান হয়, তাহলে কি এই সব খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা হবে? এটা মামুলী কথা—এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা এখনও অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাদের যা আয়, তাতে কোনরকমে টিকে থাকা যায়। দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া যায় না এবং সেইজন্যই ক্রয়-ক্ষমতা নেই। দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান যদি এমন হয় যে তাদের দু'বেলা পেট-ভরে খাবার সংগতি নেই, তাহলে সে দেশকে কি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে? যতদিন না দারিদ্র্য-সীমার নীচে যাদের আয়, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে, ততদিন এই সব খাদ্যশস্য, 'কার্যের পরিবর্তে খাদ্য' পরিকল্পনায় তাদের কাছে পেঁৗছে দিতে হবে। যতদিন না এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, ততদিন যারা ভাত রেঁধে ভিজিয়ে রেখে, পরের দিন পচাই খায়, এবং সেই পচাই খেয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে, তাদের কি করে সেই পচাই খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে? নীতির দিক থেকে হয়ত সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সে কাজ করলে সেটা হবে নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতা।

ভারতবর্ষের অনেক ছেলেমেয়ে এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। সেখানে দেখে যে কলেজের ভাল ভাল ছেলেরা সমাজে মদ্যপান করে, কলেজ সোশ্যাল-এ মদ্যপান করে, ডিনারে শিক্ষকদের সঙ্গে একসঙ্গে মদ্যপান করে এবং বাবা-মায়ের সঙ্গেও এক সঙ্গে মদ্যপান করে। তার মধ্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, বড় বড় সাহিত্যিক আছেন, বড় বড় শিল্পী আছেন। সেই সব জায়গায় ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা এই সব কলেজ সোশ্যাল-এ যায়, নিজেদের 'আইসোলেটেড' মনে করে। এখানে আদর্শের কথা শুনিয়ে তাদের হয়তো ওখান-কার সামাজিক জীবনের ঐদিকটা সম্বন্ধে বঞ্চিত রাখা যাবে, কিন্তু মনের মধ্যে তাদের যে সংগ্রাম হয়, তাতে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়। কথা উঠতে পারে, ভারত-বর্ষের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐসব ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বল যোগাবে। গোলমাল অবশ্য সেখানেও আছে। অশোকের রাজত্বকালে বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ও ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সুরাপান প্রচলিত

ছিল—এর অনেক প্রমাণ আছে এবং অতিথিদের আপ্যায়নও করা হত নানাবিধ সুরাপাত্র সামনে এগিয়ে দিয়ে। তাহলেও বর্তমানে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী যাঁরা বিদেশে আছেন, তাঁদের নিষ্ঠা সহকারে মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে। কারণ ভারতীয় সমাজে মদ্যপানের এখন চলন নেই। অবশ্য চলন নেই বললে ভুল বলা হবে, প্রকাশ্যভাবে চলন নেই, বলাই ঠিক হবে। আর সামাজিক ব্যবস্থার কথা যদি উল্লেখ করা হয়, সমাজে আর যেসব ব্যাধি ও কলঙ্ক আছে, সেই সব ব্যাধি ও কলঙ্ক বজায় রেখে কেবলমাত্র মদ্যপান বর্জনেই কি সমাজের কল্যাণ হবে? একজন মদ্যপায়ী পণপ্রথার বিরোধী, আর একজন মদ্যপান বর্জনকারী পণপ্রথার পক্ষে—এ দু'য়ে পার্থক্য কোথায়? একজন মদ্যপান বিরোধী দরিদ্রকে 'চোটা' সুদে টাকা ধার দেন, আর একজন মদ্যপায়ী দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করার সংগ্রামে তার সহযোগী হন। আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা কোন ব্যক্তিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করবে? এই জন্যই মদ্যপান বর্জন নীতি কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ যদি মদ্যবর্জন নীতিকে সমর্থন করে এবং অবিরাম এ সম্বন্ধে প্রচার চালায়, তবেই সরকারের প্রোহিবিশন নীতি সফল হতে পারে। জনতা সরকার প্রোহিবিশন নীতি গ্রহণ করেছে। ঠিক। কিন্তু যেসব বড় বড় জনসভায় জনতা নেতা ও কর্মীরা ভাষণ দেন, সেখানে তো প্রোহিবিশন-এর কথা শোনা যায় না। সেইজন্যেই মনে হয়, কেবলমাত্র সরকারী আইন দ্বারা ও সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সরকারের প্রোহিবিশন নীতি সফল হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে মদ্যপান অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কারোর মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু অনেকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় এ কাজ সফল হবে না। বিহারে ১লা এপ্রিল থেকে মাদকতা বর্জন নীতি চালু হয়েছে। কিন্তু যে জনতা সরকার এই নীতি চালু করেছেন, তাঁদের প্রতি লোকের কি সেইরকম বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে যে তাঁদের কথায় বা আইনের প্রকোপের জন্য মাদকতা বর্জন নীতি গ্রহণ করবে? যাঁরা এই নীতি চালু করতে যাচ্ছেন, তাঁরা একটি সামাজিক ব্যাধি থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যই এ নীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জনতা দলের মন্ত্রীদের ও এম এল এ-দের মধ্যে এত খেয়োখেয়ি ও রেষারেষি, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। গান্ধীজী যখন বলতেন, তার একটা মানে হত। লোকে পারুক বা না পারুক, তারা বিশ্বাস করত যে গান্ধীজী তাদের ভালোর জন্যই বলছেন। আজ ক'জন জনসাধারণের কাছে সেইরকম বিশ্বাসের পাত্র? বিধায়ক দলের ক'জনকে জনসাধারণ শ্রদ্ধা করে যে তাঁরা যে মদ্য বর্জন নীতি গ্রহণ করেছেন, তার সার্থকতা সম্বন্ধে জনসাধারণের ক'জন গভীরভাবে চিন্তা করবে? মাদকতা বর্জন বিষয়ে দু'টি দিক আছে। এক, আর্থিক, শারীরিক প্রভৃতি, আর একটি নৈতিক। সেইজন্যই কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় এ সফল হওয়া সম্ভব হবে, একথা অনেকেই মনে করেন না।

১৮৮৫ সালে যদিও কংগ্রেসের জন্ম, কিন্তু কংগ্রেস বাস্তবিক পক্ষে জন-সাধারণের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে। তারপর কংগ্রেস থেকে ভেঙ্গে অনেক দল সৃষ্টি হয়েছে, অনেক বড় বড় কম্যুনিস্ট নেতা—তাঁরাও এককালে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন শ্রীগোপালন, বঙ্কিম মুখার্জী। কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস ছাড়েন বোধ হয় ত্রিশ দশকের শেষার্ধে। ওঁরা কংগ্রেস ছাড়বার আগে মাঝে মাঝে খুবেই বিপত্তি হত। যেসব জায়গায় কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস পার্টির কর্ণধার ছিলেন, সেইসব জায়গায় কংগ্রেসের নামে জনসভা ডাকা হলেও সেখানে তোলা হত কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকা--কংগ্রেসের নয়। এইসব নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিস্ট ছিলেন, তাঁদের সংঘাত হত। পরে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

মনে হচ্ছে ১৯৩৪-৩৫ সালে কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট পার্টির (সি এস পি) জন্ম হয়। আমার যত দূর মনে হচ্ছে নাসিক জেলে এর সূচনা হয়েছিল। সি এস পি-র পুরোধা ছিলেন সর্বজনমান্য আচার্য নরেন্দ্র দেব। এরকম নিরহঙ্কার, নিরভিমান, অথচ আদর্শে ও বিশ্বাসে অবিচল আস্থাশীল মানুষ খুব কম দেখা যায়। তখনকার দিনে নরেন্দ্র দেবের পরই যাঁদের নাম শোনা যেত—ইউসুফ মেহের আলি, জয়-প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মাসানী, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া, রাওসাহেব পটবর্ধন ও অচ্যুত পটবর্ধন। বিচিত্র সমন্বয়। জয়প্রকাশ ছিলেন মার্কসিস্ট। হাজারীবাগের মত দুর্গম জেল--সেখানকার পাঁচিল টপকে পালিয়ে এসেছিলেন। মনে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল এবং জওহরলালের স্নেহপাত্র ছিলেন। কালে হয়ে উঠলেন সর্বোদয় নেতা ও গান্ধীবাদী। ১৯৪২-এর আন্দোলনের প্রারম্ভে কোথাও কোথাও সশস্ত্র বিপ্লব করা যায় কিনা, তার চেষ্টা করেছিলেন। কালক্রমে একে-বারেই পরিবর্তিত মানুষ হন। নাগাদের সঙ্গে আপস-আলোচনায় যখন অনেকে সন্দিহান হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, জয়প্রকাশ তখনও নিরাশ হননি। শেখ আবদুল্লা যখন পাকিস্তানে গুডউইল মিশনে যাবেন, জয়প্রকাশ তাঁর প্রধান সমর্থক। যে লোক এককালে নিজে জেল থেকে পালিয়েছিলেন, তিনিই চম্বলের দুরন্ত দস্যুদের প্রীতি ও ভালবাসায় মুগ্ধ করে দস্যুগিরি থেকে নিবৃত্ত করেন। আবার 'ভূদান যজ্ঞে' বিনোবা ভাবের সঙ্গী। ১৯৭০-৭১-এর পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে যখন দেশবাসী উদ্বিগ্ন, তখন তাদের মুখে ভাষা দিলেন জয়প্রকাশ। বিহার থেকে গুজরাট, তারপর আসমুদ্র হিমাচল। রোগদীর্ণ ক্লিষ্ট শরীর, কিন্তু অদম্য মনোবল। ভারতবর্ষে একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। যে দল ক'টি একত্রিত হয়ে জনতা দলে পরিণত হল, তারা দীর্ঘকাল পরস্পরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এসেছে—না ছিল মতের মিল, না ছিল আদর্শের মিল। এঁদের মধ্যে জয়প্রকাশের চেয়ে বয়স্ক নেতাও অনেক ছিলেন, তবু জয়প্রকাশ অসম্ভবকে

সম্ভব করলেন। পাঁচটি দল একত্রিত হল। এই পাঁচটি দল একত্রিত হওয়ার ফলেই কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব হল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায় এবং এ অধ্যায়ের নায়ক হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির আর এক স্তম্ভ ছিলেন ইউসুফ মেহের আলি। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় আলাপ হয়। আগা খাঁর খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে ছিলেন আগা খাঁর খুব বিরুদ্ধবাদী। এরকম বিনয়নম্র, ভদ্র রাজনীতিক খুব বেশী দেখা যায় না। যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হত, তাকে একেবারে আপন করে নিতেন। বোম্বাইয়ে একটা প্রথা ছিল যে, কর্পোরেশনের মেয়র-পদের জন্যে প্রতি বছর এক-এক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হত। মেহের আলি অত্যন্ত তরুণ বয়সে পর পর তিনবার বোম্বাইয়ের মেয়র হন। অবশ্য বিঠল-ভাই প্যাটেল এবং এস কে পাতিলের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়েছিল, কিন্তু এত অল্প বয়সে কেউ হতে পারেননি। নম্র স্বভাব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। অল্প বয়সে তাঁর দেহাবসান ঘটে এবং আমি মনে করি তাঁর অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মিনু মাসানীও খুব খ্যাতনামা ব্যক্তি। অনেক অনেক বছর আগে মিনু মাসানীর একটি বই প্রকাশিত হয়—'আওয়ার ইণ্ডিয়া'। বইটি ছাত্রমহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। বইটির মধ্যে অল্প কথায় ভারতবর্ষকে জানবার ও বোঝবার অনেক তথ্য দেওয়া ছিল। রাজাজী যখন স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন, মিনু মাসানী তখন স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দেন এবং পরে তার চেয়ারম্যান হন।

রামমনোহর লোহিয়া ছিলেন আর একটি স্তম্ভ। ওঁর বাবার কলকাতাতে ছোটখাট ব্যবসা ছিল এবং তিনি কলকাতাতেই বাস করতেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে পুরোপুরি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরিচয় যথেষ্ট ছিল। রামমনোহরের মন ছিল অশান্ত। সব সময় একটা পরিবর্তন থেকে আর একটা পরিবর্তনে যেতে চাইতেন। এককালে জওহরলালের খুব স্নেহভাজন ও কাছের মানুষ ছিলেন। কালে সি এস পি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর এস পি এবং এস এস পি দল হয়। এই ভাঙ্গা-গড়ায় রামমোনোহরের যথেষ্ট হাত ছিল। রামমনোহরের ছিল অদম্য সাহস ও অদ্ভুত খাটবার ক্ষমতা। আবার যেখানেই মনে করতেন যে, আদর্শের সঙ্গে সংঘাত হবে, সেখানে একেবারে অচল, অটল—আপসের কোন স্থান নেই। রামমনোহরের সঙ্গে অনেকেরই হয়তো মতের মিল হয়নি; কিন্তু তাঁর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহার অনেকেরই কাছে তাঁকে প্রিয় করে তুলেছিল।

আর একজন হলেন অশোক মেটা। সি এস পি যখন কংগ্রেস ছাড়ে, উনিও ছাড়েন। তারপর কংগ্রেসের বাইরে থেকেই প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন ও পরে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। সংগঠন কংগ্রেস যখন নিজে-দের অস্তিত্ব লোপ করে অন্য চারটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং জনতা দল যখন গঠিত হয়, সেই সময় অশোক ছিলেন সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি। পড়াশুনায় পণ্ডিত বলা চলে, অথচ পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নেই। যে-কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠা সহকারে তা পালন করবার চেষ্টাও করেন। চরিত্রমাধুর্যে অশোক অনেককে আকৃষ্ট করেছেন। কোন দায়িত্বশীল কাজ নিতে পেছ-পা নন এবং আমার মনে হয় কোন দিনই কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত হননি।

রাওসাহেব পটবর্ধনকে চিনতুম, কিন্তু বিশেষ জানাশুনা ছিল না। স্বভাবটি

ছিল অত্যন্ত মধুর এবং একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন। ভাই অচ্যুত পটবর্ধন। অনেক দিন বাদে আবার কলকাতায় দেখা হল। বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি এত বয়সেও। পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিচ্ছন্ন চেহারা, পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা, প্রায় আমার সমবয়সী। একসময় রাজনীতিক্ষেত্রে খুবই সুপরিচিত। তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্যদের প্রায় ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গত দশ-বার বছর বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নিয়ে আছেন। অ্যানি বেসান্টের এককালীন মানসপুত্র কৃষ্ণমূর্তির বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই কৃষ্ণমূর্তি সম্বন্ধেও আজকের ভারতবর্ষের অনেকের জানা নেই। ওঁকে ওঁর একান্ত বাল্যকালে, বোধ হয় ন-দশ বছর বয়সে, অ্যানি বেসান্ট নিজের কাজে গ্রহণ করেন। বিলেতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যান, তারপর আমেরিকায় যান। থিয়োজফি সোসাইটির পক্ষ থেকে অ্যানি বেসান্ট চারিদিকে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষে এক নূতন Messiah-র উদ্ভব হয়েছে। একটু বয়স বাড়তেই কৃষ্ণমূর্তি Messiah হতে আপত্তি করেন এবং থিয়োজফি সোসাইটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আমার মনে হচ্ছে ওঁর প্রধান কেন্দ্র এখন আমেরিকায়। তবে পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশেও ওঁর কেন্দ্র আছে। ভারতবর্ষে ওঁদের কতগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে—তার সবগুলির সঙ্গেই অচ্যুত পটবর্ধন যুক্ত। এখনও কিন্তু ওঁরা যাকে সোস্যালিজম বলে মনে করেন, সে সম্বন্ধে একটুও ভাবান্তর হয়নি। যাঁদের সঙ্গে মতপার্থক্য আছে, তাঁরাও যখন আলোচনা করেন, প্রীতিমুগ্ধ না হয়ে পারেন না।

নাসিক কংগ্রেসের সময়, বোধ হয় ১৯৫০, সৃষ্টি হল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি (কে এম পি পি)। সৃষ্টি করলেন আচার্য কৃপালনী, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, শ্রীসাদিক আলি প্রভৃতি। কে এম পি পি দলের অনেকেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে ছিলেন, পরে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। আচার্য কৃপালনী, যিনি চোদ্দ বছর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং পরে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন, তখন সকলেরই মনে হয়েছিল কংগ্রেসরূপ মহীরুহের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ল। লক্ষ্য করবার বিষয়, যেসব কম্যুনিস্ট কংগ্রেসে ছিলেন, পরে কম্যুনিস্ট হন এবং কংগ্রেস ছাড়েন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ কেউ কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সি এস পি সম্পর্কে সেই কথা বলা চলে। এঁরা ওয়ার্কিং কমিটির কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। আচার্য কৃপালনী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সুচেতা কৃপালনী, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাদিক আলি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না, অর্থাৎ কে এম পি পি সম্বন্ধে। কংগ্রেসে গান্ধীযুগ প্রবর্তনের পর বল্লভভাই, জওহরলাল, রাজেন্দ্রবাবু, মৌলানা, রাজাগোপালাচারী, আব্দুল গফুর খাঁ প্রভৃতির পরই যাঁদের নাম আসে, আচার্য কৃপালনী তাঁদের অগ্রগণ্য। মজফরপুরে এক কলেজে পড়াতেন। তারপর বেনারসে। গান্ধীজীর প্রভাব স্পর্শ করে। ব্যস। তখন থেকেই রাজনীতি ও গঠনমূলক কর্ম। ইউ পি-র বৃহত্তম এবং ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম খাদি প্রতিষ্ঠানটি আচার্য কৃপালনীর সৃষ্টি—'শ্রী গান্ধী আশ্রম'। লেখাপড়াতেও ধুরন্ধর। যেমন বক্তৃতার ভাষা, তেমনি তকতকে ঝকঝকে লেখা। যে ক'খানি বই লিখেছেন ও যেসব প্যামফ্লেট বেরিয়েছে, তা যেমন ভাষায় সমৃদ্ধ, সেইরকম সুখপাঠ্য। ১৯২০-২১-এর আন্দোলনের পর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যতগুলি স্বাধীনতা-আন্দোলন

হয়েছে, উনি তখন সাধারণ সম্পাদক। কংগ্রেস গঠনে ও তাকে শক্তিশালী করায় ও'র দান অন্য কারো চেয়ে কম নয়। জনতা দল সংগঠনে জয়প্রকাশের পরই ও'র নাম করা চলে। আর তখন আচার্য কৃপালনীর বয়স নব্বই বছর। ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয়। সেদিন কলকাতায় দেখা হল। অনেকটা সময়ই ও'র সঙ্গে ছিলুম। উনি বিধান শিশু উদ্যানেও এসেছিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেক জায়গা দেখেন। চিত্রপ্রদর্শনীটি খুঁটিয়ে দেখেন এবং নানা প্রশ্ন করেন। শারীরিক শক্তি হয়তো একটু কমেছে, কিন্তু মনের দিক থেকে কোন পরিবর্তন দেখলুম না।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এ'র কথা পূর্বেও লিখেছি, আবার লিখছি। অতি দরিদ্র ঘরের ছেলে। তখনকার দিনে অনেকের কাম্য রাজকর্মচারীরূপে উচ্চ পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও অসহযোগের ডাকে অবহেলায় তা ত্যাগ করেছিলেন এবং তারপর থেকে সর্বসময়ের জন্য কংগ্রেসের সব আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেমন কারাবরণ করেছেন, ঠিক সেইভাবেই সব গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত।) দশ বছরের উপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আশেপাশে জড় করেছিলেন বহু কৃতী ছাত্রকে। তাঁর মধ্যে সুভাষচন্দ্র অন্যতম। 'অভয় আশ্রম' স্থাপন করেন। এক দিকে গণ-আন্দোলন ও কারাবরণ এবং অন্য দিকে গঠনমূলক কাজ। কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন প্রবর্তনের পুরোধা। আই এন টি ইউ সি-র অন্যতম সংগঠক ও স্রষ্টা। আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। সুরেশদা-ও সি এস পি-র একজন সদস্য ছিলেন এবং পরে কংগ্রেসে ফিরে আসেন এবং আবার কংগ্রেস ছেড়ে গিয়ে কে এম পি পি সংগঠন করেন।

সাদিক আলি। নিষ্ঠা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ। চোদ্দ বছর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সচিব ছিলেন। পরে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে কে এম পি পি-র সদস্য হন এবং আবার কংগ্রেসে যোগদান করে বহু বছর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

তিনটি দল এবং অনেকগুলি নাম দিলাম। সব কয়টি নামই ঐতিহাসিক। এ'রা কংগ্রেস ছেড়েছেন, কংগ্রেসের বাইরে দল করেছেন এবং আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। কংগ্রেস সাময়িকভাবে শক্তিহীন হয়েছে, আবার শক্তি সংগ্রহ করে এগিয়ে গেছে। কংগ্রেসকে একেবারে অসমর্থ, অশক্ত কেউই করতে পারেনি। সেটা সুচারুভাবে সম্পন্ন করলেন ১৯৬৯ সালে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি রাষ্ট্রপতিপদের জন্য সঞ্জীব রেড্ডীর নাম প্রস্তাব করে তাঁকে পরাজিত করলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বহু যুদ্ধের পরীক্ষিত নেতা মোরারজীভাইয়ের অমর্যাদা করেন। কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যায়। সেই বিভাগের ফলে কংগ্রেস যে শক্তি হারায়, তা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। আবার কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কংগ্রেস এখন একটি ছোট রাজনৈতিক দলে পরিণত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এইসব ঘটনা একটু বিশ্লেষণের বিষয়। নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হয় না। যদি হয়, তা হলে দেখা যাবে যে কংগ্রেসের শীর্ষে থেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করার সর্বরকম চেষ্টা হয়েছিল এবং তা সফলও হয়েছে।
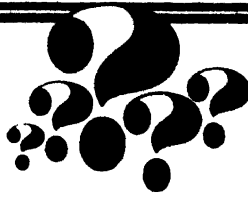
১৯৫৪-র ২৮ আগস্ট ছাত্র পরিষদ গঠিত হয়। ঐ বছরই কংগ্রেস সংস্কৃতি পরিষদও গঠন করা হয়। ছাত্র পরিষদ গঠন করা নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়েছিল। আমার এখানকার সহকর্মীদের আপত্তি না থাকলেও দিল্লীর আপত্তি এবং সবচেয়ে বেশী আপত্তি জওহরলালের। আর সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করা নিয়ে আমার এখানকার সহকর্মীদের একাংশের ভীষণ আপত্তি ছিল। কংগ্রেসের নামে নাচ-গান-অভিনয় হবে, এ তো ব্যভিচার। জওহরলাল এবং ডাঃ রায়ের কাছে আপত্তি যায়। কিন্তু অনেক তদবিরেও কোন ফল হয়নি। দুজনেই সংস্কৃতি পরিষদ গঠনে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

প্রমথনাথ বিশীকে সভাপতি ও কবুকে (কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সম্পাদক করে সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হয়। সংস্কৃতি পরিষদের প্রধান কাজ ছিল কিছু ছাত্রছাত্রীকে একত্রিত করে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করা। যেমন অভিনেতারা সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য ছিল, তেমনি গান-বাজনা যারা করত, তারাও সংস্কৃতি পরিষদের। এর আর একটা বড় কাজ ছিল ১৫ই আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল গুণিজন সংবর্ধনা ও সংবর্ধনার পর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক গান, অভিনয়, আবৃত্তি, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি প্রভৃতি। সে এক বিরাট ব্যাপার হত। ১৫ই আগস্ট এদিকে কলকাতা থেকে কাঁচরাপাড়া আর গঙ্গার ওপারে হুগলী অবধি সমস্ত হাসপাতালে রোগীদের ফুল, ফল আর শুভেচ্ছা দেওয়া হত। সন্ধ্যায় বারো হাজার লোক ধরে, এমন এক প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠান হত। এরই মধ্যে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানো হত। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন খ্যাতনামা প্রায় সকলেই সংবর্ধিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা খ্যাতিমান—যেমন শিক্ষা সাহিত্য খেলাধুলো অভিনয় সঙ্গীত চিত্রকলা—এইসব বিষয়ে কৃতিবিদ্য যাঁরা, তাঁরাই সংবর্ধনা গ্রহণ করতেন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিও হতেন খ্যাতনামা ব্যক্তিরা। সংস্কৃতি পরিষদই এইসব অনুষ্ঠানের পুরো আয়োজন করত। নাটক করেছিল অনেকগুলি—অবশ্য সবই রবীন্দ্রনাথের। ১৫ই আগস্টের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃতি পরিষদের নাটক অভিনয় হতই, তা ছাড়াও অন্যান্য সময়েও হত। ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী হয়। সেই শতবার্ষিকী বছরের কার্যসূচী যথাসম্ভব দেওয়া হচ্ছে।

কার্যসূচী

৩ আগস্ট

সকাল ৬টা ঃ ব্যারাকপুর থেকে রীলে প্রথায় মশাল-দৌড় শুরু করে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন। প্রথম মশালবাহী শ্রী পি সি সেন।

সকাল ৮টা ঃ প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন।

বিকেল ৫টা ঃ প্রদর্শনী উদ্বোধন। সভাপতি—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়। উদ্বোধক—কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই।
রাত্রি ৮টা ঃ কংগ্রেস-কর্মী সম্মেলন। বক্তা—শ্রীমোরারজী দেশাই, কোষাধ্যক্ষ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি।

৪ আগস্ট

বিকেল ৬টা ঃ মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পার বক্তৃতা—'ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীদের অবদান ও স্বাধীনতা-উত্তর উন্নয়ন'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—পালা-কীর্তন।

৫ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন। বিষয় '১৮৫৭ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

৬ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—উত্তরপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম। বিষয়—'ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উত্তর ভারতের অধিবাসীদের অবদান ও উত্তর ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর উন্নয়ন'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—পাঁচালি।

৭ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—ডঃ কালিদাস নাগ। বিষয়—'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ।' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—তরজা।

৮ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। বিষয়—'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—বাউল।

৯ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—ডঃ সুকুমার সেন। বিষয়—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—কাওয়ালী; শ্রীপান্নালাল বসু ও সম্প্রদায়।
সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা ঃ উদ্বাস্তু আশ্রয় সদস্য শিশুগণ কর্তৃক বিচিত্রানুষ্ঠান।

১০ আগস্ট

দুপুর ২টা ঃ মহিলা সম্মেলন। সভানেত্রী—শ্রীমতী প্রতিমা মিত্র।
সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' নাটক।

১১ আগস্ট

সকাল ৯টা ঃ মহিলা সভা।
সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ শিশুদের অনুষ্ঠান। পরিচালনা—'সব পেয়েছির আসর'।

১২ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—নিত্যানন্দ কানুনগো। বিষয়—'ভারতের শিল্প উন্নয়ন'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—কথকতা এবং 'নীলাচলে মহাপ্রভু' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

১৩ আগস্ট

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা ঃ বক্তৃতা—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। বিষয়—'ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সংবাদপত্রের অবদান'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—যাত্রা।

১৫ আগস্ট

সকাল সাড়ে ৭টা : কংগ্রেস ভবনে পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন।

সকাল ৮টা থেকে ১১টা : কলকাতার হাসপাতালগুলির 'ইনডোর' রোগীদের ফল ও ফুল বিতরণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

বিকেল ৪টা : কলকাতার জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি কর্তৃক শোভাযাত্রা ও ময়দানে জনসভা।

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা : কংগ্রেস ভবনে আলোকসজ্জা।

সন্ধ্যে ৭টা : পরলোকগত ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনী' প্রকাশ সম্পর্কে ঘোষণা। বক্তৃতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—স্বদেশী সংগীত।

১৬ আগস্ট

সকাল ৮টা : সূত্রযজ্ঞ।

সকাল ১০টা : স্কুল ফাইনাল ও আই এ এবং আই এস-সি পরীক্ষায় প্রথম দশজন ও ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সপ্রাপ্ত প্রথম দু'জনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। কলকাতার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন কর্তৃক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সন্ধ্যে ৭টা : ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের সংবর্ধনা। সভাপতি—শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। টিঙ্কু ঠাকুরকে ('কাবুলীওয়ালা'র মিনি) পদক প্রদান। শ্রীছবি বিশ্বাস কর্তৃক দর্শকদের কাছে টিঙ্কু ঠাকুরের পরিচয় প্রদান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'পরিত্রাণ' নাটক; কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক উপসমিতি।

১৭ আগস্ট

সন্ধ্যে ৭টা : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে-র সংবর্ধনা। সভাপতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

১৮ আগস্ট

সকাল ৮টা : শিশু উৎসব।

সন্ধ্যে ৭টা : শ্রীকালিদাস রায়ের সংবর্ধনা। সভাপতি—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'; এম জি এন্টারপ্রাইজ।

১৯ আগস্ট

বিকেল ৫টা : আই এফ এ ফুটবল।

সন্ধ্যে ৭টা : শ্রীশৈলজারঞ্জন রায়ের সংবর্ধনা। সভাপতি—শ্রীউমাপতি কুমার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আধুনিক সঙ্গীত।

২০ আগস্ট

সন্ধ্যে ৭টা : শ্রীঅতুল বসুর সংবর্ধনা। সভাপতি—শ্রীচিন্তামণি কর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'আরোগ্য নিকেতন'; বিশ্বরূপা।

২১ আগস্ট

সন্ধ্যে ৭টা : শ্রীনরেশ মিত্রের সংবর্ধনা। সভাপতি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—'চরিত্রহীন'; আর্টিস্ট অব বেঙ্গল।

২২ আগস্ট

সন্ধ্যে ৭টা : কংগ্রেস সেবাদলের অনুষ্ঠান 'লালবাঈ' নাটক। সভাপতি—শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত

যুবজয়ন্তী উৎসব। প্রত্যহ বিবিধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান।

অবশ্য ১৯৫৭-তে যা হয়েছিল, অন্য কোন বছরই তা হয়নি। অন্য সব বছরের কার্যক্রম সাত দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকটি নাম করলেই বোঝা যাবে কাঁরা কাঁরা সংবর্ধিত হয়েছিলেন। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৫৫-য় সংবর্ধিত হয়েছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, শিক্ষায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, অঙ্কনশিল্পে শ্রীযামিনী রায়, অভিনয়ে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, কৃতিত্বে তেনজিং নোরগে। আর ১৯৫৬-য় আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য নন্দলাল বসু, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রেভারেন্ড সুধীরকুমার চ্যাটার্জী (১৯১১-য় আই এফ এ শীল্ড বিজয়ীদের অন্যতম), শ্রীমতী সুখলতা রাও। আচার্য নন্দলালকে সংবর্ধনা জানানোয় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। আমরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। আর '৫৭-য় দেওয়া হয় ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, কবিশেখর কালিদাস রায়, শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীশৈলজারঞ্জন রায়, শ্রীঅতুল বসুকে। ১৯৫৭-য় এলেন ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রাইচাঁদ বড়াল, ছবি বিশ্বাস। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে বহু বছর সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে কেষ্টনগরে ছিলেন। আমরা সংবর্ধনা দেবার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসি। সেই বছরেই সংবর্ধনা দেওয়া হয় ডঃ অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী (Dr. O. C. Ganguly), শ্রীনীলরতন ধর, শ্রীদেবকীকুমার বসু, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদারকে (ছোনে)। এ ছাড়াও এসেছেন শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনাদি দস্তিদার, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীজহর গাঙ্গুলী। এ ছাড়াও ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরবিশঙ্কর, বনফুল, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তামণি কর, শ্রীমতী সরযূবালা। তা ছাড়াও আরো ছিলেন উমাপতি কুমার, গোষ্ঠ পাল, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ সুকুমার সেন, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কার্তিক বসু।

নামের তালিকা আর বাড়াবো না। সাত দিন ধরে মহোৎসব হত। প্রায় খরচ হত আশী হাজার টাকা। তার মধ্যে দু' টাকা করে আসত প্রায় সত্তর হাজার টাকা। আর ফুল-ফল যে কত পাওয়া যেত, তার ইয়ত্তা নেই। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল প্রায় বারো বছর। এঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং সব সময়ই সাহায্য করতেন। সুলালকে (জহর গাঙ্গুলী) তো প্রায় কংগ্রেসকর্মী বলা চলে। আর সুনন্দার (সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা তো আগেই লিখেছি। ছবিবাবুও খুব আসতেন। আর মলিনা দেবী ও গুরুদাস—এঁরাও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের মত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক—তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্য প্রচুর পেয়েছি। বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও নন্দলাল বসু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হত এই সাত দিন ধরে যে আসর হত তাতে ডাঃ বিধানচন্দ্রের মত মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত একই আসনে একসঙ্গে বসে দেখতেন—কোন পার্থক্য বা শ্রেণীবিভাগ ছিল না। আর এই সাত দিন ধরে বছরের পর বছর যাঁরা নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন, তাঁরা কোন দিন কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি।

স্বাধীনতা বার্ষিকী যে উৎসবমুখর করে চলতে হবে, এ পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ব্যবস্থা করা হয়। পরে অবশ্য অন্যান্য রাজ্যও গ্রহণ করেছিল। ১৫ আগস্ট করা হত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে, আর ২৬শে জানুয়ারী পালন করতেন জেলা কংগ্রেস কমিটিরা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটি নিজ নিজ জেলায় বিভিন্ন বৃত্তিশিল্পীদের অর্ঘ্য দান করে সম্মান দেখাতেন। ১৫ আগস্ট শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হত ধুতি, গরদের চাদর আর হাতির দাঁতের অশোক-স্তম্ভ দিয়ে। আর ২৬ জানুয়ারী দেওয়া হত ধুতি, গরদের চাদর এবং বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও বৃত্তি অনুযায়ী জিনিস দিয়ে। যেমন—কোদাল লাঙল ঢেলক করাত কর্নিক, প্রভৃতি। ১৫ আগস্টের অনুষ্ঠান বলা চলে শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সম্মান পেয়েছে, তন্তুবায় সম্মান পেয়েছে, সূত্রধর সম্মান পেয়েছে, পটুয়া সম্মান পেয়েছে। এঁরা যেমন সম্মান পেয়েছেন, তেমনি কৃষ্ণনগর কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরাও পেয়েছেন, কর্মকার, স্বর্ণকারও বাদ যাননি। ১৫ আগস্ট ও ২৬শে জানুয়ারী—এই দুই অনুষ্ঠানেই চেষ্টা করা হয়েছে এক দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হবার, অন্য দিকে যাঁরা কৃষি ও কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার। জনসাধারণও এইসব অনুষ্ঠানে সব রকমে সহযোগিতা করে অনুষ্ঠানগুলি সাফল্যমণ্ডিত করেন। সর্ব শ্রেণী ও সর্ব স্তরের লোকেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরাও মনে করেছি যে, আমাদের যা উদ্দেশ্য ও আদর্শ, সেদিকে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক টাকা আনা পাই দিয়ে হিসেব করলে কি হবে বলতে পারি না, কিন্তু কোন সজীব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইসব অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন বলে বরাবর মনে করে এসেছি। এর মধ্যে কোন হিসাববোধ ছিল না। এসব অনুষ্ঠান হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে যতটা ছিল, তার চেয়ে তাগিদ বেশী ছিল মনের। আমাদের সংস্কৃতি পরিষদ কোন দিন রাজনীতি প্রচারে নামেনি। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং গুণীর মর্যাদা দিয়েছে। কেজো লোকেরা হয়ত এর পেছনে বিশেষ যুক্তি খুঁজে পাবেন না, কিন্তু এইসব অনুষ্ঠান করায় সংস্কৃতি পরিষদ কোন দিন কুণ্ঠিত হয়নি। পরম উৎসাহ ও আনন্দ সহকারেই তারা এসব অনুষ্ঠান করেছে।
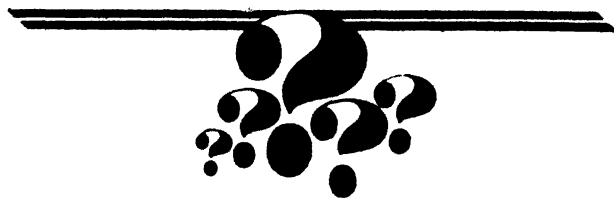
বছরটা ঠিক মনে নেই—৫৬-৫৭ সাল হবে। পার্লামেন্টের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নিয়ে কমিটি হয়েছে। গোবিন্দবল্লভ পন্থ কমিটির চেয়ার-ম্যান। ভাষার ব্যাপার নিয়ে পার্লামেন্টারী কমিটিতে আলোচনা করে আমরা সুপারিশ করবো। সভা আরম্ভ হবার একটু পরেই আলোচনা এমনভাবে মোড় নিল যে সবাই প্রায় হতভম্ব। একজন চোস্ত হিন্দীতে তাঁর মতামত ব্যক্ত

করলেন। তারপরই কথ্য বাংলা। বাংলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল মালয়লম এবং ঠিক তার পরেই কানাড়া। প্রায় অচল অবস্থা। বিশেষ উত্তেজনা নেই; দেখে মনে হচ্ছে, অনেকেই যেন উপভোগ করছেন। কমিটিতে উপস্থিত অনেকেই দায়িত্বশীল এবং ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্। গোবিন্দবল্লভ পন্থ অতি ধীর স্থির মানুষ ছিলেন। অনেক প্ররোচনাতেও তাঁকে ধৈর্য হারাতে দেখা যায়নি। মানসিক স্থৈর্য তাঁর ছিল অনন্যসাধারণ। কিছুক্ষণ বাদে তিনি সভার কাজ সেদিনকার মত স্থগিত রাখলেন। মুখে কিন্তু তাঁর হাসিটি লেগেই ছিল। সেদিনই বিকেলে গোবিন্দবল্লভের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কমিটির মেম্বারদের মধ্যে আমরা অনেকেই উপস্থিত হলুম। খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর কমিটির মিটিং-এর কথা উঠল। সকলেই নিজ নিজ ভাষায় বলবার জন্য ভীষণ আগ্রহী। যাঁরা সাধারণত ইংরেজীতে কথা বলেন, তাঁরাও মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য ভীষণ উৎসাহী। কোন মীমাংসাই হয় না। শেষে অনেক আলোচনার পর ট্যান্ডনজীর (শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন) ফর্মুলা সবাই মেনে নিলেন। ট্যান্ডনজী বলেছিলেন যে, সকলেই ইংরেজীতে বলবেন; যাঁরা ইংরেজীতে বলতে পারবেন না তাঁরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় বলবেন; দোভাষী রাখা হবে, ঐ কথাগুলি ইংরেজীতে তরজমা করবার জন্য। ব্যস্, শান্তি হল। ট্যান্ডনজী ছিলেন খুব হিন্দী ভাষার সমর্থক। কিন্তু ও'র একটা গুণ ছিল। উনি বিসংবাদের পথ না নিয়ে আপসরফার দ্বারা কাজ করে নিতেন। উত্তরপ্রদেশের স্পীকাররূপে এবং কংগ্রেস সভাপতি রূপে এইজন্য ও'র খুব নামও হয়েছিলো। নিজের মত সম্পর্কে ও'র খুব দৃঢ়তা ছিল কিন্তু অন্যের মত সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ভাষার ব্যাপার নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যে দেশে শতকরা ত্রিশজনের বেশী মাতৃভাষায় নাম সই করতে পারে না, সে দেশে হিন্দী ভাষার প্রচলন হবে কি ইংরাজী থেকে যাবে, তা নিয়ে বিতণ্ডা খুবই মর্মান্তিক। মুষ্টি-মেয় লোকই এই ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষে শতকরা দশ-জনের মধ্য থেকেই ভাল ভাল চাকরিতে লোক যায়। শতকরা কুড়ি জন ভাল চাকরির ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। বাকী শতকরা সত্তরজন তো নাম সই করতেই জানে না! কিন্তু ভাষা সংক্রান্ত বিবাদ এমন ভাবপ্রবণতা এনে দেয় যে, ভাষা নিয়ে যেসব অশান্তি হয়েছে, তাতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই কোন ভাষা জানেন না। আমাকে কয়েকবারই ভাষার বিসংবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাদ্রাজে একবার হয়েছিল। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে তো বহুবারই হয়েছে! এই কলকাতা শহরে পুরনো কোম্পানী বাগান, তারপর বীডন স্কোয়ার—বর্তমানের রবীন্দ্রকাননে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২৫ বৈশাখের সভায় গিয়ে আমি বলেছিলুম, 'যখন ইংরেজ ছিল, তখন একরকম ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এমনভাবে মানুষ হচ্ছে যে, বাংলা ভাষা তাদের অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে।' আমার কথা শুনে সভা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। আমি তখন একটু হেসে তাঁদের বললুম, 'কথাটি আমার নয়। রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষা" থেকে কিছু পড়ে শোনাই।' তখন সভা শান্ত হল। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাও তাঁদের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেনি। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে। সভায় কিছু লোক 'হিন্দী, হিন্দী' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন, যদিও আমি হিন্দীতেই বলছিলাম।

আমি তখন সভার শেষ সারি থেকে পাঁচজন লোককে আমার কাছে ডাকি। তাঁরা কিছুতেই রাজী হন না। অতি কষ্টে তাঁদের ধরে আনা হল এবং আমি তাঁদের একটা হিন্দী বই পড়তে দিই। তিনজন পড়তে পারেন এবং দু'জন পারেননি। আমি তখন আমার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বিনীতভাবে নিবেদন করলাম যে, 'যাঁদের কোন ভাষাতেই অক্ষর জ্ঞান হয়নি, তাঁদের ভাষা-আন্দোলনে যোগদান করা উচিত নয়।'

ভাষা-আন্দোলনের সময় রক্তের আখরে লেখা অনেকগুলি চিঠি পেয়েছিলাম। লেখা ছিলঃ 'তুমি ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীর সমর্থক।' চিঠিগুলি পেয়ে ভয় একটুও হয়নি, তবে মনটা একটু মুষড়ে গিয়েছিল। চিঠির ভাষা দেখে মনে হয়েছিল, তাঁরা ইংরেজী, হিন্দী মোটেই জানেন না—এমন কি বাংলাও ভাল জানেন না। এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর হতে পারে না। আমাদের ছেলেবেলায় ধুতিতে নামের আদ্যক্ষর লেখার প্রচলন ছিল। যাঁরা সেলাই করতেন, তাঁদের অনেকেই ইংরেজী ভাষা জানতেন না। বাংলাও জানতেন না—তবে খানিকটা অক্ষর-পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁরাই কাপড়ে A. B. C. D লিখতেন; কোন দিন অ, আ, ক, খ লেখেননি। এ একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা।' ছেলেবেলায় ফার্স্ট বুক-এ ইংরেজীতে পড়া হত—I am up। তরজমা করা হত, 'আমি হই উপরে'; He is to go—'তিনি হন যাইতে'। যে বাংলায় মায়ের সঙ্গে কথা বলি না, মেয়ের সঙ্গে কথা বলি না—সেই বাংলা অভ্যেস করতে হত। এইভাবে যারা শিক্ষালাভ করত, তাদের ইংরেজী, হিন্দী ইত্যাদি নিয়ে তর্কাতর্কি মারামারি শুধু যে অসঙ্গত তা নয়, একান্ত অশোভনীয় এবং কলঙ্কজনক। তবুও তখন দেশ পরাধীন ছিল। অসহ্য হলেও অনেক জিনিস মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন দেখি শুধু মামি-ড্যাডি বলছে না, বাংলায় চিঠি লিখতেও অপরাগ, তখন ললাটের কলঙ্ক-কালিমা আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। ইংরেজী বা ফরাসী বা গ্রীক বা পারসিক ভাষা শিখতে কারোই আপত্তি নেই; কিন্তু মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে বিদেশী ভাষা শেখা শুধু যে গ্লানিকর তা নয়, বিশেষ বেদনাদায়ক। বাংলা ভাষা যাঁরা জানেন, তাঁদের পক্ষে ইংরেজীর চেয়ে হিন্দী বোঝা ঢের বেশী সহজ। উর্দুমিশ্রিত যে হিন্দুস্থানী ভাষা, তা বোঝা শক্ত হলেও এলাহাবাদ, কাশী, জব্বলপুরে যে হিন্দী ভাষা প্রচলিত আছে, তা বোঝা কোন শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে শক্ত নয়। হিন্দী গ্রামারের কথা উঠতে পারে। কিন্তু গ্রামার বাদ দিয়ে তো এখন ইংরেজী ভাষারই প্রচলন হয়েছে। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যা লেখা হয় তাতে অনেক সময়েই ব্যাকরণসম্মত নয় এমন অনেক শব্দ দেখা যায়। অতএব গ্রামারের যুক্তি সব সময়ে খাটে না। উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য অনেক সময়ে বোঝবার অসুবিধা হয়; কিন্তু সেটা তো ভাষার দোষ নয়। যিনি বলেন এবং যিনি শোনেন উভয়েই যদি ধৈর্যশীল হন, তা হলে এই বাধা সহজেই দূর করা যায়। অসমিয়া লিপি ও বাংলা লিপি একইরকম। তাড়াতাড়ি অসমিয়া ভাষায় কথা বললে আমাদের পক্ষে বোঝা ভয়ানক শক্ত। আমরা বলি 'মানুষ', অসমিয়া ভাষায় উচ্চারণ 'মানুহ্'। আবার ওড়িয়া লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। তবু ওড়িয়া ভাষায় যখন 'মনুষ্য' বলা হয়, আমরা বুঝতে পারি। মালয়ালম ভাষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপর সংস্কৃত শব্দ আছে। ডেমোক্রেসি—আমরা বলি 'গণতন্ত্র'। মালয়ালম ভাষায় বলে 'জনাধিপত্য'। বোঝার অসুবিধে কোথায়? কেবল উচ্চারণের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এসব কথাই তো

বাহ্য। নিরক্ষরদের কাছে এবং যে দেশের শতকরা সত্তরজনই নিরক্ষর, সে দেশের পণ্ডিত মানুষদের পক্ষে ভাষার তর্ক সাজে না। আমাদের সংবিধানে ভাষা সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হয়েছে তা যেমন প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দী, ইংরেজী ছাড়া যে সমস্ত ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, সেইসব ভাষা সম্বন্ধেও খানিকটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। পার্লামেন্টে যেসব ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, তা ছাড়াও বহু আঞ্চলিক ভাষা আছে। তার কতগুলি বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভায় স্বীকৃতি পেলেও আরও অনেক চলতি ভাষা আছে যেগুলি স্বীকৃতি পায়নি। সেইজন্যই একান্ত ধৈর্যসহকারে দায়িত্বশীল ভারতবাসীদের ভাষা আন্দোলনের খারাপ দিকটা পরিহার করা প্রয়োজন। ভাষা-আন্দোলন নিশ্চয়ই করা উচিত, তা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। বর্তমানে মাতৃভাষার অমর্যাদার উপর ইংরেজী শিক্ষার গরিমা প্রচার হচ্ছে। কোন সভ্য ও স্বাধীন জাতির পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাকর ঘটনা ঘটতে পারে না।

এখানে ভাষা সংক্রান্ত সংবিধানের কতগুলি পরিচ্ছেদ এবং পার্লামেন্টে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার খানিকটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি ভাষাবিদ্‌ও নই, পণ্ডিতও নই। প্রত্যহ মাতৃভাষার অসম্মান দেখে যে মানসিক গ্লানি হয়েছে, তারই খানিকটা প্রকাশ করলুম এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে যেসব রাজ্যে ঐ পার্লামেন্টে স্বীকৃত ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে—তারও উল্লেখ করলুম। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য মনে করে। এইসব ভাষা এবং আরও অনেক ভাষা নিয়েই ভারতবর্ষ। অন্য ভাষা না শিখতে পারি, কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় তো কোন বাধা নেই। অর্থনৈতিক কারণে অনেককে ইংরেজী শিখতে হয়, এটা সত্য। কিন্তু তার জন্য মাতৃভাষাকে অবহেলা করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। এইটে বোঝা খুব শক্ত যে, যাঁদের বাড়িতে 'ইলিয়ড্' আছে, তাঁদের বাড়িতে 'শকুন্তলা' থাকবে না কেন?

আমাদের সংবিধান চালু হয়েছে ১৯৫০ থেকে। সংবিধান প্রস্তুত করেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান, ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ডেপুটি চেয়ারম্যান। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আর হরেনদা হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। ভাষা সম্বন্ধে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়ঃ 'Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English.

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the people, or person acting as such as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue.

Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in

English" were omitted therefrom.

১২০ ধারার ২-এর অনুচ্ছেদ অতি পরিষ্কার: 'Unless Parliament by law otherwise provides'. অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পার্লামেন্ট যতদিন ইচ্ছে ইংরেজী ভাষা বজায় রাখতে পারবে এবং ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট যেভাবে গঠিত, তাতে ভোটের জোরে কেউ কোন ভাষা চাপিয়ে দিতে পারবে না। আবার ৩৪৮ ধারার ২-এর অনুচ্ছেদে আরও পরিষ্কার করে বলা আছে: 'Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (i), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that state;

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgement, decree or order passed or made by such High Court.'

রাজ্য আইনসভাগুলি নিজেদের রাজ্যে ভাষা সম্বন্ধে স্থির করতে পারবেন, তাও সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় দেওয়া আছে। 'Subject to the provisions of articles 346 and 347, Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.'

সংবিধানে ৩৪৪-এর (১) এবং ৩৫১ ধারা অনুযায়ী অষ্টম তফশিলে (Schedule) নিম্নলিখিত ভাষাগুলি পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে: (১) অসমিয়া, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটী, (৪) হিন্দী, (৫) কানাড়া, (৬) কাশ্মীরী, (৭) মালয়লম, (৮) মারাঠী, (৯) ওড়িয়া, (১০) পাঞ্জাবী, (১১) সংস্কৃত, (১২) সিন্ধী [১৯৬৭-এর সংশোধনী অনুযায়ী] (১৩) তামিল, (১৪) তেলুগু, (১৫) উর্দু।

১। অসমিয়া

একাদশ শতাব্দীতে প্রথম অসমিয়া ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভালভাবে প্রথম এই ভাষায় বই প্রকাশিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দুর্লভ-নারায়ণ ও শঙ্করদেবের রচনায় অসমিয়া ভাষা সমৃদ্ধ হয়। ১৮৩৬ সালে বাংলা ভাষা অসমিয়া ভাষার স্থান নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আসাম ভারতবর্ষের মধ্যে সবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রবর্তন হয়। আনন্দরাম ফুকনের প্রচেষ্টায় ১৮৭৩-এ অসমিয়া ভাষা তার নিজের স্থান ফিরে পায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে ইংরেজ মিশনারীরা অসমিয়া ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করে।

২। বাংলা

সাধারণত বলা হয় বাংলা ভাষা এসেছে প্রাকৃত ভাষা থেকে। এ মতও চালু আছে যে, সংস্কৃত অপভ্রংশ থেকে প্রাকৃত ভাষা সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মী বর্ণমালা থেকে বাংলা বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে পুরনো বাংলা লিপি পাওয়া যায়, আট শো থেকে হাজার বছরের। বাংলা বর্ণমালায় প্রথম বই ছাপেন চার্লস উইলকিনস্। তিনি এন বি হ্যালহেড-এর 'এ গ্রামার অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' ছাপেন।

৩। গুজরাটী

সপ্তম শতাব্দী থেকে গুজরাটী ভাষার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় জৈন মুনি-দের কবিতা-সংগ্রহ থেকে। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার গান 'বৈষ্ণবজন' শ্রীনরসিং মেটার লেখা। লেখার সময় নিরূপিত হয়েছে পঞ্চাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গুজরাটী গদ্য-রচনার বাস্তবিকপক্ষে বিকাশ হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ আসার পর থেকে।

৪। হিন্দী

হিন্দী ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায় দশম শতাব্দীতে। তারপর এই ভাষা চার পর্যায়ে সমৃদ্ধ হয়েছে—১। আদিকাল, ২। ভক্তিকাল, ৩। রীতিকাল, ৪। নিক্‌কাল।

উল্লেখযোগ্য নাথ সাহিত্য; সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। হিন্দী ভাষা গোলকনাথ এবং তাঁর অনুবর্তীগণের লেখা দিয়েই সমৃদ্ধ হয়। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিকাব্য সমৃদ্ধ হয়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দী সাহিত্য বর্তমান রূপ পায় ১৮৬৫ সালে। জয়শঙ্কর প্রসাদ, রাজকৃষ্ণ দাস, মহাদেবী বর্মা, মাখনলাল চতুর্বেদী প্রমুখ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। প্রেমচাঁদের লেখা হিন্দী ভাষাকে জনপ্রিয় করে। স্বাধীনতার পর জৈনেন্দ্র কুমার, যশপাল, আগেয়া, অমৃতলাল নাগর, রেণু, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সীয়ারামশরণ গুপ্তের রচনা দ্বারা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। দিন-করের নামও হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

৫। কানাড়া

ভারতের সর্বপুরাতন ভাষাগুলির একটি। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন অনুলেখের মাধ্যমে। প্রথম সাহিত্যিক লেখা পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে। কর্ণাটকে অনেক লিপি পাওয়া যায়, যার কেবল ঐতিহাসিক মূল্যই নয়, তাতে কাব্যপ্রতিভাও পরিস্ফুট। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কানাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ শুরু হয়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে কানাড়া সাহিত্য একটা নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করেছে। যদিও এই ভাষায় কাব্য-সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ ছিল, ১৯২০ সালের আগে তা খুব সুসংবদ্ধ ছিল না। বর্তমানে কানাড়া ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেনঃ ১। বি এম কান্তিয়া, ২। ডি ভি গুণ্ডাপ্পা, ৩। শ্রীনিবাসন, ৪। কে ভি কুট্টাপ্পা, ৫। জি পি রাজরত্নম, ৬। ভি কে গোকক প্রভৃতি।

৬। কাশ্মীরী

চতুর্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরী ভাষার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই ভাষার সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধরনের লেখকের লেখা দ্বারাই এই ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

৭। মালয়লম

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই ভাষার বিশেষ যোগসূত্র আছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভাষার উৎকর্ষ সাধন শুরু হয়। এর পর মাত্র তিন শতকের মধ্যে এই ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বর্তমানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকঃ ১। কুমারণ আসান, ২। নারায়ণ মেনন, ৩। উল্লুর পরমেশ্বরণ, ৪। শংকর কুরুপ।

৮। মারাঠী

দশম শতাব্দী থেকেই এই ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃতের সঙ্গে এই

ভাষার যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই মারাঠী সাহিত্য এক বিশেষ রূপ নেয়। তুকারাম এবং তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধু রামদাসের নাম মারাঠী ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দী। অষ্টদশ শতাব্দী থেকেই মোরোপন্থের নাম সর্বজনস্বীকৃত। ইনি 'ময়ূর' নামে লিখতেন। তারপরই নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে তিলকের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'গীতা রহস্য' মারাঠী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকঃ ১। বি আর তাম্বে, ২। যশোবন্ত, ৩। ডি বি বোরকা প্রমুখ।

৯। ওড়িয়া

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ওড়িয়া ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ওড়িয়ার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এই ভাষার সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়েছে। ধনঞ্জয় ভঞ্জকে বলা হয় 'ওড়িয়া রীতিকাব্যের জনক'। এই সঙ্গে লোকনাথ বিদ্যাধরের নামও করা হয়। ধনঞ্জয় ভঞ্জের পৌত্র উপেন্দ্র ভঞ্জকে 'কবিসম্রাট' বলা হয়। বর্তমানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকঃ ১। কবিবর রাধানাথ রায়, ২। ভক্তকবি মধুসূদন রাও, ৩। মায়াধর মানসিংহ, ৪। সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, ৫। ফকিরমোহন সেনাপতি, ৬। উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস, ৭। গোপীনাথ মহান্তি।

১০। পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবী ভাষা প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের সঙ্গে যুক্ত হলেও অষ্টম শতাব্দীর আগে এর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবী সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্যের পর। দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফি কবি ফরীদের কাব্যে পাঞ্জাবী ভাষার ব্যবহার বেশ ফুটে ওঠে। গুরু নানক—যিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক, তাঁর সময়ে নানা স্তব-স্তোত্র-গানের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবী ভাষা আরও বিকাশ লাভ করে। গুরু নানকের কাব্য ভাষার সমস্ত আগল খুলে দিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে গুরু নানকের পর গুরু রামদাস, অর্জুনদেব প্রভৃতির সময়ে ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয় এবং গুরু অর্জুনদেবই আদি গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। আদি গ্রন্থের সঙ্গে গুরু গোবিন্দ ও গুরু তেগবাহাদুরের কবিতা সংযুক্ত করেন। ফলে পাঞ্জাবী ভাষা সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে অনেক কাব্য সৃষ্টি হয় এবং তার অনেকগুলি আসে গুরু গোবিন্দ সিংহের কাছ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভাই বীরসিংহের কাব্য পাঞ্জাবী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে। তারপরই আসেন মোহন সিং—যাঁকে আধুনিক কবিদের অগ্রদূত বলা হয়। পরে আসেন পূরণ সিং এবং ধনীরাম ছত্রিক্—আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১। সংস্কৃত

সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে বলতে গেলে দেখা যাবে সংস্কৃত আমাদের প্রাচীনতম ভাষা। পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষার বয়স পাঁচ হাজার বছর থেকে তিন হাজার বছর ধরেছেন।

সংস্কৃতের প্রভাব ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষার উপর পড়লেও ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষাগুলি নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া পারসিক ও আরবী ভাষার প্রভাব পড়েছে, ইংরেজী ভাষার প্রভাবও কম পড়েনি। সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, দর্শন, বেদান্ত এবং বহু কাব্য-নাটক রচিত হয়েছে।

১২। সিন্ধী

বহু ভাষার মিশ্রণে সিন্ধী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সিন্ধী ভাষার কবিতার প্রতিভা বিকশিত হয়। পুরনো যুগের সবচেয়ে বড় কবি ছিলেন শাহ আব্দুল লতিফ। সিন্ধী গদ্যসাহিত্যের চর্চা বাস্তবিকপক্ষে শুরু হয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে। সিন্ধী অনুবাদসাহিত্য খুব সমৃদ্ধ হয়। সিন্ধী ভাষায় কবি সুরদাস, মীরা, তুলসীদাসের অজস্র কবিতা অনূদিত হয়েছে। আবার বিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রেমাচন্দের বই অনূদিত হয়েছে, তেমনি বঙ্কিম, শরৎ, তারাশঙ্করের বইও অনূদিত হয়েছে। গদ্যসাহিত্যের শুরুতে শ্রীদয়ারাম ডিডুমলের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার কৌরমল, খিলনানি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সমাজ-সংস্কারের জন্য অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। পরমানন্দ মেওয়ারামের নামও উল্লেখযোগ্য। তারপরই আসেন খেরুমল মেহেরচাঁদ এবং লালচাঁদ অমরদীনমল। জেঠমল পরশুরামের নামও উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে আচার্য গীদওয়ানি, এন আর মালকানি, লীলারাম প্রেমচাঁদ, দয়ারাম মীরচন্দনী প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩। তামিল

তামিল ভাষা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছে। তামিল সাহিত্যের সঙ্গমযুগ যে কবে থেকে চালু আছে তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে; কিন্তু সে সময়ে তামিল ভাষা খুব সমৃদ্ধ হয়েছিল। হাজার বছর আগে আরম্ভ হয়ে পাঁচ শ বছর আগে অবধি তামিল ভাষা নানারকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। তামিল ভাষার পুরো ইতিহাস জানা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে, প্রায় দু' হাজার বছর আগেই এর কাব্যসাহিত্য খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 'ভক্তি-সাহিত্য' গড়ে ওঠে। একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তামিল সাহিত্যের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং তার মধ্যে প্রধানতম ছিলেন মহিলা কবি Avbaiyar। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান বিংশ শতাব্দী অবধি বহু দার্শনিক তথ্যের সূত্র সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে। বর্তমানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকঃ (1) Psambanda Mudaliar, (2) Subramania Bharati, (3) Dr. U. V. Swaminatha Iyer, (4) B. Krishnamurty, (5) R. Krishnamurty (Kalki). এ ছাড়াও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নাম তামিল ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৪। তেলুগু

তেলুগু সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, এর উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আদি দ্রাবিড় ভাষা থেকেই এর উদ্ভব। প্রথম শতাব্দী থেকেই তেলুগু ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তেলুগু লিপি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনজন তেলুগু কবির লেখা মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া যায়। আরম্ভ করেন Nannaya. তারপর রচনাটি দু'শো বছর পড়ে থাকে। Tikkua শুরু করে খানিকটা এগিয়ে যান এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে শেষ করেন Yerrapragaba. এই তিনজনকে 'কবিত্রয়' বলা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তেলুগু সাহিত্য মহা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেবরায় (Krishnadevaraya) খুব পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁর সময়কেই প্রবন্ধসাহিত্যের সময় বলা হয়। তেলুগু ভাষায় এক বিশেষ ধরনের কাব্যসাহিত্যকে প্রবন্ধসাহিত্য বলা হয়। বর্তমান যুগে তেলুগু ভাষায় কয়েকজন

উল্লেখযোগ্য লেখক ঃ (1) Tirupali Venkatakavellu, (2) Krishnamurty Sastri, (3) Vavilakolanum Subbarao, (4) Janamanchai, (5) Seshadri Sarma, (6) Veeresalingam Pantulu -র 'রাজশেখরচরিত' উপন্যাসের খুব নাম আছে। (7) Gopichand, (8) Buchibabu, (9) Potukuchi, (10) Nori Narasimha Sastri, (11) Balivada Kantrao.

১৫। **উর্দু**

উর্দু একটি তুর্কী শব্দ। মানে হল বড় দল (যাযাবর)। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই উর্দু ভাষার প্রচলন শুরু হয়। এর মানে এই নয় যে, এ ভাষা একেবারে নতুন আরম্ভ হয়েছে। এ ভাষা যখন থেকে পারসিক প্রভৃতিরা দলবদ্ধভাবে ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করেন, সেই একাদশ শতাব্দী থেকে এর শুরু। ভারতবর্ষের যেসব জায়গায় উত্তর দিক দিয়ে পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে সব এসেছিলেন, সেই পারসিক ভাষা এবং স্থানীয় ভাষার সংমিশ্রণেই একটি কথ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এই কথ্য ভাষার সঙ্গে আরও অনেক ভাষা সংযুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে এই কথ্য ভাষা খুব বিস্তৃতি লাভ করে এবং সেখান থেকেই দিল্লীতে এটা ছড়িয়ে পড়ে। তখন দিল্লীতে পারসিক ভাষারই প্রাধান্য। দিল্লীর কবিরা সাগ্রহে উর্দুকে গ্রহণ করেন এবং উর্দু ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। মোগল সম্রাটরা এই ভাষাকে বলতেন, 'হিন্দুস্তানী'। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উর্দু ভাষা উত্তর ভারতের দরবারী ভাষা বলে পরিগণিত হয়। তারপর থেকে এই ভাষার মাধ্যমে শাসনকার্য চালানো হয়। নাজীর আকবর-বাদীর নাম উর্দু ভাষার সমৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পূর্বে তিন বড় কবি উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করে যান—জৌক, মোমিন, গালিব। গদ্যসাহিত্যের পুরোধা হলেন মোল্লা ভাজি (Vajhi)। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, হালি, আজাদ, নাজির আহমদ—এঁদের উর্দু গদ্যসাহিত্যের পুরোধা বলা চলে।

বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং সেইসব রাজ্যের ভাষা এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাষা সম্পর্কে কিছু পরিচয় দেওয়া হল।

১। **অন্ধ্রপ্রদেশ**

লোকসংখ্যা—৪,৩৫,০২,৭০৮।

এখানে রাজ্যের ভাষা যদিও তেলুগু, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষাও বহুল-প্রচলিত।

২। **অরুণাচল প্রদেশ**

লোকসংখ্যা—৬৭,৫১১।

এখানে বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষাই রাজ্যের ভাষা। এ ছাড়াও ইংরেজী ভাষার প্রচলন আছে।

৩। **আসাম**

লোকসংখ্যা—১,৪৬,২৫,১৫২।

রাজ্যের ভাষা অসমিয়া। তা ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী, খাসি, বাজো, গারো ইত্যাদি ভাষারও প্রচলন আছে।

৪। **বিহার**

লোকসংখ্যা—৫,৬৩,৫৩,৩৬৯।

রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরাজী। এ ছাড়াও এ রাজ্যে বাংলা ও উর্দু ভাষা বহুলব্যবহৃত।

৫। **গ্‌ুজরাট**

লোকসংখ্যা—২,৬৬,৯৭,০০০।

সরকারী কার্যে, আইন-আদালতে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্‌ুজরাটী ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সাধারণত হিন্দী ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

৬। **হরিয়ানা**

লোকসংখ্যা—১,০০,৩৬,৮০৮।

রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরাজী।

৭। **হিমাচলপ্রদেশ**

লোকসংখ্যা—৩৪,৬০,৪৩৪।

রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরেজী।

৮। **জম্মু ও কাশ্মীর**

লোকসংখ্যা—৪৬,১৬,৬৩২।

রাজ্যের সরকারী ভাষা উর্দু ও ইংরেজী। এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে কাশ্মীরী, ডোগরী, বাল্টি, দার্দী, পাহাড়ী, লাডাকী, পাঞ্জাবী ও গোগরী ভাষার প্রচলন আছে।

৯। **কর্ণাটক**

লোকসংখ্যা—২,৯২,৯৯,০১৪।

রাজ্যের ভাষা কানাড়া ও ইংরেজী।

১০। **কেরালা**

লোকসংখ্যা—২,১৩,৪৭,৩৭৫।

রাজ্যের ভাষা মালয়ালম ও ইংরেজী।

১১। **মধ্যপ্রদেশ**

লোকসংখ্যা—৪,১৬,৫৪,১১৯।

রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরেজী। এ ছাড়াও অন্যান্য কথ্য ভাষা হিসাবে হিন্দী, উর্দু, মারাঠী, রাজস্থানী, গ্‌ুজরাটী, সিন্ধীর প্রচলন আছে।

১২। **মহারাষ্ট্র**

লোকসংখ্যা—৫,০৪,১২,২৩৫।

রাজ্যের ভাষা মারাঠী ও ইংরেজী।

১৩। **মণিপুর**

লোকসংখ্যা—১০,৭২,৭৫৩।

মণিপুর ও ইংরেজী রাজ্যের সরকারী ভাষা এবং বাংলা ভাষারও প্রচলন আছে।

১৪। **মেঘালয়**

লোকসংখ্যা—১০,১১,৬৯৯।

ইংরেজী হল রাজ্যের সরকারী ভাষা, যদিও আইনসভা এ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অন্যান্য মুখ্য কথ্য ভাষাগুলি হল খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো।

১৫। **নাগাল্যান্ড**

লোকসংখ্যা—৫,১৬,৪৪৯।

১৯৬৭ সালে নাগাল্যান্ড আইনসভা ইংরাজীকে সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন

উপভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে সাধারণ ভাষাগুলি হল ইংরাজী এবং নাগামিজ (Nagamese)।

১৬। **উড়িষ্যা**

লোকসংখ্যা—২,১৯,৪৪,৬১৫।
রাজ্যের ভাষা ওড়িয়া ও ইংরেজী।

১৭। **পাঞ্জাব**

লোকসংখ্যা—১,৩৫,৫১,০৬০।
রাজ্যের ভাষা পাঞ্জাবী ও ইংরেজী।

১৮। **রাজস্থান**

লোকসংখ্যা—২,৫৭,৬৫,৮০৬।
রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরেজী।

১৯। **তামিলনাড়ু**

লোকসংখ্যা—৪,১১,৯৯,১৬৮।
রাজ্যের ভাষা তামিল ও ইংরেজী। অন্যান্য বহুলব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলি হল তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়া, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী।

২০। **ত্রিপুরা**

লোকসংখ্যা—১৫,৫৬,৩৪২।
রাজ্যে সরকারী ভাষা ইংরেজী। বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হয়।

২১। **উত্তরপ্রদেশ**

লোকসংখ্যা—৮,৮৩,৪১,১৪৪।
রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরেজী।

২২। **পশ্চিমবঙ্গ**

লোকসংখ্যা—৪,৪৩,১২,০১১।
রাজ্যের ভাষা বাংলা ও ইংরেজী। দার্জিলিং-এর কিছু কিছু অংশে নেপালী ভাষা প্রচলিত।

২৩। **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**

লোকসংখ্যা—১,১৫,১৩৩।
রাজ্যের ভাষা ইংরেজী। মুখ্য কথ্য ভাষা বাংলা, তামিল, হিন্দী, মালয়ালম, তেলুগু।

২৪। **চণ্ডীগড়**

লোকসংখ্যা—২,৫৬,৯৭৯।
রাজ্যের ভাষা ইংরেজী।

২৫। **দাদরা ও নগর হাভেলি**

লোকসংখ্যা—৭৪,১৭০।
রাজ্যের ভাষা ইংরেজী। গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, কোঙ্কনী প্রভৃতি ভাষার প্রচলন আছে।

২৬। **দিল্লী**

লোকসংখ্যা—৪০,৬৫,৬৯৮।
রাজ্যের ভাষা হিন্দী ও ইংরেজী।

২৭। **গোয়া, দমন ও দিউ**

লোকসংখ্যা—৮,৫৭,৭৭১।

রাজ্যের ভাষা ইংরেজী। মুখ্য কথ্য ভাষা কোঙ্কনী ও গুজরাটী।

২৮। লাক্ষাদ্বীপ

লোকসংখ্যা—৩১,৮১০।

রাজ্যের ভাষা ইংরেজী ও মালয়ালম।

২৯। মিজোরাম

লোকসংখ্যা—৩,৩২,৩৯০।

রাজ্যের ভাষা ইংরেজী।

৩০। পণ্ডিচেরি

লোকসংখ্যা—৪,৭১,৩৪৭।

রাজ্যের ভাষা ইংরেজী, ফরাসী, তামিল, মালয়ালম ও তেলুগু।

৩১। সিকিম

লোকসংখ্যা—২,০৮,৮৪৩।

রাজ্যের ভাষা নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্চি ও ইংরেজী।

সব স্বীকৃত ভাষারই খানিকটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। অবশ্য পরিচয় বললে ভুল হবে, উল্লেখ করা হল। এই সংখ্যাটি যাঁরা পড়বেন, তাঁদের মধ্যে ভাষাবিদ্ যদি কেউ থাকেন, তা হলে তাঁকে অনুরোধ, তিনি যেন ভাষাগুলির বিশদভাবে পরিচয় দেন। আমাদের দেশে যতগুলি ভাষা আছে, অন্তত স্বীকৃত ভাষাগুলি শিক্ষিত সমাজের জানা প্রয়োজন। আমি খালি শুরু করেছি। পার্লামেন্টে স্বীকৃত ভাষা ছাড়াও রাজ্য আইনসভায় অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে—যেমন দার্জিলিং জেলার কয়েকটি অঞ্চলে—নেপালী ভাষা চালু হয়েছে। সেইরকম অন্যান্য রাজ্যেও আঞ্চলিক ভাষা আছে। সবেরই বিশদ বিবরণ জানা প্রয়োজন। আগেও লিখেছি, আবার পুনরুক্তি করছি, অন্য ভাষার সঙ্গে যেন মাতৃভাষাকে এক আসনে বসানো না হয়। ছোট থেকে বড় অবধি সবার পক্ষে যেমন মাতৃভাষায় পরিষ্কার করে বলা যায় এবং বোঝানো যায়, সেটা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। অবশ্য ভিন্ন রুচির লোকও আছেন। এক ইংরাজীনবিশ বিখ্যাত বাঙালী আছেন, তিনি বাংলা জানেন, তবু বাংলায় চিঠি লেখা বা কথা বলা তাঁর খুব অপছন্দ। তিনি নির্মলদাকে (অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু) প্রায়ই বলতেন, 'নির্মল, তুমি মানুষ হলে না, এখনও ফরাসী ভাষা শেখনি?' ইনি নিশ্চয়ই পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এ'কে দিয়ে মিটতে পারে না। মাতৃভাষা যাঁর কাছে উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত, তাঁর পাণ্ডিত্যকে অনায়াসে ভেজাল-পাণ্ডিত্য বলা চলে। মানুষ তখনই নিজের পরিবার, সমাজ, দেশকে গ্রহণ করতে পারে, যখন সে নিজের ভাষা সম্পর্কে সম্যক সচেতন।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' কথাটা। মানে তখনও জানতুম না, এখনও জানি না। অবশ্য ক্রিকেট মাঠে 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা'র মানেটা

খুব স্পষ্ট। আটানব্বই হল, আর দুই হলেই সেঞ্চুরী হত—আহা রে।

'কণ্টকল্পিত' নিরানব্বইয়ে এসে পৌঁছেছে। যাঁরা 'কণ্টকল্পিত' পড়েন, তাঁদের বিড়ম্বনা আর বিলম্বিত করতে মন চাইছে না। 'যার শেষ ভাল, তার সব ভাল'—এ ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা প্রযোজ্য নয়। এতদিন যা লিখেছি তা কিছু লোকের ভাল লাগেনি এবং মাঝে মাঝে প্রতিবাদের চিঠিও পেয়েছি। লেখায় তথ্যগত ভুল যাঁরা ধরিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যাঁরা ভুল খুঁজে পেয়েছেন, তাঁদের প্রতিবাদ আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি।

'কণ্টকল্পিত' ইতিহাসাশ্রিত নয়, কল্পনাশ্রিত। কতগুলো ব্যাপার দীর্ঘদিন ধরেই বুঝি না এবং এখনও বুঝি না। সেইজন্য সেইসব লেখার অনেক প্রতিবাদ বেরলেও আমি সংশোধন করার চেষ্টা করিনি। যেমন, 'সিরাজদৌল্লা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব'। এই যুক্তিহীন ও অর্থহীন বর্ণনার কোন মানে খুঁজে পাই না। সিরাজদৌল্লা যে উত্তরাধিকারসূত্রে নবাব হয়েছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর স্বাধীনতা আসেনি। বরাবরই এঁরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিলেন। অনেক নাটক এবং উপন্যাসে সিরাজদৌল্লাকে শেষ স্বাধীন নবাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে—তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকও এ কথা লিখেছেন, সেটিই বোধগম্য নয়। ইচ্ছাকৃত বিকৃতি বললে, যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অমর্যাদা করা হবে; সেটা আমি করতে চাই না। হয়তো পরাধীন ভারতবর্ষে দেশভক্ত এবং বীর নায়কের প্রয়োজন-বোধেই তাঁরা এটা করেছেন।

তারপরই আসে প্রতাপাদিত্যের কথা—

'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥'

আমার আপত্তি 'নাহি মানে পাতশায়'—এই অংশটিতে। প্রতাপাদিত্য দিল্লীর সম্রাটের সনদ নিয়ে এসে মহারাজা হয়েছিলেন। বাংলার 'বার ভূঁঞ্যা' মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেননি। প্রতাপাদিত্য পর্তুগীজ বোম্বেটেদের সাহায্য নিয়ে স্বাধীন বার ভূঁঞ্যার কয়েকজনের রাজ্য দখল করে নিয়ে রাজ্য বিস্তার করেন। এতে কুশলতা ও চতুরতা থাকতে পারে, কিন্তু 'নাহি মানে পাতশায়' কথাটি আসে না। মোগল সম্রাটের যাঁরা অধীন, এমন কোন রাজত্ব তিনি দখল করেননি এবং স্বাধীন যে রাজ্যগুলি তিনি দখল করেছিলেন, তা পর্তুগীজ বোম্বেটে-দের সহায়তায়। এই প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তী কেন করা হয়, তাও বুদ্ধির অগম্য।

মহারাজ নন্দকুমারের কথায় আসা যাক। যতরকম উপায় আছে, সব উপায় অবলম্বন করে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য বহু বাঙালীর সর্বনাশ করেন। ভাগ-বাঁটোয়ারায় গোলমাল হওয়ায় তাঁর প্রভু ইংরাজ তাঁকে এনে ফাঁসিকাঠে লটকে দেন। তাতে তিনি শহীদ কি করে হলেন? কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করলুম। আরও বহু নিদর্শন দেওয়া যায়। আমার এই লেখাগুলিতে অনেকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়গুলি একেবারে নিছক ইতিহাসাশ্রিত। আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলা দেশে কোন দিনই দেশভক্ত, দেশপ্রেমিকের অভাব হয়নি। এখানে এইসব ভুয়ো দেশপ্রেমিক সাজাবার কি প্রয়োজন ছিল? এতে শুধু ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়নি, ছেলেবেলা থেকেই অনেক ছাত্রছাত্রীকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক ও দেশভক্তের অনেক দোষ থাকতে পারে, সেগুলো হয়তো

সামাজিক অপরাধ, এবং তাতে দেশভক্তি বা দেশপ্রেমের কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। কিন্তু যাঁরা এমন কাজ করে গেছেন, যার সঙ্গে দেশভক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের দেশপ্রেমিক বা শহীদ সাজিয়ে কারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় সখারাম গণেশ দেউস্কর শিবাজী উৎসবের প্রচলন করেন। শিবাজী নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর দেশভক্তি ছিল অসামান্য। তিনি তৎকালীন মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং এক শক্তিশালী মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শিবাজীর জন্য পরবর্তী মারাঠা নায়কদের শ্রদ্ধা করতে হবে—এ শুধু অযৌক্তিক নয়, বাঙালীর পক্ষে একান্ত কলঙ্কজনক। আমরা মগ, পর্তুগীজ—এদের বোম্বেটে বলি, ডাকাত বলি, নৃশংস বলি, এদের আমরা ঘৃণা করি। মারাঠারা, যাদের বাংলা দেশে 'বর্গী' বলে অভিহিত করা হত, তাদের নৃশংসতা, অত্যাচার মগ-পর্তুগীজ এদের চেয়ে কিছু কম ছিল না, বরং বেশীই ছিল। আপস করেও সেই আপসকারীর গ্রাম বর্গীরা পুড়িয়ে দিত, এমন দৃষ্টান্তও কম ছিল না। গ্রামে, গঞ্জে, নগরে সব সময়েই অধিবাসীদের মুখে মুখে ছড়া শুনতে পাওয়া যেত,

'খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এলো দেশে'—

মায়েরা অনেক সময় বাচ্চাদের ভয় দেখাতেন 'ঐ বর্গী আসছে' বলে। এই অবস্থায় যদি সেই বর্গীদের কোন সেনাপতিকে বাংলা দেশের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখানো হয়, তা হলে তার দ্বারা যে শুধু অসত্য প্রচারিত হবে, তা না; বাঙালীর প্রতি অশ্রদ্ধাও দেখানো হবে।

সবচেয়ে মনকে যা পীড়া দিয়েছে, তা হল 'বঙ্গভঙ্গ' সম্বন্ধীয় প্রচার। আমার জন্ম ১৯০৪-এ। কাজে কাজেই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন যখন প্রখর, তখন আমার ৫।৬ বছর বয়স। যেমন 'রাখীবন্ধন' দেখেছি, তেমনি বাড়িতে এক বেলা রান্নাও বন্ধ, তাও দেখেছি, আর নানারকম গল্পও শুনেছি। যা দেখেছি, তার চেয়ে শুনেছি বেশী। যখন খালি পায়ে খেলে বাঙালীর ছেলেরা ১৯১১-য় শীল্ড পেল, সে ব্যাপারও তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। জন্মেছি পাথুরেঘাটায়। সেই সময়েই ৭৫ কিংবা ৭১ নম্বর পাথুরেঘাটা স্ট্রীটের বাড়ির সামনে বিপ্লবীদের গুলিতে এক পুলিস কর্মচারী নিহত হয়েছিল, তার উন্মাদনাও কম ছিল না। আবার বোধ হয় সেই সময়েই ১৯১০-এ বিরাট রুশ সাম্রাজ্য পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানীদের কাছে হেরে গেল। তাতেও শোরগোল কম হয়নি। দেশী এশিয়াবাসীর কাছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেবের জাত ইউরোপের রাশিয়ানরা হারতে পারে, এ ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু সত্যিই তাই ঘটেছিল। বড় হবার পর ধীরে ধীরে নানারকম কথা শুনে মন সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। পরে সন্দেহের অবসান হয় এবং স্থির সিদ্ধান্তে আসি যে, পার্টিশন রদ করে আমরা যে জয়ী হয়েছিলুম এটা ছিল বড় রকমের ধাপ্পা। অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, পরাজয়কে জয় বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটেছিল কূটনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা। আর এখানে যাঁরা ধাপ্পা দিলেন, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, দেশবরেণ্য, স্বনামধন্য ব্যক্তি। বাংলা বিভাগ যখন হয়, তখন বাংলার মধ্যে ছিল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মানভূম ও সিংভূম জেলা; আর পাট ও অন্য কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ সুরমা ভ্যালি অর্থাৎ সিলেট, কাছাড় জেলা। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ করে কি হল? এই জেলা চারটি বাংলা থেকে বেরিয়ে গেল। ইংরাজ সাম্রাজ্য-

বাদ চেয়েছিল একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করতে। রদ হল যে শর্তে, তাতে গোটা বাংলা দেশই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। বাস্তবপক্ষে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দেশের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ইংরাজ যা চেয়েছিল, তাই হল; আর হল অর্থনীতির দিক দিয়ে বাংলার সমূহ ক্ষতি। খনিজ সম্পদ বাদ দিয়ে বাংলায় রইল কেবলমাত্র কয়লার খনি। আর পাট ও কৃষিজাত দ্রব্যের এলাকা বাদ দিয়ে অন্য ক্ষতিও কম হয়নি। অর্থাৎ পার্টিশান রদ করে কূটনীতির দিক দিয়ে ইংরাজ জয়ী হল, আর অর্থনীতির দিক দিয়ে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হল। একে জয় বলে অভিহিত করা একটা মর্মান্তিক পরিহাস। পরিহাস যখন ব্যক্তিবিশেষকে করা হয়, সেটা হয় জীবনযাত্রার একটা অভিব্যক্তি, আর পরিহাস যখন দেশের আর্থিক সর্বনাশ উপলক্ষ করে করা হয়, তা হয় গভীর কলঙ্কজনক। এইরকম সব বিতর্কজনক বিষয় নিয়ে 'কষ্টকল্পিত'য় কিছু কিছু লিখেছি। এতে যাঁরা দুঃখ পেয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি; কিন্তু লেখার বিষয়বস্তু বদলাবার একটুও প্রয়োজন আছে, আমি মনে করি না।

'কষ্টকল্পিত' আমার জীবনী বা জীবনী সম্পর্কীয় স্মৃতিকথা নয়। কতগুলি ঘটনা, কতগুলি মানুষ, কতগুলি স্থান সম্বন্ধে আমার মনে যে রেখাপাত হয়েছে, তাই লেখা হয়েছে। তার যে অংশগুলির সঙ্গে ইতিহাসের মিল আছে, সেগুলি যেন লোকে গ্রহণ করেন; বাকিগুলি সবই আমার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে লেখা হয়েছে। বহু মানুষের কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমার পরিচিত উল্লেখযোগ্য সকলের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং আশপাশ থেকেও অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। তাতে অনুযোগ করা হয়েছে যে, কতগুলি ব্যক্তি, স্থান ও বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। অনুযোগগুলি সঠিক। কিন্তু আমি নিরুপায়। সকলের কথা লেখা সম্ভব নয়, তেমনি সকল স্থান ও ঘটনার কথাও লেখা হয়ে ওঠেনি। এর জন্য হয়তো কিছু মানসিক কষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু সেটা আমার একান্ত নিজস্ব। এমন অনেক গৃহস্থ আছেন, যাঁদের বাড়িতে আমি থাকার জন্য তাঁরা নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন—তাঁদের কথাও লেখা হয়নি। কারণ, সব কথা লেখা যায় না। রুশো বা গান্ধী হয়তো সব কথা লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি তাঁদের জীবনী। আমি তো জীবনী লিখিনি।

প্রতিবাদ যত পেয়েছি, তার চেয়ে বেশী পেয়েছি সমর্থন। কিন্তু মানুষের সামাজিক মন এমন যে, সমর্থন পেলে যত না খুশী হয়, প্রতিবাদ পেলে তার চেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হয়। যারা হাজার হাজার লোকের কাছে ফুলের মালা পেয়েছেন, তাঁরা যদি কয়েকজনের কাছে নিন্দার মালা বা জুতোর মালা পান, অনেক সময়ে সেটাই বড় হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ সম্পর্কে [illegible]র ঔদাসীন্য থেকেই এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। আমার বন্ধুবান্ধব মহলে ঠাট্টা করে বলে, 'তুমি মারা গেলে বলতে পারব না, তুমিও একজন মন্ত্রী ছিলে।' এটা পরিহাস করে বললেও এর মধ্যে একটু খেদের আভাস আছে। এঁরা মনে করতে পারেন না যে, আমার স্তরের একজন মানুষ, যে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে কতকগুলি পরিবারে বিনা সঙ্কোচে দীর্ঘকাল বসবাস করতে পারে, তার কোনো মূল্য আছে? মূল্যবোধ আমাদের কাছে আজ তার যথার্থ মূল্য হারিয়েছে। সেইজন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছার স্থান কোন পদ অলঙ্কৃত করার বহু নীচে বলে অনেকের মনে হয়। এই মনোভাব হল অর্বাচীন। কোন বাধ্যতামূলক চাপের জন্য আমি রাজনীতি করিনি, স্বেচ্ছায়

করেছি। তার প্রতিদান একমাত্র প্রীতিতেই হতে পারে। পদমর্যাদা বা আর্থিক সঙ্গতির উপর তা নির্ভর করে না। যখন দেখি কোন তরুণ যুবক নতুন রাজনীতি করতে এসে অক্লান্ত নিষ্ঠায় কাজ করে হয়তো কোন পদ লাভ করেছে, বা মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী হয়েছে, তখন সত্যিই আনন্দ হয়। কিন্তু যখন সেই যুবকই দেখি হোটেলের সামান্য কর্মচারীকে প্রহার করতে দ্বিধা করে না, তখন মনটা সত্যিই মুষড়ে যায়। অবশ্য এ ঘটনা খালি রাজনীতিতেই নয়, অন্য স্তরেও আছে। যেমন কলকাতার প্রতিষ্ঠাবান দলের অধিনায়ক কর্তৃক রেফারীকে প্রহার। এ যে কি ভীষণ লজ্জাকর ও কলঙ্কজনক ঘটনা, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এইসব ঘটনাই জীবনের সব নয়। জীবন আরও অনেক জিনিস নিয়ে গড়ে ওঠে। তার মধ্যে যেটুকু ক্লেদাক্ত, তার জন্য সত্যিই দুঃখিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে সেটাই সবটা ভাবলে ভুল করা হবে। কোন মানুষই গুণহীন বা দোষমুক্ত নয়। বিচার করবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলাই সবচেয়ে দুঃখজনক। আমার লেখায় হয়তো সব সময়ে এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি, কিন্তু যেখানে যেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে এবং পাঠকদের মধ্য থেকেই সেগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন এবং সেইজন্যই ঐসব পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদি পাঠকরা মনে করেন যে, এ লেখার কোন শুরুও ছিল না, কোন শেষও নেই, তা হলেই আমার লেখা চরিতার্থতা পাবে।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা লিখেছি এইজন্য যে সাধারণতঃ লোকে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা বলতে বিষয়টির অবসান বোঝায়।

'কষ্টকল্পিত' এইখানেই শেষ করা উচিত বলে আমি মনে করছি। অবশ্য আবার যদি চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

নির্ঘণ্ট

অ

খ

গ

ঘ

চ

ফ

ব